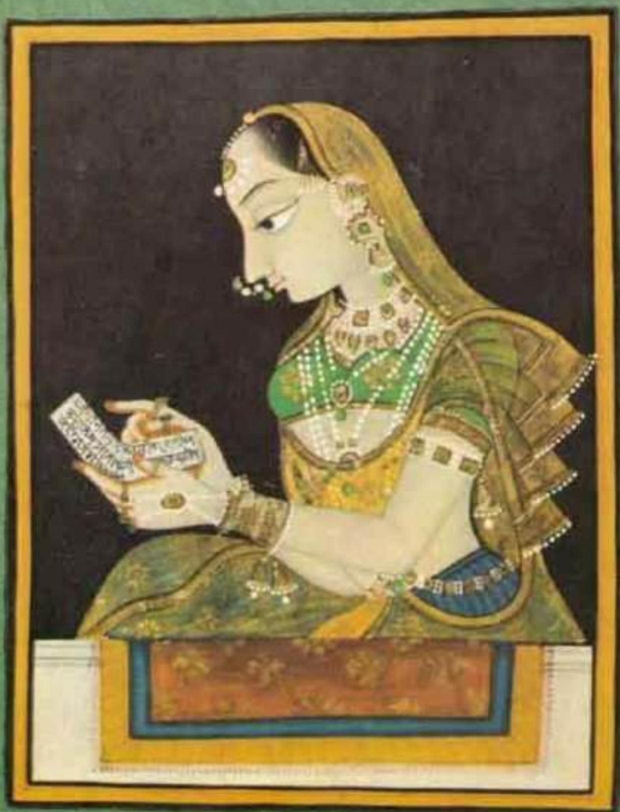
অশোক মিত্র

ভারতের চিত্রকলা

(প্রথম খণ্ড)



ভারতের চিত্রকলা

প্রথম খণ্ড

ভারতের চিত্রকলা

প্রথম খণ্ড

[আদি যুগ থেকে খ্রীস্টীয় আঠারো শতকের প্রথমার্ধ]

অশোক মিত্র

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ ১৯৫৬

প্রথম আনন্দ সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৫ মুদ্রণ সংখ্যা ২০০০
দ্বিতীয় মুদ্রণ জানুয়ারি ২০০০ মুদ্রণ সংখ্যা ১০০০

ISBN 81-7215-239-6

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
পি ২৪৮ সি. আই. টি. স্কিম নং ৬ এম কলিকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে
তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য ১৫০.০০

আমার মায়ের স্মৃতিতে



এই লেখকের অন্যান্য বই

ইওরোপের ভাস্কর্য

ছবি কাকে বলে

পশ্চিম ইওরোপের চিত্রকলা

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

প্রয়াত 'লোকায়ত' দার্শনিক বন্ধুবর দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের একান্ত আগ্রহে স্বাক্ষর প্রকাশসংস্থা ১৯৫৫ সালে 'পশ্চিম ইওরোপের চিত্রকলা' এবং স্বাক্ষর ও বেঙ্গল পাবলিশার্স যুগ্মভাবে ১৯৫৬ সালে 'ভারতের চিত্রকলা' প্রকাশ করেন। ইওরোপীয় ভাষায় ইওরোপীয় সভ্যতার প্রতিযুগের রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে ইওরোপীয় চিত্ররীতি ও ভাস্কর্যের দার্শনিক ও শৈলীগত পরিবর্তনের একাধিক উৎকৃষ্ট ধারাবাহিক ইতিহাস আগে থেকে পড়া থাকার ফলে, উপরন্তু ছাত্রাবস্থায় ইংলন্ডে ব্রিটিশ মিউজিয়মে ও অন্যান্য সংগ্রহালয়ে মূল ছবি ও ভাস্কর্য দেখার ফলে প্রথম বইটি লেখা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। কিন্তু ভারতের ইতিহাসের নানা যুগের ও নানা অঞ্চলের চিত্ররীতির দার্শনিক ভিত্তি ও রচনারীতি ও শৈলীর পারস্পরিক আদানপ্রদান, সংযোগ, পরিবর্ধন ও পরিশীলনের কালক্রমিক ইতিহাসের ধারাবাহিক আলোচনা সম্বলিত কোন একক গ্রন্থ ১৯৫৬-র আগে প্রকাশিত হয়নি। যা কিছু গবেষণা ও রচনা হয় তার অধিকাংশই হয় আঞ্চলিক, না হয় বিশেষ যুগের সৃষ্টির আলোচনায় আবদ্ধ থাকে। এমন কি ১৯২৭ সালে প্রকাশিত পার্সি ব্রাউনের বইটি অথবা লব্ধপ্রতিষ্ঠ দেশী বিদেশী কলা ঐতিহাসিক বা সমালোচকরাও ভারতের চিত্রকলার কোন ধারাবাহিক ইতিহাস রেখে যাননি, যা নাকি পরপর যুগগুলির রাজনৈতিক, সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে চিত্ররীতি ও দর্শনের ক্রমবিবর্তনের সমন্বয় প্রয়াসে রচিত। ১৯৫৬ সালের শুরুতে আমি যখন 'ভারতের চিত্রকলা'র প্রথম সংস্করণের পাণ্ডুলিপি অত্যন্ত সংকোচ বশে শিল্পীবর যামিনী রায় ও অতুল বসুর কাছে তাঁদের মতামতের আশায় পেশ করি, তখন তাঁদের কাছে আমি অপ্রত্যাশিত উৎসাহ পাই। প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় তার উল্লেখ পাঠক পাবেন।

সেই ভূমিকাতেই আলোচিত ছবিগুলির মূলের সঙ্গে পরিচয়ের অভাবের জন্য আমি পাঠকের মার্জনা ভিক্ষা করি। বস্তুত ১৯৫৫-র আগে ভারতের কয়েকটি মাত্র আঞ্চলিক চিত্রশালার সংগ্রহেই আমার পরিচয় সীমিত ছিল। কিন্তু আমার সৌভাগ্যক্রমে ১৯৫৬ সালের পর থেকে দুটি বইই জ্ঞানের বিভিন্ন জগতের বিশেষজ্ঞদের কাছে অভাবিত সাধুবাদ পাওয়ায় আমি ধন্য বোধ করি। যেমন একদিকে সুপ্রসিদ্ধ নবীন অমর্ত্য সেন, সুখময় চক্রবর্তী থেকে বিশ্ববিশ্রুত পরম পণ্ডিত সত্যেন্দ্রনাথ বসু, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং শিল্পীবর রামকিঙ্কর বেজ ও বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়রাও তৃপ্তি প্রকাশ করে আমাকে ধন্য করেন। ১৯৬৫ সাল নাগাদ যখন দুটি বইয়েরই প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয় তখন থেকেই আমি বহু পরিচিত, অপরিচিত সুধীজনের কাছে পুনর্মুদ্রণের দাবি বা অনুরোধ পাই। এমন কি ১৯৯০ সালে আমি যখন কার্যোপলক্ষে ঢাকায় যাই তখন অনেক বংলাদেশী সুধীজনও আমাকে 'ভারতের চিত্রকলা' বিষয়ে অনুরোধ জানান।

আমার বিশেষ সৌভাগ্যবলে ১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত দিল্লীতে কাজ করার সময়ে আমি ভারতের বিভিন্ন স্থানে অনেক চিত্রশালা ও সংরক্ষণকেন্দ্র এবং ইওরোপ, সোভিয়েট ইউনিয়ন, লণ্ডন, আমেরিকা ও জাপানের প্রধান চিত্রশালাগুলিতে শুধু ইওরোপীয় নয়, ভারতীয় চিত্রসংগ্রহ দেখার সুযোগ পাই। ফলে ১৯৮০-র দশকে যখন আনন্দ পাবলিশার্স আমার 'ছবি কাকে বলে' এবং 'পশ্চিম ইওরোপের চিত্রকলা'র দ্বিতীয় সংস্করণ, এবং ১৯৯২ সালে আমার 'ইওরোপের ভাস্কর্য' বইগুলি প্রকাশ করেন, তখন অনেক মূল ছবি ও ভাস্কর্যের সঙ্গে আমার

সাক্ষাৎ পরিচয়ের দরুন বইগুলিতে আরো দৃঢ়ভাবে নিজস্ব প্রতীতি ও মতামত প্রকাশের মনোবল আমি পাই।

ভাগ্যক্রমে ১৯৭৯ থেকে ১৯৯৩ পর্যন্ত আমি প্রায় এক বছর অন্তর প্রতিবছর মাস চারেক করে আমেরিকায় থেকে নানা মিউজিয়মে ও চিত্রশালায় ভারতীয় চিত্রসংগ্রহ দেখার সুযোগ পাই। আমার বিশেষ সৌভাগ্যবশে লেনিনগ্রাড, ভিয়েনা, প্যারিস, লন্ডন ও আমেরিকার যেসব সংগ্রহশালায় ভারতীয় চিত্রের সংগ্রহ আছে তাদের সংরক্ষকরা আমাকে সেসব সংগ্রহ ধীরেসুস্থে দেখার সুযোগ দেন। সেসব সুযোগ আমার জীবনে পরম লাভ হিসাবে মনে করি। ক্লীভল্যান্ড মিউজিয়মে আমি যখন ভারতীয় শিল্পীকৃত সম্রাট শাজাহানের প্রতিকৃতির রেমব্রান্টের নিজের হাতে তৈরি নকল ছবি দুটি পাশাপাশি দেখি তখন আমার সারা দেহে যে লোমহর্ষণ হয় তা আমার চিরদিন মনে থাকবে।

১৯৮৩ সালে আনন্দবাজার পত্রিকাগোষ্ঠীর কানাইলাল সরকার মহাশয় 'ভারতের চিত্রকলা' পুনঃপ্রকাশের উদ্দেশ্যে উদ্যোগী হয়ে আমাকে আনন্দ পাবলিশার্সের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ করেন। ১৯৫৫-র পর সারা ভারতে ত বটেই, সোভিয়েট ইউনিয়নে, ইংলন্ডে, বিশেষ করে আমেরিকায় ভারতীয় চিত্রঐতিহ্য নিয়ে এত বিশদ ও ব্যাপক গবেষণা ও আলোচনা হয় যে শুধুমাত্র পুনর্মুদ্রণে আমার মন কিছুতেই সায় দেয়নি। সর্বদাই মনে হত, শুধুমাত্র পুনর্মুদ্রণে আমি পাঠককে ঠকাবো, এমন কি তাঁদের কাছে অপরাধী হব। সেই বিবেকবশে ১৯৯১ সাল থেকে আমি আদ্যোপান্ত পুনর্মূল্যায়ন ও পরিবর্ধনের কাজ শুরু করি। সেই কাজে বিড়লা অ্যাকাডেমি অভ আর্ট এন্ড কালচার এবং তার অধ্যক্ষা ডঃ শ্রীমতী অর্চনা রায় আমাকে অকুণ্ঠচিত্তে সর্বপ্রকার সাহায্য করেছেন। প্রতিষ্ঠানটি এবং বিশেষ করে শ্রীমতী রায়কে আমার বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।

প্রথম সংস্করণের কলেবর স্বভাবতই স্ফীত হয়ে এই সংস্করণে প্রায় দুই গুণ হয়েছে। ফলে, দুই খণ্ডে প্রকাশ অনিবার্য হয়ে পড়ে। উপরন্তু আগের তিনটি বইয়ের মত এই দুই খণ্ডেও আনন্দ পাবলিশার্সের কর্তৃপক্ষ, বিশেষ করে শ্রীযুক্ত বাদল বসু ও বন্ধুবর শোভন বসু, যাঁকে আমি আনন্দ পাবলিশার্সের নির্মম অনুবীক্ষণ যন্ত্র বলে মনে করি, তাঁরা আমার কোন আবদারে বাদ ত সাধেনই নি, উল্টে আমি যতখানি মনে করেছিলুম তার থেকে অনেক বেশী সংখ্যক রঙীন চিত্র দিয়ে, মিতব্যয়িতা দূরের কথা, মুক্তহস্তের পরিচয় দিয়ে আমার প্রচেষ্টাকে সম্মানিত করেছেন। ফলে, বইয়ের বক্তব্যে ও প্রস্তুতিতে যা কিছু দোষত্রুটি থেকে গেল তার জন্য নিজেকে দায়ী করা ব্যতীত আমার অন্য কোন অজুহাত তাঁরা রাখেননি। আমি তাঁদেরকে এবং তাঁদের সহকর্মীদের আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এই বিরাট রচনার শ্রীশোভন বসু-কৃত পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণানুক্রমিক নির্ঘণ্ট বইটিকে দুর্লভ মর্যাদা ও মূল্য দিয়েছে। সেজন্য তাঁর কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য।

৫০৫ যোধপুর পার্ক
কলকাতা ৭০০০৬৮
১৬ ডিসেম্বর ১৯৯৪

অশোক মিত্র

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

১৯২৭ সালে পার্সি ব্রাউনের ইণ্ডিয়ান পেন্টিং-এর পর ইংরেজি বা বাংলায় ভারতের চিত্রকলা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক ইতিহাস আর বোধহয় প্রকাশিত হয়নি। আশা করি বাংলা ভাষায় প্রথম প্রয়াস হিসাবে বইটি সহৃদয় পাঠকের কাছে নানা ত্রুটি বিচ্যুতির মার্জনা পাবে।

সর্বপ্রথমে আমার বন্ধু ও প্রকাশক শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে ঋণ স্বীকার করি। তিনি বিশেষভাবে লেগে থেকে উৎসাহ না দিলে বইটি আদৌ হাতে নেওয়া সম্ভব হত কিনা সন্দেহ। যে সমস্ত বই এবং প্রবন্ধের কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী তার সংক্ষিপ্ত তালিকা বইয়ের শেষে দিয়েছি। এই সুযোগে অজন্তার রচনা ও পরিপ্রেক্ষিত সম্বন্ধে শ্রীমতী জনিন ওবোয়ের একটি প্রবন্ধের বিশেষ উল্লেখ প্রয়োজন, কারণ বইয়ের একটি অংশে শুধু যে আমি তার অনুবাদ দিয়েছি তা নয়, তাঁর লেখাটি এতই সার্থক যে ভারতের চিত্রকলা সম্বন্ধে অত মূল্যবান একক প্রবন্ধ দুর্লভ। ভারতের নানাস্থানে যতগুলি সাধারণগম্য চিত্রশালা ও ব্যক্তিগত সংগ্রহ আমি দেখার সুযোগ পেয়েছি তাদের কর্তৃপক্ষদের কাছেও আমি এই উপলক্ষে আমার ধন্যবাদ জানাই। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে অধিকাংশ উৎকৃষ্ট প্রাচীন ও আধুনিক ছবি এখন ভারতের বাইরে, সেগুলি দেখার সুযোগ আগে সামান্য যা হয়েছে তা এই বই লেখার কাজে আসেনি, অতএব ছাপা এ্যালবাম দেখেই সাধ মেটাতে হয়েছে। বলা বাহুল্য বড় বড় সংগ্রহের খুব কম ছবিই ছাপা হয়, আর বিশেষ করে ভারতীয় ছবির উৎকৃষ্ট ছাপা নকল খুব কমই আছে। সুতরাং প্রত্যক্ষ দেখার যে আবেগ ও প্রত্যয় লেখায় আসা সম্ভব তা বইয়ের অনেক জায়গায় আসেনি।

আমার পরম সৌভাগ্যের বিষয় শ্রীযুক্ত যামিনী রায় মহাশয় অনেকগুলি অধ্যায় সযত্নে পড়ে সংশোধন করে দিয়েছেন, যদিও যাবতীয় ভুলত্রুটির জন্য আমিই দায়ী। তাঁর কাছে আমার ঋণস্বীকারের প্রয়াসও ধৃষ্টতা মাত্র, আমার সামান্য উদ্যমকে তিনি দুর্মূল্য মর্যাদা দিয়েছেন। শ্রীযুক্ত পৃথ্বীশ নিয়োগী আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন, বস্তুত আধুনিক শিল্পীদের সম্বন্ধে তিনি আমাকে যত তথ্য ও তত্ত্বের সন্ধান দিয়েছেন, তার জন্য তাঁর কাছে আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞ। শ্রীমতী আভা মিত্র আদ্যোপান্ত পাণ্ডুলিপি নকল করে দিয়েছেন ও শ্রীযুক্ত সমর সেন কিছু কিছু অংশ পড়ে ত্রুটি বিচ্যুতি সংশোধন করে দিয়েছেন।

আর্ট ইন ইণ্ডাস্ট্রি প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অজিত মুখোপাধ্যায় অনেকগুলি ব্লকের ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে বইটিকে সমৃদ্ধ করেছেন ; তাঁকে এবং তাঁর প্রতিষ্ঠানকে ধন্যবাদ জানাই। শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয় ও শ্রীযুক্ত যামিনী রায় মহাশয়ের ছবি ছাপাতে পেরে বইটি বিশেষ মর্যাদালাভ করেছে। অন্যান্য ছবির জন্য যাঁদের কাছে বইটি ঋণী তাঁদের উল্লেখ যথাস্থানে করেছি। জাতীয় গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বি এস কেশবন ও পশ্চিমবঙ্গ দপ্তরের গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার চক্রবর্তী ও তাঁদের সহকর্মীরা অনুগ্রহ না করলে আমার পক্ষে অনেকগুলি বই বারবার করে দেখা অসম্ভব হত।

তাঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

বইটির কিছু কিছু অংশ সাহিত্যপত্র, পরিচয় নতুন সাহিত্য, পরিক্রমা, তরুণের স্বপ্ন, চতুরঙ্গ ও অগ্রণীতে প্রথম বেরোয়, পত্রিকাগুলির সম্পাদকমণ্ডলীকে এই সুযোগে আমার ধন্যবাদ জানাই। ইণ্ডিয়ান ফোটো এনেগ্রভিং কোম্পানির কর্তৃপক্ষ ও কর্মীবৃন্দ বিশেষ ধৈর্য ও যত্ন সহকারে বইটি ছেপেছেন, তাঁরা আমার ধন্যবাদার্হ, ইতি।

কলকাতা, ৩০শে জুলাই ১৯৫৬

অশোক মিত্র

সূচী

চিত্রসূচী

ক—রেখাচিত্র

খ—রঙীন এবং হাফটোন চিত্র

ফৈজাবাদ (অযোধ্যা)। আনু. ১৭৭০ (ফ'ক ও আর্চারের ইণ্ডিয়ান মিনিয়েচর্স ইন ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি-র সৌজন্যে)

২১৭ প্রেমিকার আলিঙ্গনবদ্ধ প্রেমিকের হাতে তীরধনুক। শিল্পী উদবন্ত সিং। মুঘল অন্তযুগ। প্রাদেশিক। অযোধ্যা। আনু. ১৭৭৫ (প্রতাপাদিত্য পালের কোর্ট পেন্টিংস অভ ইণ্ডিয়া ১৬-১৯ শতকের সৌজন্যে)

যোগী ও রাজকুমার। প্রাদেশিক। মুর্শিদাবাদ। আনু. ১৭৫০-৭৫ (প্রতাপাদিত্য পালের কোর্ট পেন্টিংস অভ ইণ্ডিয়ার ১৬-১৯ শতকের সৌজন্যে)

২১৮ মধ্যমাদি রাগিণী। প্রাদেশিক। মুর্শিদাবাদ। আনু. ১৭৬০ (ফ'ক ও আর্চারের ইণ্ডিয়ান মিনিয়েচর্স ইন ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি-র সৌজন্যে)

২১৯ বৃন্দাবনে কৃষ্ণ বলরাম। ভাগবত পুরাণ। উত্তর ভারত। আনু. ১৫৯০ (প্রতাপাদিত্য পালের কোর্ট পেন্টিংস অভ ইণ্ডিয়া ১৬-১৯ শতকের সৌজন্যে)

২২০ মালকোষ রাগিণী। শিল্পী নাসিরুদ্দিন। মেবার। আনু. ১৬০৫ (প্রতাপাদিত্য পালের কোর্ট পেন্টিংস অভ ইণ্ডিয়া ১৬-১৯ শতকের সৌজন্যে)

রাধার অন্বেষে কৃষ্ণ। শিল্পী কেশবদাস। রসিকপ্রিয়া। মালোয়া। আনু. ১৬২৫-১৬৫০ (প্রতাপাদিত্য পালের কোর্ট পেন্টিংস অভ ইণ্ডিয়া ১৬-১৯ শতকের সৌজন্যে)

২২১ পুষ্করিণী তীরে স্নানরতা রমণী; হাঁস ও সারস। দেওগড়। মেবার। আনু. ১৭৫০-১৭৭৫ (প্রতাপাদিত্য পালের কোর্ট পেন্টিংস অভ ইণ্ডিয়া ১৬-১৯ শতকের সৌজন্যে)

২২২ অশোকবনে হনুমান। উদয়পুর, মেবার। আনু. ১৬৫৩ (ফ'ক ও আর্চারের ইণ্ডিয়ান মিনিয়েচর্স ইন ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি-র সৌজন্যে)

রাধার কুঞ্জে কৃষ্ণ রাধার নিদ্রাভঙ্গ করছেন। মেবার। আনু ১৭০০ (প্রতাপাদিত্য পালের কোর্ট পেন্টিংস অভ ইণ্ডিয়া ১৬-১৯ শতকের সৌজন্যে)

২২৩ রাজকুমারী শিশুকে আশীর্বাদ করছেন; সমুখে সহচরী দাঁড়িয়ে। বিলাসপুর। আনু ১৬৫০ (প্রতাপাদিত্য পালের কোর্ট পেন্টিংস অভ ইণ্ডিয়া ১৬-১৯ শতকের সৌজন্যে)

২২৪ বিষ্ণুর দুই কোলে শ্রীদেবী ও ভূদেবী। বাশোলি অথবা মানকোট। আনু. ১৭০০ (প্রতাপাদিত্য পালের কোর্ট পেন্টিংস অভ ইণ্ডিয়া ১৬-১৯ শতকের সৌজন্যে)

২২৫ বিষ্ণু ও লক্ষ্মী (?)। কুলু। আনু. ১৭০০-১৭২৫ (প্রতাপাদিত্য পালের কোর্ট পেন্টিংস অভ ইণ্ডিয়া ১৬-১৯ শতকের সৌজন্যে)

২২৬ ঝড় আসন্ন। সম্ভবত গুরশাই কলম। গুলের। আনু. ১৭০০ (প্রতাপাদিত্য পালের কোর্ট পেন্টিংসে অভ ইণ্ডিয়া ১৬-১৯ শতকের সৌজন্যে)

২২৭ অলৌকিক কর্মকাণ্ডে রত শ্রীরাম। রামায়ণ চিত্রমালা। হিন্দুর। আনু. ১৮০০-১৮২৫ (প্রতাপাদিত্য পালের কোর্ট পেন্টিংস অভ ইণ্ডিয়া ১৬-১৯ শতকের সৌজন্যে)

কৃষ্ণ ও রাধা। গাড়োয়াল। আনু. ১৭৭৫ (প্রতাপাদিত্য পালের কোর্ট পেন্টিংস অভ ইণ্ডিয়া ১৬-১৯ শতকের সৌজন্যে)

২২৮ রাজকুমার বাজপক্ষী লইয়া শিকার খেলিতেছেন। গোলকুণ্ডা। আনু. ১৬১০-২০ (ফ'ক ও আর্চারের ইণ্ডিয়ান মিনিয়েচর্স ইন ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি-র সৌজন্যে)

পাতিয়ালার রাজা করম সিং। পাতিয়ালা। আনু. ১৮৩০ (প্রতাপাদিত্য পালের কোর্ট পেন্টিংসে অভ ইণ্ডিয়া ১৬-১৯ শতকের সৌজন্যে)

২২৯ বাশোলির রাজা সংগ্রাম পাল (১৬৩৫-১৬৭৩)। বাশোলি। আনু. ১৬৭৫-১৭০০ (প্রতাপাদিত্য পালের কোর্ট পেন্টিংসে অভ ইণ্ডিয়া ১৬-১৯ শতকের সৌজন্যে)

২৩০ কৃষ্ণের বিরুদ্ধে গোপীদের অনুযোগ। ভাগবত পুরাণ। আনু. ১৬৭৫-১৭০০ (প্রতাপাদিত্য পালের কোর্ট পেন্টিংস অভ ইণ্ডিয়া ১৬-১৯ শতকের সৌজন্যে)

সিংহাসনাধীন রাজা। বিজাপুর। আনু. ১৬৭৫ (প্রতাপাদিত্য পালের কোর্ট পেন্টিংস অভ ইণ্ডিয়া অফিস ১৬-১৯ শতকের সৌজন্যে)

২৩১ পারসীক রাজকুমার। গোলকুণ্ডা। আনু. ১৬৭৫ (প্রতাপাদিত্য পালের কোর্ট পেন্টিংস অভ ইণ্ডিয়া ১৬-১৯ শতকের সৌজন্যে)

২৩২ সোরথ রাগিণী। হায়দ্রাবাদ। আনু. ১৭৬০ (ফ'ক ও আর্চারের ইণ্ডিয়ান মিনিয়েচর্স ইন ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির সৌজন্যে)

মহীশূরের টিপু সুলতান (১৭৮২-১৭৯৯)। মহীশূর। আনু. ১৮০০ (ফ'ক ও আর্চারের ইণ্ডিয়ান মিনিয়েচর্স ইন ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি-র সৌজন্যে)

২৩৩ ইতিহাসের আগের যুগের গুহাচিত্র

মহেঞ্জোদারো : ডি-কে এরিয়া, জি সেকশন, তলার স্তর : ষাঁড়ের সীল

হরপ্পা পটারি : মানুষ ও জীবজন্তু (হরপ্পার ঢিপি)

মহেঞ্জোদারো : ডি-কে এরিয়া, জি সেকশন, তলার স্তর : চিত্রিত পটারির টুকরো

(ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সৌজন্যে)

২৩৪ হরপ্পায় প্রাপ্ত বসা অবস্থায় ছোট মূর্তি

হরপ্পায় প্রাপ্ত মানুষের ছোট মূর্তি

হরপ্পায় প্রাপ্ত ছেলে-কোলে মাতৃমূর্তি

মহেঞ্জোদারো : ডি. কে. এরিয়া, জি সেকশন, নীচের স্তর : বাঘের সীল

মহেঞ্জোদারো : ডি. কে. এরিয়া, জি সেকশন, নীচের স্তর : হাতির সীল

হরপ্পায় প্রাপ্ত দুটি ছোট মূর্তি

মহেঞ্জোদারোয় প্রাপ্ত নানা জন্তুর সীল

(ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সৌজন্যে)

২৩৫ সিগিরিয়ার একটি ফ্রেস্কো (আর্ট ইন ইন্ডাষ্ট্রি পত্রিকার সৌজন্যে)

সাঁচির পূর্বতোরণে খোদাই (খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতক) (আর্ট ইন ইন্ডাষ্ট্রি পত্রিকার সৌজন্যে)

২৩৬ আবু পর্বতের দিলওয়ারা মন্দিরে ছাতের ভিতরকার ভাস্কর্য (অনুমান ১২৩২ খ্রীস্টাব্দ) (আর্ট ইন ইন্ডাষ্ট্রি পত্রিকার সৌজন্যে)

২৩৭ বাঘ : ৩নং গুহার প্রকোষ্ঠে দরজার ছবি

বাঘ : ৩নং গুহার প্রকোষ্ঠে দরজার ছবি

বাঘ : ৪নং গুহার সমুখের বারান্দার ছবি

বাঘ : ৪নং গুহার উত্তর-পূর্ব প্রকোষ্ঠের ফ্রিজের অংশ

(দি ইন্ডিয়ান অ্যান্টিকোয়ারি পত্রিকা অগাস্ট ১৯১০ সংখ্যার সৌজন্যে)

২৩৮ দণ্ডন-উলিখ : চীনে রাজকুমারী

দণ্ডন-উলিখ : পারসীক বোধিসত্ত্ব (কাঠের পাটায় চিত্রিত)

(ভি-এ স্মিথের ফাইন আর্ট ইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড সিলোনের সৌজন্যে)

২৩৯ তিব্বতী ধ্বজা : বুদ্ধ অমিতাভ

(ই-বি হ্যাভেলের ইণ্ডিয়ান স্কাল্‌পচার অ্যান্ড পেন্টিং-এর সৌজন্যে)

২৪০ দেবানন্দ চৌদ্দটি স্বপ্ন দেখছেন : ফোলিও ৩-ক। কল্পসূত্র ও কালকাকথা। সংগ্রহ : মুনি শ্রীপুণ্যবিজয়জী মহারাজ। খ্রীঃ ১৩৪৬।

মহাবীরের জন্ম। ফোলিও ৩৬-খ। কল্পসূত্র ও কালকাকথা। সংগ্রহ : মুনি শ্রীপুণ্যবিজয়জী মহারাজ। খ্রীঃ ১৩৪৬

(ডঃ মোতিচন্দ্র ও ডঃ উমাকান্ত পি শাহ-র নিউ ডকুমেন্টস অভ জৈন পেন্টিং-এর সৌজন্যে)

২৪১ যুদ্ধদৃশ্য : নল-দময়ন্তী রাস পুঁথিপত্র, ফোলিও ১৬-খ। সংগ্রহ : মুনি শ্রীপুণ্যবিজয়জী মহারাজ। খ্রীঃ ১৭শ শতক

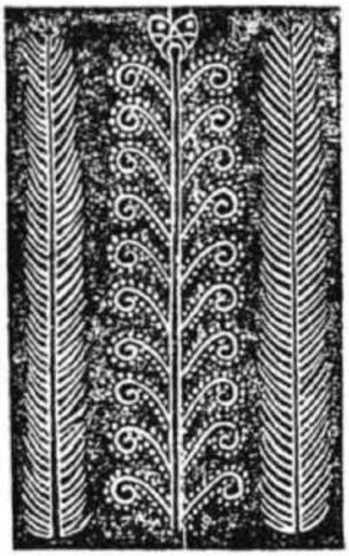
(উপরে) ব্যাতস্ত্র বৃক্ষের বিভিন্ন প্রতীক। ফোলিও ৬-ক। লঘু সংগ্রহণী সূত্র। খ্রীঃ ১৫৮৩

(নীচে) নর্তকী ও বাদ্যকরগণ। ফোলিও ৭-খ। লঘু সংগ্রহণী সূত্র। খ্রীঃ ১৫৮৩। সংগ্রহ : মুনি শ্রীপুণ্যবিজয়জী মহারাজ

(ডঃ মোতিচন্দ্র ও ডঃ পি শাহ-র নিউ ডকুমেন্টস অভ জৈন পেন্টিং-এর সৌজন্যে)

২৪২ মহাবীরের জন্ম। উত্তরাধ্যয়ন সূত্রের পুঁথিচিত্র : ষোল শতক (১৫৯০-১) (ডব্লিউ নর্মান ব্রাউনের ম্যানাস্ক্রিপ্ট ইলাস্ট্রেশন্‌স অভ দি উত্তরাধ্যয়ন সূত্রের সৌজন্যে)

আমীর হামজা (১৫৫০-৭৫) : কাপড়ের উপর চিত্র (ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়মের



প্রস্তাব

১৯১১ সালে বিখ্যাত ইংরেজ সমালোচক রজার ফ্রাই প্রাচ্যদেশের চিত্রকলা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে এই মন্তব্যটি করেন :

> গত বিশ বছরে যে সব বিস্ময়কর ব্যাপার প্রকাশ পেয়েছে, পাশ্চাত্য চারুকলার উপর তার ফল কি রকম দাঁড়াবে ? ফল যে প্রায় সবটাই নিতান্ত শুভ হবে এ বিষয়ে বোধহয় সন্দেহের অবকাশ নেই। একবার যদি বিদগ্ধ-সমাজ প্রাচ্য চারুকলার শ্রেষ্ঠ কীর্তির সংযম, উপকরণের মিতব্যয়, তাদের অনির্বচনীয়, চরম গুণে অভ্যস্ত হন, তাহলে আশা করা যায় তাঁরা আধুনিক পাশ্চাত্য চিত্রকলার অধিকাংশ কাজের দিকে আর ফিরেও তাকাতে চাইবেন না। তখন তাহলে বোধহয় আমাদের শিল্পীদের নতুন এক বিবেক চেতনা হবে, তাঁরা তখন নিছক চোখে-যেমনটি-দেখছি তেমনটি নিখুঁত করে আঁকার জবরজঙ্গ যন্ত্রপাতি সব ফেলে দেবেন, তারপর শুধু বিশ্বপ্রকৃতির মূল সত্তাটুকু রূপায়িত করার দিকে মন দেবেন। এইভাবে চিত্রকলাকে পরিশুদ্ধ করে, যে সব লক্ষণ গৌণ, যাদের সাক্ষাৎ তন্ময় প্রকাশ শক্তি নেই, তাদের থেকে মুক্ত হয়ে, পাশ্চাত্য শিল্পীরা আবার নিজেদের পুরনো বহুবিস্মৃত ঐতিহ্যে ফিরে যাবেন মাত্র। আমাদের কাছে প্রাচ্য চিত্রকলার সবচেয়ে বেশি ব্যবহারিক মূল্য হচ্ছে এই যে প্রতিচ্ছবি বা ভেরিসিমিলিটিউডের মৃগতৃষ্ণার পিছনে ঘুরে যে সব মূল সূত্র আমরা চাপা দিয়েছি, প্রাচ্যের শিল্পীরা যুগ যুগ ধরে ঠিক সেইগুলিকেই অনেক বেশি একাগ্রমনে তুলে ধরেছেন।

বীজ থেকে অঙ্কুর, তার থেকে ছোট চারা যেমন কালক্রমে বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়, ইওরোপীয় চিত্রকলাও সেরকম বহু শতাব্দী ধরে ক্রমবিবর্তনের পথে অবিচ্ছিন্ন পরিণতি লাভ করেছে, বিকশিত হয়েছে। অন্যপক্ষে প্রাচ্য বা ভারতীয় চিত্রকলা যেহেতু কতগুলি মূল সূত্র বারবার নানাভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে, সেহেতু তার ইতিহাস কতকটা মানুষের কুলপঞ্জীর সঙ্গে তুলনীয়। মনে হয়, একই বংশ যেন নানা স্থানে ছড়িয়ে গেছে, ক্রমান্বয়ে বিচিত্রমুখী বিবর্তনের প্রশ্ন সেখানে আসে না। সেই হিসাবে ভারতের বিভিন্ন দেশকালের চিত্রকলার বিচিত্র রীতি, নীতি, অন্বিষ্টের একটানা বিবর্তনের ইতিহাস খুঁজতে যাওয়া আপাতদৃষ্টিতে যেমন কিছুটা নিরর্থক, অন্যদিকে ভারতের চিত্রকলায় একটি স্পষ্ট ঐতিহাসিক ধারা যে আছে এ কথাও অস্বীকার করার উপায় নেই। প্রতি যুগে, প্রতি রীতিতে চিত্রকলার মূল সূত্রগুলি কিভাবে উচ্চারিত হয়েছে তাদের প্রতিটির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং মহিমাই বা কি, সংক্ষেপে সে সব কথা বলার উদ্দেশ্যে এই বইটি লেখা। লেখকের ব্যক্তিগত রুচি বা ভাললাগা-মন্দলাগা যথাসম্ভব বাদ দেবার চেষ্টা হয়েছে। রজার ফ্রাইয়ের মতে পশ্চিমের মন আজ যেমন প্রাচ্যের দিকে ছুটেছে, প্রাচ্য

মনও আজ পশ্চিমের অনুমোদন না পেলে তৃপ্ত হয় না। ভারতীয় শিল্পীর পক্ষে আজ চিত্রশিল্প সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি একান্ত প্রয়োজন, সে বিষয়ে পাশ্চাত্য সতীর্থের কাছে তাঁকে আজ শিখতেই হবে। কি করে এক টুকরো স্পেস বা জমিকে বিজ্ঞানী চোখে দেখে, বিশ্লেষণ করে, তারপর সংশ্লেষণ করতে হবে, সে অনুসন্ধানের আজ সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। ছবির জমি বা সারফেস, রঙ, রেখা, খোলের বুনন বা টেক্সচার, মাত্রা বা ডিমেন্সন ইত্যাদি বহু বিষয়ে আজ ভারতীয় শিল্পী বিনয়নম্রচিত্তে ইওরোপীয় শিল্পীর কাছে শিক্ষানবিশী করতে বাধ্য। কিন্তু সেই সঙ্গে নিজের দেশের চিত্রকলার ঐতিহ্যও তাঁর ভুললে চলবে না। সে ঐতিহ্য সুমহান। কালো বা সাদা নিয়ে চূড়ান্ত কাজ প্রাচ্য চিত্রেই হয়েছে। ষোল ও সতেরো খ্রীস্টাব্দে সৃষ্টির যাবতীয় প্রাণী ও ব্যক্তিবিশেষের নিখুঁত প্রতিকৃতি ও মানবিক চরিত্রচিত্রণে দুর্লভ মিতব্যয়িতার যে আশ্চর্য পারদর্শিতা ভারতীয় শিল্পী দেখিয়েছেন রেমব্রান্টের মত অদ্বিতীয় পোর্ট্রেট শিল্পী তার অকুণ্ঠ তারিফ করেন। স্থাপত্য এবং জ্যামিতি নিয়ে চূড়ান্ত কাজও হয়েছে এই প্রাচ্য চিত্রে। স্থাপত্য, গাছপালা, ফুলপত্রফল, মানুষের শরীর, সমস্ত কিছু একই ছবিতে অখণ্ডভাবে, এক সমগ্র, সর্বাশ্রয়ী চিত্রডিজাইনের মধ্যে গাঁথার কাজও প্রাচ্যে যতখানি হয়েছে, ইওরোপে ঠিক ততখানি নিশ্চয় হয়নি। তাছাড়া সাজন, অলঙ্কার বা ডেকরেটিভ চিত্র এবং রঙের অপূর্ব বিন্যাসের যে চূড়ান্ত কাজ ভারতীয় চিত্রে হয়েছে তার সমকক্ষ অন্যত্র সত্যই দুর্লভ। তাই ভারতীয় চিত্রঐতিহ্য শিল্পীর অত্যন্ত গর্বের বিষয়। আরও গর্বের বিষয় এই যে, যে-লোকচিত্র ইওরোপে আজ লুপ্ত বললেই হয়, যার অভাবে শিকড় আটকাবার মাটি না পেয়ে আজ ইওরোপীয় শিল্পী প্রায়ই দিশাহারা হন, সেই লোকচিত্র ভারতে এখনও দৈনন্দিন ব্যবহারের সমস্ত সামগ্রীতে বর্তমান ; যার থেকে প্রত্যেক ভারতীয় শিল্পী বারংবার বিচিত্র শক্তি আহরণ করতে পারেন।

ভারতের অধিকাংশ শিল্পীসৃষ্টির মূলে ছিল ধর্মভাব ও ধর্মবিশ্বাস। যা কিছু সৃষ্টি হত অধিকাংশই ধর্মের উদ্দেশে উৎসর্গ হত। অবশ্য একান্ত লোকায়ত শিল্পও যে যথেষ্ট ছিল তা আমরা অনেক সময়ে মনে রাখি না। অধিকাংশ মহান সৃষ্টির মূলে থাকে মহান আদর্শ, শুদ্ধ ভাব, তীব্র ভক্তি ও আরাধনা ; যা না থাকলে শিল্পীর মনে পবিত্রতা, তন্ময়তা, একাগ্রতা আসা শক্ত। পবিত্র, শুদ্ধ, চেতনা ব্যতীত কোন সৃষ্টি ষড়ঙ্গের রসোত্তীর্ণ হয় না। কিন্তু এই ধর্মহীন, তামস যুগে আমরা পবিত্র, শুদ্ধ চেতনাকে প্রচলিত হিন্দু অধ্যাত্মবাদের সামিল করি। ফলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত মহাধার্মিক কি করে পতিতা নারীর জন্য অশ্রুপাত করে তাকে গোপনে অর্থ সাহায্য করতেন, তা আজও আমরা বুঝতে অপারগ।

ফল হয়েছে এই যে বৌদ্ধবাদ, অধ্যাত্মবাদ, বা বেদান্তবাদের ধূসর কাঁচের মধ্যে দিয়ে যতক্ষণ না আমরা ভারতশিল্প দেখি ততক্ষণ স্বস্তিবোধ করি না। এমন কি যেখানে জীবন সম্বন্ধে আনন্দ, উল্লাস নিরতিশয় স্পষ্ট, যেখানে শিল্পীর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভুল করার কোন কারণ নেই, সেখানেও আমরা জোর করে গভীর ধর্ম ও অধ্যাত্মবাদের পরাকাষ্ঠা দেখি। ভারতশিল্পে গভীর ধর্মভাব প্রণোদিত অনেক সৃষ্টি আছে যার জুড়ি পৃথিবীর অন্যত্র মেলা দুঃসাধ্য। কিন্তু তবুও একথা মানতেই হবে যে ভারতীয় শিল্পী তাঁর শিল্পে চারপাশের জীবনের পরিপূর্ণতা ফুটিয়ে তোলার জন্যই যেন বেশি ব্যস্ত ছিলেন ; পরলোকের চেয়ে ইহলোকই যেন বেশি ভালবাসতেন ; ভালবাসতেন গ্রাম ও শহর ; অরণ্যের নির্জনতা নয়, বরং তার পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ। এসবের প্রকাশ আমরা প্রত্যক্ষ ও প্রচণ্ডভাবে প্রথম দেখি ভারুত, সাঁচি, বা অমরাবতীতে ; তারপরে অজন্তার মৃদু আদর্শবাদের আবরণে ; শেষে মধ্যযুগে, সারা দেশময় অজস্র মন্দিরগাত্রের চিত্রভাস্কর্যের প্রাণের তূর্যনিনাদে।

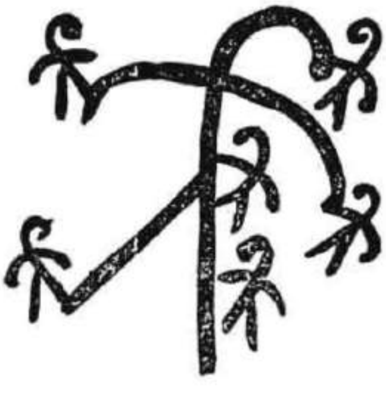
ঠিক যে সময়ে, অর্থাৎ মধ্যযুগে, ইওরোপ ধর্মভাব নিয়ে মেতে রইল, ঈশ্বরের চিন্তা আরাধনাকে রূপ দিল তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর, সুউচ্চ গথিক স্পায়ারে, তীক্ষ্ণ কোণকরা খিলানে ; তাদের ভাস্কর্যে খ্রীস্ট, অবতার, সাধুসন্তদের মূর্তি হল দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর, সর্বাঙ্গ রইল বসনে ঢাকা, যাতে বাসনার অবকাশ না থাকে ; দেহ হল তপস্যায় উজ্জ্বল, শান্ত, কিন্তু শীর্ণ, কঠোর, এমন কি স্মিতভাববর্জিত ; যখন ইওরোপ বেশ কয়েক শতক ধরে ইহলোকের কামনা বাসনা, ভোগলিপ্সা থেকে মুখ ফিরিয়ে, শিল্পে ভগবানের আরাধনায় মন দিল, ঠিক সে সময়ে ভারতীয় শিল্পের প্রতিটি অঙ্গে এল প্রাণের বিচিত্র, দুর্বার জোয়ার, যা শতভাবে শতধারায় মহা উল্লাসে চারিদিকে ফেটে পড়ল। মন্দির চাইল না লম্বিত হয়ে আকাশ ভেদ করে শূন্যে আরোহণ করতে, সে রইল নিজের ওজন ও অস্তিত্ব নিয়ে মাটির উপরে বসে। মন্দির খুব উঁচু হল না, বরং তার গড়ন হল কতকটা দোহারা, বলিষ্ঠ, এমন কি বেঁটেও বলা যায়। দেবতারা হলেন অল্পবয়স্ক, সুপুরুষ, তাঁদের শরীর নধর, সুপুষ্ট, এমন কি খানিকটা মেয়েলি। দুঃখবাদের চেয়ে সুখবাদই বেশি প্রশয় পেল। নটরাজ ছাড়া সব মূর্তিই রইল মাটিতে ভাল করে বসে বা দাঁড়িয়ে।

স্বল্পবসন বা নগ্ন নারীদেহ বারবার ঘুরে ফিরে এল সৃষ্টির অপূর্ব বিস্ময়, তথা সাজন হিসাবে, এবং সে দেহও হল সর্বদা পূর্ণ, ফুল্লবিকশিত।

তা ছাড়া ভারতশিল্পের আরেকটি লক্ষণ উল্লেখযোগ্য। ইওরোপ শীতের দেশ, কিছুটা রুক্ষ ; সেখানে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সর্বদা চলে লড়াই, সব সময়ে চলে প্রকৃতিকে পরাজয় করার চেষ্টা। ফলে ইওরোপীয় শিল্পের চেষ্টাও হয় প্রকৃতির মধ্যে নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিক্ষেপ করে ঘোষণা করতে ; তাই আকাশ ফুঁড়ে ওঠে তীক্ষ্ণ, ছুঁচের মত স্পায়ার ; গড়ন হয় আত্মঘোষণার মত অপ্রাকৃত, তীর্যক। ভারতীয় জীবনে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই যত না আছে, তত আছে প্রকৃতিকে অকুণ্ঠ গ্রহণ, যার ফলে নিসর্গ ও মানুষ ওতপ্রোতভাবে মিশে যায়, অন্যোন্যনির্ভর হয়। ফলে, ভারতশিল্পে নিসর্গ, প্রকৃতি, গাছপালা, ফুলফল, পশুপক্ষী, মানুষ সবই একত্রে এক সুডৌল সার্বিক ডিজাইনে পড়তে অসুবিধা হয় কম।

কঠোর তপশ্চর্যায় বিশীর্ণ, শুষ্ক, বৈরাগ্যসন্ন্যাসের কথা আমাদের দেশের সাহিত্যে যথেষ্ট থাকলেও, ভাস্কর্য ও চিত্রে সন্ন্যাসীরা হলেন গোলগাল, প্রফুল্ল। এ বিষয়ে ইওরোপ আর ভারতবর্ষ ঠিক যেন উল্টো। ইওরোপের ভাস্কর্যে সাধুসন্তরা হলেন গম্ভীর, কঠোর, দীর্ঘদেহ, বিশুষ্ক, আপাদমস্তক আলখাল্লায় আবৃত, অথচ সাহিত্যে দেখা দিলেন তাঁরা নধর, প্রায়লম্পট বেশে। তার কারণ ইওরোপে স্থাপত্য ভাস্কর্য করলেন ব্রহ্মচর্যাবলম্বী চার্চ, সাহিত্য সৃষ্টি করলেন জীবনাসক্ত বোকাচ্চো, চসারের সন্ততিরা। আর ভারতবর্ষে পুঁথি ও শাস্ত্র লিখলেন কঠোর তপশ্চর্যারত ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ বা শ্রমণ, শিল্পসৃষ্টি করলেন সংসারাশ্রমের পার্থিব মানুষ, রাজা ও প্রজা। ভারতশিল্পে দেবদেবী, সাধুসন্তরা বরাবরই যেন মাটির টান ঠেলতে পারেন না, যেন ইচ্ছাও তেমন নেই। তপশ্চর্যার মধ্যেও সর্বত্র দেখা যায় পার্থিব বাসনা। শিল্পশাস্ত্রের কঠোর আইনকানুনের ফাঁকে শিল্পী ঢুকিয়ে দিতেন এই পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু সম্বন্ধে সুতীব্র আবেগ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের প্রতি দুর্মর টান, পৃথিবীর সর্ববিধ প্রাণ সম্বন্ধে প্রগাঢ় মমতা। এই আবেগ ও তার প্রকাশ আজও অক্ষুণ্ণ, এমন কি বিমূর্ত-চিত্রণেও।

এই বইয়ে যদি এসব সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিতও দিয়ে থাকতে পারি তবেই আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।





প্রথম অধ্যায়

ভারত চিত্রকলার আদিকাণ্ড

ভূমিকা

আমাদের দেশে ইচ্ছামত ছবি দেখতে পাওয়া মুশকিল। মূল ছবি অধিকাংশই বিদেশে, যেটুকু এদেশে আছে তা নানাস্থানে রাজারাজড়া ও ধনীলোকের সংগ্রহে ছড়িয়ে আছে। একমাত্র সম্পূর্ণ অবস্থায় আছে গুহার ছবি যেগুলি স্থানান্তর করা যায় না। সুতরাং ইচ্ছামত ছবি দেখা যায় না। কোন গ্রন্থাগারেও দেশবিদেশের ছবি সম্বন্ধে পুরোপুরি সংগ্রহ নেই, ছবি বুঝতে গেলে যে ধরনের ইতিহাস, ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি, রাজনীতি সম্বন্ধে বই থাকা দরকার তাও নেই। ফলে চিত্রকলার ছাত্রকে প্রায়ই দিশাহারা হতে হয়।

ছবি সম্বন্ধে জানতে গেলে, বুঝতে গেলে ছবি দেখা দরকার। কারও আঁকা একটি ছবি আবার একক স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। সে ছবি সেই শিল্পীর অন্যান্য অনেক কাজের মধ্যে মাত্র একটি। সুতরাং তাঁর অন্যান্য কাজ না দেখলে একটি ছবি থেকে তাঁর সম্বন্ধে আন্দাজ করতে যাওয়া ভুল। সেই শিল্পী আবার কোন একটি বিশেষ দেশে, একটি বিশেষ সময়ে, একটি বিশেষ ঐতিহাসিক, সামাজিক, রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যে কাজ করেছেন। সুতরাং শুধু সেইটুকু দেশ, সেইটুকু কাল, সেইটুকু পরিবেশের মধ্যে সেই শিল্পীকে বুঝতে যাওয়াও ভুল। সেই দেশের, সেই কালের, সেই পরিবেশের পূর্বাপর আছে। সুতরাং সেই পূর্বাপর বুঝতে গেলে অন্য অনেক দেশের অনেক যুগের অনেক শিল্পীর কাজ জানা ও বোঝা প্রয়োজন। শুধু একটি শিল্প সম্বন্ধে চর্চা করলেও কিছু হয় না, আনুষঙ্গিক সমস্ত ধরনের শিল্পকলার চর্চার প্রয়োজন হয়, তার সঙ্গে নানা দেশের ইতিহাসের, বিজ্ঞানের। সারা পৃথিবীর নানা যুগের চারুকলার গতিপ্রগতি ও অভিব্যক্তির ধারা আলোচনা করলে একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে না এসে পারা যায় না। বহু যুগ বা ভূগোলের দুস্তর ব্যবধান সত্ত্বেও বিভিন্ন সংস্কৃতির চিত্রকলায় প্রকাশভঙ্গির এমন এক একাত্মতা আকস্মিকভাবে প্রকাশ পায় যা আশ্চর্যরকম কাকতালীয় বলে মনে হতে পারে।

এর কারণ জগজ্জয়ী প্রতিভাও স্বয়ম্ভু নয়। সেও অনেক কিছুর সাহায্যে বেড়ে ওঠে। বিশেষ করে শিল্পজগতে দেশকালের ব্যবধান নেই, একদেশের শিল্প অন্যদেশের, অন্যকালের শিল্পীর কাছে অনবরত ধার করতে, শিখতে বাধ্য ; সে সব শিখে, অধিকার করে, তিনি মৌলিক সৃষ্টি করে ঋণশোধ করেন। উপরন্তু তাঁর পক্ষে সবার উপরে প্রয়োজন হয় একটি বিশেষ দেশে, বিশেষ যুগে, বিশেষ সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকা। তার জন্যে দরকার হয় অন্য দেশ, অন্য যুগ, অন্য সময় সম্বন্ধে জ্ঞান।

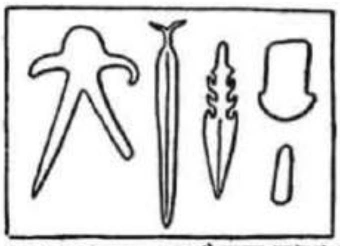
তা ছাড়া, কোন একটি ভাষা যেমন কোন জাতির সাধারণ সম্পত্তি হওয়া সত্ত্বেও, তা শুনতে ভাল লাগে না, তার চরিত্র প্রকাশ পায় না, যতক্ষণ না সে ভাষা কোন বিশেষ ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব ভঙ্গি ও কথার টানের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়, ঠিক তেমনি, শিল্পকলা বা চিত্রের ভাষা বিশ্বজনীন হলেও যতক্ষণ না দেশকাল পাত্রভেদে তার

মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জাতিগত, রাষ্ট্রগত, সমাজগত, ব্যক্তিগত লক্ষণ, ভঙ্গি ও রীতির নিজস্ব চরিত্র প্রকাশ পায়, ততক্ষণ তার মহিমা পূর্ণ হয় না।



ইতিহাসের আগের যুগ : সবচেয়ে পুরনো ছবি

মানুষের স্বভাবই হচ্ছে আঁকা। সে যেমন আঁকাই হোক। এ স্বভাব যেমন খুব অল্পবয়সেই দেখা দেয়, তেমন অনেক যুগ আগে মানুষের ইতিহাসের শৈশবেও নিশ্চয় এ স্বভাব ছিল। এ স্বভাব কেন ছিল, কিসের তাগিদে মানুষ তখন আঁকত তার সম্বন্ধে নানা গবেষণা নানা পণ্ডিত করেছেন, সে সব আলোচনায় নাই গেলুম, তবু কথা থেকে যায় যে বহু হাজার বছর আগে যখন আসানসোল, রাণীগঞ্জ, বীরভূম, বাঁকুড়া পাহাড়প্রমাণ বরফের নীচে চাপা ছিল, তারও আগে, মানুষ যখন কাঁচা মাংস খেত, আগুন জ্বালাতে শিখেছে কি শেখেনি, তখনও মানুষ গুহায় থেকে গুহার দেয়ালে কষ্ট করে ছবি আঁকত। কি তাগিদে ছবি আঁকত কে জানে, কিন্তু আঁকত। আর আশ্চর্যের কথা এই যে, সে ছবির মধ্যে এমন সব ছবিগত গুণ আছে, যা আজকালকার জ্ঞানী গুণী পণ্ডিত শিল্পীরাও অবজ্ঞা করতে ত পারেনই না, বরং তার সরলরেখা, ঋজুতা, বলিষ্ঠতা, আবেগ নিজের ছবিতে আনতে পারলে ধন্য বোধ করেন।



প্রথম শুনলে অবাক হতে হয় যে, সারা ভারতে অন্তত সাতশ' ছোটবড় জায়গা আছে যেখানে কোথাও হয়ত একটা, প্রায়ই তার বেশি, কোথাও কোথাও একত্রে পঁচিশ ত্রিশ বা তার বেশি গুহা আছে যেখানে পুরাকালে মানুষ বাস করত, সেই যুগে যাকে প্রত্নতাত্ত্বিকরা বলেন পাথরের যুগ বা অরিগনেসন যুগ। তার বহু পরে, বহু হাজার বছর পরে এল আমাদের হাল আমলের ইতিহাসের যুগ, যার বয়স মাত্র তিন চার হাজার বছরের বেশি নয়। এই যুগেও মাত্র কয়েক শ' বছর আগে পর্যন্ত মানুষ দল বেঁধে গুহায় থাকত। এখনও অনেক জায়গায় থাকে।

আমাদের দেশে ইতিহাস শুরু হবার হাজার বছরের আগেকার গুহাচিত্র খুব কমই আছে। তারই দু'-একটার কথা দিয়ে শুরু করা যাক। যেটুকু আছে তা কম মূল্যবান নয়, স্পেনের আলতামিরা গুহা ইত্যাদির কথা মনে করিয়ে দেয়। আর আশ্চর্য মিল আছে স্পেনের কোগুল বা আলতামিরা বা অরিগনেসন গুহার ছবির সঙ্গে আমাদের দেশের গুহাচিত্রের। ভারতের ঠিক মাঝখানে কাইমুর রেঞ্জ বলে এক পাহাড়ের মালা আছে। তার মধ্যে কয়েকটি গুহায় শিকারের ছবি কিছু কিছু এখনও অস্পষ্ট দেখা যায়। এগুলি গুহাচিত্র হিসেবে খুব ভাল বলা যায় না কিন্তু বোধহয় পাথর যুগেরও আগেকার ছবি।

মির্জাপুরের কাছে বিন্ধ্যপর্বতমালার মধ্যে কিছু গুহা আছে তাতে পাথর যুগের শেষের দিককার সময়ের কিছু কিছু ছবি দেখতে পাওয়া যায়। এই গুহাগুলি কিছু বছর আগে খুঁড়ে আবিষ্কার করা হয়েছে। এইসব গুহার কাছে, লাল লোহাপাথরের চাঙ্গড় পাওয়া গেছে, তাকে বলে 'রাড়ল'। সেই লোহাপাথর ঘসে ঘসে লালচে বা খয়েরি রঙের গুঁড়ো বার করা হত, আর সেই গুঁড়ো থেকে রঙ তৈরি করার জন্য শিলনোড়ার মত জিনিসও কাছে পাওয়া গেছে। প্রায় একেবারে চিত্রশিল্পীর স্টুডিও বললেই হয়, গুহার মানুষের ছবি আঁকার কারখানা!

মধ্যপ্রদেশে রায়গড় বলে আগে একটা দেশীয় রাজ্য ছিল এখন সেটি একটি জেলা, উড়িষ্যার সম্বলপুরের ঠিক উত্তরে। মন্দ্ বলে একটা নদী আছে, তার পাড়ে সিংহনপুর বলে একটি গ্রামের গায়ে ছোট একটি পাহাড়ের মালা আছে। এর মধ্যে কতকগুলি গুহার মুখের দেয়ালে বেলে পাথরের গায়ে লাল রঙে আঁকা কয়েকটি ছবি আছে যা নিশ্চয়ই খুব প্রাচীন। মানুষ আর জন্তুর ছবি, তার সঙ্গে হিজিবিজি অক্ষরের মত আঁকা খানিকটা ঈজিপ্‌শন্ হাইঅরোগ্লিফিকের মত । জন্তুগুলি একেবারে গুহাচিত্রের জন্তু, বড় হরিণ, অতিকায় হাতি বা ম্যামথ, খরগোশ, মানুষগুলি গতি ও কর্মব্যস্ততায় মুখর। একটা ছবি আছে খুব সুন্দর, তার মধ্যে ছন্দ আর গতি যেন জোরে পাক খাচ্ছে, বিষয়টা হচ্ছে একটা বাইসন শিকার ; মধ্যিখানে একটি বিরাট হিংস্র বাইসন, তার চারধারে লোক ছুটোছুটি করছে, শিকারের চেষ্টায় কয়েকটি লোক বাইসনের শিঙের ঘায়ে শূন্যে ডিগবাজি খেয়ে রক্তাক্ত শরীর নিয়ে মাটিতে পড়ে, আর বাকি ক'জন বাইসন শিকারে মত্ত। সেই দেয়ালেরই অন্যধারে আরেকটি ছবি : একটা বুনো মোষ বর্শা খেয়ে ভীষণভাবে জখম হয়ে মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করছে আর তাকে চারদিকে ঘিরে শিকারীর দল উল্লাসে প্রায় নাচছে। এরই কাছে পাথরের তৈরি অস্ত্র, যন্ত্রপাতি পাওয়া গেছে। তাতে মনে হয়, এসব পাথরকাটা ছবি, পাথর গুঁড়িয়ে রঙ করে, সেই রঙে পাথরের তুলি দিয়ে আঁকা। আশ্চর্য মানুষের খেয়াল।





উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুর জেলায় কয়েকটি গুহা আবিষ্কার হয়েছে, সেখানেও লাল লোহাপাথরের গুঁড়োর রঙ দিয়ে কতকগুলি খুবই অদ্ভুত ছবি আঁকা আছে। শিকারের ছবিই বেশি, জন্তুজানোয়ার তাড়া করা হচ্ছে, তারা ছুটে যাচ্ছে, তাদের গতি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে, জন্তুদের মধ্যে আছে গণ্ডার, বড় শিংওলা হরিণ, সাম্বার।

অনেক পণ্ডিত মনে করেন যে এসব গুহাচিত্র ইতিহাসের আগের যুগের, অর্থাৎ পাথর যুগের ছবি নাও হতে পারে। এগুলি হয়ত সত্যিই এমন কিছু বিশ ত্রিশ হাজার বছর প্রাচীন নয়। তার কারণ আমাদের দেশে এখনও অনেক জাতি আছে, যারা পাথরের অস্ত্র, হাতিয়ার ব্যবহার করে। দু'-তিন হাজার বছর আগে তাদের সংখ্যা নিশ্চয় বেশি ছিল এবং তাদের আঁকার রীতির মধ্যে আদিম বলিষ্ঠতা আর ঋজুতাও ছিল। সেই হিসেবে যে সব গুহাচিত্রের কথা এখানে বললুম সেগুলি খুব পুরনো নাও হতে পারে। বর্কিট নামে একজন ইংরেজ পণ্ডিত এরকম

মনে করেন। কিন্তু সঠিক কিছু বলা যায় না।

স্পেনের গুহাচিত্রে যেমন কালো আর লাল রঙের মধ্যে দিয়ে ছবির ঘনত্ব, পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব, সম্বন্ধ, পরিপ্রেক্ষিত বা ইংরেজিতে যাকে বলে পারস্পেক্টিভ, এসেছে, এসব গুহাচিত্রেও ঠিক তেমনি এসেছে। তাছাড়া রায়গড় বা কাইমুরে যে সব গুহাচিত্র পাওয়া গেছে তাতে জ্যামিতিক রেখা, জ্যামিতিক চিত্রের পুরো আভাস পাওয়া যায়। আজকের দিনে এসবের মূল্য খুব বেশি।

মানুষ যখন গুহা ছেড়ে বাড়ি তৈরি করতে শিখল, তখনও বাড়ির দেয়ালে ছবি আঁকার অভ্যাস রয়ে গেল। বিশেষত যে সব বাড়ি টিকে থাকবে বলে লোকে মনে করত, সে সব বাড়ির দেয়াল ছবি দিয়ে মুড়ে দিত। যেমন ধরা যাক ঈজিপ্টের পুরাকালের কবর বা মন্দির, দুই নদীর দেশ ক্যালডিয়া, অসিরিয়ার শহরের বাড়ির দেয়ালের টালি। এই সময়ে বা তারও আগে থেকে মাটির ভাঁড়ে বা অন্যান্য নানা পাত্রে মানুষ ছবি আঁকা আরম্ভ করে। মাটির ভাঁড় বা চিনেমাটির পাত্রে একরঙা বা নানা রঙা ছবি আঁকা এখনও চলে আসছে, মানুষ যতদিন বাঁচবে ততদিন নিশ্চয় চলবে কারণ, মানুষ বোধ হয় রঙ, রেখা, ছবি ছাড়া বাঁচতে পারে না। আমরা সামান্য পোশাকই কত পরিপাটি করে, রঙ মিলিয়ে পরি, চুল আঁচড়াই যাতে মাথাটা ছবির মত দেখায়।

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের উদ্যমে গত চল্লিশ বছরে আরো অনেক জায়গায় গুহাচিত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানে বিশদ তালিকা দেয়া আমার উদ্দেশ্য নয়, তবে কয়েকটি স্থানের উল্লেখ না করলেই নয়। যে দুটি রাজ্য থেকে সবথেকে উল্লেখযোগ্য ফল পাওয়া গেছে সে দুটি হল মধ্যপ্রদেশ আর উড়িষ্যা। মধ্যপ্রদেশে সবথেকে উৎকৃষ্ট নতুন আবিষ্কার হচ্ছে ভীমভেট্‌কার চমকপ্রদ গুহাচিত্ররাজি। বিষ্ণু ওয়াকাঙ্করের স্টোন এজ পেন্টিং ইন ইন্ডিয়া বইতে ভীমভেট্‌কার কিছু গুহাচিত্র সুন্দরভাবে মুদ্রিত হয়েছে। সুবিখ্যাত 'মার্গ' পত্রিকার একটি সংখ্যাও মুখ্যত ভীমভেট্‌কা নিয়ে। ভীমভেট্‌কায় আমি নিজে যাইনি, কিন্তু ছাপা ছবি দেখে মনে হয় এগুলি সম্ভবত ইতিহাসের আগের যুগের, কারণ যে সব রঙ এতে ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলি মাটি বা পাথরের আকর গুঁড়ো করে তৈরি হয়েছিল। তদুপরি রঙ বাছাই ও প্রয়োগের রীতিপ্রকৃতি, রেখার বলিষ্ঠতা, চিত্রগুলিতে প্রাণী ও ঘটনার আকৃতি, গতি ও বেগের দ্যোতনা, দর্শকের মনকে ইতিহাসের আগের যুগেই নিয়ে যায়। আশা করি ভীমভেট্‌কার উপর আরো নতুন তথ্য শীঘ্র বেরোবে। সম্প্রতি 'এবং এই সময়' ত্রৈমাসিক পত্রিকায় (৯ম বর্ষ ৩০শতম শীত সংখ্যা ১৪০০) অমিতাভ গুপ্ত একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখেছেন। রামগড় নরসিংগড়ের পূর্বপ্রান্তে কান্রে বিহার বলে একটি পাহাড়েও ওয়াকাঙ্কর ষাটটির উপর প্রাচীর চিত্র-অলঙ্কৃত গুহাশ্রয় আবিষ্কার করেন। এগুলিতেও আছে শিকারের দৃশ্য, নাচ ; ঘোড়সওয়াররা ঢাল বা তরোয়াল চালাচ্ছে। এগুলি কত প্রাচীন বলা শক্ত, হয়ত ইতিহাসের প্রথম যুগের হবে। খুব সম্প্রতি, ১৯৮৯ সালের গোড়ায়, বাস্তার জেলার রাজারাও মালভূমিতে একটি গুহাশ্রয়ে প্রায় পঁচিশটি গুহাচিত্র পাওয়া গেছে। এগুলিও মুখ্যত মুখ্যত শিকারের দৃশ্য, তবে যুগ নির্ণয় করা শক্ত।

উড়িষ্যার সুন্দরগড় জেলার মানিকমুণ্ডার গুহাশ্রয়ে কিছুকাল আগে বেশ কয়েকটি গুহাচিত্র আবিষ্কার হয়েছে। এগুলি মুখ্যত লাল মেটে সিঁদুর বা লোহাপাথর এবং অন্যান্য স্থানীয় আকর গুঁড়িয়ে তাদের রঙে চর্বি বা প্রাণীদের তেল দিয়ে গুহার গায়ে আঁকা। বেশির ভাগই শিকারের দৃশ্য। গুহার গায়ে যেখানে যেখানে চিত্র আছে তাদের প্রায় সবখানি চাবড়া চাবড়া রঙে ও জমাট ফিগারে ভর্তি। ছাড়া ছাড়া আকৃতি নয়, পরিচিত প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্রের চিত্ররীতি বা শৈলীর অনুরূপ নয়। ফলে কত প্রাচীন বলা শক্ত। সুন্দরগড় জেলায় আরো একটি স্থানে, লেফরিপাড়া থানার উষাকোটি বলে একটি পাহাড়ের গুহায় কিছু কিছু ছবি পাওয়া গেছে। তার সঙ্গে মনে হয় লিপিও আছে। লিপিগুলি এখনও উদ্ধার হয়নি। সম্বলপুর জেলার উলাপগড়, কালাহাণ্ডি জেলার গুড়াহাণ্ডিতেও এই ধরনের গুহাশ্রয়ে কিছু কিছু ছবি পাওয়া গেছে। তবে এগুলিরও বয়স নির্ণয় করা কঠিন, প্রাগৈতিহাসিক যুগের কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। তার একটি মস্ত কারণ, মাত্র কয়েক শতক আগে পর্যন্তও এসব জেলায় এমন অনেক গিরিবন জাতি ছিল, এমন কি এখনও আছে, যাদের জীবনধারণ ও জীবনদর্শন, প্রযুক্তি ও সমাজব্যবস্থা নিতান্তই প্রাচীন যুগের, অর্থাৎ শিকার ছিল এবং এখনও আছে পুষ্টিকর খাদ্যাহরণের উৎস ও উপায়, এবং সে শিকার হতো মুখ্যত তীরধনুক বা ঐ ধরনের মানুষের হাতের পেশীনির্ভর ক্ষেপণাস্ত্রের সাহায্যে। যে ধরনের প্রযুক্তির উপর কোন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত সে-সমাজের ললিতকলাও মোটামুটি সেই প্রযুক্তির জগতে ও দর্শনে সীমাবদ্ধ থাকে, যদিও তার সৃষ্টির নান্দনিক অভিব্যক্তি বহুযুগব্যাপী ভবিষ্যতের প্রজন্মকেও চমৎকৃত করতে পারে। সত্যি কথা বলতে, প্রতিভার অভিব্যক্তির কোন কালানুক্রমিক প্রগতির পথ

আছে কিনা সন্দেহ, প্রযুক্তির প্রগতির ফলে প্রতিভার নতুন নতুন দিকে অভিব্যক্তির প্রকাশকেই আমরা অভিব্যক্তি ও বোধের প্রগতি বলে অনেক সময়ে হয়ত ভুল করি।

সম্প্রতি ১৯৮৮ সালে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ রাজস্থানের জয়পুর জেলার বিরাটনগরের কাছে আরাবল্লী পাহাড়ের কিছু গুহাচিত্র আবিষ্কার করেছেন। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে এগুলি প্যালিও-লিথিক যুগেরও হতে পারে। গুহাচিত্রগুলি পাওয়া যায় ত্রিশটি গুহাশ্রয়ে, সেগুলি আবিষ্কার হয় ভীমজী কী ডুংড়ি, গণেশ ডুংড়ি, বিজক কী পাহাড়ি গ্রাম। ছবিগুলি মুখ্যত জীবজন্তুর : হরিণ, মহিষ বা বাইসন ; ভাল্লুক, বাঘ, হাতি এমন কি মাছ। তার সঙ্গে অবশ্য আছে মানুষের ছবি এবং অনেক জ্যামিতিক আল্পনা বা ছক। ছবিগুলির আকার আঁকা হয়েছে লাল সিঁদুর মাটিতে, কিছু কিছু ছবির জমি সাদা রঙে লেপা। মহিষ, বাইসন ও বাঘ লাল সিঁদুর মাটিতে আঁকা। মহিষগুলির সম্মুখ অর্থাৎ মাথার দিকটা লাল সিঁদুর মাটিতে আঁকা, পিছন দিকগুলি কালো কালো ডোরা কাটা। তার মধ্যে একটি ছবি আছে সমুখে আগুন, তার দিকে মুখ করে থমকে দাড়ানো এক হরিণ ; আগুনের পাশে একটি বর্শা ও ঢাল।

আরও অন্যান্য জায়গায় ইতিহাসের আগের যুগের কিছু কিছু গুহাচিত্র পাওয়া গেছে। যেমন, ওয়াইনাদের এদাকল গুহায়, বেলারি জেলার কাপগালাইয়ে, কালাটে, বুন্দেলখণ্ডে, বান্দায়, হোসঙ্গাবাদে, বাঙ্গালোরে। ঘাটশিলার কাছেও কিছু পাওয়া গেছে। এখন পাঁচ ছ' হাজার বছর আগেকার মাটির ভাঁড়ের ছবির কথা বলব।

দুই নদীর দেশ : বালুচিস্তান আর সিন্ধু

পাব্‌লো পিকাসো বলে জগদ্বিখ্যাত আধুনিক শিল্পীর নাম সকলেই জানেন। ১৯৫২ সাল নাগাদ কলকাতায় একটা আন্তর্জাতিক ছবির প্রদর্শনী হয়, তাতে তাঁর আঁকা একটি ছবি ছিল, রেখা দিয়ে নিজের ছোট্ট মেয়ের ছবি। সে ছবির কথা এখন বলতে বসিনি। বলব তাঁর একটি বিশেষ উক্তি সম্বন্ধে। পিকাসো বলেন, গত দু' তিনশ' বছর ধরে আমরা ছবি বলতে বুঝি একটুকরো চট বা ক্যানভাস বা কাঠের পাটা বা কাগজ, তাতে কিছু রঙ আর তার চারধার ঘিরে একটা ফ্রেম যা আশপাশের সব জিনিস থেকে রঙীন বস্তুটিকে আলাদা করে রাখবে। ছবির এই সংজ্ঞা বদলাতে হবে তা না হলে আমরা ভবিষ্যতে নানা দিকে এগোতে পারব না, অতীত থেকেও শিখতে পারব না।

কথাটা এভাবে বললে স্বতঃসিদ্ধ মনে হয় ; মনে হয় এ আর নতুন কথা কি। কিন্তু গত শতকেও এমন দিন গেছে যখন কর্তাব্যক্তিরা মিশরীদের কবরচিত্রকে বা গ্রীক ভাসকে বা পম্পিয়াই, ইট্রুস্কান মাটির পাত্রের গায়ে আঁকা অপূর্ব ছবিকে ছবি বলে মানতেই নারাজ ছিলেন। এমনও বলতেন যেন ওসব জিনিস কারুশিল্প মাত্র, চারুশিল্পের পর্যায়ে পড়ে না।

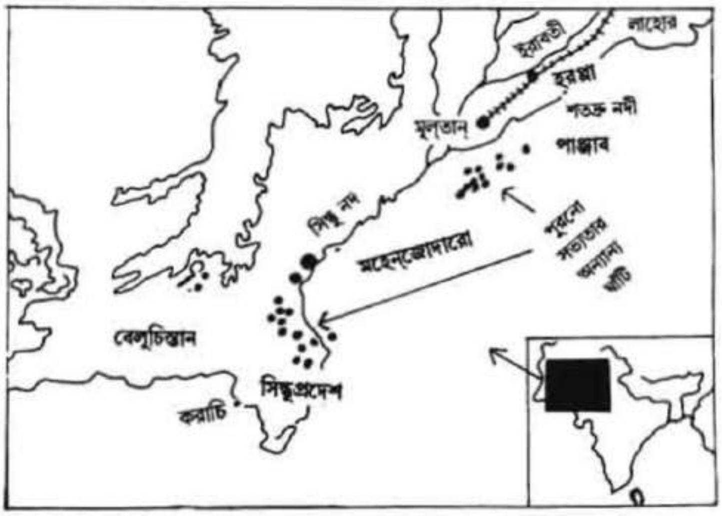
আমরাও উনিশ শতকের পণ্ডিতদের মানব না। যেখানেই মানুষ রেখা, রঙ, তুলি বা কলম দিয়ে ছবি এঁকেছে সেইখানেই আমাদের ছবির উৎস, ছবির মালমশলা খুঁজতে যেতে হবে। চিত্রকলা তুলোর বাক্সয় সযত্নে রাখা কান্দাহারী আঙুর বলে মানতে আমরা নারাজ। চিত্রকলা আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক অবশ্য ব্যবহারের জিনিস, মোটেই শৌখিন কিছু নয়, ছবি না হলে আমাদের দিন চলে না।

মধ্যপ্রাচ্য দেশে ঈজিপ্টের প্রায় হাজার মাইল পূবে একটা দেশ আছে তাকে বলে মেসপটেমিয়া। দুই নদীর মাঝখানে যে জমি বা দেশ তাকে বলে মেসপটেমিয়া, টাইগ্রিস্ আর ইউফ্রেটিস্ নদী তার দু'ধারে। ভারতবর্ষ নদীর দেশ, বলা যায় অনেকগুলি মেসপটেমিয়া দিয়ে ভর্তি। একবার ম্যাপ খুললেই বুঝতে দেরি হয় না যে কলকাতাই এক বিরাট মেসপটেমিয়ার মধ্যে। এখন যেটা পশ্চিম পাকিস্তান সেখানেও দুই নদীর দেশ আছে, পূবে বিরাট সিন্ধু নদ, পশ্চিমে জোব নদী। মধ্যে আছে আধুনিক কালের বালুচিস্তান আর সিন্ধু।

এই সারা দেশটিতে বহু পুরনো সভ্যতার যে কিছু থাকতে পারে তা সত্তর বছর আগে পর্যন্ত লোক জানত না। সেখানে প্রথমে খোঁজখবর আরম্ভ করেন ১৯২২ সালে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলে এক কৃতী বাঙালী, এবং হার্‌গ্রীভ্‌স্ বলে এক ইংরেজ ১৯২৫ সালে। তাঁদের ঠিক পরেই স্যর অরেল স্টাইন বলে এক জগদ্বিখ্যাত ভবঘুরে

পণ্ডিত ১৯২৬-২৭ সালে উত্তর বালুচিস্তানে আর ১৯২৭-২৮ সালে দক্ষিণ বালুচিস্তানে খোঁড়াখুঁড়ি করে এমন সব জিনিস আবিষ্কার করেন যাতে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে ঈরাণ ও মেসপটেমিয়ার প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে এই অঞ্চলের ইতিহাসের-আগের-যুগের সভ্যতার অনেক মিল আছে। আর এই মিল ধরিয়ে দিতে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে মাটির ভাঁড়ের টুকরোর রঙ-করা ছবি, খোলামকুচির রঙ ও ছবি, যার কি দাম না জানলে সাধারণত লোকে ঝাঁট দিয়ে ফেলেই দেয়। স্টাইনের সঙ্গেই এলেন আর এক বাঙালী ভদ্রলোক, নাম ননীগোপাল মজুমদার। তাঁর মত প্রতিভাসম্পন্ন আর সন্ধানী ব্যক্তি ভারতীয়দের মধ্যে রাখালদাসের পরে দুর্লভ। খুব আক্ষেপের কথা তিনি অল্প বয়সে মারা যান। এই অঞ্চলে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত কাজ করে তিনি অনেক কিছু মূল্যবান জিনিস সংগ্রহ করেন।

স্টাইন আর মজুমদার এই দুই নদীর দেশ ঘুরে ঘুরে সিদ্ধান্ত করেন যে পণ্ডিতেরা যাকে ব্রোঞ্জ যুগ বলেন সেই যুগে এ অঞ্চলের নানা জায়গায় লোকের ভালরকম বাস ছিল। শুনলে আশ্চর্য হতে হয় এ সবই তাঁরা বেশ সন্তোষজনক ভাবে প্রমাণ করেন মাটির ভাঁড়ে আর খোলামকুচিতে আঁকা ছবি দেখে। তাঁরা বলেন উত্তর বালুচিস্তানে খ্রীস্টপূর্ব ২৯০০-২৮০০ বছর আগে এখন যেখানে কোয়েটা শহর সেখানে ঘন বসতি ছিল। তারও আগে থেকে এবং কয়েক শত বছর ধরে খ্রীস্টপূর্ব ২২০০ বছর পর্যন্ত জোব নদীর ধারে এক সংস্কৃতি ছিল, তার নাম রাণাঘুণ্ডাই। রাণাঘুণ্ডাই সংস্কৃতির আবার বয়স হিসাবে নানা স্তর আছে, সে আলোচনার মধ্যে যাওয়া এখানে



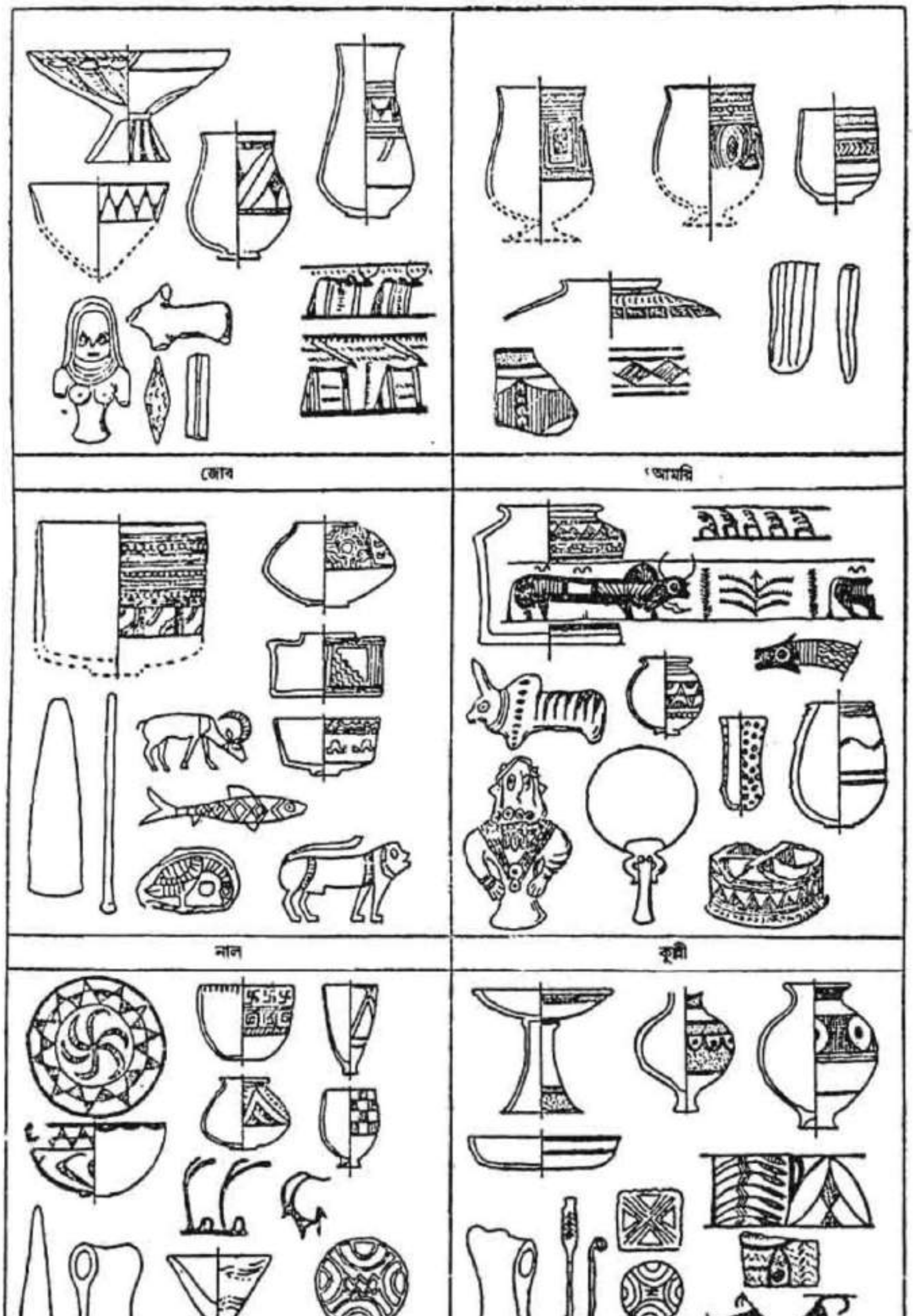
সম্ভব নয়। প্রায় একই সময়ে দক্ষিণ বালুচিস্তানে খ্রীস্টপূর্ব ৩০০০, ২৮০০, ২৫০০, বছরে আম্‌রি, নান্দারা, নাল বলে তিনটি জায়গায় পরপর তিনটি সংস্কৃতি দেখা দেয় (এগুলি সবই আধুনিক নাম, পুরাকালের নাম জানা নেই)। এই দক্ষিণ বালুচিস্তানেই কুল্লী বলে জায়গায় খ্রীস্টপূর্ব ২৪০০ বছরে আরেকটি সংস্কৃতির সন্ধান পাওয়া যায়। কুল্লীর ঠিক পশ্চিমে শাহীটুম্প্‌ বলে জায়গায় খ্রীস্টপূর্ব ২০০০ বছরে আরেকটি সংস্কৃতি ছিল।

জ্ঞান আর অধ্যবসায় দিয়ে মানুষ আয়ত্ত করতে পারে না এমন জিনিস বোধ হয় খুব কমই আছে। মাটির খেলনা, ভাঁড়, খোলামকুচি দেখে দেখে আগেকার পণ্ডিতরা ঠিক করেন যে ইতিহাসের আগের যুগে পারস্য দেশের দক্ষিণ দিকে হত বাফ্‌ বা হল্‌দেটে রঙের মাটির পাত্র, আর উত্তর দিকে হত লাল রঙের পাত্র। বালুচিস্তানে ঠিক একই জিনিস দেখা গেল। দক্ষিণদিকে বাফ্‌ বা হল্‌দেটে রঙের পাত্র ; উত্তর দিকে লাল রঙের পাত্র। এছাড়া মাটিতে গড়া স্ত্রী পুরুষের মূর্তি বা মডল দেখেও তাঁরা উত্তর-দক্ষিণের চরিত্রগত তফাৎ ঠিক করলেন। লাল রঙের পাত্র একমাত্র উত্তরদিকে জোব নদীর ধারের সভ্যতাতেই পাওয়া গেল। কিন্তু হল্‌দে রঙের পাত্র বালুচিস্তান আর সিন্ধুর নানা জায়গায় পাওয়া গেছে। জায়গাভেদে এইভাবে সংস্কৃতি ক'টিকে ভাগ করা যায়।

ক। লাল রঙের মাটির পাত্রের সংস্কৃতি

উত্তর বালুচিস্তানে জোব নদীর সংস্কৃতি বা রাণাঘুণ্ডাই-এর নানা স্তর। খ্রীস্টপূর্ব ৩৫০০ থেকে ২২০০।

খ। বাফ্‌ বা হল্‌দেটে রঙের মাটির পাত্রের সংস্কৃতি



শাহী টুম্প ঝুকর

(১) কোয়েটা সংস্কৃতি ; বোলান গিরিবর্ত্মের কাছে, খ্রীস্টপূর্ব ২৯০০-২৮০০।

(২) আম্‌রি (খ্রীস্টপূর্ব আন্দাজ ৩০০০) নান্দারা (খ্রীস্টপূর্ব ২৮০০), নাল (খ্রীস্টপূর্ব ২৫০০) সংস্কৃতি ; দুটি জায়গায় পাওয়া গেছে, প্রথমটি সিন্ধু, দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি বালুচিস্তানের নাল উপত্যকার মাথায়।

(৩) কুল্লী সংস্কৃতি ; দক্ষিণ বালুচিস্তানে কোল্‌ওয়া বলে জায়গায় পাওয়া গেছে। খ্রীস্টপূর্ব ২৪০০।

(৪) শাহীটুম্প্ সংস্কৃতি ; দক্ষিণ বালুচিস্তানে, কুল্লীর প্রায় একশ' মাইল পশ্চিমে। খ্রীস্টপূর্ব ২০০০।

এবারে খুব অল্পের মধ্যে প্রত্যেকটির কথা বলব। কারণ, ছবি দেখলেই বোঝা যায় যে এত যুগ আগের হলেও প্রায় সবগুলি নক্‌শাই কাঁথা, ছাপাকাপড়, বোনা শাল, ছুঁচের কাজ, চীনেমাটির বাসনে এখনও আমাদের মধ্যে চলছে এবং আরো নতুন করে বেশি আসছে।

প্রথমে বলব জোব নদী বা লাল রঙের মাটির পাত্রের সংস্কৃতির কথা।

জোব নদীর ধারে রাণাঘুণ্ডাইতে যে সব মাটির পাত্র পাওয়া গেছে, সেগুলি, বিশেষ করে দু' নম্বর স্তরে, খুবই সুন্দর রঙ করা, চাকে ঘুরিয়ে তৈরি। তাদের গোলাপী কিংবা হলদে কিংবা গাঢ় পোড়ামাটির রঙের গায়ে কালো রঙে সুন্দর মিহি স্টাইলাইজ করে আঁকা ককুদওলা ষাঁড় আর সোজা সোজা কালো শিংওলা কালো হরিণের ছবি। যেমন আঁকার দক্ষতা, তেমনি সাহস। ইংরেজিতে স্টাইলাইজ কথাটির বাংলা এক কথায় ঠিক নেই, সংকেতিত বা একটা রীতির ছাঁদে ফেলা বলা যায়। ষাঁড়ের আকৃতি মোটামুটি রেখে তার বিশেষত্বগুলি মুখ্য করে দেখালে যা হয় তাকে বলে স্টাইলাইজ করা, অর্থাৎ যেটির যা বিশেষত্ব, অন্য সাদৃশ্যকে গৌণ করে, সেই বিশেষত্বটিকে ফলাও করে এঁকে ফুটিয়ে তোলা হয়। মহেঞ্জোদারোর বিখ্যাত ষাঁড় এখানে মনে পড়ে, তাকে বলে স্টাইলাইজ করা।

এইসব পাত্রে শুধুই কালো রঙ ব্যবহার হয়েছে, তার সঙ্গে লাল রঙের রেখা নেই। পাত্রগুলির গড়ন খুব সুন্দর আর পরিষ্কার, তলায় খুরো দেওয়া। পেটের কাছে একটি পটি চারিদিকে ঘুরে গেছে, তাতে হয় স্টাইলাইজ করা ষাঁড় না হয় কালো হরিণ, তাদের পা আর শিং লম্বালম্বির দিকে এত সরু লম্বা করে দেওয়া যে অদ্ভুত দেখায়। প্রায় প্রতিদেশের অতি প্রাচীন গুহাচিত্রে অত্যন্ত বলিষ্ঠ বেগবান চতুষ্পদ প্রাণীদের পা এই ধরনের সরু ও লম্বা করে আঁকা। কুল্লীতে পাওয়া পাত্রে এগুলি আড়াআড়ি করে টেনে বাড়িয়ে দেওয়া, ধাঁচটি খুব পরিপাটি, কাটাকাটা, একটু অপ্রাকৃত। বহু যুগ আগের গুহাচিত্র আর আমাদের যুগের শিল্পীদের ছবির সঙ্গে খুব মিল। অর্থাৎ আধুনিক শিল্পী বহু প্রাচীন ছবির মধ্যে তাঁদের ঐশ্বর্য খুঁজছেন। এই রাণাঘুণ্ডাইতেই আবার আর একধরনের ছবি মাটির পাত্রের গায়ে দেখা যায়, সেগুলিতে লাল দ্বিতীয় রঙ হিসেবে ব্যবহার হয়েছে, যদিও পাত্রের গা'ও লাল। এই লালের উপর লাল এক অদ্ভুত রীতির সৃষ্টি করেছে, খানিকটা ভাস্কর্যের আমেজ আনে। আধুনিক ছবিতে একই রঙের জমি বা রেখার উপর সেই রঙেরই গাঢ় ফিকে ব্যবহার খুব চল হয়েছে। অন্যান্য নক্‌শার মধ্যে দুই রঙে আঁকা কতকগুলি নক্‌শার খুব চলন ছিল, যেমন সরুমোটা, লালকালো অনেকগুলি লাইন দিয়ে সমচতুষ্কোণ ; এগুলি আম্‌রিতেও পাওয়া গেছে। জোব উপত্যকার সুরজাঙ্গাল বলে একটি জায়গায় দু'রঙা মাটির ভাঁড়ের কাজ আরও সুন্দর। দক্ষিণ বালুচিস্তানে গাঢ় জমা রক্তের মত লাল রঙ ব্যবহার হত, কিন্তু এখানে হত জ্বলজ্বলে কমলা রঙ, তাতে লাল জমির উপরে লাল রেখা আরও খোল্‌তাই হত। এক ধরনের ফাঁদালো জামবাটির মত উঁচু খুরোওলা পাত্রের গায়ে আঁকা পটি পাওয়া গেছে, তাতে ককুদওলা ষাঁড়ের সারির এত লম্বা লম্বা পা আর লম্বা লম্বা লেজ পাত্রের মাঝামাঝি পর্যন্ত নামিয়ে দেওয়া হয়েছে যে ষাঁড় বলে প্রায়ই চেনাই যায় না।



এখন কোয়েটা সংস্কৃতির কথা একটু বলি। এখানকার মাটির পাত্রগুলির জমি বাফ্ বা হল্‌দেটে রঙের, বেগনি আভাওলা লাল্‌চে-খয়েরি (কালো) রঙের কালি দিয়ে দরাজ ভাবে, নিশ্চিত নিপুণ হাতে আঁকা। দ্বিতীয় কোন লাল রঙ নেই। পাত্রগুলির গড়ন বেশ ভাল, একটু পলতোলা মত। কোন কোন পাত্র বেশি পোড়ানর দরুন গোলাপী সাদা এমন কি ঈষৎ সবজে দেখায়, কোন কোনটা আবার ছাই রঙের, বেশ শক্ত খোলা, তাতে 'কালো' রঙে নক্‌শা আঁকা। নক্‌শাগুলি সবই জ্যামিতিক রেখা, কোন জীবজন্তুর ছবি নেই। মোটা সরু রেখা দিয়ে তীরের ফলার আকারে আঁকা, চতুষ্কোণকে আড়াআড়ি ভাগ করে ভাঙা, উল্টোদিকে মুখঘোরানো ত্রিভুজ অথবা ধাপে ধাপে সিঁড়ির মত

করে রেখা আঁকা।

আম্‌রি-নাল সংস্কৃতিতে মাটির জিনিসের জমি প্রায় চমৎকার নরম বাফ্ রঙের কিংবা একটু গোলাপী। তার উপরে মাঝে মাঝে সাদা আস্তর পড়ত। চাকে ঘোরানো হত, সেইজন্য পাত্রগুলি খুব পাতলা। তলায় খুরো,



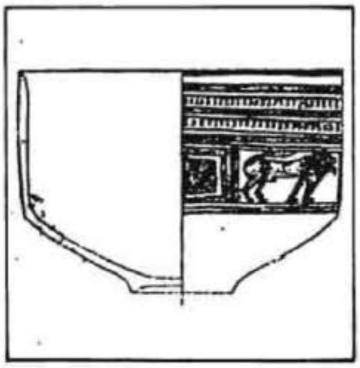


চ্যাপটা গড়ন, কোনটা সাদাসিধে বালতির মত গড়ন। আম্‌রিতে যে সব মাটির জিনিস পাওয়া গেছে, তাতে জীবজন্তু বা গাছপালার ছবি নেই, কিন্তু নালের পাত্রে এসব খুব আছে।

আম্‌রি, নান্দারা বা নাল সবেতেই চিত্রগুলির রেখা প্রথমে কড়া তুলি দিয়ে 'কালো' বা ব্রাউন রঙে আঁকা হত। আম্‌রি আর নান্দারায় লাল দ্বিতীয় রঙ হিসেবে ব্যবহার হত। কিন্তু নালে লাল ত থাকতই, উপরন্তু হল্‌দে, নীল, সবুজ রঙও দেওয়া হত, তাতে নানা রঙের চিত্ররীতি গড়ে ওঠে। মাটির পাত্রে নীল আর হল্‌দের ব্যবহার পশ্চিম এশিয়ায় ইতিহাসের যুগের আগে একমাত্র নালেই দেখা যায়।

মাটির পাত্রের জমিকে আড়াআড়ি, লম্বালম্বি, একাধিক রেখা দিয়ে লম্বা লম্বা চৌকোণ বা প্যানেলের মত করে ভাগ করে নেওয়া হত। তারপর এইসব প্যানেলের মধ্যে সাদাকালো চৌখুপির ছোট ছোট প্যানেল করা হত, এইসব চৌখুপি প্যানেলের চারদিকে আবার ছোটর থেকে বড়, কালোর পরে লাল, একের পরে আরেক রেখা দিয়ে চতুষ্কোণ এঁকে দেওয়া হত। এ ছাড়াও একরঙা বর্‌ফি বর্‌ফি, কোণের শেষে কোণ লাগিয়ে, পাত্রের গা বেয়ে পটির মত চলে যেত (লম্বালম্বি পটি কমই হত), কখনও বর্‌ফি একরঙা না হয়ে আঁজিকাটা (ইংরেজিতে হ্যাচ করা) হত, কখনও তীরের ফলার মত, কখনও বা ফাঁসের (ইংরেজিতে লুপ) মত, কখনও গ্রীক সিগ্‌মা অক্ষরের মত, কখনও নিক্তির আকারে। এই ধরনের অতি সুন্দর সরু, মোটা, ঋজু, লীলায়িত অথবা কুঞ্চিত রেখা দিয়ে নানা আকারের জ্যামিতিক ছক এঁকে বিচিত্র নয়নাভিরাম অলঙ্করণে বিভিন্ন মাপের ও আকারের জমি ভরিয়ে দেবার রীতি প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে বরাবর লৌকিক চিত্রে বা আল্‌পনায়, পোশাকে, গৃহসজ্জায় এবং নানা সরঞ্জামে বিশেষ স্থান ও সমাদর পেয়েছে। অধুনা আবার নিজস্ব মহিমায় সম্পূর্ণ চিত্র হিসাবে আধুনিক শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীদের চিত্ররচনায় বহুল ও বিচিত্রভাবে ফিরে এসেছে। তাঁদের নতুন সৃষ্টিপথে উদ্বুদ্ধ করেছে।

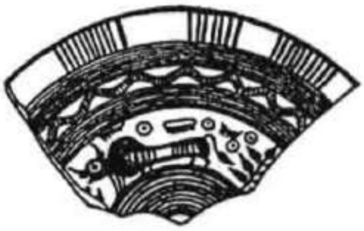
নান্দারার পাত্রে বেশ ভাল আঁকা জীবজন্তু খুব পাওয়া যায়, যেমন সিংহ, মাছ, পাখি, তাদের গায়ের সবটা লাল রঙে ভর্তি। একটি মাত্র বলদ পাওয়া গেছে। হরতনের নক্‌শা প্রায়ই পাওয়া যায়, এটি পিপুল গাছের পাতা থেকে নেওয়া। পিপুল গাছ এখনকার মত তখনও বোধহয় লোকে পূজা করত। মাঝে মাঝে কালো হরিণ, বা আইবেক্স, স্টাইলাইজড্ ভাবে আঁকা, পাওয়া যায়।



নালে এসব নক্‌শা আরও জটিল। আম্‌রি-নান্দারার চৌখুপি, রুইতন বা বর্‌ফি, লাল রেখার প্যানেল, সিগ্‌মা চিহ্নের মত সরল নক্‌শা নেই। তার জায়গায় বাঁকা রেখায় আঁকা ছবি, একের পিঠে আরেক বৃত্ত ঘুরে ঘুরে ছড়িয়ে ছড়িয়ে হল নতুন নক্‌শা। নতুন নতুন জীবজন্তুর আবির্ভাব হল, যেমন নানাধরনের পাখি, আইবেক্স, কাঁকড়াবিছে। গরুর জোয়ালের মত একরকম নক্‌শা হল, বোধহয় গ্রীক সিগ্‌মা অক্ষরকে বিলম্বিত করা। রঙও নানারকম হল, আগে শুধু লাল ছিল, তার উপরে হল নীল, হল্‌দে আর সবুজ।

কুল্লীতে মাটির পাত্রের গায়ে জমি হিসাবে যে রঙ দেওয়া হত ইংরেজিতে তাকে বলে স্লিপ। তা হত সাধারণত বাফ্ কিম্বা গোলাপী কিম্বা ফিকে লাল বা সময়ে সময়ে সাদাটে। তার উপরে পাত্রের গা বেয়ে আড়াআড়ি সমভূমিক বা ইংরেজিতে হরিজন্টাল ভাবে মোটা মোটা রেখার পটির মধ্যে নক্‌শা হত। পাত্রগুলির গড়ন হত সুন্দর, হালের আমলের ফলের ডিশের মত, লম্বা খুরোওলা ডিশ্, গোল আকারের জলের পাত্র, লম্বা শিশির মত ভাস, ছোট ছোট চ্যাপটা ডিশ্। বড় বড় লম্বা কিম্বা পেটমোটা গোল জালাও হত। উপরে নীচে জ্যামিতিক রেখা বা নক্‌শার দুটি মোটা পটি, মধ্যে জীবজন্তু গাছপালার নক্‌শা, পাত্রের চারদিকে গোল হয়ে ঘুরে গেছে। সাধারণত এই ধরনের পটির মাঝখানে একজোড়া জন্তু থাকে, পিঠে ককুদ, কিন্তু জাতে বাঘ বা বেরাল ধরনের, শরীরটা চ্যাপ্‌টা অসম্ভব লম্বা করে আঁকা (ডাক্‌শুণ্ড কুকুরের মত খানিকটা, শরীরটা খুব লম্বা পাঁউরুটির মত, পাগুলো খুব বেঁটে বেঁটে), তার সঙ্গে গাছপালার বিশুদ্ধ আকৃতির ল্যান্ডস্কেপ (ইংরেজিতে এই ধরনের আঁকাকে ফর্ম্যালাইজড্ বা ছকে ফেলা বা রীতিবিন্যস্ত বলে, যেমন বট গাছ আঁকতে হলে পাতা না এঁকে খানিকটা ইস্কাবন বা চিড়িতনের মত এঁকে দেয়, শুধু আভাস বা দূরসাদৃশ্য আনার জন্য), তার সঙ্গে কখনও কখনও ছোট ছোট, স্টাইলাইজ করা শিংওলা ছাগল। প্রধান জীবজন্তুর উপরে ইংরেজিতে ডব্লিউ অক্ষরের আকারে কখনও থাকে রেখা বা রঙ দিয়ে আঁকা ছোট ছোট পাখি, কখনও মাছ, কখনও নানারকম রোজেট্ বা গোলাপ নক্‌শা। বলদগুলি কখনও কখনও গাছের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা। পিপুলগাছের হরতন আকারের পাতা প্রায়ই দেখা যায়।









কুল্লীর সব পাত্রই নরম তুলি দিয়ে কালো রঙে আঁকা। বাইরের আকারের রেখা, ইংরেজিতে যাকে বলে আউটলাইন, সেটা কালো, তার মধ্যের জমি মোটা মোটা রেখা অথবা সরু রেখার আড়াজালি দিয়ে ভরানো। চোখ সব সময়েই বড় করে আঁকা, প্রকাণ্ড বৃত্তের মত, মধ্যে ছোট কালো বৃত্ত, তার চারিদিকে সাদা বৃত্ত। সমস্ত শরীরটা অদ্ভুত চ্যাপ্‌টা আর লম্বা করে দেওয়া, কেউ যেন জন্তুটার উপর দিয়ে রোলার চালিয়ে দিয়েছে। অথচ পা, খুর এসব খুব নিখুঁত করে আঁকা। পাত্রের বা স্থাপত্যের বিস্তৃত বাঁকের জমি ভরাবার উদ্দেশ্যেই জন্তুর দেহের আকার এইভাবে বিকৃত করা হয়। এই ধরনের আর্য প্রয়োগের, যাকে ইংরেজিতে বলে ডিস্‌টরশন্, রীতি বহুযুগ ধরে নন্দনশাস্ত্রে আদৃত হয়ে এসেছে, প্রাচ্য ষড়ঙ্গে সম্মানের স্থান পেয়েছে। তার সঙ্গে উপরে নীচে যে সব জ্যামিতির নক্‌শা থাকে সেগুলি কখনও কখনও জোড়া জোড়া ত্রিভুজ, কোণের সঙ্গে কোণ আড়াআড়ি জুড়ে দেওয়া, অথবা রুইতন। মাঝে মাঝে ফাঁস ঝুলে থাকে, সিগ্‌মা বা চোক নক্‌শাও দেখে যায়। কখনও কখনও পাওয়া যায় ঢেউখেলানো নক্‌শার পটি। মাঝে মাঝে উপর নীচে মোটা রেখার মত করে লাল রঙ দেয়া। লালটি হচ্ছে দ্বিতীয় রঙ।

শাহীটুম্প্ সম্বন্ধে দু'এক কথা বলে দুই নদীর দেশের কথা শেষ করব। শাহীটুম্প্ থেকে যে সব মাটির পাত্র পাওয়া গেছে সেগুলির খোলা খুব উৎকৃষ্ট, শক্ত, পাতলা ; রঙ ছাই থেকে ফিকে গোলাপী, কখনও পরিষ্কার হলুদে-বাফ্। সবচেয়ে বেশি পাওয়া গেছে এক ধরনের চ্যাপ্টা গামলা বা বাটির মত পাত্র, তলায় বেশ কেতাদুরস্ত খুরো দেয়া। বড় বড় পাত্রও পাওয়া গেছে।

নরম তুলি দিয়ে নক্শা আঁকা, নক্শার রঙ কালো থেকে নয়নতৃপ্তিকর সেপিয়া, তার থেকে লাল্চে-ব্রাউনে চলে গেছে। শাহীটুম্পের একটি প্রধান বিশেষত্ব হচ্ছে যে, রঙে আঁকা রেখার সীমাটি অল্প অস্পষ্ট হয়ে গেছে, তীক্ষ্ণ নেই—তার মানে সীমান্তে পাতলা রঙ সীমারেখা ছাড়িয়ে খড়খড়ে বেলে জমিতে ছড়িয়ে শুষে গেছে। আঁকার রীতি খুব ঋজু বা দৃঢ় নয়, বরং ঢিলেই বলা যায়। পাত্রের গায়ে ভাগ করে প্যানেল করা, পেটের কাছে সাধারণত স্বস্তিকা আঁকা। ভিতরদিকেও চিত্র করা, স্বস্তিকার খোঁচা খোঁচা ভাবে আঁকা শম্বুক বা স্পাইরাল, তার সঙ্গে তীরের ফলা, বর্‌ফি বা ত্রিভুজ। একটি পাত্রে তীরের ফলার নকশায় লাল কালো দু'রঙেরই রেখা আছে।



হরপ্পা আর মহেঞ্জোদারো

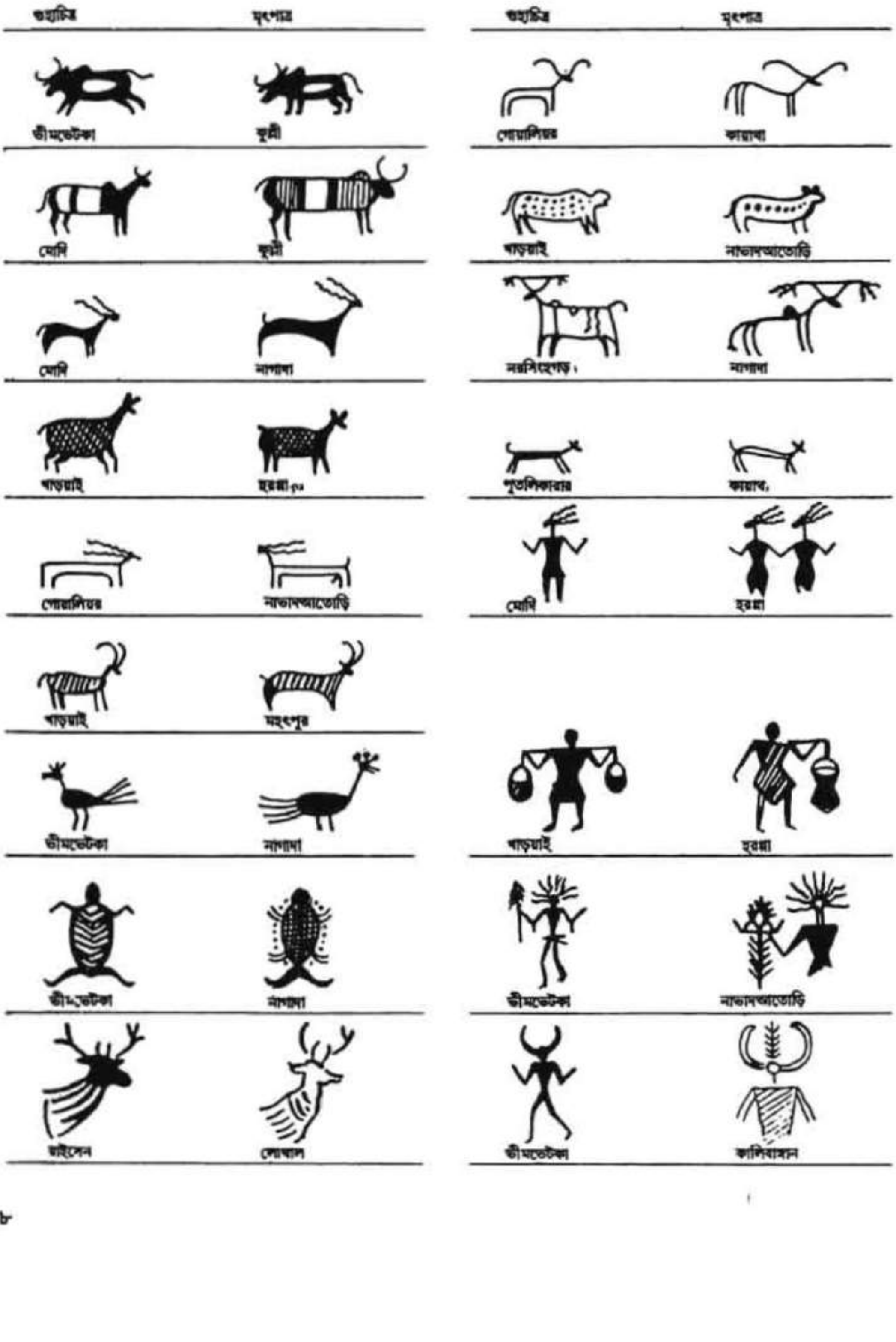
পশ্চিম পাকিস্তানের দুই নদীর দেশের সংস্কৃতির কথা সামান্য বললাম। জায়গাগুলি বালুচিস্তান আর সিন্ধুপ্রদেশে। জোব্ রাণাঘুণ্ডাই-এর প্রায় দু'শ মাইল পূবে আর একটি জোড়া নদীর সভ্যতার কথাও মাত্র গত ষাট সত্তর বছর হল লোকে ভাল মত জানতে পেরেছে। হরপ্পা বা হড়প্পা জায়গাটি পশ্চিম পাঞ্জাবের লাহোর শহরের প্রায় ১০০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে সিন্ধু প্রদেশে, ঝিলম আর শতদ্রুর মাঝামাঝি, প্রায় রবি নদীর উপরে। এই হরপ্পারই আবার ৩৫০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে সিন্ধু প্রদেশে বড় সিন্ধু নদীর উপর আরেকটি বিরাট নগরের কথাও পৃথিবীর লোক মাত্র বছর সত্তর হল জানতে পেরেছে, তার নাম মহেঞ্জোদারো।

গ্রীক ভূগোলবিদ্ স্ট্রাবো লিখে গেছেন, "ঝিলম আর বিয়াস (বিপাসা) নদীর মাঝখানে শোনা যায় নয়টি মহাজাতি পাঁচ হাজার নগরে বসবাস করে, তার একটি নগর নাকি আমাদের (গ্রীসের) কোশের মত বড় ; কিন্তু আমার মনে হয় এসব কথা অতিরঞ্জিত।"

সম্প্রতি পণ্ডিতরা মনে করেন যে হরপ্পা আর মহেঞ্জোদারো এই সাম্রাজ্যের দুটি বড় নগর ছিল। তাদের মধ্যে ছিল অগণিত ছোটবড় শহর। "হরপ্পা সংস্কৃতি" এই নামের আড়ালে হয়ত চাপা পড়ে আছে পশ্চিম এশিয়ার একটি বৃহৎ সাম্রাজ্যের উপাখ্যান। কিছু বিচিত্রও নয়। কারণ হরপ্পা আধুনিক লাহোর থেকে ১০০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে, রবি নদীর উপরে। আর মহেঞ্জোদারো তার ৩৫০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে সিন্ধু বা ইন্ডাস্ নদীর উপরে, আধুনিক করাচীর ২০০ মাইল উত্তরে। যা কিছু প্রমাণ এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে তাতে ধরে নিতে বাধা নেই যে দুটি নগরী একই সময়ের, একই ধরনের প্ল্যানে করা, একটি সাম্রাজ্যের দুটি যমজ শহর, একটি উত্তরে, একটি দক্ষিণে। উত্তর-পশ্চিম ভারতে এরকম যমজ শহর আরও ছিল, যেমন শক-কুশানদের সময়ে উত্তরে পেশোয়ার বা তক্ষশীলা আর দক্ষিণে মথুরা একই সাম্রাজ্যের দুটি যমজ নগর। ছেলেবেলায় অবিভক্ত ভারতে পাঞ্জাবের লাহোর আর বাংলার কলকাতাকে আমার এইভাবে যমজ নগর বলে ভাবতে ভাল লাগত। কী সংস্কৃতি, কী রাজনৈতিক আন্দোলন, কী সামাজিক উদ্যম, এমন কি নগর সমৃদ্ধির ব্যাপারেও (লাহোর গড়েন জাহাঙ্গীর, কলকাতা গড়েন আদর্শে ও আশায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ইংরেজ ও দেশীয় নগর স্থপতিরা), দুই নগরের মধ্যে মেজাজের খুব মিল ছিল। লাহোরের আনারকলি অঞ্চলের কথা উঠলেই আমার কলকাতা নগরের উত্তরে বিড়ন্ স্ট্রীট দক্ষিণে বৌবাজার স্ট্রীটের মধ্যে আবদ্ধ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় অঞ্চলটি মনে পড়ত ও গর্ব হত।

হরপ্পার আশেপাশে ছোটবড় চোদ্দটি গ্রাম বা নগরের চিহ্ন পাওয়া গেছে। মাঝখান দিয়ে সিন্ধু নদী নিশ্চয় দুটি মহানগরীকে ভাগ করে সংযুক্ত করত, সিন্ধু দিয়ে চল্‌ত জলপথে বাণিজ্য আর বালুচিস্তানের গিরিবর্ত্ম দিয়ে চল্‌ত পশ্চিমের সঙ্গে ব্যবসা।

গুহাচিত্রের সঙ্গে চ্যালকোলিথিক মৃৎপাত্রের তুলনা



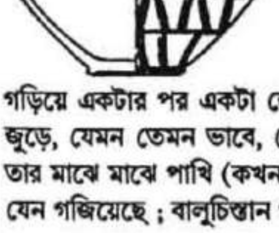
যদিও হরপ্পা সম্বন্ধে প্রায় একশ' বছর ধরেই পণ্ডিতদের মন উসখুস্ করছে, কিন্তু খোঁড়াখুঁড়ি কাজ আরম্ভ হয়েছে মাত্র সত্তর বছর। প্রথম হরপ্পা সম্বন্ধে ঔৎসুক্য দেখান বিখ্যাত ভারতবিদ প্রত্নতাত্ত্বিক জেনারেল ক্যানিংহ্যাম্। ১৮৫৬ সালে তিনি হরপ্পা দেখে আসেন। তারপর আর খোঁজখবর নেই। হঠাৎ স্যর জন মার্শালের উদ্যোগে হরপ্পায় খোঁড়াখুঁড়ির কাজ শুরু হয় ১৯২০ সালে, ১৯২১-এ বন্ধ হয়, আবার আরম্ভ হয় ১৯৩৩ সালে, এক বছর চলে। হরপ্পার কাজ পরিচালনা করেন দয়ারাম সাহনি। হরপ্পায় যখন কাজ আরম্ভ হয়, তখন মহেঞ্জোদারোয় একক উৎসাহে খোঁড়াখুঁড়ি করে নানা চিহ্ন, লক্ষণ, অকাট্য নিদর্শন দেখে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে খননের জন্য খুব উঠে পড়ে লাগেন। তাঁরই একান্ত উদ্যোগে মহেঞ্জোদারোর কাজ শুরু হয় ১৯২২ সালে, চলে ১৯৩১ পর্যন্ত। তারপরে কিছুদিন বন্ধ, আবার শুরু হয় ১৯৩৫-এ, শেষ হয় ১৯৩৬ সালে। এ সময়ে একজন ইংরেজ ছিলেন, অর্নেস্ট ম্যাকাই। ১৯২৭ থেকে ১৯৩১ পর্যন্ত ননীগোপাল মজুমদার, যাঁর নাম আগেই করেছি, এই সারা অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোর আশেপাশে কি ধরনের সভ্যতা ছিল তার বহু নিদর্শন আবিষ্কার করেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে ১৯৩৮ সালে যখন আবার নতুন উদ্যমে কাজ আরম্ভ করবেন, তখন কীরথার পাহাড়ে পার্বত্য হুরজাতীয় দস্যুদের হাতে তিনি প্রাণ হারান। তারপর আবার ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত প্রোফেসর মর্টিমার হুইলর খোঁড়াখুঁড়ির পরে একটি বই বার করেছেন যেটি বেশ প্রামাণ্য বলে ধরা যায়।

মহেঞ্জোদারো আর হরপ্পার নগরগুলিতে কি আশ্চর্য ব্যবস্থা ছিল, তখন সামাজিক সংগঠন, নগর রক্ষার ব্যবস্থা, ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা, নগর পরিচালনা, সাধারণ নগরবাসীর দৈনন্দিন জীবনে কত পরিপাট্য ছিল, এসবের বর্ণনা মার্শালি বা মর্টিমার হুইলরের বইতে পড়লে তন্ময় হতে হয়। শুনলে ভাল লাগে যে আধুনিক যুগের সেরা নগরশিল্পীরা, যেমন ল' কর্বুসিয়ের, জন্‌রো, ম্যাক্সওয়েল ফ্রাই, মোজার প্রভৃতি, খুব মন দিয়ে হরপ্পা, মহেঞ্জোদারোর নগরব্যবস্থা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেছেন এবং তার থেকে কি শিখেছেন তা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। এঁরা পৃথিবীর সবচেয়ে আনকোরা নতুন শহর, পূর্ব পাঞ্জাবের রাজধানী চণ্ডীগড় তৈরি করেছেন।

হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোর নগরসংস্থান, নাগরিক ব্যবস্থা ও সামাজিক জীবনের আলোচনা এখানে করব না। শুধু জেনে রাখি যে তাঁদের ব্যবস্থা থেকে আধুনিক জীবনে অনেক কিছু শেখার, নেবার, ধার করার আছে। এইটুকু যদি আমরা জানি তাহলে এটাও বুঝতে দেরি হবে না যে হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোতে যদি কিছু ছবি পাওয়া গিয়ে থাকে, তবে তার থেকেও আমাদের যথেষ্ট শেখার আছে, এবং ভারতবর্ষের জীবনে হয়ত সেগুলি বারবার কাজে লেগেছে, কারণ যে কোন যুগে ছবি মানুষের জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ।

হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোয় খোঁড়াখুঁড়ি করে দেয়ালে, পটে বা কাপড়ে আঁকা কোন ছবি পাওয়া যায়নি। মহেঞ্জোদারো আর হরপ্পা সমসাময়িকই বলা যায়, এবং পণ্ডিতরা মনে করেন এ দুটি নগরের সবচেয়ে জাঁকজমক ছিল খ্রীস্টপূর্ব ২৯০০ থেকে ২০০০ পর্যন্ত। হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোতে যে সমস্ত অত্যাশ্চর্য মনোরম মূর্তি, মাটির পুতুল, মাটির ছাপের জন্তুজানোয়ার আঁকা সীল পাওয়া গেছে তার ছবি এক আধটা দেখে মনে হয় এরকম অদ্ভুত তেজ, আঁকার পরিপাট্য, স্টাইলাইজেশন্ খুবই দুর্লভ। কিন্তু রঙ আর তুলি দিয়ে আঁকা ছবি একমাত্র মাটির পাত্রের গায়েই পাওয়া গেছে। তার সম্বন্ধে অল্প করে বলব।

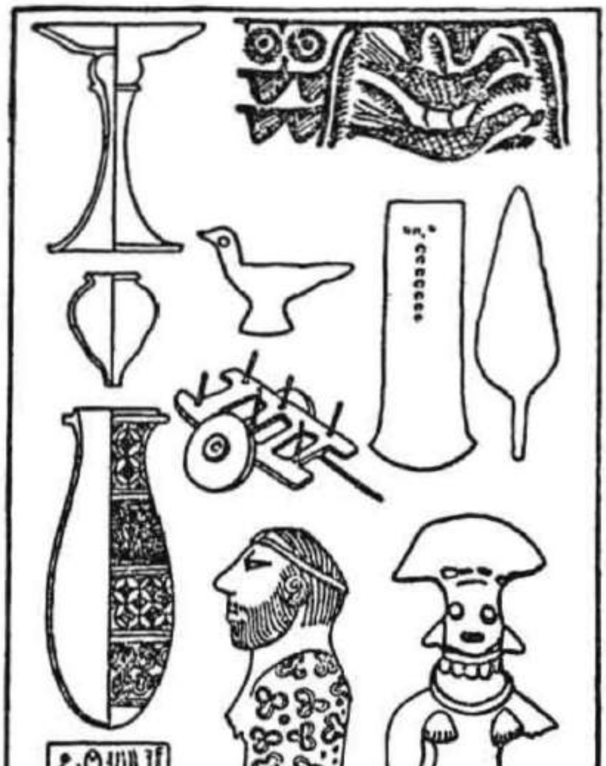
হরপ্পা সংস্কৃতির যে মাটির পাত্র পাওয়া যায়, তার গায়ের ছবি রাণাঘুণ্ডাই-এর কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু সেই সঙ্গে কুল্লীর মাটির জিনিসের কথাও মনে আসে। ছবিগুলি লাল জমির উপরে কালো রঙে আঁকা, আল্‌পনা



বা ছবিগুলি গাঢ় লাল, জ্বলজ্বলে পালিশ করা গায়ের উপর চিত্রিত। দুই ধরনের চিত্র বা প্যাটার্ন ঘুরে ফিরে আসে : একটি জ্যামিতিক বা অপ্রাকৃত, তার মধ্যে গোল বা বৃত্ত পরস্পরের উপর পড়ে জাফ্রির মত প্যাটার্ন তৈরি করেছে। দ্বিতীয় প্যাটার্ন হচ্ছে প্রকৃতি থেকে নেওয়া গাছপালা, জন্তুজানোয়ারের ছবি। প্রথম প্যাটার্নটি অত উল্লেখযোগ্য কিছু নয়, কিন্তু দ্বিতীয়টি হরপ্পার নিজস্ব। এগুলি সাধারণত গড়িয়ে গড়িয়ে একটার পর একটা জের টেনে চলে গেছে, কিছুটা যেন অগোছালোভাবে আঁকা ; মাটির পাত্রের সমস্ত গা জুড়ে, যেমন তেমন ভাবে, কোন বিশেষ ছন্দ বা সমতা না রেখে, রাশি রাশি লতাপাতা, লতার ডগা চলে গেছে, তার মাঝে মাঝে পাখি (কখনও ময়ূর), আবার কখনও কখনও অন্য চতুষ্পদ জন্তু। কিছুটা অপরিচ্ছন্ন, ঝাঁকড়া হয়ে যেন গজিয়েছে ; বালুচিস্তান পটারির মত দৃঢ়, কঠিন, তক্‌তকে, ধ্রুপদী কাজ নয়। মনে হয় যেন বালুচিস্তানের ছবি

সেই দেশেরই মত শক্ত, শুক্‌নো, পাথর বের করা পাহাড়ের মত টান ; চর্বিবিহীন পেশী আর হাড়ের মত ; আর সিন্ধু নদীর ছবি সেখানকার ভিজে, স্যাঁতসেঁতে সমতলভূমির অজস্র লতাপাতা জঙ্গলের মত বেড়ে উঠেছে।

হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর জন্তুজানোয়ারের ছবি খানিকটা কুল্লীর কথা মনে পড়িয়ে দেয়। মোটা রেখা দিয়ে শরীরটা আঁকা, মধ্যেকার জমি আড়াআড়ি বেড়াবোনার মত রেখা অথবা সমান্তরাল রেখা দিয়ে ভর্তি। কুল্লীর মতই জন্তুদের শরীরগুলো চ্যাপ্‌টা, লম্বা করে আঁকা, কুল্লীর পটারীর সঙ্গে বাস্তবিক খুব সাদৃশ্য আছে। যেমন মহেঞ্জোদারোর একটি পাত্রের গায়ে শরীরটা লম্বা করে আঁকা একটি হরিণ আছে (হয়ত বা শিংওলা ছাগল হবে) ;



হরপ্পা সংস্কৃতি

তার গা আড়াআড়ি রেখা দিয়ে ভর্তি ; প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে, সেটা আবার ফুটকি আর বৃত্ত দিয়ে ভরাট করা, তারই মধ্যে আবার আড়াআড়ি টানা রেখার সঙ্গে রঙের ছোট ছোট চাপ। পাশে আরেকটি দ্বিতীয় জন্তু, বোধ হয় শেয়াল হবে, খোঁচাখোঁচা ডালওলা একটি গাছের পাশে দাঁড়িয়ে। যদিও হুবহু কুল্লীর মত নয়, তবুও দেখে মনে হয় রীতিটা সেখান থেকে মহেঞ্জোদারোর শেষের যুগের আমদানি। কাছেই চানহুদারোতে দেখা যায় আইবেক্স বা শিংওলা কালো হরিণ, আর বড়শিঙ্গা ; এগুলির আদৎ একেবারে হরপ্পার নিজস্ব।

কিন্তু হরপ্পার অদ্বিতীয় ছবি হচ্ছে পটারির গায়ে মানুষের ছবি। একটি পাত্রে একটি মানুষ কাঁধে বাঁক ঝুলিয়ে যাচ্ছে, দু'দিকে দুটি বড় বড় মাছধরা জাল, পিছনে বোধ হয় একটি বড় কাছিম, তার পিছনে মাছ। পা দুটি একটি মোটা রেখার পটির উপর দাঁড়িয়ে ; তার তলায় আড়াবোনা রেখা চলে গেছে নীচের দিকে, একটি বোধ হয় নদী, তার পাশ দিয়ে লোকটি হেঁটে চলে যাচ্ছে, অন্তত সেইরকম মনে হয়। যেন কোন আধুনিক ছবি, রেখার স্বল্পতা আর পারিপাট্যের উপর এত নজর। আর একটি টুকরো পাওয়া গেছে, (এটি বোধহয় অনেক পরের) সেটি দেখে

মনে হয় খুব বিশদভাবে আঁকা ছিল, পাত্রটির গা জুড়ে, ফলাও করে অনেকগুলি প্যানেল ছিল মনে হয়। একটি প্যানেলে প্রাকৃতিক দৃশ্য, তারপরের প্যানেলে চৌকো চৌকো সতরঞ্চ নক্‌শা, আবার প্রাকৃতিক দৃশ্য, এইভাবে চলে গেছে। যেটুকু আছে দেখা যায় একটি প্যানেলের একটু টুক্‌রোয় গাছের ডালপালা, তার উপরে একটি পাখি, তলায় এক মা-হরিণ বাচ্চাকে দুধ খাওয়াচ্ছে, আরো দুটো পাখি ; প্যানেলের উপর দিকে একটা মাছ, তার সঙ্গে



একটা তারা, তারপরে সতরঞ্চের পটি বা প্যানেল। তারপরের প্যানেলের টুকরোয় একটি মানুষ একহাত তুলে দাঁড়িয়ে, আরেক হাত মাথায়, পিছনে একটি ছোট ছেলে, তারও দু'হাত মাথার উপরে তোলা, পাশে দুটি মাছ, মাঠে একটি মোরগ কঁক কঁক করতে করতে যাচ্ছে। আরো দুটো পাত্রের টুকরোয় দেখা যায় গাছ, মানুষের মাথা আর হাত, একটাতে বোধহয় ফনাতোলা গোখ্‌রো সাপ, আরেকটা ডালপালাওলা প্রকাণ্ড গাছ। এইরকম ধরনের কিছু পটারি পারস্যের মাকরাণে 'খুরাব' কারখানায় পাওয়া যায়।

হরপ্পা সভ্যতার আরেক ধরনের পটারির কথা বলতেই হয়। এর নক্‌শায় একাধিক রঙ ব্যবহার হয়েছে। ইতিহাসের আগের যুগে এ অঞ্চলে নানারঙা পটারি প্রায় পাওয়াই যায় না ; যদিও লাল কালো দুই রঙে আঁকা মাটির জিনিস খুবই পাওয়া যায়। কিন্তু সত্যকারের রঙীন পটারি, যা আমরা হরপ্পা বা মহেঞ্জোদারোয় পাই, সেগুলি বাফ্ বা হল্‌দেটে জমির উপর লাল আর সবুজ রঙে আঁকা। চানহুদারোতে আবার হল্‌দে জমির উপর কালো, সাদা আর লালে আঁকা পাখি আর জন্তু দেওয়া প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি পাওয়া গেছে। কিন্তু হরপ্পায় যেমন লাল, নীল, সবুজ আর হল্‌দে অর্থাৎ পুরো রঙ দেওয়া পটারি পাওয়া গেছে, সেরকম একমাত্র, আগে যা বলেছি, নাল সংস্কৃতিতেই পাওয়া গেছে।

এইবার শেষ করব হরপ্পায় পাওয়া বিশেষ একধরনের পটারির কথা বলে। এটি এইচ—কারখানায় পাওয়া গেছে এক নম্বর আর দু'নম্বর স্তরে। এখানকার পাত্রগুলি খুব মজবুত করে তৈরি, তাদের গায়ের জমি জ্বলজ্বলে লাল। তাদের গায়ে কালো দিয়ে আঁকা নক্‌শার সীমাগুলি বেলে-গায়ে শুষে গিয়ে মোলায়েম হয়ে গেছে, সেরকম তীক্ষ্ণ, কাটাকাটা নেই। শাহীটুম্পের মত। আঁকার রীতিপদ্ধতি খুবই সুনিপুণ, দৃঢ়। পাত্রগুলির গড়ন যেমন মার্জিত, ছবিগুলিও তেমনি সুরুচিপূর্ণ আর পরিপাটি। নিশ্চয় তখনকার কুমারশালে পোড়ানোর জন্যে ভাল ভাঁটা বা পোনঘর ছিল। নক্‌শার মধ্যে পাওয়া যায় নানাধরনের তারা, স্টাইলাইজ করা গাছপালা, ফুটকি আর বৃত্ত,



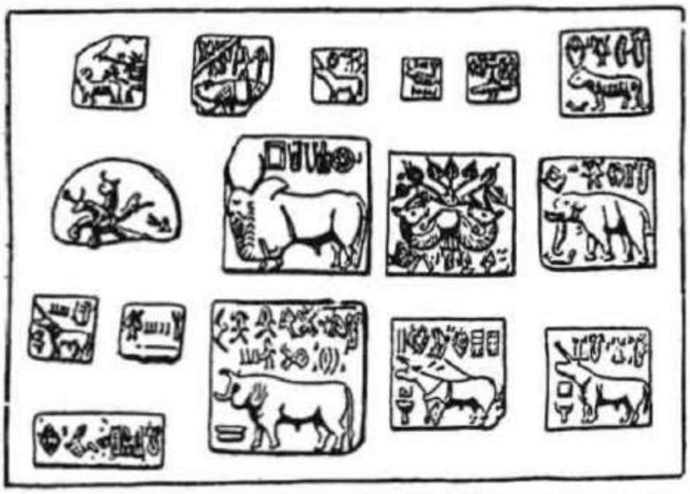
সোজা আর আঁকাবাঁকা লাইনের সারি আর ব্যাকগ্রাউণ্ড বা পিছনের জমি ভরাবার জন্য ঘুরপাক খাওয়া রেখা। এগুলি খানিকটা ধ্রুপদী বা জ্যামিতিক বা ইংরেজিতে যাকে বলে ফর্মাল নক্‌শা, তাছাড়া প্রায়ই পাওয়া যায় ষাঁড়, বলদ বা গরু, ছাগল, ময়ূর, মাছ, খুব জাঁকালোভাবে আল্‌পনার মত আঁকা। কখনও কখনও পাত্রের গা বেয়ে সবটা চলে গেছে, কখনও বা প্যানেল করে আঁকা। কখনও বা ঢাকনির ভিতর গোল করে আঁকা। এসব ছবি

মোটেই প্রাকৃতিক দৃশ্যের ভাবে আঁকা নয়, উল্টে এগুলি যেন সংকেতে বা প্রতীকে, যাকে ইংরেজিতে বলে সিম্বলিজমে ভর্তি—একসার ময়ূর তাদের মাঝে মাঝে তারার সভা বা সূর্য। এই ময়ূরের গায়ে বা পেটে আবার একটি গোল, তার মধ্যে পুরো মানুষ আঁকা। আরেকটি পাত্রে আবার ময়ূরের সঙ্গে একধরনের সেন্টর একের পর এক চলে গেছে, সেন্টরের মাথায় বড়শিঙার মত বড় বড় শিং। আরেকটি অদ্ভুত ভাজের (vase) উপরদিকে একটা গোল করে পটি বা ফ্রিজ আছে। শুরু হয়েছে দুটি ময়ূর দিয়ে, তারপরে একটি ছবি, তাতে উস্কোখুস্কো হাওয়ায় উড়ছে চুলওলা একটি মানুষ, ধরে আছে দুটি গরু, তাদের পিছনে একটা কুকুর। তারপরে আসছে একটি পটি, তারপরেই অদ্ভুত ধরনের ককুদওলা একটা ষাঁড়, তার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিঙে সাতটি পতাকার মত কি যেন লাগানো, ঠিক বোঝা যায় না। তারপরে আসছে আরেকটি লোক দুটি গরু অথবা ষাঁড় নিয়ে, তাদের প্রত্যেকের শিংজোড়ার মধ্যে একটি পতাকা, খানিকটা মনে হয় যেন ক্রীটের মিনোয়ান ষাঁড়, মাথায় জোড়া কুড়ুল। সারা ছবিটাই আবার তারা, পাতা ঘুরপাক খাওয়া রেখায় ভর্তি। এরকম ছবি আঁকা পাত্র এ অঞ্চলে একেবারেই অভূতপূর্ব। একমাত্র পাওয়া গেছে কিছু সামারা পটারিতে।

পরিশেষ

ইতিহাসের আগের যুগের ছবির কথা নিয়ে অনেকখানি লিখলাম।

ছবির কথা বলতে গিয়ে প্রত্নতত্ত্বের কথা বলবার মত হল। কিন্তু ছবিগুলি একটু যত্ন করে দেখলে ঔৎসুক্য বেড়ে যাবে, বড় বইয়ের সন্ধান করতে ইচ্ছে হবে। ১৯৩৭ সালে ভারত সরকারের প্রকাশিত "ফার্দার এক্সক্যাভেশন্‌স্ এ্যাট্ মহেঞ্জোদারো" বার হয়, তার দ্বিতীয় খণ্ডে ৫২ থেকে ৯০ পর্যন্ত ছবিগুলি পটারি চিত্র, তার সঙ্গে প্রথম খণ্ডে ১৭৪ থেকে ২৯৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত তাদের বর্ণনা। ১৯৪০ সালে ভারত সরকারের প্রকাশিত "এক্সক্যাভেশন্‌স্ এ্যাট্ হরপ্পা" বলে বইটির প্রথম খণ্ডে ২৭৫ থেকে ৩১৫ পৃষ্ঠা অবধি আছে বর্ণনা, আর দ্বিতীয় খণ্ডে ৬০ থেকে ৭৫ নম্বর পর্যন্ত ছবি। উত্তরপ্রদেশের বেরিলী জেলার অহিচ্ছত্রে খ্রীস্টযুগের প্রথম দিকের কিছু চিত্রিত পটারি পাওয়া গেছে। দেশবিভাগের পরে আমাদের ভারতবর্ষের যে সব স্থানে মহেঞ্জোদারো-হরপ্পা সংস্কৃতির প্রমাণ পাওয়া গেছে তাদের কয়েকটির নাম উল্লেখ করি। সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছ প্রদেশে আছে রোজাড়ি, রঙপুর, লোথাল। পাঞ্জাবে আছে রোপড়, আলমগীরপুর, কালিবাঙ্গান।

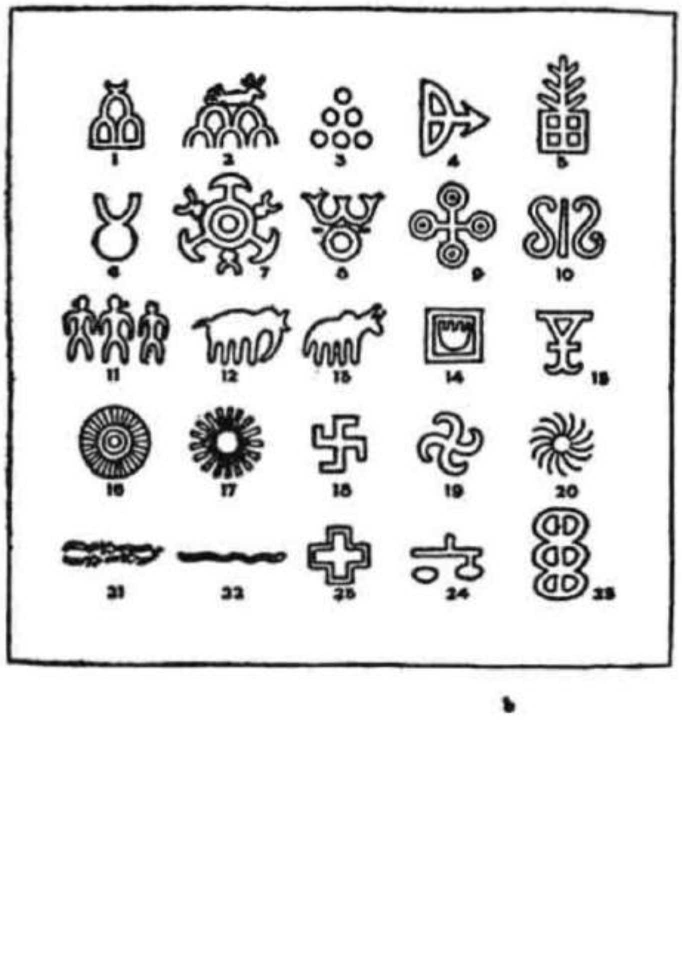


জোব, রাণাঘুণ্ডাই, কোয়েটা, আম্‌রি, নান্দারা, নাল্, কুল্লী, শাহীটুম্প্, হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো, চানহুদারোর সম্বন্ধে বিশদভাবে বলার উদ্দেশ্য আছে। প্রথমেই বলি যে, আজকের দিনে ইংলণ্ড, আমেরিকা, রাশিয়া, জাপানে যা ঘটছে, তার সন্ধান যেমন আমরা আমাদের দেশে পাই, আমাদের দেশের সন্ধানও তারা পায়, তেমনি ইতিহাসের আগের যুগেও নিশ্চয় সেরকম আদান-প্রদান যথেষ্ট ছিল। দ্বিতীয়ত, একদেশে ছবি আঁকার ব্যাপারে নতুন কিছু হলে তার খবরটা নিশ্চয় অন্যদেশে তাড়াতাড়ি চলে যেত, অর্থাৎ শিল্পীরা বৈজ্ঞানিকদের মত চিরকালই আন্তর্জাতিক। শুধু যে রেমব্রান্ট পারসীক বা মুঘল ছবি নকল করতেন, তা নয়।

এসবের চেয়েও বড় কথা হচ্ছে যে ভারতবর্ষের ছবিতে, ভাস্কর্যে জীবনের সব কিছুর সম্বন্ধে আছে অপরিসীম আগ্রহ ও আনন্দ। সৃষ্টির প্রাচুর্য, রূপ, রস, গন্ধ, প্রাণীর সঙ্গে প্রাণীর যোগ, গাছপালা, ফুলফল, লতাপাতার সঙ্গে কীটপতঙ্গ থেকে অতিকায় হাতি পর্যন্ত সমস্ত রকমের জীবন্ত জিনিসের সঙ্গে একান্ত যোগ, সারা বিশ্বের সৃষ্টির সঙ্গে একাত্মতা, যাকে ইংরেজ কবি কীটস্ বলেছেন, "ওআন্‌নেস্ অব্ দি ইউনিভার্স", তার উন্মাদনায় বিভোর, আত্মহারা

হয়ে ভারতীয় শিল্পী যেন পাগলের মত এঁকে গেছেন। এমন কি এই আগ্রহের দরুন ও সেই অনুপাতে শিল্পজ্ঞানের স্বাধীনতা মনে বা হাতে না থাকায় আঁকার মধ্যে অসংযম বা পারিপাট্যের অভাবও দেখা যায়। ভারতশিল্পের এ ধারার মূল উৎস আমরা খুঁজে পাই এই দুই নদীর সভ্যতার মৃৎপাত্রের ছবিতে। এর পরের কথা হল, লাল কালো রঙে আঁকা, লালের উপর লাল দিয়ে ছবি আঁকা, তারপরে জ্বলজ্বলে হলদে, সবুজ, নীল, লালে ছবি আঁকার রীতি বরাবরই যেন ভারতবর্ষের নিজস্ব রীতি, ঐতিহ্যের সিঁড়ি বয়ে চলে এসেছে আমাদের লোকশিল্পে, একালের সজ্ঞান শিল্পীর কাজ পর্যন্ত। তারপরের কথা হল, যে-ধরনের লতাপাতা, ফুলফল, জ্যামিতিক রেখা, প্রাকৃতিক বা আজগুবি জীবজন্তু বা জীবজন্তুর স্টাইলাইজড বা রীতিবিন্যস্ত ছবি আমরা দুই নদীর দেশে পাই, তার প্রায় সব কটি নক্‌শা ঘুরে ফিরে সারা ভারতের ভাস্কর্যে আর চিত্রকলায় পাওয়া যায়। বিশেষ দেখা যায় মাটির পাত্রের নক্‌শায়, কার্পেটে, সতরঞ্চে, বিছানাঢাকায়, সাজে, পুতুলে, আর সবচেয়ে বেশি বোধ হয় বাংলার কাঁথায়।

শেষকথা হল যে এইসব পটারিতে যেখানেই মানুষের ছবি আছে, সেখানেই তারা মিশর বা অসিরিয়ার ছবির রাজারাজড়া বা সম্রাট নয়, তারা নিতান্তই সাধারণ মানুষ, মাঠে কাজ করছে, গরু বাঁধছে, মাছ ধরছে, মাথায় হাত দিয়ে আছে। এই দৈনন্দিন, নিতান্ত ঘরোয়া কাজে রত মানুষের ছবি ভারতের শিল্পে সব যুগেই প্রকাণ্ড একটা জায়গা জুড়ে আছে, আর সেইজন্যই দেখতে অত ভাল লাগে। আমরা এখন বুঝতে পারছি যে এরও মূল সূত্র বা ঐতিহ্য সেই আর্যপূর্ব ইতিহাসের আগের যুগের দুই-নদীর সভ্যতার মাটির পাত্রের ভাঙা টুকরোর ছবিতে



৮



দ্বিতীয় অধ্যায়

ইতিহাসের যুগে গুহাচিত্র

যোগীমারা

ভারতবর্ষে পাথরের যুগে যে সব গুহাচিত্র পাওয়া গেছে তার কথা অল্প বলেছি। সেগুলি ইতিহাসের যুগের আগের কথা, বহু হাজার বছর আগে যখন মানুষ বন্য ছিল, গায়ে লম্বা লম্বা লোম ছিল, জন্তু জানোয়ার মেরে তারই মাংস কোন রকমে ঝলসিয়ে খেত, সেই জানোয়ারেরই চর্বির সঙ্গে লাল মাটি বা পাথরের গুঁড়ো মিশিয়ে, কাঠকয়লার কালি দিয়ে ছবি আঁকত অথবা পাথরের তীক্ষ্ণ ফলা দিয়ে গুহার দেয়ালের ভিতরের বা বাইরের গায়ে ছবি খুদত। অনেক সময়ে ছবি খুদে তাতে রঙ ঢুকিয়ে দিত। এসবের বহু হাজার বছর পরে জোব, আমুরি, নান্দারা, নাল, শাহীটুম্প, হরপ্পা, মহেঞ্জোদারোর যুগ এল। এসবের পরেও আবার বহুদিন কোন কিছুর চিহ্ন নেই। সোজা চলে আসতে হয় খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতকে, তখনকার চিত্র করা গুহার কথা বলব। মধ্যপ্রদেশে সুরগুজায় রামগড় বলে একটি পাহাড় আছে। সেই রামগড়ে যোগীমারা গুহার দেয়ালে আঁকা কয়েকটি ছবিই আমাদের ইতিহাসের যুগের প্রথম ছবি বলা যায়।

রামগড়ের ছবি ইংরেজিতে যাকে বলে ফ্রেস্কো করা। ফ্রেস্কো মানে কি একটু বলি। পাথরের বা অন্য কিছুর দেয়ালে প্রথমে চুন বালি বা অন্য কিছুর একটা আস্তর দেওয়া হয়। আস্তরকে আমরা বলি পলেস্তারা, ইংরেজিতে প্লাস্টার। সেই আস্তর ভিজে থাকতে থাকতে, অর্থাৎ সদ্য-লাগানো অবস্থায় ভিজে দেয়ালের গায়ে ছবি এঁকে তাতে রঙ করা হয়। রঙ সাধারণত জলে গোলা হয়। এই রঙ ভিজে আস্তরে লেগে সেই জমিতে শুষে যায়। তারপর যখন শুকোয় তখন আর ওঠে না। সুতরাং ফ্রেস্কোয় আঁকার বা রঙের কিছু ভুল হলে আর উপায় নেই, হয় সেই পলেস্তারাটি আবার চেঁচে ফেলে দিয়ে, নতুন আস্তর লাগিয়া নতুন করে জায়গাটি আঁকতে হবে, না হয় যে ভুল হল সেই ভুলই থেকে গেল। এই ধরনের ফ্রেস্কোকে ইটালিয়ান ভাষায় বলে ফ্রেস্কো বুয়োনো। ফ্রেস্কো যাতে খুব মসৃণ আর টেকসই হয় সেজন্য ইওরোপীয় ফ্রেস্কোরীতির চেয়ে আমাদের দেশের পুরনো ফ্রেস্কো আরও যত্ন নিয়ে তৈরি করা হত। ইটালিয়ান ইনফ্রেস্কো থেকে ইংরেজি 'ফ্রেশ' এসেছে, ফ্রেশ মানে কাঁচা বা টাটকা, অর্থাৎ কাঁচা সদ্য-লাগানো পলেস্তারা। যোগীমারার ফ্রেস্কো দেখে মনে হয়, তখনই ফ্রেস্কো-রীতিতে বহুদিন থেকে শিল্পীরা অভ্যস্ত। গুহার ছবিগুলি অবশ্য খুব উঁচুদরের নয়। কয়েক জায়গায় চৈত্য-জানালা আঁকা, তিন ঘোড়ায় টানা দুই চাকার রথ, রথের উপর ছাতা ধরা। সাঁচি ভারুতের কথা মনে হয়। ফ্রেস্কোগুলির জমি সবটাই সাদা; তার উপরে মানুষ, জীবজন্তু সাধারণত গাঢ় লালে আঁকা, কোথাও বা কালোয়। ছবিগুলি প্যানেলে ভাগ করার সময়ে হলুদে পটি ব্যবহার হয়েছে। মানুষের শরীর গাঢ় লালে আঁকা, কখনও বা সীমারেখাগুলি কালো রেখায় আঁকা। মাথার চুল মাথার বাঁ দিকে ঝুঁটি করে বাঁধা। সাদা জমির উপর লাল সীমারেখায় পরিচ্ছদ আঁকা।

মানুষের গায়ের মত হাতি, ঘোড়া, পাখি, গাছ সবই লাল রঙে আঁকা। একই বিন্দুকে কেন্দ্র করে কতকগুলি বৃত্তাকারে ছবিগুলি আঁকা। এই বৃত্তগুলি লাল আর হল্‌দে রঙে আঁকা, মধ্যে মধ্যে জ্যামিতিক নক্‌শা আছে। বৃত্তগুলি ছোট ছোট প্যানেলে বা কক্ষে ভাগ করা। তাদের মধ্যে ছবি। ওদেরই মধ্যে যে ছবিগুলি এখনও বেশ ভাল অবস্থায় আছে তাদের বিষয় আর রীতি দেখে মনে হয় বোধহয় জৈন চিত্র হবে, কারণ পুরুষের ছবির গায়ে একেবারে কাপড় নেই। বৌদ্ধ ছবি হলে তা হত না। দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়ের কথা জানা আছে নিশ্চয়। তাঁরা পুরাকালে নাগা বা নগ্ন হয়ে ঘুরে বেড়াতেন। চারটি প্যানেলের ছবি বেশ বোঝা যায়, অন্যগুলি অস্পষ্ট। এই চারটির একটির মধ্যস্থলে একজন পুরুষ গাছের তলায় বসে আছে, বাঁদিকে নর্তকী আর বাদ্যকরের দল, ডানদিকে এক শোভাযাত্রা, সঙ্গে একটি হাতি। দ্বিতীয় কক্ষে কতকগুলি পুরুষ একত্রে, একটি চক্র, তার সঙ্গে জ্যামিতিক নক্‌শা। তৃতীয় কক্ষের এক অর্ধেকে ফুল, ঘোড়া, কাপড় পরা মানুষের অস্পষ্ট ছবি, অন্য অর্ধেকে একটি গাছের ডালের উপর একটি উলঙ্গ শিশু বসে, তার কাছে একটা পাখি, আর গাছের তলায় গোল করে কতকগুলি উলঙ্গ লোক দাঁড়িয়ে, প্রত্যেকের মাথার বাঁদিকে খোঁপা করে চুল বাঁধা। খানিকটা শ্রীকৃষ্ণের বস্ত্র-হরণের কথা মনে করিয়ে দেয়। চতুর্থ কক্ষের প্রথম ভাগে একটি উলঙ্গ লোক বসে, তার পাশে তিনজন কাপড় পরা লোক দাঁড়িয়ে, পাশে আরও দুটি উলঙ্গ লোক বসে, তাদের পাশে আবার আরও তিনটি কাপড় পরা লোক দাঁড়িয়ে। এরই তলার দিকে চৈত্য জানালাওলা একটা বাড়ি, একটা হাতি, সমুখে তিনটি কাপড় পরা লোক। এদের কাছেই তিন ঘোড়ায় টানা একটা রথ, রথের উপরে ছাতা, তার পাশে আরেকটি হাতি আর তার মাহুত। এই প্যানেলের দ্বিতীয় অংশেও ঐ ধরনের ছবি।

যোগীমারায় যেটুকু ছবি আছে সেইটুকুর একটু বিশদ বর্ণনা করলাম, ছবির সঙ্গে আবার কিছু লিপিও অছে। আঁকার রীতি দেখে সাঁচি আর ভারুতের ভাস্কর্যের কথা খুব মনে পড়ে যায়। যোগীমারাকে খ্রীস্টপূর্ব এক থেকে দুই শতকে ফেলা যায়। তারপরে নয়ই। যোগীমারা গুহার ছবি যদি ধর্মপ্রণোদিত বলে মানতেই হয়, তবে তাতে বোধহয় বৌদ্ধের চেয়ে জৈনের প্রভাবই বেশি বলতে হবে। কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে যে বরাবরই, আবহমান কাল থেকে, ভারতবর্ষে ধর্মবিষয়ক ছবিতেও জাগতিক, দৈনন্দিন জীবনের ছবি প্রাধান্য পেয়েছে বেশি, যোগীমারা এ বিষয়ে ব্যতিক্রম নয়। আর ব্যতিক্রম নয় বলে, ইতিহাসের যুগের প্রথম বলে জানা গুহাচিত্র হিসাবে, যোগীমারার ছবির একদিকে ইতিহাসের আগের যুগের ছবির সঙ্গে, অন্যদিকে ইতিহাসের যুগের অজন্তা, ইলোরা, ইত্যাদি গুহাচিত্রের সঙ্গে বেশ একটি ধারাবাহিক সম্বন্ধ আছে। আঁকার রীতি হিসাবেও সম্বন্ধ বেশ স্পষ্ট। চিত্রগুলি সাদা জমির উপর প্রায়ই লালে আঁকা, ক্বচিৎ কালোয়। মানুষ বা জীবজন্তুর ছবির রেখা কালোয় আঁকা, কাপড় সাদা, যদিও কাপড়ের সীমারেখাগুলি লাল, চুল কালো, চোখ সাদা, ছবির প্যানেল ভাগ করার সময়ে শুধু সীমারেখায় হল্‌দে এসেছে, কিন্তু নীল সচরাচর দেখাই যায় না।

অজন্তা

ভূমিকা

এর ঠিক পরেই এল যাকে বলা যায় ইতিহাসের যুগের গুহাচিত্রের পাকা সড়ক, রাজপথ, যা নিয়ে চিত্র জগতে প্রাচীন ভারতের এত নামডাক, সম্মান, অর্থাৎ অজন্তা। অজন্তায় প্রথম ছবি আঁকা আরম্ভ হয় বোধহয় খ্রীস্টপূর্ব এক শতকের মাঝামাঝি, যদিও গুহাগুলি খোদাই আরম্ভ হয় খ্রীস্টপূর্ব দুই শতকে, শেষ হয় খ্রীস্টীয় সাত শতকে বা তারও পরে ; অর্থাৎ অজন্তার ছবি প্রায় সাতশ' বছর ধরে আস্তে আস্তে আঁকা। খ্রীস্টীয় ৭৯ সালে পম্পিয়াই আগ্নেয়গিরি ভিসুভিয়াসের অগ্ন্যুদগারের তলায় চাপা পড়ে যায়। ১৭৪৮ সালে পম্পিয়াই খোঁড়াখুঁড়ি আরম্ভ হয়, তার ফলে সেখানকার বাড়ির দেয়ালে আঁকা আশ্চর্য সুন্দর ছবি সব বেরিয়েছে। ঈজিপ্টের পিরামিড, চীনের

টুনহুয়াঙ গুহাগুলি, ক্রীটদ্বীপের কিছু ধ্বংসাবশেষ, পম্পিয়াই বাদ দিলে, এক জায়গায় একত্রে এত সুন্দর, এত প্রাচীন ছবি অজন্তা ছাড়া পৃথিবীতে অন্যত্র বোধ হয় নেই।

হায়দ্রাবাদ রাজ্যের খান্দেশ জেলায়, জলগাঁও থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে, ফর্দাপুর বলে একটি ছোট শহরের ৩½ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে, অন্যদিকে অজন্তা নামেরই একটি ছোট শহরের চার মাইল উত্তর-পশ্চিমে, অজন্তা গুহার সারি। গুহাগুলি ইন্ধ্যাদ্রি পর্বতমালার নীচে একটি ঘাটের কাছে, এই ইন্ধ্যাদ্রি পাহাড়ের একদিকে দাক্ষিণাত্যের মালভূমি, অন্যদিকে তাপ্তি নদীর উপত্যকা। বাগোড়া বলে একটি পাহাড়ে নদী পাথরের বুকে গভীর রাস্তা কেটে চলে গিয়ে হঠাৎ সাতটি জলপ্রপাত করে বহু নীচে পড়েছে। তাদের শেষ ধারাটি প্রায় ৭০/৮০ ফিট নীচে লাফিয়ে পড়েছে। এদের বলে সাতকুণ্ড। গুহার পাহাড়টি এই বাগোড়ার গায়ে চাঁদের ফলার মত সোজা প্রায় আড়াইশ' ফিট খাড়াই হয়ে পাড় দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জায়গাটি যেমন নির্জন, তেমনি মনোরম, আবার তেমনি মন উদাস করা। এই খাড়াই পাহাড়ের গায়ে উনত্রিশটি গুহা খুদে খুদে তৈরি, সাধু সন্তদের থাকার পক্ষে এর চেয়ে ভাল জায়গা বোধহয় হতে পারে না। লম্বায় ছ'শ গজ জায়গা জুড়ে একের পর এক গুহা বাগোড়া নদীর বুক থেকে ৩৫ থেকে ১০০ ফুট উঁচুতে পূব থেকে পশ্চিমে বরাবর চলে গেছে।

পণ্ডিতপ্রবর ডি কোশাম্বী ইলোরা, অজন্তা, কাহ্নেরী, কারলি, ভাজা, বাঘ প্রভৃতি বিচিত্র ও ঐশ্বর্যপূর্ণ গুহাগুলির ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে গবেষণা করে এক অতি তাৎপর্যপূর্ণ সার্থক সিদ্ধান্তে আসেন। এইসব গুহা ও কীর্তির প্রায় সবগুলিই দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত প্রসারী রাজপথগুলি যে সব গিরিবর্ত্মের মধ্যে দিয়ে গেছে, তাদের মুখে প্রহরীরূপে অবস্থিত। তাঁর মতে এইসব গুহাগুলি দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত পণ্য ও বাণিজ্য চলাচল প্রসূত অন্তর্দেশীয় শুল্ক আদায়ের ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহৃত হত। উপরন্তু পণ্যবাহী দলগুলি যাতে এইসব গুহার আশ্রয়ে বিশ্রাম করার এবং সেই সঙ্গে ধর্মশিক্ষা ও সাধনার সুযোগ পায়। চীনদেশের বিখ্যাত টুনহুয়াঙ গুহারাজি, চীনদেশের জিয়ান প্রদেশ থেকে ইওরোপ পর্যন্ত ইতিহাসের প্রথম যুগ থেকে যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সিল্ক রুট বা রেশম পথ ছিল, সে পথের উপর অবস্থিত ছিল। টুনহুয়াঙের অন্যতম কাজ ছিল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্ভূত শুল্ক আদায় করা। তার সঙ্গে রাজকীয় ও ধর্মীয় ঘাঁটি হিসাবে বিরাজ করা ত বটেই। কোশাম্বী এরই নজীরে ভারতীয় বৌদ্ধ গুহাগুলির ভৌগোলিক অবস্থানের তাৎপর্য বিষয়ে একই সিদ্ধান্তে আসেন।

কালপঞ্জী

গুহাগুলি আবিষ্কার হয়েছে দু'শ' বছরেরও কম আগে। প্রকৃতপক্ষে ১৮২৯ সালে। তার আগে হিউয়েন সাঙের (৬৪০ খ্রীস্টাব্দ) পরে অজন্তার খবর ইতিহাসের পাতায় বা ভ্রমণ বৃত্তান্তে নেই বললেই হয়। একবার একটু উল্লেখ পাওয়া যায়, ঔরঙ্গজেবের সৈন্যরা দাক্ষিণাত্য জয়ের পর দিল্লী ফেরার পথে গুহায় ঢুকে বিশ্রাম করেছিল। তারপর আর খোঁজ খবর নেই। ১৮০৩ সালে আসাহী যুদ্ধের পর লর্ড ওয়েলেস্‌লির সৈন্যরা অজন্তা শহরে বিশ্রামের জন্য ছাউনি ফেলে। তখন কয়েকটি পল্টন ছটকে গিয়ে গুহাগুলি দেখে আসে, তাদের মধ্যে আবার কেউ কেউ রান্নার জন্য গুহার মধ্যে আগুন ধরিয়ে অপরিষ্কার করে আসে। কিন্তু অজন্তা আসলে ভালভাবে আবিষ্কার হয় ১৮১৯ সালে। ঐ সালে যদিও অজন্তার পরিচয় পাওয়া গেল, তবুও উৎসাহী পণ্ডিতদের আসতে আরও কিছু বছর লাগল। প্রথম আবিষ্কারের সময়ে শত শত বছরের অযত্ন সত্ত্বেও, প্রায় প্রত্যেক গুহাতেই ফ্রেস্কো দেখা গিয়েছিল। ১৮২৯ সালে রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় অজন্তার চিত্ররাজি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ বেরোয়। কিন্তু কারোর টনক নড়ল না। ১৮৩৮-৯ সালে জেম্‌স্‌ ফার্গুসন বলে এক ভদ্রলোক গেলেন গুহাগুলি দেখতে। ১৮৪৫ সালে তাঁর অজন্তা এবং অন্যান্য গুহার উপর প্রথম বইটি প্রকাশিত হয়। বইটি প্রথমে একটি ভাষণ হিসাবে জার্নাল অব দা রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির ১৫শ খণ্ডে ১৮৪৪ সালে প্রকাশিত হয়। জেম্‌স্‌ ফার্গুসন ছিলেন অসামান্য পণ্ডিত আর পাকা জহুরী। ভারতের স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা, পুরাতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ভূগোল, ইতিহাস আর ভূতত্ত্বের ছাত্র মাত্রেরই নমস্য গুরু হচ্ছেন ফার্গুসন। যে সব বিষয়গুলির উল্লেখ করলুম সে সবের অনেকগুলিতেই ফার্গুসনের কাজ এখনও প্রামাণ্য, অনেক ক্ষেত্রে চূড়ান্ত। অনেকেই ফার্গুসনের লেখা নিজের বলে ভাঙ্গিয়ে বিখ্যাত হবার চেষ্টা করেন, স্বীকারও করেন না। ফার্গুসন সাহেব অজন্তা দেখে লাফিয়ে উঠলেন। তখনি লেগে গেলেন কি করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টরদের বলে কয়ে সরকারের খরচায়

অজন্তার ছবির ভাল করে নকল তুলে রাখা যায়। তাঁর আপ্রাণ চেষ্টার ফলে কোম্পানি মেজর গিল বলে এক শিল্পীকে অল্পদিনের মধ্যেই নিযুক্ত করেন। মেজর গিল দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে (১৮৪৪-১৮৬৩) বহু কষ্ট স্বীকার করে একা একা বসে বসে নকল করতে থাকেন। ত্রিশটির উপর বড় বড় জড়ানো পটে যখন সকল নকল শেষ হয়, তখন সেগুলি এক এক করে বিলেত পাঠানো হয়। কিন্তু তারপরে অত্যন্ত আপসোসের এক ব্যাপার ঘটল। ১৮৬৬ সালে লন্ডনের ক্রিস্টাল প্যালেসের প্রদর্শনীতে সেগুলি দেখানোর ব্যবস্থা হয়, আর সেখানেই বিরাট অগ্নিকাণ্ডে ৫টি পট ছাড়া বাকি সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ইতিমধ্যে কিন্তু নানা অত্যাচারে অজন্তার ফ্রেস্কোগুলি ক্রমেই নষ্ট হতে থাকে। ১৮৭৯ সালে ডঃ বার্জেস যখন ভাল করে ফোটো তুলতে যান তখন মাত্র ষোলটি গুহায় ছবি ছিল, বাকিগুলি নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু ভাগ্যক্রমে ইতিমধ্যে বম্বে স্কুল অভ আর্টের অধ্যক্ষ ডঃ গ্রিফিথ্সের চেষ্টায় ভারত সরকার সরকারি খরচে নতুন করে নকল তোলার আদেশ দেন। ডঃ গ্রিফিথ্স্ তাঁর ছাত্রের দল নিয়ে ১৮৭২ সাল থেকে ১৮৮৫ সাল পর্যন্ত খেটে বহু যত্নে বহু পরিশ্রমে ছবির নকল করেন। সেগুলি তিনি অনেক যত্নে সম্পাদনা করে খেটে খুটে সত্যিকারের বিদগ্ধ মন আর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়ে, একটি প্রকাণ্ড ভূমিকা লিখে, ১৮৯৬ সালে বিরাট আকারের দুই খণ্ড বইয়ে লন্ডন থেকে প্রকাশ করেন। প্রায় চোদ্দ বছর ধরে ডঃ গ্রিফিথ্স্ আর তাঁহার ছাত্রের দল সবসুদ্ধ ৩৩৫টি কপি তৈরি করেন, তার মধ্যে ১নং গুহার ১৭৭টি, ২নং গুহার ৫০টি, ৬নং গুহার ৫টি, ৯নং গুহার ১১টি, ১০ নম্বরের ১৮টি, ১১ নম্বরের ১টি,-১৬ নম্বরের ১৮টি, ১৭ নম্বরের ৫১টি, ১৯ নম্বরের ১টি, ২১ নম্বরের ২টি, আর ২২ নম্বরের ১টি। এদের মধ্যে যেগুলি সবচেয়ে বড় সেগুলির একটির মাপ ৩৭ ফিট লম্বা ১২ ফিট ১ ইঞ্চি চওড়া, অন্যটির ৩৫ ফিট ২ ইঞ্চি লম্বা ১২ ফিট ২ ইঞ্চি চওড়া। এ রকম অতিকায় সাইজের কপি অনেকগুলিই হয়।

কথায় বলে পোড়া কপাল। অদৃষ্টের লিখনই ছিল বোধহয় যে অজন্তায় গত শতকেও অটুট অবস্থায় যেটুকু ছিল সেটুকুর কপিও পৃথিবীর লোকের ভাগ্যে দেখা জুটবে না। তাই ডঃ গ্রিফিথ্স্ কপিগুলি লন্ডনের সাউথ কেনসিংটন মিউজিয়মে পাঠানোর অল্পদিন পরেই সেখানেও অগ্নিকাণ্ড হল, ফলে ১৮৫টি কপি পুড়ে নষ্ট হয়ে গেল। বাকি ১৫০টির মধ্যে আবার অনেকগুলি খারাপ হয়ে গেছে, যেগুলি এখনও ভাল আছে সেগুলি ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়মে খুব সযত্নে রাখা আছে। ইতিমধ্যে কিন্তু অজন্তার ছবিগুলির উপর কালাপাহাড়ি অত্যাচার শুরু হয়ে গেল। নিজামের কর্মচারীরা কিছু কিছু ছবি বেচবার দুরাশায় কোদাল ছুরি দিয়ে পলেস্তারা চাঁচতে লেগে গেলেন ; সেই সব ডাকাতের দলে বম্বের এক প্রত্নতাত্ত্বিক, ডাঃ বার্ডও জুটে গেলেন। বলাই বাহুল্য, এইসব বাহাদুর ডাকাতের ভাগ্যে কয়েক সের করে রঙীন ধুলো ছাড়া আর কিছু জুটল না, কিন্তু তাঁরা অজন্তার গুহাচিত্রের দফা অনেক জায়গাই বেশ ভাল করে নিকেশ করলেন। ১৯০৩ সালের পর নিজাম সরকারের চৈতন্য হল, কিন্তু ইতিমধ্যে অযত্নে, জলের স্যাঁতসেঁতানিতে, নকলকারদের পাণ্ডিত্যে আর ডাকাতদের লোভের অত্যাচারে অজন্তার ছবির অনেক কিছুই নষ্ট হয়ে গেল। ১৯০৯-১১ সালের মধ্যে লেডী হেরিংহ্যামের উদ্যোগে অজন্তার কতগুলির ছবির নকল হয়। এই নকলগুলি শ্রীমতী হেরিংহ্যাম লন্ডনের ইন্ডিয়া সোসাইটিকে উপহার দেন। ১৯১৫ সালে সোসাইটি সেগুলি দুইখণ্ডে প্রকাশ করেন। যাঁরা নকলের কাজে লেডী হেরিংহ্যামকে সাহায্য করেন তাঁদের নাম ডরথি লার্চার, নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার, সৈয়দ আহম্মদ, মহম্মদ ফজলউদ্দিন ও সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত। ১৯১৭ সালে মুকুলচন্দ্র দে বিখ্যাত জাপানী শিল্পী আরাই-এর সঙ্গে অজন্তা যান, ও ১৯১৯ সালে দ্বিতীয়বার অজন্তা গিয়ে কিছু ফ্রেস্কো নকল করেন। তাঁর 'মাই পিলগ্রিমেজেস্ টু অজন্তা অ্যাণ্ড বাঘ' বলে একটি চমৎকার বই আছে। সেটি ১৯২৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত হয়। অবশেষে দু'জন ইটালিয়ান বিশেষজ্ঞ, প্রফেসর লরেনৎসো চেচ্চোনি আর কাউন্ট অর্সিনি এলেন, আর ১৯২০ থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত কাজ করে বহু পরিশ্রমে ফ্রেস্কোগুলি পরিষ্কার করে উদ্ধার করেন। ছবিগুলি পরিষ্কার করে, যে সব নিকৃষ্ট শিল্পীরা খেয়াল খুশিমত বাজে রঙ লাগিয়েছিল সেগুলি ঘষে ঘষে তুলে, তাঁরা এমন সব স্বচ্ছ আঠার মত জিনিস লাগালেন যাতে বাকি ছবিগুলি আর দেয়াল থেকে উঠে না আসে। ঠিক যেমন গত শতকে এক ইটালিয়ান ওস্তাদ ইটালির একটি মনাস্টারির একটা নীচু স্যাঁতসেঁতে ঘরের দেয়ালে লেঅনার্দো দা ভিঞ্চির আঁকা জগদ্বিখ্যাত 'লাস্ট সাপার' ফ্রেস্কোটির উদ্ধার করেন। কিন্তু ১৮১৯ সালে অজন্তার ফ্রেস্কোর যাও বা ছিল আজ তার সামান্য অংশ মাত্র দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য আজও অতর্কিতে আনাচে কানাচে নতুন ছবি আবিষ্কার হয়, যেমন হয়েছে ১৯৩৫ সালে ৬নং গুহার ছোট ছোট কুঠুরির দরজার উপর। সম্প্রতি নিজাম সরকারের তরফ থেকে ডঃ জি

ইয়াজদানি চারটি বিরাট খণ্ডে অজন্তার অ্যালবাম প্রকাশ করেছেন, সেগুলি খুবই ভাল। প্রথম খণ্ডটি বেরোয় ১৯৩১ সালে, চতুর্থটি ১৯৫৫ সালে। ইয়াজদানির অ্যালবামের অধিকাংশ ছবি ই এল ভেসি বলে এক ভদ্রলোকের তোলা রঙীন ফোটোগ্রাফ থেকে নেওয়া। সম্প্রতি ইউ-এন-ই-এস-সি-ও বা ইউনেসকো থেকে অজন্তা সম্বন্ধে ৩২টি রঙীন ছবিসুদ্ধ একটি সুন্দর অ্যালবাম বেরিয়েছে। ফার্গুসন, গ্রিফিথ্‌স্‌, বার্জেস, শ্রীমতী হেরিংহ্যাম আর ইয়াজদানির লেখা অজন্তার ইতিবৃত্তগুলি পড়া খুব দরকার। শান্তিনিকেতনের কলাভবনে, চীনাভবনে ও কলকাতার রবীন্দ্রভারতীর ভাণ্ডারে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর হাতের অজন্তা ও বাঘের কিছু উৎকৃষ্ট নকল আছে।

১৮৭৯ সালে ষোলটি গুহাতেই মোটামুটি ছবি পাওয়া যায়। তাদের নম্বর পূর্ব থেকে পশ্চিমে হচ্ছে, ১, ২, ৪, ৬, ৭, ৯, ১০, ১১, ১৫, ১৬, ১৭, ১৯, ২০, ২১, ২২, আর ২৬। কোন ফ্রেস্কো পাওয়া যায়নি ৩, ৫, ৮, ১২, ১৩, ১৪, ১৮, ২৩, ২৪, ২৫, ২৭, ২৮ আর ২৯নং গুহায়। গ্রিফিথ্‌স্‌ কোন কোন গুহা থেকে কতগুলি নকল তোলেন তার হিসাব আগেই দিয়েছি। সবচেয়ে বড় সাইজের কপি হয় ১৭নং গুহা থেকে, তারপর হয় ২নং আর ১নং থেকে। ৮, ১২ আর ১৩নং গুহাই বোধহয় সবচেয়ে প্রাচীন, তাদের গায়ে কোন ছবি নেই। তার মধ্যে আবার ১৩নং গুহাই বোধ হয় সবচেয়ে প্রাচীন, এর দেয়ালগুলি খুব মসৃণ, কিন্তু ছবি নেই। এটির খোদাই-এর তারিখ বোধ হয় খ্রীস্টপূর্ব ২০০ বছর। ৮, ৯, ১০, ১১, ১২ আর ১৩নং গুহাগুলি বোধহয় প্রথম কালের হীনযান মতাবলম্বীদের সময়ে খোদাই। এদের বয়স বোধহয় খ্রীস্টপূর্ব ২০০ থেকে ১৫০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রায় ৩৫০ বছরের উপর বিস্তৃত। আর বাকি সবগুলিই মহাযান মতাবলম্বীদের কীর্তি। ৬ আর ৭নং গুহার তারিখ বোধহয় ৪৫০ থেকে ৫৫০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে। অন্যগুলি অর্থাৎ ১ থেকে ৫ আর ১৪ থেকে ২৯নং গুহাগুলি বোধহয় ৫০০ খ্রীস্টাব্দের পরে খোদাই, এর মধ্যে কতকগুলি শেষ পর্যন্ত অসম্পূর্ণই রয়ে গেছল। ফার্গুসনের মতে ১নং গুহার ছবিগুলির বয়সই সবচেয়ে কম। বলাই অবশ্য বাহুল্য যে গুহা খোদাই-এর বেশ কিছু পরে অজন্তার চিত্রসৃষ্টি হয়। বোধহয় ৯ আর ১০নং গুহার চিত্রই সবচেয়ে প্রাচীন। এই দুটি গুহায় এক পরত ছবির তলায় আবার মাঝে মাঝে আর এক পরত ছবি পাওয়া গেছে। এখন ছবি দেখতে পাওয়া যায় ১, ২, ৯, ১০, ১৬ আর ১৭নং গুহায়। অর্থাৎ ১৮৭৯ সালে ছবি ছিল ১৬টি গুহায়, এখন ৬টিতে। এই ৬টি গুহায় অবশ্য ছবি আছে সারা দেয়ালময়, এমন কি থাম আর ভিতরে ছাতের সমস্ত জায়গা জুড়ে।

ভারুত, অমরাবতী, সাঁচির ভাস্কর্যের সঙ্গে চিত্রশিল্পের যদি কোথাও আশ্চর্য মিল থাকে তা ৯ আর ১০নং গুহার ছবির। শ্রীযুক্ত সি শিবরামমূর্তি তাঁর 'অমরাবতী স্কাল্‌চার্স ইন দা মাদ্রাজ গভর্মেন্ট মিউজিয়ম' (মাদ্রাজ, ১৯৪২) বইয়ে পাশাপাশি রেখাচিত্র সাজিয়ে পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন বসনভূষণ, মুকুট, পাগড়ি, অঙ্গভঙ্গি, শরীরের গড়ন, ভাবভঙ্গিতে অজন্তার ছবির সঙ্গে, বিশেষ করে নারীদের, সাঁচি, ভারুত, অমরাবতীর ভাস্কর্যের কত আশ্চর্য মিল। পণ্ডিতরা বলেন এই দুটি গুহার ছবিই সবচেয়ে প্রাচীন, অর্থাৎ খ্রীস্টীয় প্রথম শতকের। তা যদি হয় তবে ভারুত সাঁচির সমসাময়িক বলতে হয়। অজন্তার ছবি মোটামুটি তিন যুগে ভাগ করা যায়। প্রথম হচ্ছে ৯ আর ১০নং গুহার যুগ। প্রাচীনত্বের কারণেই হয়ত ৯ ও ১০নং গুহার ছবিগুলির রঙ গাঢ় ও অনুজ্জ্বল, এবং কিছুটা ম্যাড়মেড়ে ; ১ বা ২নং গুহার ছবির মত অত উজ্জ্বল নয়। রেখাও অত লীলায়িত, ছন্দোময় ও সাবলীল নয়। এগুলি যদিও সবচেয়ে প্রাচীন, তবু এত আগেও চিত্রকলা ক্রমবিকাশের খুব উঁচু পর্যায়ে উঠেছিল বলতে হবে, কারণ এগুলিতে আমরা একদিকে যেমন দেখি নক্‌শা আঁকার দক্ষতা, অন্যদিকে তেমনি পরিষ্কার পরিপাটি কাজ। খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে অজন্তার প্রাচীনতম ছবিতেও আমরা শিক্ষানবিশী হাতের অর্থাৎ কাঁচা হাতের নমুনা একটুও পাই না, সবই



পরিপূর্ণ, নিটোল, পাকা হাতের কাজ, কোথাও দ্বিধা বা অপরিণত হাতের প্রমাণ নেই, রেখা, রঙ, নক্‌শার পিছনে হাতড়িয়ে বেড়ান নেই। পরিষ্কার নিপুণ হাত, যেন চিরকাল বনেদী ঐতিহ্যে অভ্যস্ত বহু শতাব্দীর অভ্যাস। বুঝতে একটুও কষ্ট হয় না যে এ চিত্ররীতি বৌদ্ধযুগের আগে থেকেই সরাসরি এক খুব দক্ষ বিরাট

চিত্রঐতিহ্যের রাজপথ বেয়ে চলে এসেছে, যে ঐতিহ্য প্রায় সম্পূর্ণ ; যার নতুন করে আঙ্গিকের বিষয়ে শেখার বিশেষ কিছু নেই, বরং নতুন নতুন পথে নতুন নতুন শক্তি আর উন্মেষের পরিচয় দিতেই সে ব্যস্ত। ৯ আর ১০নং গুহার ছবি যখন আঁকা হয় তখন দেশটি বোধ হয় অন্ধ্র সাতবাহন রাজাদের অধীন ছিল (খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে ২৩৬ খ্রীস্টাব্দ)। মধ্য ও পশ্চিম দাক্ষিণাত্যে তাঁদের রাজত্ব ছিল। এঁরা ব্রাহ্মণ্যধর্মী হলেও বৌদ্ধদের উপর বোধহয় অত্যাচার করতেন না। তখন রাজশক্তির সঙ্গে শিল্পী বা সংঘকর্মীদের কি সম্বন্ধ ছিল সঠিক জানা যায় না ; হয়ত এসব হয়েছিল কোনও রাজার আদেশে, কিংবা বৌদ্ধসংঘের কর্তৃপক্ষ রাজার কাছ থেকে অনুমতি চেয়ে নিয়ে। হয়ত রাজার অনুমতিতে এইসব গুহা উৎসর্গীকৃতও হয়। কিন্তু ঠিক কি ধরনের সমাজব্যবস্থায় এদের উদ্ভব হয় সঠিক বলা যায় না। এটা প্রায় নিশ্চিত যে তখনকার দিনেও অজন্তা ছিল জনপদবাসীর পক্ষে দুর্গম, লোকচক্ষুর অন্তরালে। যাঁরা শিল্পী ছিলেন তাঁরা নিশ্চয় তদ্গত হয়ে সৃষ্টির নেশায় সব কিছু ভুলে কাজ করতেন, কোন্ রাজা এল, কে বা গেল তার হয়ত হিসাবও রাখতেন না। এই ধরনের শিল্পীগোষ্ঠীর প্রমাণ ভারতবর্ষের যেখানে সেখানে মন্দির ইত্যাদির কাজ দেখলেই পাওয়া যায়, কিন্তু কোণার্ক মন্দিরের মত এখানেও এক মুহূর্ত বুঝতে দেরি হয় না যে, যে সব শিল্পী এখানে সব কিছু ত্যাগ করে নিরলস একাগ্রমনে বছরের পর বছর কাজ করে গেছেন, জীবনের রূপ, রস, গন্ধের প্রতি তাঁদের ছিল নিদারুণ আসক্তি। ফুল, লতা, পাতা পাখি, প্রাণী, মানুষ, সামাজিক আচার ব্যবহার নিয়ত তাঁদের উত্তেজিত, চঞ্চল, আবিষ্ট করেছে, যার ফলে বাগোড়ার পাথর কাটা নদীর বুকে, জঙ্গলের গুহায়, তাঁরা কখনই নিজেদের মনকে বাঁধা পড়তে দেননি। বরং প্রতিটি ধর্মবিষয়ক চিত্রেও একান্ত মানুষী ভাব, প্রকৃতির বৈভব, বৈচিত্র্য, প্রাণস্পন্দন, উত্তেজনা যেন উপছে উপছে পড়ছে। ছবিতে জীবনের যেন শেষ নেই। অবশ্য এত আবেগ, আকাঙ্ক্ষা, উল্লাস সবই সংহত করে আছে একটি অতি সরল ঋজু, নিরাভরণ



চিত্রনীতি, যার মূল উপাদান হল আবেগময়, ক্লেশহীন, প্রাণবন্ত, শুধুহাতে-খেলানো সীমারেখা। প্রত্যেকটি চিত্রের কম্পোজিশন, অর্থাৎ ছবিতে আঁকা বিষয়বস্তুর পারস্পরিক ভারসাম্য, সম্বন্ধ, গভীরতা অতি সুন্দর, প্রতিটি বিষয় নিপুণ হাতে আঁকা, নক্‌শার দক্ষতা বিপুল। প্রত্যেকটি ছবিতে হাত আঁকা দেখলেই বোঝা যায় হাতের মধ্যেই কি পরিমাণ সংবেদনা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এর পর প্রায় ২৫০ বছর পরে অজন্তার চিত্ররীতির দ্বিতীয় যুগ আসে, যার সূচনা আমরা পাই ১০নং গুহাতেই। এগুলির তারিখ বোধহয় ৩৫০ খ্রীস্টাব্দের আগে পরে। এই সময়ের ছবির সবচেয়ে ভাল উদাহরণ পাই ১০নং গুহার থামগুলির ছবিতে। এগুলিতে গান্ধার শিল্পের প্রভাব সুস্পষ্ট, এ সম্বন্ধে গ্রিফিথ্‌সের যুক্তি যেমন ভাল তেমনি হৃদয়গ্রাহী। গান্ধার শিল্পের প্রভাব যেমন দেবগণের বা ভগবান বুদ্ধের মাথার পিছনে গোলাকার (জ্যোতি থেকে) সবচেয়ে বেশি দেখা যায় কাপড়ের ভাঁজে পা পাটে, এগুলি খানিকটা গতানুগতিক বা মামুলি হলেও পরিপাটি, পরিচ্ছন্ন গম্ভীর। তুলির কাজ অনেক বেশি পরিণত। এসময়ে দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক অবস্থা কিরকম ছিল বলা শক্ত, কিন্তু মনে হয় উত্তর ভারতের গুপ্ত সাম্রাজ্যের, তথা সমুদ্রগুপ্তের শাসনের ছায়া, সুদূর অজন্তায় বেশ এসে পড়েছে। ১৬ আর ১৭ নং এবং সম্ভবত ৪, ৭, ১১ ও ১৫ নং গুহার ছবিগুলি এই দ্বিতীয় যুগে ফেলা যায়। এদের তারিখ প্রায় খ্রীস্টীয় ছয় শতক। তখন দেশ বাকতক বংশের অধীনে। ১৬নং গুহার একটি অস্পষ্ট লিপিতে জানা যায় যে বিহারটি এই বংশেরই এক মন্ত্রীর ছেলের নং গুহার ছবিগুলি এই দ্বিতীয় যুগে ফেলা যায়। এদের তারিখ প্রায় খ্রীস্টীয় ছয় শতক। তখন দেশ বাকতক বংশের অধীনে। ১৬নং গুহার একটি অস্পষ্ট লিপিতে জানা যায় যে বিহারটি এই বংশেরই এক মন্ত্রীর ছেলের হুকুমে খোদাই হয়। বাকতক বংশের নিশ্চয়ই প্রতাপ ছিল, কারণ একবার গুপ্তবংশের সঙ্গে তাঁদের সন্ধি হয়। ফলে বাকতক বংশের এক রাজপুত্রের সঙ্গে গুপ্তবংশীয় এক রাজকুমারীর বিবাহ হয়। ১৬নং গুহায় ছবির যেটুকু এখনও আছে তার থেকে বোঝা যায় যে এই গুহার চিত্ররীতি সৌন্দর্যের এক নতুন সীমায় ওঠে, গ্রিফিথ্‌স্ দেখিয়েছেন পারস্য রীতির সঙ্গে তার কত মিল। এর ঠিক পরেই আসে ১৭নং গুহার ছবি। এই গুহার ছবিগুলি সব গল্পবলা ছবি, প্রত্যেকটিতে এক একটি জাতক আখ্যান। গুহাটি যেন একটি বিরাট ছবির গ্যালারি, যার মাঝে বুদ্ধের জন্ম, জীবনী, মৃত্যুর ঘটনা, নানা উপাখ্যান ভিড় করে জমজমাট হয়ে আছে। এই

ছবিগুলির মূল বক্তব্য উপাখ্যান, রীতি নাটকীয়, শান্ত, নির্লিপ্ত, নির্বাণকল্প, ধর্মভাব যেন কম। যেন ছবিগুলি ভিড় করে চারদিক থেকে কথা কয়ে উঠে সমস্বরে দর্শককে বলছে, বুদ্ধের জীবনী কি মহান, কি অনির্বচনীয়। প্রাণ, আবেগ, উত্তেজনায় ভরপুর, যেন কথা কয়ে ওঠে ছবি। বোধহয় ঠিক এই সময়ে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব কমতে থাকে এবং সেই হিসাবে বুদ্ধের জীবনী প্রচারের তাগিদও হয় সবচেয়ে বেশি। ১৬নং গুহার গায়েই আমরা পাই প্রসিদ্ধ 'মরণোন্মুখ রাজকুমারী'র ছবি।

সবচেয়ে কম পুরনো চিত্র পাওয়া যায় ১ আর ২নং গুহায়। এদের তারিখ মোটামুটি বেঁধে দেওয়া যায়, কারণ ১নং গুহায় একটি ছবি আছে যেখানে সম্রাট দ্বিতীয় পুলকেশীন পারস্যের রাজা খসরু পরভেজের পাঠানো দূতদের সম্বর্ধনা করছেন। ইতিহাসে এই ঘটনাটি ঘটে খ্রীস্টীয় ৬২৬ থেকে ৬২৮-এর মধ্যে। এই ঘটনাটির চিত্র ছাড়াও ১নং আর ২নং গুহায় ছবি আঁকার রীতিতেও পারস্য এবং ঐ অঞ্চলের চিত্ররীতির প্রভাব সুস্পষ্ট। ১নং গুহা যে এখনও ছবিতে ভরতি গ্রিফিথ্‌সের তালিকার হিসেব দেখলেই বোঝা যায়। আরও উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে যে এই গুহার ছবির সঙ্গে দু'শ বছর পরের জাভার বোরো-বুদুর স্তূপের ভাস্কর্যের সঙ্গে খুব মিল আছে। ২নং গুহার চিত্রই বোধহয় সবচেয়ে আধুনিক। স্পষ্টই মনে হয় শিল্পীর হাতের তেজ, আবেগ কমে আসছে, এর মধ্যে অনেক ছবিই আছে যা তখনকার প্রচলিত রীতিদুরস্ত, অর্থাৎ শিল্পী বাঁধা ছকে ছবি ফেলে তুলি বুলিয়ে গেছেন মাত্র, নতুন সৃষ্টির উত্তেজনা নেই। ২নং গুহারই এক ধরনের ছবিতে খোটানের ছবির সঙ্গে মিল খুব স্পষ্ট, ল' কক আর অরেল স্টাইনের উদ্ধার করা খোটানের ছবি দেখলে বেশ বোঝা যায়। এমন কি পুরনো তিব্বতী মন্দিরের ধ্বজা, টাংকার, সঙ্গে মিল সাধারণ চোখেও ধরা পড়ে। এই গুহাতেই আর এক ধরনের ছবি পাই যাতে কিন্তু কম্পোজিশন বা বিষয় সংস্থানের তেমন বাঁধুনি নেই, খানিকটা ঢিলে কাজ। অবশ্য এর মধ্যেও প্রধান চিত্রগুলিতে পাকা হাতের চিহ্ন ভুল করার অবকাশ নেই, তবুও মনে হয় যেন অস্থির, অপরিণত, মাঝে মাঝে অনিপুণ হাত, খানিকটা এলোমেলো ভাবে কাজ করে গেছে। এ যেন তখনকার যুগের বৌদ্ধধর্মের অবনতি, অবক্ষয়ের ছাপ ছবিতেও এসে লেগেছে। পারসীক প্রভাব ছাড়াও চীনে প্রভাবও ছবিতে সুস্পষ্ট। ছবিগুলিতে চীনে রীতি কত সুস্পষ্ট তা ১৮৪৩ সালে ফার্গুসনই প্রথম বলেন : "অজন্তার রীতির সঙ্গে চীনে রীতির খুব মিল আছে, বিশেষ করে, ছায়ার অভাবে আর রঙের ফ্ল্যাট চরিত্রে।" আরও কত বিষয়ে চীনে লক্ষণ আছে সে কথা গ্রিফিথ্‌স্ বিশদভাবে বলেছেন ; যেমন, সাধারণ কম্পোজিশনের রীতিতে, মানুষের চোখের গড়নে ; সমস্ত শরীরের গড়নে ; অনেক অলঙ্কারের গড়নে, আকারে ; প্রতীক ও অলঙ্কারের ব্যবহারে। মাথার মুকুট ও উষ্ণীষ যে একেবারে চীন থেকে আমদানি, সে কথা গ্রিফিথ্‌স্ ছবি তুলে তুলে দেখিয়েছেন। যেমন অজন্তার ছবির সাধারণ লোকের পাগড়ি আর ১৮৯২ সালে চীনদেশের সাধারণ লোকের পাগড়ি এবং বাঁধার ঢঙ যে একেবারে এক, তা ছবি তুলে দেখিয়েছেন। অন্যদিকে দেখিয়েছেন অজন্তার ছবির মেয়েরা কত একান্তভাবে ভারতীয় ; ভারতীয় স্থাপত্যের মেয়েদের সঙ্গে তাদের কত মিল। এমন কি ছেলে-কাঁখে-করা অজন্তার একটি মেয়ের ছবি এমন তুলে দিয়েছেন ঠিক মনে হয় যেন কোন ভারতীয় মা। সম্প্রতি চীন থেকে চীনের টুনহুয়াঙ গুহাচিত্রের যে সব ছবি বেরিয়েছে, তার রীতি, নীতি, কম্পোজিশনের সঙ্গে অজন্তার অনেক হুবহু মিল আছে। এমন কি, শিবিরাজা প্রভৃতির আখ্যানও এক। বুঝতে দেরি হয় না যে, যে বৌদ্ধধর্ম কয়েক শতাব্দী আগে সারা প্রাচ্যে ছড়িয়ে পড়ে, সেই বৌদ্ধ প্রভাবই চীনে গিয়ে টাং বংশের সৃষ্টির তেজ আর আবেগে সঞ্চারিত হয়ে ভারতবর্ষে এসে যেন পিতৃ-পুরুষের ঋণ শুধতে বদ্ধপরিকর। পূর্বপুরুষের রক্ত যখন নিস্তেজ হয়ে এসেছে তখন এ যেন প্রবাসী বংশধরের নিজের গায়ের রক্ত দিয়ে তাকে প্রাণবন্ত করার চেষ্টা।

অজন্তা তা হলে ভারতবর্ষের প্রায় ছ'-সাত শ' বছরের চিত্ররীতির ইতিহাস এখনও ধরে আছে। ইতিহাসের যে সময়ে ৯নং আর ১০নং গুহার ছবি আঁকা হয়, বোধহয় তাকেই উদ্দেশ করে তারনাথ আক্ষেপ করে বলেন যে নাগার্জুনের পরে (যখন নাগ শিল্পী অত্যাশ্চর্য কাজ করে যান) "বহু বছর ধরে ধারাবাহিক ক্রমে আর ভাল শিল্পীর দেখা মেলে না, যদিও কয়েকজন প্রতিভাশালী শিল্পী আপ্রাণ চেষ্টা করেন। পরে রাজা বুদ্ধপক্ষর সময়ে (বোধ হয় খ্রীস্টীয় পাঁচ কি ছয় শতকে) 'মধ্যদেশ' রীতির প্রতিষ্ঠাতা শিল্পী বিম্বসারের ভাস্কর্য আর চিত্রকলা এত আশ্চর্য রকম উৎকৃষ্ট হয় যে বিশ্বাস করা শক্ত যে সে সব মানুষের হাতের সৃষ্টি, দেবতার নয়।" এটা সম্ভব যে ৯নং আর ১০নং গুহার কাজের পর চিত্রশিল্পের পরিণতিজনিত অবক্ষয় ঘটে, আবার শেষবার প্রদীপ নেভার আগে দপ করে জ্বলে ওঠার মত ১নং আর ২নং গুহায় শেষ প্রতিভার ছটা দেখিয়ে যায়।

অজন্তা চিত্রাঙ্কণের উপকরণাদি

ভণিতা অনেক বড় হয়ে গেল। এখন অল্প কথায় প্রথমে বলব অজন্তার ফ্রেস্কো কিভাবে আঁকা হত, অর্থাৎ কি কি উপকরণ, মালমশলা দিয়ে। তারপর বলব কি চিত্রধর্ম বা দর্শনের উপর ভিত্তি করে অজন্তার গুহাচিত্র আঁকা। তৃতীয়ত অজন্তার ছবির সংক্ষেপে কিছু কিছু বর্ণনা দিয়ে বলতে চেষ্টা করব এই দর্শন কার্যত কি রকম দাঁড়িয়েছে। শেষে বলব ভারতীয় চিত্রনীতির ইতিহাসে অজন্তার গুহাচিত্রের কতখানি প্রভাব, কিভাবে তার বৈশিষ্ট্য ভারতীয় চিত্রধারায় পারম্পর্য রক্ষা করেছে, এবং অজন্তার ঐতিহ্য কতখানি প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে ভারতীয় শিল্পীর হাতের শিরাউপশিরায় বয়ে তার হাতকে চালিত করেছে।

ইতিহাসের আগের যুগের ছবির উপকরণের কথা সংক্ষেপে বলেছি। সেগুলি ছিল লাল লোহা মেশানো পাথুরে মাটির গুঁড়ো, যাকে বলত 'রাড়ল', চর্বি বা রক্তর সঙ্গে মিশিয়ে, হয় ছুঁচলো কাঠি না হয় আঁশ ওঠে এ রকম কাঠের 'তুলি' দিয়ে আঁকা। ইতিহাসের প্রথম যুগে, অর্থাৎ রামগড়ের যোগীমারা গুহার শিল্পীর সরঞ্জামে তিনটে রঙ দেখা দিল—লাল, সাদা, আর কালো। লাল রঙ এল পাথরের গুঁড়ো থেকে, সাদা এল এক ধরনের মাটি থেকে, আর কালো এল হরীতকী থেকে। বহু পুরাকাল থেকে ভারতবর্ষে লোহা মেশানো এক ধরনের সোরার সঙ্গে হরীতকী মিশিয়ে খুব উৎকৃষ্ট কালো রঙ তৈরি হয়। সে সময়ে তুলি ছিল বোধহয় বড় বড় দাঁতনের মত জিনিস, অর্থাৎ কচি ডালকে ছিবড়ে মত করে তাই দিয়ে রঙ লাগানো হত। যোগীমারার ছবির জমি ভাল করে মসৃণ করে তৈরি করা নয়। গুহার এবড়ো-খেবড়ো গায়ে যেমন তেমন করে অনেক জায়গায় ছবি আঁকা, কিছু কিছু জায়গায় ডিমের খোলার মত পাতলা করে পলেস্তারা লাগিয়ে তার উপরে আঁকা, তাতে বিশেষ সুবিধা হয়নি, কারণ প্লাস্টার লাগানোর আগে গুহার গা খুব মসৃণ করে চেঁচে নেওয়া হয়নি। বৌদ্ধযুগের ফ্রেস্কো এখন যেখানেই পাওয়া যায় তার তলার আস্তর বা জমি প্রায় সব জায়গাতেই একই ধরনের তৈরি। ছেনি দিয়ে অসমান করে কাটা গুহার গায়ে মাটি, গোবর, আর মিহি করে গুঁড়ো করা 'ট্র্যাপ' পাথরের বালি একত্রে মিশিয়ে ১/২ থেকে ৩/৪ ইঞ্চি পুরু করে প্রথম আস্তর দেওয়া হত। মাঝে মাঝে এই ধরনের একমেটের মধ্যে মিহি করে কাটা খড়কুচি বা ধানের তুঁষ থাকত। এইভাবে 'একমেটে' জমি তৈরি হবার পর অনেক সময়ে এর উপর অত্যন্ত পাতলা, প্রায় ডিমের খোলার মত পাতলা, এমন কি ডিমের খোলার মতই দেখতে, আর একটা সাদা আস্তর পড়ত। এই আস্তরটিকে ঘষে ঘষে খুব মসৃণ করা হত। শেষে এই রকম পালিশ করা, মসৃণ, ঝিনুক বা খোলার মত জমির উপর জলরঙ দিয়ে ফ্রেস্কো হত।

কি করে অজন্তা প্রভৃতি গুহায় এই ধরনের জমির উপর জল রঙ লাগিয়ে ছবি আঁকা হত তা নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন এগুলি 'আসল ফ্রেস্কো' (ইটালিয়ানরা যাকে বলেন ভাল ফ্রেস্কো বা 'ফ্রেস্কো বুয়োনো') ; আবার কেউ কেউ বলেন এগুলি 'আসল ফ্রেস্কো' আর 'টেম্পেরা' দুই রীতি মিশ্রণের ফল, ইটালিয়ানে যাকে বলে 'ফ্রেস্কো আ সেক্কো' অর্থাৎ শুকনো ফ্রেস্কো (ফ্রেস্কো বুয়োনো হচ্ছে ভিজে ফ্রেস্কো)। আবার কেউ কেউ বলেন অজন্তার ফ্রেস্কো সবটাই টেম্পেরা অর্থাৎ মিশ্রিত রঙ দিয়ে আঁকা। ইওরোপে বহুকাল থেকে সদ্যকরা ভিজে ফ্রেস্কোর চলন। এমন কি খ্রীস্টপূর্ব যুগের ভিট্রুভিয়াস আর প্লিনি দু'জনেই ভিজে ফ্রেস্কো সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করে গেছেন। আগেই বলেছি ভিজে ফ্রেস্কো করতে গেলে আস্তর বা পলেস্তারা বা প্লাস্টার দিয়ে জমি তৈরি করে নিতে হয়, এবং তা ভিজে থাকতে থাকতে দরাজভাবে রঙ দিতে হয়। কাজ খুব তাড়াতাড়ি সারতে হয়, কারণ প্লাস্টার শুকোবার আগেই ছবি আঁকা, রঙ দেওয়া শেষ করা দরকার। সুতরাং একসঙ্গে বেশি জমিতে ফেস্কো করা অসম্ভব, যেটুকু জায়গায় একচোটে ছবি আঁকা, রঙ দেওয়া সম্ভব, এক একবারে শুধু সেইটুকুই প্লাস্টার দিতে হয়। প্লাস্টারের যেটুকুতে ছবি হল না দিনের শেষে সেটুকু কর্নিক বা ছুরি দিয়ে চেঁচে বাদ দিয়ে ফেলে দিয়ে পরে আবার যেদিন ছবি আঁকা হবে সেইদিন ফের সদ্য প্লাস্টার লাগাতে হবে। সেইজন্য ইওরোপীয় ফ্রেস্কোতে প্রায়ই এই ধরনের জোড়ার জায়গাগুলি স্পষ্ট দেখা যায়। অবশ্য এও ঠিক যে ইওরোপের অনেক ফ্রেস্কোই এত সযত্নে করা যে শত শত বছর পরেও এই জোড়াগুলি দেখা যায় না। পুরনো ভারতীয় বৌদ্ধ ফ্রেস্কোতে কিন্তু এই ধরনের জোড় আদৌ দেখা যায় না। এছাড়া ইওরোপীয় ফ্রেস্কো রীতিতে জল রঙ ভাল করে প্লাস্টারে ঢুকে, শুষে, যাতে প্লাস্টারের সঙ্গে এক হয়ে যায় তার জন্যে সদ্য করা প্লাস্টারটি অন্তত সিকি ইঞ্চি পুরু হওয়া দরকার, তা না হলে বুয়োনো ফ্রেস্কোর জল রঙ ভাল করে বসে না, ছবির রঙ স্থায়ী হয় না, সমান হয় না, খোলে না। এই যে

পুরু শেষ আস্তর যাকে ইটালিয়ানে ইন্তোনাকো বলে, সেটি কিন্তু অজন্তাতে, আগেই বলেছি, প্রায় ডিমের খোলার মত পাতলা। ৯নং গুহায় একজায়গায় একটি চিত্র আছে, সেটি গুহার পাথরের দেয়ালের উপর মাত্র $\frac{১}{৩২}$ ইঞ্চি পুরু প্লাস্টারের উপর আঁকা, তার উপর জমিটি চীনেমাটির মত পালিশ করা। ইওরোপের জলবায়ুতে ইন্তোনাকো সিকি ইঞ্চি পুরু হলে চলে, কিন্তু গরম দেশে এই আস্তর আরও পুরু হওয়া দরকার, কারণ জল তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। সুতরাং ভিজে প্লাস্টার তাড়াতাড়ি শুকোলে রঙকরা ছবিও তাড়াতাড়ি শুকোবে। অতএব শিল্পী একসঙ্গে খুব অল্প কাজই করতে পারবেন যেহেতু সদ্যকরা প্লাস্টার বেশিক্ষণ ভিজে থাকে না। খ্রীস্টপূর্ব যুগে ইট্রুরিয়ানদের আধা ফ্রেস্কোর কাজে পাথরের ভিজে দেয়াল শিল্পীকে সাহায্য করত, সদ্য লাগানো প্লাস্টারের খোসাকে চট করে শুকোতে দিত না, ফলে জলরঙ ঠিকমত ভিজে প্লাস্টারে ঢুকে শুষে যেত। ঈজিপশন বা মেসোপটেমিয়ার ছবিতে প্লাস্টার হত বেশ পাতলা, তাতে বিশুদ্ধ বুয়োনো ফ্রেস্কোরীতি দুঃসাধ্য। তাই সে দেশ দুটিতে হত টেম্পেরা বা মিশ্রিত রঙে ছবি আঁকা। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে ভারতবর্ষের অজন্তাতে টেম্পেরা রীতিই চলেছিল। ফ্রেস্কো সেক্কো বা টেম্পেরা বা শুকনো ফ্রেস্কো হচ্ছে একধরনের রীতি যা শুকিয়ে যাওয়া প্লাস্টার জমির উপর চুন দিয়ে আঁকা। আগে প্লাস্টার দিয়ে জমি করে সেটা শুকিয়ে নেওয়া হয়, তারপর ছবি আঁকার আগের দিন রাত্রে সেটি অল্প চুন গোলা জলে খুব ভাল করে ভিজিয়ে নেওয়া হয়। পরের দিন সকালে আবার ঐ ভাবে ভাল করে ভেজানো হয়। এই ভাল করে ভেজানো জমিতে তখন শিল্পী যে রঙে বুয়োনো ফ্রেস্কো করেন, সেই রঙেই ছবি আঁকেন, কিন্তু এর বেলায় রঙগুলি চুনজল অথবা জলে গোলা পাথুরে চুনের সঙ্গে মিশিয়ে নেন। বুয়োনো বা আসল ফ্রেস্কোর তুলনায় টেম্পেরা ভারি অস্বচ্ছ, আর যদিও বহুদিন টেকে তবুও বুয়োনো ফ্রেস্কোর মত রাসায়নিক স্থায়িত্ব তার নেই। বুয়োনোতে রঙ জলের সঙ্গে মিশে প্লাস্টারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, একেবারে ঢুকে শুষে, মিশে প্লাস্টারের সঙ্গে এক হয়ে যায়। কিন্তু সেক্কো কখনই তা হয় না, সে উপরে উপরেই দেয়ালের জমির উপর আলাদা একটি পর্দা হয়ে থাকে। অজন্তার রীতি পরীক্ষা করে পণ্ডিতদের মত যে তা আসল বুয়োনো ফ্রেস্কো নয়, তারই একধরনের রকমফের। আবার অনেকে অজন্তার প্লাস্টার পরীক্ষা করে, রঙের অস্বচ্ছতা দেখে, কিছু কিছু জায়গায় রঙ জ্বলে যাওয়া দেখে, সিদ্ধান্ত করেন যে অজন্তার ফ্রেস্কো আসলে টেম্পেরা অর্থাৎ মিশ্র রঙে আঁকা ছবি। এ সম্বন্ধে আমি যতটুকু পড়াশোনা করে বুঝেছি তাতে মনে হয়, যেহেতু অজন্তা গুহাগুলির কাজ বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে চলে, উপরন্তু গুহা থেকে গুহার মসৃণতার তারতম্য অনিবার্য হয়ে পড়ে, সেহেতু চিত্রশিল্পীরা ভিন্ন ভিন্ন যুগে, ভিন্ন ভিন্ন গুহায়, ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে কাজ করেছেন। মূলত কিন্তু সেগুলি ফ্রেস্কো বুয়োনো, ফ্রেস্কো আ সেক্কো, এবং টেম্পেরার শুদ্ধ অথবা মিশ্র প্রয়োগ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা উচিত আ ফ্রেস্কো বুয়োনো রীতিতে বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় শান্তিনিকেতনের হিন্দীভবনের তিনটি দেয়ালে, চীনাভবনের সিঁড়ির ঘরে, ও কলাভবনের ছাত্রাবাসে অতি আশ্চর্য কাজ কয়েক বছর আগে করেন।

জমি তৈরির কথা ত গেল। এখন আসল ছবিটি আঁকার রীতি কি রকম ছিল? শ্রীমতী হেরিংহ্যামের মতে, জমি বা প্লাস্টার তৈরি হবার পর শিল্পী সাদা প্লাস্টারের উপর শুধু হাতে প্রথমে লাল কড়া রেখায় একটি রেখাচিত্র এঁকে নিতেন। ঠিক যেমন আজও বাংলার চিত্রকর বা পটুয়া, ছেলেদের পট আঁকা শেখান সদ্য গোবর নিকোন মাটির দেয়ালে আলতা রঙের একটানে আঁকা একটি গরু বা ফুল বা মানুষ এঁকে, সেই রেখাটি ছেলেকে বুলোতে দিয়ে। গ্রিফিথস্ কিন্তু এই লাল রেখার কথা বলেন না। কিন্তু এই লাল রেখার ছবিতেই প্রথম থেকে ফুটে ওঠে ছবির যত কিছু শক্তি, আবেগ, উত্তেজনা, জ্ঞান আর সংকল্প। এর উপরে লাগানো হয় খুব পাতলা স্বচ্ছ এক রকম সবুজ মাটি-গোলা রঙ, ইংরেজিতে যাকে বলে টেরা ভার্দি, তার মধ্যে দিয়ে লাল রেখা ফুটে ওঠে। তখন লাগানো হয় যেখানে যেমন রঙ দরকার। তারপর আবার ছবির সীমারেখা স্পষ্ট জোরালো করার জন্য লাগানো হয়, লাল রেখার পাশে বা উপরে, কালো বা ব্রাউন রেখা যা ছবিকে দেয় দৃঢ়তা, বলিষ্ঠতা কিন্তু সেই সঙ্গে একটু চাপা বা ম্যাড়মেড়ে করে দেয়। অবশেষে একটু গাঢ়-ফিকে বা শেডিং দরকার হয়। আলো ছায়া নিয়ে খুব যে সুস্পষ্ট শেডিং করা হয় তা নয়, কিন্তু জমির রঙের সঙ্গে বিপরীতধর্মী জোরালো সাদা বা কালো রঙের বিরোধ ঘটিয়ে খুব বাহাদুরি করে ছবিটির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, গভীরত্ব, ব্যাপ্তি, সমগ্রতা ফুটিয়ে তোলা হয়।

ঠিক এই ধরনের রীতি ঈজিপশনরাও প্রয়োগ করতেন। পরে ক্রীটদ্বীপের কন্‌সসে এবং ইটালির পম্পিয়াইতেও এ রীতির কিছু নমুনা দেখা যায়। ফলে গ্রিফিথসের কথা ছেড়ে শ্রীমতী হেরিংহ্যামের কথাই মানতে ইচ্ছা করে। অজন্তার শিল্পী কি ধরনের তুলি ব্যবহার করতেন জানার উপায় নেই। কোথাও উল্লেখ নেই। কিন্তু

কি রঙ ব্যবহার করতেন তা আমরা জানি। বুয়োনো ফ্রেস্কো শিল্পীর রঙের ভাণ্ডার খুব ছোট, কারণ তাঁর প্রতিটি রঙ এমন হওয়া দরকার যা চুনের সঙ্গে মিশে খারাপ হবে না, অর্থাৎ স্বাভাবিক মাটি বা পাথর গুঁড়িয়ে করতে হবে। কিন্তু যেহেতু অজন্তার শিল্পী, ঈজিপশনদের মত, টেম্পেরায় আঁকতেন, সেহেতু তাঁর রঙের দৌড় ফ্রেস্কো শিল্পীর থেকে বেশি ছিল। তিনি অনায়াসে গাঢ় বা বেগনি-লাল, গোলাপী, সবুজ ব্যবহার করতে পারতেন, যা বুয়োনো রীতিতে অসম্ভব, কারণ সদ্য গোলা পাথুরে চুনে সেগুলি টিকবে না। অজন্তা আর বাঘের নানা পর্দার লাল লোহাপাথরের গুঁড়ো (গেরু বা মেটে সিন্দুর) থেকে নিশ্চয় এসেছে, সবুজ এসেছে খুব মিহি করে গুঁড়োনো এক ধরনের লোহামেশানো বালি থেকে। সাদা এসেছে চুন থেকে। নীল এসেছে আলট্রামেরিন, ল্যাপিজ ল্যাজুলাই পাথর থেকে, হলুদে এসেছে হরিতাল থেকে।

এই ত গেল খুব সংক্ষেপে কি কি উপকরণ বা মালমশলা দিয়ে অজন্তার চিত্র আঁকা হয়েছিল তার সম্বন্ধে আলোচনা। বিস্তৃত তথ্য পাওয়া যাবে গ্রিফিথ্স্‌, বার্জেস, হেরিংহ্যাম, ইয়াজদানির বইয়ে। মেজর গিলের তোলা ৭৪টি ফোটোগ্রাফ সম্বলিত পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ ফার্গুসনের একটি বই আছে, সেটি এখন একান্তই দুর্লভ, জেম্স্‌ মারে কোম্পানি ১৮৬৪ সালে প্রকাশ করেন, তাতেও বর্ণনা আছে। গ্রিফিথ্সের বইও এখন রীতিমত দুষ্প্রাপ্য, যদিও হাতে পাওয়া যায়। কাগজগুলি আর ছবিগুলি এত পাঁপড়ের মত মচ মচে, ভঙ্গুর হয়ে গেছে, যে নাড়তে ভয় করে। তবুও গ্রিফিথ্স্‌ না দেখলে অজন্তার গুহা দেখাও অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ইয়াজদানির অ্যালবামগুলি বহুশ্রমে বহু অর্থব্যয়ে তৈরি, কিন্তু গ্রিফিথ্স্‌ দেখে যেন বেশি তৃপ্তি হয়। তবে সদাসর্বদা হাতের কাছে রাখার মত সুন্দর রঙীন ছবির অ্যালবাম হিসাবে ইউনেসকো প্রকাশিত বইটি অতুলনীয়। এবার কি ধরনের চিত্রধর্ম বা দর্শনের উপর ভিত্তি করে অজন্তার ছবি আঁকা হয় সে সম্বন্ধে সামান্য দু'চার কথা বলা দরকার।

অজন্তাচিত্রে ষড়ঙ্গ ও চিত্রবিষয়

উষা অনিরুদ্ধের উপাখ্যান থেকে আমরা জানতে পাই যে মহাভারতের যুগেও এখন যাকে বলে প্রতিকৃতি বা পোর্ট্রেট তার বেশ চলন ছিল, তা না হলে নেতি নেতি করে উষা সব দেবদেবীর আঁকা ছবি একে একে বাদ দিয়ে শেষকালে অনিরুদ্ধের পোর্ট্রেটে স্বপ্নে দেখা আরাধ্যকে চিনলেন কি করে? রামায়ণেও রাম সীতার আলেখ্য দর্শনের কথা আমরা পড়ি। কিন্তু বৌদ্ধ যুগে চোখের দেখা চেনা বা হুবহু-স্বাভাবিক দৃশ্য আঁকা, অথবা পোর্ট্রেট আঁকার রেওয়াজ গেল কমে, এল ধর্মবিষয়ক চিত্র। তার থেকে হল ছবি আঁকা সম্বন্ধে আস্ত একটি দর্শনের সৃষ্টি, যার সন্ধান আমরা পাই বিনয় পিটকে, যেখানে চিত্রঘরের উল্লেখ আছে। সতেরো শতকের তিব্বতী ঐতিহাসিক তারনাথের একটি ছোট ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস আছে। তাতে তিনি বলেছেন যে ভারতে চারুশিল্পের ঐতিহ্য বহু প্রাচীন, ভগবান বুদ্ধেরও আগের। তারনাথ প্রথম যুগের প্রাচীর চিত্রের ভূয়সী প্রশংসা করেন, তাঁর মতে এগুলি এতই উৎকৃষ্ট যে সেগুলি দেবতাদের আঁকা। দেবতাদের কাজ পরে যক্ষরা (পুণ্যজন বা সুজনরা) বজায় রেখে চলেন। সম্রাট অশোক যক্ষদের নিযুক্ত করেন, পরে নাগার্জুন নাগদের এই কাজে নিয়োগ করেন। ঠিক যেমন এখন বাংলার প্রত্যেক শিল্পীজাতিই বিশ্বকর্মার বংশধর বলে পরিচিত হতে চান। সম্ভবত বৌদ্ধপূর্ব যুগেই ভারতীয় চারুশিল্পের বিখ্যাত ষড়ঙ্গ, বা চিত্রকলার ছয়টি অঙ্গ, বা বৈশিষ্ট্য আস্তে আস্তে স্বীকৃতি লাভ করে। ষড়ঙ্গকে আমরা ভারতীয় চিত্রকলার মূল নীতি বলে মেনে নিতে অভ্যস্ত। খ্রীস্টীয় তিন শতকে বাৎস্যায়ন তাঁর 'কামসূত্রে' এই ষড়ঙ্গের উল্লেখ করেন। বলা বাহুল্য বাৎস্যায়ন নিজেই স্বীকার করেছেন যে তিনি আরও প্রাচীন শাস্ত্র থেকে এগুলি উদ্ধার করেন। ষড়ঙ্গের সবচেয়ে ভাল আলোচনা আছে 'বিষ্ণুধর্মোত্তরে'। এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে ভারতীয় ও চীনদেশীয় ষড়ঙ্গ দর্শন সূত্রহিসাবে প্রায় এক, যদিও তাদের আধ্যাত্মিক আবেদন, আবেগ এবং শৈলীপ্রয়োগ বহুলাংশে ভিন্ন। দুটি আলাদা বিশ্ব বলা যায়। এগুলি হচ্ছে ষড়ঙ্গ—

(১) রূপভেদ—অর্থাৎ দৃশ্যমান জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান।

(২) প্রমাণম—স্পষ্ট, চিত্রসিদ্ধ অনুমান, মাপ, গড়ন।

(৩) ভাব—আকারে বা দেহে অনুভূতির প্রকাশ ও বিস্তার।

(৪) লাবণ্যযোজনম—লাবণ্য সঞ্চার, সৌন্দর্য বিকাশ ও বিস্তার ।।

(৫) সাদৃশ্যম—দুটি বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে রূপ বা আকারের পরোক্ষ বা মননগত মিল, যেমন সুপুরুষের

দেহকাণ্ডের সঙ্গে মহিষ মুণ্ডের বা মহিষ মুখের মিল।

(৬) বর্ণিকাভঙ্গ—উপকরণের যথার্থ ও সঙ্গত ব্যবহার ও বিন্যাস।

এটা বুঝতে দেরি হয় না যে ভারতীয় চিত্রকলা এই ষড়ঙ্গ দর্শনে বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়, যার বলে ভারতীয় চিত্রকলা চোখের দেখা, চোখের চেনা, স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক যথাযথ্য রক্ষার অত্যাচারের কবলে বা শৃঙ্খলে কোন দিন পড়েনি, চিরকালই কল্পনালোকে মুক্ত বিচরণের ছাড়পত্র পেয়েছে। যেমনটি দেখছি তেমনটি আঁকতে হবে এই নিগড়ের কুহক অথবা গোলকধাঁধায় পড়ে যেমন গ্রীক শিল্পী জিউক্সিস, পলিগ্নোটাস থেকে আরম্ভ করে রেনেসাঁসের যুগ থেকে এখনও পর্যন্ত প্রত্যেকটি ইওরোপীয় শিল্পী যন্ত্রণা ভোগ করেছেন, সেই কুহক বা নিগড় থেকে ষড়ঙ্গ ভারতীয় শিল্পীকে বহু যুগ আগে থেকেই মুক্তি দিয়েছে। পারস্পেক্‌টিভের সংকীর্ণতা বা চেনা-চেনা আঁকার কড়া আদেশ ভারতীয় শিল্পীকে একদিকে যেমন সহ্য করতে হয়নি, অন্যপক্ষে তাঁর দায়িত্বও তেমনি বরাবরই গেছে অসম্ভব বেড়ে। আর সেই দায়িত্বের গুরুভার সব সময়ে ভারতীয় শিল্পী ঠিকমত বইতে পেরেছেন, একথাও জোর করে বলা যায় না। কিন্তু অজন্তার গুহাচিত্রে ষড়ঙ্গের সুদৃঢ় প্রয়োগ যেমন সুন্দর তেমনি আবেগময়। রূপভেদ হচ্ছে প্রকৃতির বিশ্লেষণ, ফিগর এবং দেহের জ্ঞান, প্রাকৃতিক দৃশ্য, স্থাপত্য। প্রমাণম হচ্ছে পারম্পর্য, ভারসাম্য, মাপ, শরীরের অস্থিসংস্থান সম্বন্ধে জ্ঞান, ফোরশর্টনিং বা সমুখ দিকটা খাটো করে দেওয়া—যার থেকে ইওরোপীয় নীতিতে এসেছে পারস্পেক্‌টিভ। ভাব হচ্ছে দেহের উপর মনের প্রভাব আর তার অভিব্যক্তি, যার অনেক চূড়ান্ত উদাহরণ বৌদ্ধ চিত্রে পাওয়া যায়। লাবণ্যযোজনম হচ্ছে লাবণ্য ও সৌন্দর্যের প্রকাশ। সাদৃশ্য আসে সত্য আর সততায়। বর্ণিকাভঙ্গ হচ্ছে চিত্রোপকরণের যথাযথ ব্যবহার, এবং যথার্থ, সমুচিত আঙ্গিক, বা প্রকাশ রীতির প্রয়োগ। অবশ্য এই ছয়টি কথার পিছনে আছে বহু বড় বড় গ্রন্থ, গভীর দর্শন। অবনীন্দ্রনাথের "ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ" (বিশ্বভারতী) পড়লে এ বিষয়ে কিছু বোঝার সুবিধা হয়। এখানে আরও দুটি পুঁথির উল্লেখ দরকার। একটির নাম চিত্রলক্ষণ, এটি খুব প্রাচীন। অন্যটি গুপ্তবংশের পূর্ণ মহিমার কালে লেখা, নাম শিল্পশাস্ত্র। এই তিনটি বইয়ের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে ভারতীয় চিত্রকলার পিছনে বরাবরই কত সূক্ষ্ম এবং গভীর এক দর্শন প্রত্যেকটি মহৎ শিল্পীর কাজকে এক সূত্রে গেঁথেছে। অনুরূপ চিত্রদর্শন আছে চীনদেশেও। সেদেশেও এই দর্শনের চীনা নাম ষড়ঙ্গ। তবে প্রতি অঙ্গের সংজ্ঞায় ও ব্যাখ্যায় ভারতীয় ষড়ঙ্গের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যার থেকে কিছু কিছু পার্থক্য আছে।

এত অল্প কথায় ষড়ঙ্গের আলোচনা হয় না, কিন্তু এখন ঐটুকুই থাক, কারণ রূপভেদ, প্রমাণ, ভাব, লাবণ্য যোজনা, সাদৃশ্য, বর্ণিকাভঙ্গ, কথাগুলি এমনই ব্যঞ্জনাময় যে যতই লোকের অভিজ্ঞতা বাড়ে ততই যেন তার কাছে ঐ ছ'টি কথার নতুন নতুন মানে ফুটে ওঠে। সংস্কৃত সৌন্দর্য বা নন্দনতত্ত্বে, ইংরাজিতে যাকে বলে ইসথেটিকস, সার্থক এই ছ'টি কথা প্রয়োগ হয়েছিল বলতে হবে। কিন্তু কথা ছ'টি সর্বপ্রথম শুনলে গোড়ায় একটি ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে শাস্ত্রকার যেন চিত্রশিল্পে সব সময়ে একটি আদর্শ অবস্থা, আদর্শ নর-নারী, আদর্শ দৃশ্য, আদর্শ সৌন্দর্যময় পরিবেশের বর্ণনা বা ছবি চাইছেন, যার মধ্যে যা কিছু সাধারণ, দৈনন্দিন, নিতান্ত প্রাকৃত তার প্রবেশ নিষেধ। যেন তাঁরা বলছেন চিত্রে স্থান পাবে সেই ভাব, দৃশ্য, জীবজন্তু, নরনারী যার রূপভেদ, প্রমাণ, ভাব, লাবণ্য মানুষের আরাধ্য, আদর্শ। দৈনন্দিন দৃশ্যমান জড়জগতের যা কিছু সাধারণ, তাকে আদর্শের রসে রসিয়ে, সম্পূর্ণ বদলিয়ে, আদর্শ জগতের উপকরণে পরিবেশে ফেলে দেখাতে হবে। একথা অবশ্য বিষ্ণুধর্মোত্তর পড়লে যতটা না মনে হয় তার চেয়ে বেশি মনে হয় চিত্রলক্ষণ বা শুক্রনীতিসার বা শিল্পশাস্ত্র পড়লে, যেখানে বলা আছে দেবতা বা রাজাদের চিত্র কেমন অতিকায় হবে (ঠিক ঈজিপশনদের ছবির মত), সাধারণ লোকের ছবি হবে ছোট, কি করে আদর্শ সাধারণ মুখ হবে "চৌকো, চোখ কান টানা টানা, পরিষ্কার করে আঁকা 'সুন্দর' করে তুলির টানে শেষ করা, মুখে সতেজ, জ্যোতির্ময় ভাব, দেহে অলঙ্কার। মুখ তেকোণা হবে না, বাঁকাচোরা হবে না, কিংবা গোল বা ডিমের মত লম্বাও হবে না। যে এইভাবে ঠিকমত মুখ আঁকবে তার জীবন সর্বদা সুখে কাটবে। সাধারণ লোকের মুখ লম্বা, কিংবা গোল, কিংবা তেকোণা, কিন্তু মুখে শান্তভাব, আঁকলেও চলবে।" স্ত্রীলোক আঁকার সময়ে চিত্রশিল্পীকে আর একটু স্বাধীনতা দেওয়া যেতে পারে, যদিও প্রতিটি স্ত্রীলোকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুঠাম, আদর্শ মাপের, যাতে নম্র সলজ্জ, সুশীলা দেখায়, তাদের শরীরের পেশীতে ত্বকে ফুটে উঠবে যৌবন, দাঁড়িয়ে থাকবে সোজা হয়ে যাতে তাদের লাবণ্য ও পূর্ণতা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

শাস্ত্রের বিধি এইভাবে পড়লে আর অক্ষরে অক্ষরে মানতে চাইলে একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে দৈনন্দিন

জীবনের সাধারণ পরিবেশ শিল্পের বিষয় থেকে শাস্ত্রকার বাদ দিতে চাইছেন। এখন দেখা যাক অজন্তার গুহাচিত্রে কি ধরনের বিষয়ের অবতারণা শিল্পী করেছেন। আমরা অল্প কথায় অজন্তার বিশেষ বিশেষ ছবিগুলির বর্ণনা করব, প্রথমে করব সবচেয়ে প্রাচীন চিত্র, অর্থাৎ ৯ আর ১০নং গুহার, তারপর ১৬ আর ১৭ নম্বরের, সবশেষে ১ আর ২ নম্বরের।

৯নং গুহাটি হচ্ছে চৈত্য গুহা, এটি দেখলে নাসিকের কাছে তেইশটি বৌদ্ধগুহার (হীনযান বৌদ্ধদের 'পাণ্ডু-লেনা') ১৮নং গুহাটির কথা মনে হয়। ৯নং চৈত্য গুহা, নাসিকের কাছে পাণ্ডুলেনার ১৮নং গুহা, আর পুণায় কারলি চৈত্য গুহা, তিনটি প্রায় সমসাময়িক, অর্থাৎ খ্রীস্টপূর্ব দুই থেকে এক শতকে খোদাই, অজন্তার গুহাটির বোধ হয় ওরই মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন। ৯নং গুহায় একটি ছবির নৈপুণ্য খুব, বিষয়টি হচ্ছে একটি মেয়ে মাটিতে হাঁটু দুটি মুড়ে উঁচু করে রেখে দর্শকের দিকে পিছন করে বসে। গহনা পরা হাত দুটি উঁচু করে তুলে প্রণামের ভঙ্গিতে জোড় করে ধরা, পরনে কটিবাস, কানে কারুখচিত গহনা, মাথায় খুব যত্ন করে পাগড়ি বাঁধার মত করে চুলের সঙ্গে খুব মিহি কাজ করা কাপড় বাঁধা। পূর্ণ সুগঠিত শরীর, পিঠে মেরুদণ্ডের সুদৃঢ় রেখা, কাঁধ, কোমর, বস্তি, দেহের পেশী ও কঙ্কাল সংস্থান সম্বন্ধে নিখুঁত জ্ঞানের পরিচয় দেয়। মুখের ডান পাশ একপেশে, বা প্রোফাইল করে দেখানো। এটি গ্রিফিথ্‌স্ খারাপ হয়ে যাওয়া একটি ছবি চেঁচে তুলে ফেলে তার তলা থেকে উদ্ধার করেন। এই ছবিটির কথাই আগে বলেছি; একেবারে পাথরের দেয়ালের উপর ডিমের খোলার মত পাতলা, চীনেমাটির মত মসৃণ পালিশ করা খোসার মত প্লাস্টারের উপর আঁকা। এ ছাড়া আছে সারা দেয়ালময় ফুল, লতা পাতা, জ্যামিতিক নক্‌শা, রোজেট, গীলোশ, যক্ষের ছবি, যেগুলি এমন মজার যে যেদিক থেকে, যতদূর থেকেই দেখা যায়, মনে হবে যেন দর্শকের দিকেই তাকিয়ে আছে, একই মুখের নানাদিক থেকে নানা রকম ভঙ্গি, কখনও কটাক্ষ, কখনও হাসছে, কখনও গম্ভীর।

দশ নম্বর গুহায় একশ' বছর আগেও বহু ছবি ছিল। ডানদিকের দেয়ালে একধার থেকে হস্তীযূথের সারি ছিল, শুধু তাদের শরীরের রেখাগুলি আঁকা। রেখাগুলি যেমন সার্থক তেমনি বলিষ্ঠ। বাঁয়ের দেয়ালে ছিল একটি পুরুষদের শোভাযাত্রা, কেউ পদব্রজে কেউ ঘোড়ার পিঠে নানারকম পোশাক, তাদের পিছনে মেয়েদের ছোট ছোট দল। কিন্তু এগুলি এখন নষ্ট হয়ে গেছে। যখন ভাল ছিল তখন তাদের কিছু কিছুর নকল বা কপি বার্জেসের বইয়ে পাওয়া যায়, কিছু আছে লন্ডনের কমন্‌ওয়েল্‌থ অফিসে, জয়রাও রাঘোবা বলে একটি ছাত্রের আঁকা। একটি খুব সুন্দর কম্পোজিশন আছে, রাজা আটজন পরিচারিকার মাঝখানে দাঁড়িয়ে: গ্রুপটির তুলনা মেলা ভার। শোভাযাত্রার অসংখ্য লোকজনের পরস্পরের সম্বন্ধ, দূরত্ব, গভীরত্ব, পরিপ্রেক্ষিত বা যাকে ইংরেজিতে বলে পারস্পেক্‌টিভ তা অতি সুন্দর এসেছে। আঙুল, হাত, বাহুতে ফুটে উঠেছে ভাবের অভিব্যক্তি। এই গুহারই থামের গায়ে আঁকা বুদ্ধের ছবি বোধহয় এদের পরে আঁকা, তারিখ বোধহয় পাঁচ শতক বা তারও পরে হবে। শরীরের পিছনের জ্যোতি আর কাপড়ের ভাঁজ বা পাটের রেখা গান্ধার ভাস্কর্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। কখনও বা মনে আসে সাঁচির ভাস্কর্যের কথা। আরেকটি ছবি আছে বাঁ দেয়ালে, এক রাজা রানী আর রাজকুমারী পাত্রমিত্রকে নিয়ে বোধিদ্রুমের পূজা দেখছেন। এটিও অতি সুন্দর।

এখন ১৬ আর ১৭নং গুহায় যাওয়া যাক। ১৮৭৪ সালে গ্রিফিথ্‌স্ ১৬নং গুহা থেকে 'মুমূর্ষু রাজকুমারী' বলে একটা ছবি কপি করেন। গ্রিফিথ্‌স্ তার বর্ণনা এইভাবে দেন: "রাজপরিবারের এক মহিলা বাঁ বাহু বালিশে ভর দিয়ে পালঙ্কে বসে আছেন, পিছনে একটি পরিচারিকা তাঁকে সেই অবস্থায় ধরে রেখেছে। তারও পিছনে একটি অল্প বয়স্ক মেয়ে বুকে হাত দুটি চেপে মহিলার দিকে তাকিয়ে আছে। বুকে কাপড় বাঁধা আরেকটি মেয়ে পাখার হাওয়া করছে, মাথায় সাদা টুপিপরা একটি বৃদ্ধ দরজা দিয়ে উঁকি মারছে, অন্য একটি লোক একটি থামের পাশে বসে। আরেক জনের মাথায় পারসীক টুপি, সঙ্গে মুখে-বাটি-দেওয়া একটি কলসি, তার কাছে কাফ্রীদের মত কোঁকড়া কোঁকড়া চুলওলা একটি লোক কি যেন চাইছে। ডানদিকে আরেকটি ঘরে দুটি কঞ্চুকিনী বসে। শোক আর দুঃখের এমন কথা-কয়ে-ওঠা ছবি চিত্রকলার ইতিহাসে বোধ হয় আর দ্বিতীয় নেই। ফ্লরেন্টাইন শিল্পী হয়ত এর চেয়ে ভাল আঁকতে পারতেন, ভিনিশান শিল্পী হয়ত রঙ দিতে পারতেন এর চেয়ে ভাল, কিন্তু তাদের কেউই এমন ভাব ফোটাতে পারতেন না। মাথা ঝুলে পড়েছে, চোখ আধবোজা, শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিথিল, অবশ, মুমূর্ষ মহিলা শয্যায় হেলান দিয়ে বসে। দর্শক যেন মৃত্যুর মুখোমুখী। যে পরিচারিকাটি ধরে আছে তারও মুখে কি ক্লেশ আর করুণার ভাব, আরেকজন কত উদ্বেগে মুখের দিকে চেয়ে আছে।" সকলের মুখে কি উদ্বেগ, শোক,

হতাশা!

এই গুহাতেই পারসীক টুপিপরা আরও ছবি আছে, তাতে মনে হয় পারস্যের সঙ্গে বেশ আদান-প্রদান ছিল। ১৭নং গুহাতে নানা ধরনের বিচিত্র ছবি পাওয়া যায়, এর অবশ্য অনেক এখন নষ্ট হয়ে গেছে। ১৭নং গুহার বারান্দার বাঁ দিকের কোণে একটি বৌদ্ধ প্রাণমণ্ডল আছে, অনেকে ভুল করে একে রাশিচক্র মনে করেন। দেখতে খানিকটা তিব্বতী নিশান বা পতাকার মত। বার্জেসের একটি ছবি দেখে মনে হয় যে সিংহলে বিজয় সিংহের অবতরণ চিত্রটি এই গুহায় আছে; আসলে ছবিটির বিষয় 'সিংহল অবদান'। আরেকটি ছবিতে শিবি রাজার গল্প আছে। প্রাণমণ্ডলে মানুষ আর জীবজন্তুর ছবি। বারান্দার পূর্বদিকের পিছনের দেয়ালে অর্ধেক জুড়ে আছে আরেকটি ছবি : শূন্যের মধ্যে তিনটি নারী আর একটি পুরুষ উড়ে যাচ্ছে। গুহার ভিতরের দেয়ালগুলি ধোঁয়ায় খুব নষ্ট হয়ে গেছে। পশ্চিমের দেয়ালে আছে বিচার গৃহের একটি দৃশ্য (শিবি রাজার উপাখ্যান), শিকারের দৃশ্য, আরেকটি ছবি সুতসোম জাতক থেকে নেওয়া। একটি ছবি আছে রাক্ষসীরা মানুষ ধরে ধরে খাচ্ছে। ১৭নং গুহার একটি ছবির তুলনা মেলা ভার। ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষায় বেরিয়েছেন। দেবদেবী, অতিমানব বা নমস্য ব্যক্তির দেহ নশ্বর সাধারণ মানুষের থেকে অপেক্ষাকৃত বড় মাপে আঁকা হত। আকারের পার্থক্য ছিল মহত্ত্বের একটি স্থূল লক্ষণ। যে যার বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে এসেছে বুদ্ধকে ভিক্ষা দিয়ে ধন্য হতে। একটি মা (অনেকে বলেন যশোধারা) ছেলেকে (অনেকের মতে রাহুলকে) নিয়ে বেরিয়ে এসেছেন, বাইরের দরজায়, ছেলের হাতে ভিক্ষা দিয়ে অতি ব্যাকুলভাবে তাকে এগিয়ে দিচ্ছেন, যাতে ছেলে বুদ্ধকে ভিক্ষা দিতে পারে, ছেলের ভিক্ষা না নিয়ে তিনি যেন না যান। ভিক্ষা দেবার আগ্রহের সঙ্গে বুদ্ধকে দেখার ব্যাকুলতা কি অদ্ভুতভাবে মায়ের চোখে দেহে ফুটে উঠেছে তা ছবিটি না দেখলে কল্পনা করা যায় না।

এক আর দু'নম্বর গুহার ছবিরও কিছু বর্ণনা দরকার। ১নং গুহার মুখে, উপর দিকে সোজা সারি করে হস্তীযূথ, শিকার, আর লোকের দলের সারি, সবই অতি উৎকৃষ্ট খোদাই। পশ্চিমের কক্ষে চারটি ছবি, রোগ, জরা আর মৃত্যুর, এবং যা দেখে বুদ্ধ সংসার ত্যাগ করেন। উপরে ছবির সার করা একটি পটি, হংসবলাকার, তারও উপরে সিংহমুখের সারি। বারান্দার দিকে তিনটি দরজা, দুটি জানালা। মধ্যের দরজাটি অদ্ভুত ভাস্কর্য-খচিত। গুহার ভিতরে পিছনের থামের সারিতেও তেমনি ভাস্কর্যের কাজ, নিবিষ্ট মনে দেখার মত। গুহার একেবারে ভিতরে গর্ভগৃহে বুদ্ধের বিরাট মূর্তি, দু'পাশে দুটি ইন্দ্রের মূর্তি। ইন্দ্র বৃষ্টির দেবতা। দুয়ারের দু'পাশে উপরের দিকে গঙ্গা যমুনার মূর্তি, নিচের দিকে দুটি নাগফণার মুকুট পরা দ্বারপাল। বুদ্ধের মূর্তির মুখে অদ্ভুত ভাব, সমুখ থেকে আলো পড়লে ধ্যানমগ্ন, স্তব্ধ, গম্ভীর; এক পাশ থেকে আলো পড়লে মুখের ভাব স্নিগ্ধ, সুস্মিত; অন্য পাশ থেকে আলো পড়লে অসীম করুণাময়। গুহার ভিতরে সমস্তটাই ছবিতে মোড়া ছিল। হাতের চারকোণে ছোট ছোট স্কেয়মণ্ডলে বা প্যানেলে বিদেশীদের গ্রুপ, বোধহয় পারসীকদের। সমুখের দেয়ালে সম্রাট দ্বিতীয় পুলকেশীন পারস্যের রাজা খসরু পরভেজের দূতকে অভ্যর্থনা করছেন। পিছনে, পূর্বদিকের কক্ষে একটি পার্বত্য দৃশ্য, দুই কক্ষের দরজার মাঝখানের দেয়ালে নাগরাজা আর রানী আরেকজন রাজপুরুষের সঙ্গে আলাপ করছেন। তার উপরে সাপুড়ের সাপ খেলানোর একটি ছবি। আরেকটু দূরে নাগরাজা আর নারীদের আর একটি ছবি। পূর্ব দেয়ালে দ্বিতীয় আর তৃতীয় কক্ষের মাঝখানের দেয়ালে হাতি আর সৈন্যদের একটি দৃশ্য। গর্ভগৃহের সমুখের দেয়ালে একটি প্রকাণ্ড ছবি, বুদ্ধের প্রলোভন : মার বুদ্ধকে প্রলুব্ধ করছেন। বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণির ছবির তুলনা নেই। আর তুলনা নেই জগদ্বিখ্যাত 'কৃষ্ণা রাজকুমারীর', গর্ভগৃহের সমুখের দেয়ালে আঁকা।

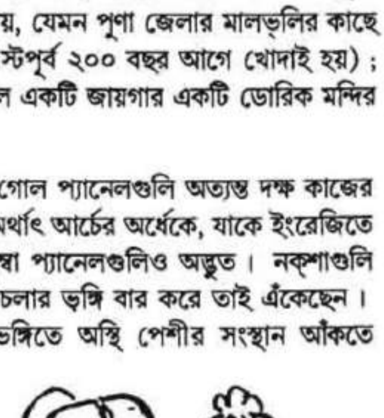


এক নম্বর গুহার ছাতের প্যানেলগুলি সাজানো নক্শা হিসাবে অদ্বিতীয়। ইংরেজিতে যাকে বলে ডেকরেটিভ ডিজাইন বা বাংলায় অলঙ্কার আল্পনা, তাতে শিল্পী অদ্ভুত কৌশল দেখিয়েছেন। এগুলি বোধহয় সবই সাত শতকের প্রথম দিকে আঁকা। গ্রিফিথ্স্ বহু যত্নে ও পরিশ্রমে এগুলির নকল করান। এগুলির বৈচিত্র্যে তিনি মুগ্ধ হয়ে যান। বৈচিত্র্যের যেন সীমা নেই, প্রতিটি ছোটখাটো জিনিসের প্রতি নিরলস নজর, ফলে একই জিনিসের পুনরুক্তি কোথাও নেই। প্রগল্ভ কল্পনা আর খেয়াল দুইই বাধাবিমুক্ত, প্রকৃতির অতি সামান্য সৃষ্টি শিল্পীর হাতে

পড়ে নয়নাভিরাম হৃদয়গ্রাহী অলঙ্কার হয়ে উঠেছে। ছোট প্যানেলগুলি বিচিত্র, লাবণ্যময় অলঙ্কারে ভরপুর, কল্পনা আর খেয়াল এখানে কোন বাধাই মানেনি। কোন কোনটাতে অদ্ভুতাকার নরনারীর ছবি, হাসি তামাসায় উজ্জ্বল, কারো মাথায় মজার দেখতে পারসীক পাগড়ি, গায়ে পারসীক কোট, পায়ে ডোরাকাটা মোজা, ফল ফুলের আড়ালে আবডালে খেলে বেড়াচ্ছে, ছুটোছুটি করছে, নাচছে, মদ খাচ্ছে, কিংবা গীতবাদ্য করছে, কিংবা হয়ত আষাঢ়ে গল্পে মত্ত, কারোও সঙ্গে নানা জীবজন্তু, তাদের মধ্যে জড়িয়ে আছে পদ্ম, ঠিক যেমন বিলে ফুটে থাকে। কোথাও হাতির দল, ককুদওলা ষাঁড়, বানর, টিয়াপাখি, কাকাতুয়া, হাঁস, আজগুবি ছবির পাখি, কখনও জোড়ে, কখনও একলা, রীতিবিন্যস্ত বা স্টাইলাইজ করা, মাথায় গাছের পাতার মত ঝুঁটি, লেজগুলি কত ভঙ্গিতে খেলানো। কোথাও বড় গোলাপী পদ্ম, পূর্ণ প্রস্ফুটিত, কোথাও আধফোটা, কোথাও কুঁড়ি, কোথাও বা ছোট লাল বা সাদা পদ্ম। কোথাও আম, কোথাও বা আতা। ফলের মধ্যে কোথাও বেল বা বাতাবি লেবু, কোথাও বা বেগুন, আরও কত কি। অলঙ্কারগুলি একটির পর একটি কালো আর লাল জমির উপর আঁকা। প্রথমে সারা প্যানেলময় জমির রঙটি দেওয়া হয়, তার উপরে অলঙ্কারটি সাদা রঙে জমজমাট করে আঁকা আর সাদা রঙ দেওয়া। এই সাদার উপর আবার পাতলা নানারঙের স্বচ্ছ প্রলেপ দিয়ে সম্পূর্ণ করা। খেয়ালও অদ্ভুত। যেমন একটা থামে চারটি হরিণ আঁকা, চারটি হরিণের কিন্তু একটি মাত্র মাথা, অর্থাৎ একটি হরিণের মাথার চারদিকে চারটি হরিণের শরীর। ১নং গুহার ভিতরে পশ্চিম দেয়ালের মুখোমুখি থামের উপর হঠাৎ দুটি ষাঁড়ের লড়াই-এর ছবি। তাতে ষাঁড়ের শরীর সম্বন্ধে অদ্ভুত জ্ঞানের পরিচয়, লড়াই-এর মধ্য দিয়ে যেন পেশীর চঞ্চলতা, ষাঁড়ের রাগ আর গতি ফুটে বেরোচ্ছে। ঠিক এই চিত্রটি পৃথিবীর নানা জায়গায় আশ্চর্যভাবে পাওয়া যায়, যেমন পুণা জেলার মালভূলির কাছে আঠারোটি গুহা সম্বলিত ভাজার একটি গুহার ভাস্কর্যে (ভাজা বোধ হয় খ্রীস্টপূর্ব ২০০ বছর আগে খোদাই হয়); ষোল শতকে আকবরের রাজধানী ফতেপুর সিক্রিতে; ট্রোডের অ্যাসস বলে একটি জায়গার একটি ডোরিক মন্দির থেকে নেওয়া, এখন প্যারিসের লুভরে রক্ষিত একটি বিখ্যাত ভাস্কর্যে।



দু'নম্বর গুহাতেও একই ধরনের আশ্চর্য কাজ, অদ্ভুত ছবি। এর গোল গোল প্যানেলগুলি অত্যন্ত দক্ষ কাজের পরিচয় দেয়। থামের মাথা যেখানে বেঁকে আর এক থামের দিকে গেছে, অর্থাৎ আর্চের অর্ধেকে, যাকে ইংরেজিতে স্প্যান্ড্রিল বলে, সেখানকার ছবিগুলি অসম্ভব মূর্ত, গতিচঞ্চল। ছাতের লম্বা প্যানেলগুলিও অদ্ভুত। নক্শাগুলি অতি সুনিপুণ, মনে হয় শিল্পী ভেবে ভেবে যত শক্ত শক্ত বসা, দাঁড়ানো, চলার ভঙ্গি বার করে তাই এঁকেছেন। ঠিক যেমন মিকেলাঞ্জেলো মানুষের বাঁকাচোরা দোমড়ানো নানা শক্ত ভঙ্গিতে অস্থি পেশীর সংস্থান আঁকতে ভালবাসতেন। একটি ছবিতে একটি মেয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করছে। পাকানো পাকানো ফণার মুকুট পরা নাগ, কিংবা জলদেবতাদের ছবি এইসব কষ্টকল্পিত শরীরের অবস্থার খুব দক্ষ ড্রয়িং। একটি ছবির কথা বলি। একটি স্ত্রীলোক থামে পিঠ দিয়ে বাঁ পা তুলে হাঁটু মুড়ে পায়ের চেটো থামে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে। স্ত্রীলোকটির পা হাতের মতই নিখুঁত করে আঁকা। দোলনায় বসা মেয়েটি মনকে খুবই দোলা দেয়। একটি ছবিতে রাজারানী সদ্যোজাত শিশুকে দেখছেন। পূবের দেয়ালে একটি ছবিতে রাজা শোভাযাত্রায় বেরিয়েছেন, সঙ্গে হাতি, ঘোড়া, পাইক বরকন্দাজ, তার সঙ্গে আবার একটি পালতোলা জাহাজের মত নৌকা, কলসিতে ভর্তি। দৃশ্যটি পণ্ডিত জাতক থেকে নেওয়া।



অলঙ্কার বা আলপনার জন্য আঁকা প্যানেলগুলি ছাড়া ছবির বিষয়গুলি প্রায় সমস্তই বৌদ্ধ ধর্মবিষয়ক। বুদ্ধের নানা ভাবের নানা ভঙ্গির প্রতিকৃতি ত আছেই, উপরন্তু বৌদ্ধধর্মের নানা চিহ্ন আছে। বড় ছবিদের প্রায় সবগুলিই গৌতম বুদ্ধের জীবনের কোন না কোন ঘটনা নিয়ে আঁকা কিংবা কোন কোন জাতক থেকে নেওয়া। কয়েকটি ছবি দেখে স্পষ্টই

বোঝা যায়, কোন্ জাতক অবলম্বনে ছবিটি আঁকা হয়েছে, আবার কোন কোন ছবি এতই নষ্ট হয়ে গেছে যে ঠিক বোঝা যায় না। যেমন ১৭নং গুহায় দানবীর শিবি রাজার (যিনি নিজের দুই চোখ সুদ্ধ ভিক্ষা হিসাবে দান করেছিলেন) উপাখ্যান দেখলেই বোঝা যায়। ২নং গুহার একটি ছবি আবার আর্যসূরের জাতকমালার কান্তিবাদিন আর মৈত্রবালার জাতক থেকে আঁকা। ১০নং গুহার ছ'টি দাঁতওলা হাতির গল্প এবং অন্যান্য উপাখ্যান স্পষ্টই জাতক থেকে নেওয়া। আবার সরাসরি জাতক থেকে নেওয়া নয় এমন বৌদ্ধ বিষয়সম্বলিত ছবিও আছে, যেগুলি নাকি বুদ্ধের নিজের জীবনী থেকে নেওয়া বা অবলোকিতেশ্বর সূক্ত থেকে আঁকা। অজন্তার ছবি বইয়ে দেখে সমালোচনা করার আগে কয়েকটি জিনিস মনে রাখতে হবে । মনে রাখা দরকার যে চিত্রগুলি গুহার দেওয়ালে প্রকাণ্ড বড় বড় করে আঁকা, কোন কোনটির ব্যাস কুড়ি ফিটেরও উপর হবে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে সেগুলি বেশ দূর থেকে দেখবার কথা, সুতরাং খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সূক্ষ্ম তুলির কারিকরির প্রমাণ দেবার জন্য আঁকা হয়নি, ঠিক যেমন সিস্তিন চ্যাপেলের ভিতরের ছাতে মিকেলাঞ্জেলোর আঁকা ফ্রেস্কো। বইয়ের কয়েক ইঞ্চি মাত্র বড় ফোটোগ্রাফে অজন্তার ছবি দেখাও যা আর বড় দীঘি দেখে সমুদ্রের আন্দাজ করাও তা। তাছাড়া আরও মনে রাখতে হবে যে শিল্পী যে ধর্মভাবে আপ্লুত, অভিষিক্ত হয়ে, তদ্গত হয়ে ছবি এঁকেছিলেন, আজকে দর্শকের মনে সে ধর্মভাব নেই, সুতরাং সেই ভাবজনিত আগ্রহও নেই। কিন্তু এসব সত্ত্বেও অজন্তার ছবি বইয়ে দেখলেও স্তম্ভিত হতে হয়, আসল গুহায় দেখলে ত বটেই। এরকম গভীর সংবেদনা, আবেগ, বিশ্বসৃষ্টির সব কিছুর প্রতি ভাস্বর উল্লাস, আর মমতা, ভালবাসা, একাত্মতা, সে পুরুষ হোক, নারী হোক, শিশু হোক, জন্তু, জানোয়ার, উৎকট উদ্ভট জীব হোক, বা ফুল, লতা, পাতা, ফল যাই হোক, নক্শার কাজে এত বাহাদুরি, রঙের কাজে এত কৌশল, রীতির এত নৈপুণ্য, নক্শার এবং তুলির এত বৈচিত্র্য আর প্রাণবন্ততা যে ইটালির রেনেসাঁসের যুগের ছবির সঙ্গে অনায়াসে তুলনা চলে। দক্ষতার যেন তুলনা নেই। একটি মাত্র সমান রেখায়, যা কখনও মোটাও হচ্ছে না, সরুও হচ্ছে না, তুলির একটিমাত্র টানে, নিঁখুত, বড় বড়, চূড়ান্ত কৌশলময় ছবি ফুটে উঠেছে। স্পর্শ যেমন কঠিন তেমনি প্রাণবন্ত, বিচার ও ব্যাপ্তি তেমন দরাজ। অঙ্গসজ্জা ও কাপড়ের ভাঁজ যেমন ভাল জানা আছে তেমনি ভাল আঁকা হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাপড়ের ভাঁজ যদিও তখনকার চলিত রীতিতে আঁকা তবুও গায়ের মাপে কাটা বা শেলাই-না-করা পরিধেয় কিভাবে গায়ে লেগে থাকে, কিভাবে পড়ে থাকে, ঝোলে, সে বিষয়ে শিল্পীর শেখার কিছু বাকি নেই। অজন্তার রীতি সম্বন্ধে শ্রীমতী হেরিংহ্যামের কয়েকটি লাইন আছে খুবই ভাল। ১ আর ৯নং, ১৬ আর ১৭নং গুহার চিত্ররীতির উল্লেখ করে তিনি বলেন যে ১৭ নম্বর গুহার গল্প বলার রীতির আরও উন্নতি দেখা যায় ১ আর ২নং গুহায়। "এই গুহাগুলিতে আছে (১) আরও দৃঢ় স্টাইলাইজ করা রীতি, নক্শায় আরও বেশি অপ্রাকৃত রীতি, বেশি কর্মব্যস্ততা আর গতিবেগ, কম মমতা, (২) আরও লোকপ্রিয়, প্রাণবন্ত, নাটকীয় পরিস্থিতি, তার সঙ্গে গল্প বলার তাগিদ, ঘটনাবাহুল্য আর প্রাকৃত ভাব।



"দু'নম্বর গুহায় আরও তিনটি সুস্পষ্ট রীতি দেখা যায়। একটি ছোট কক্ষের দু'পাশের দুটি দেয়ালে আমরা পাই খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আঁকা, প্রায় প্রমাণ আকারের চার পাঁচটি নগ্নপ্রায় শরীর। এদের সীমারেখা সারা শরীর ঘিরে পেঁচিয়ে গেছে, ঠিক মনে হয় যেন চীমাবুয়ের আঁকা, প্রায় একই ধরনের গড়ন, ভাব, চিন্তা। এমনভাবে আঁকা মনে হয় যেন প্রলম্বিত ভাস্কর্য ; দেয়ালের গায়ে অর্ধেক গভীর পর্যন্ত খোদাই করা, ইংরেজিতে যাকে বলে বেস-রিলিফ, নতোন্নত বা অর্ধচিত্র ভাস্কর্য, ছবিটি অবশ্য গুহার মতই অনেক পরের যুগের।"

এই কক্ষেরই উল্টোদিকে একটি কক্ষে ঠিক একই ধরনের ছবি আর অলঙ্কার। পশ্চিমের দেয়ালের ছবি দেখে মনে হয় যেন চীনে ভিক্ষুদের সমাবেশ আঁকা হয়েছে, ছবির তুলির টানে বিস্ময়কর দৃপ্তি আর আত্মবিশ্বাস, ইংরেজিতে এককথায় যাকে বলে ব্রাভুরা। রঙ বিশেষ কিছু আর অবশিষ্ট নেই, কিন্তু রঙ উঠে গিয়ে জোরালো কালো আর লালচে ব্রাউনে আঁকা রেখা এমন ফুটে বেরিয়েছে, এত তার সাবলীল ভঙ্গি, প্রাচীন পুঁথির লেখার মত তা এত স্বচ্ছন্দে খেলে বেড়াচ্ছে, যেন মনে হয় রঙ উঠে গিয়ে রেখা বেরিয়েছে ভালই হয়েছে, তা না হলে এত

প্রাণ ফুটে বেরোত না। এই পশ্চিম দেয়ালেই আরেকটি ছবি আছে ; পদ্ম সরোবরে মানুষ আর হাঁস একসঙ্গে আঁকা। বিষয়টি একান্ত ভারতীয় হলেও আঁকার এত নৈপুণ্য আর স্বাধীনতা যে সবথেকে উৎকৃষ্ট চীনে ছবির সঙ্গে অনায়াসে তুলনা চলে। যেমন নক্শার পারিপাট্য তেমনি রঙের তীব্র সাদা, গভীর বেগ্নে-লাল্চে-ব্রাউন, স্বচ্ছ, টলটলে পান্না-সবুজ, তার সঙ্গে পরিষ্কার লালের ছিট। ১৭নং গুহায় আবার একই হাতে আঁকা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের তিনটি ছবি আছে : (১) সিংহ আর কালো হরিণ শিকার, (২) হাতি শিকার, (৩) রাজ দরবারে হাতি শুঁড় তুলে প্রণাম করছে। তিনটি ছবিতেই রঙ গাঢ়-ফিকে বা শেডিং করে এমন পারস্পেক্টিভ বা পরিপ্রেক্ষিত আনা হয়েছে যা সত্যই বিস্ময়কর। তিনটিই এক রঙা ছবি বললে হয়, রঙের মধ্যে কেবল গাঢ় আর ফিকে ধূসর ; শুধু গাছপাতা আর ঘাস ম্যাড়মেড়ে সবুজ। সমস্ত কম্পোজিশনটি, এমন কি প্রত্যেকটি প্রাণীর ভঙ্গিমাসুদ্ধ যেমন স্বাভাবিক তেমন আধুনিক, নক্শা সাবলীল, হালকা, যেন খেয়াল খুশিমত করা, যদিও রঙ দেওয়া হয়েছে খুব কড়া, ভারি তুলির টানে—খানিকটা ফরাসী পোস্ট-ইম্প্রেশনিস্টদের কায়দায়। ঘোড়া, হাতি, কুকুর, কালো হরিণ, সব জন্তুই অতি সুন্দরভাবে আঁকা।

পরিশেষ

ইলোরা, কাহ্নেরি, কার্লি, ভাজা, বেদ্সা, নাসিক্, বাঘ, বাদামী, জুনার, অজন্তা, গুহাচিত্রের সব শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান। সবাইকে ছাপিয়ে উঠেছে অজন্তা। বিশ্বসৃষ্টির সমস্ত কিছুতে অসীম আগ্রহ, সব কিছুতে একান্ত একাত্মতা, সামান্য কীট থেকে মানুষ পর্যন্ত প্রতিটি জিনিস পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা, দরদ, সংবেদনা দিয়ে আঁকা। নরনারীর ছবির কথা ত বাদই দিলুম। কিন্তু হাত, পায়েরই বা কত বিচিত্র ভঙ্গি, কত বিচিত্র মুদ্রা। একদিকে যেমন চোখের দেখা স্বাভাবিকত্বের বালাই নেই, অর্থাৎ ইওরোপীয় চিত্রের বোকাবানানো রিপ্রেজেন্টেশন নেই, অন্যপক্ষে তেমনি আছে ভাব, সাদৃশ্য, লাবণ্য, রূপভেদ, প্রমাণ আর বর্ণিকাভঙ্গের চূড়ান্ত। ফর্ম্যালি, স্টাইলাইজ করা পরোক্ষরীতিবিন্যস্ত শরীরে কি করে এত মানুষী ভাব, ভঙ্গিমা, ব্যাকুলতা, উত্তেজনা আসতে পারে, কি করে এত কাম, ক্রোধ, ভয়, সম্মোহ প্রভৃতির প্রকাশ হতে পারে, কি করে শুধু কালো রেখার মধ্যে এত কম্পোজিশনের নৈপুণ্য, আর রঙের একান্ত স্বল্পতার মধ্যেও, শুধু গাঢ়-ফিকে বা শেডিং-এর মধ্যে, চূড়ান্ত ভাস্কর্যসুলভ গড়ন আর পরিপ্রেক্ষিত আসতে পারে, স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। এত বিচিত্র ভঙ্গি, বিচিত্র ভাব, এত শান্ত, স্তম্ভিত সৌন্দর্য, এত ভাবানুষঙ্গতা বড় বিস্ময়কর। সারা বিশ্বের প্রাচুর্য যেন অকৃপণ হাতে ঢালা। স্ত্রীপুরুষের অলঙ্কারের কত বৈচিত্র্য। উদ্ভট, বিদঘুটে কিন্নর, নাগ, রাক্ষসী, গাঁয়ের কুমোরের তৈরি উদ্ভট বেহাই-বেহানের মত পেটমোটা রসিক রসিকারা, ভয়ঙ্করমুখ রাক্ষসরা, আজগুবি জন্তু, গথিক গির্জার ভাস্কর্য, যেমন নোতর দাম, বা রীম্স, বা শার্তরকেও যেন হার মানিয়েছে। হাতি, ঘোড়া, ছুটন্ত হরিণ, বানর, হনুমান, ভীত সন্ত্রস্ত গরু মোষের পাল, কাকাতুয়া, টিয়া, হাঁসের পাতি, মরাল, রাজহাঁস, নেকড়ে বাঘ, সাপ কোন কিছুই বাদ যায়নি। কোথাও সিংহ আক্রমণ করছে, কোথাও জোর পাবার জন্য গাছের চারধারে শরীরটা কুণ্ডলী পাকিয়ে অজগর সাপ হাতির পা কামড়ে ধরেছে, হাতি সমুখের পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে পালাবার শেষ চেষ্টা করছে ; কোথাও ভীত, সন্ত্রস্ত মানুষকে আচমকা ভাল্লুক এসে জাপটে ধরেছে। শোভাযাত্রার কি বাহার, কি কৌশল কম্পোজিশনের, তার সঙ্গে কত অজস্র বৈচিত্র্য অস্ত্রশস্ত্র, কলকব্জার। হাত পাখাই কত রকম, কত রকমই বা বাদ্যযন্ত্র। কত রকমের যে টুপি তা বর্ণনা করা শক্ত। ঘড়া, ঘট, ভাজ, পাত্র, কলসি, শিকের বৈচিত্র্য থেকেও চোখ ফেরানো দুঃসাধ্য। মানুষ, গরু, ছাগল, হাতি, ঘোড়া, যাবতীয় বিশ্বসৃষ্টির প্রাণীর আর সৃষ্টিছাড়া উদ্ভট কিন্নর রাক্ষসের শরীর, বাঁকা চোরা, দোমড়ানো, মোচড়ানো নানা ভঙ্গিতে দেখা ছবি আঁকতে যেন শিল্পী অদ্ভুত আনন্দ পান। মিকেলাঞ্জেলোও হার মানেন। হাওয়ার মধ্যে দিয়ে রাক্ষসীদের বেগে শন্ শন্ করে ছোটা যেন তিন্তোরেত্তোকে কোথায় হার মানিয়ে লজ্জা দেয়।



একটি ছবি আছে নৌকা বিহার, তার লাস্যভাব ওয়াতোকে লজ্জা দেয়। ফল, ফুল, লতা পাতার কথা বলে শেষ করা অসম্ভব। স্বাভাবিক পদ্মকে পৃথিবীতে যদি কেউ হার মানিয়ে থাকে তবে অজন্তার ছবি। শিল্পী যেন সারা বিশ্বকে জাপটে ধরতে চান, কিছুই যেন ছাড়তে চান না, অথচ এত নিপুণ ও সত্য তাঁর মাত্রা ও শালীনতা বোধ যে কোথাও অপরিচ্ছন্নতা নেই, নেই পরিপাট্যের অভাব অথবা প্রগল্‌ভতা। সর্বত্র সংযম, অসামান্য রুচি।

আমার সৌভাগ্যক্রমে বা দুর্ভাগ্যক্রমে জানি না, দশদিনের অন্তরে আমি কোণার্ক আর অজন্তা দেখি। প্রথমে দেখি কোণার্ক, তারপর অজন্তা। আমার ধারণা কোণার্ক প্রথম দেখার পর অন্তত বছর খানেক অন্য কিছু দেখা উচিত নয়। তার আগে দেখলে, পরে যা দেখা যায় তার উপর সুবিচার হয় না। কিন্তু তবুও কোণার্কের পর অজন্তা দেখলে এইটুকু অন্তত বোঝা যায় যে দুই জায়গার শিল্পীরই অম্বিষ্ট ছিল অনেকটা এক রকম। অজন্তা সম্বন্ধে এত নির্বোধ দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য উচ্ছ্বাস হয়েছে, অজন্তার ছবির এত অবিশ্বাস্য রকমের কুৎসিত নকল, প্রাণহীন, নীরস, কার্ডবোর্ডে আঁকার মত এত অসুন্দর ব্যর্থ ছবি 'ভারতীয় অজন্তা রীতি' বলে এদেশের কিছু কিছু শিল্পী চালাবার চেষ্টা করেছেন, তার উপরে গ্রিফিথ্‌স্‌, ইয়াজদানির বই এত দুষ্প্রাপ্য আর দুর্মূল্য, এবং অন্যান্য বইগুলি এত সংক্ষিপ্ত, খাপছাড়া, খারাপভাবে ছাপা, যে অনেক বিদগ্ধ মনও কি রকম যেন অজন্তার প্রতি বিরূপ হয়ে গেছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন বাঘের ছবি অজন্তার চেয়েও ভাল। অবশ্য লরেন্স বিনিয়ন যখন বলেন, যে অজন্তার ছবিতে মহান সর্বশ্রিয়ী ঐক্যের অভাব, অথবা সবকিছু একসূত্রে ধরে রাখে এমন ছন্দ আর ভারসাম্যের অভাব, তখন মনে রাখতে হবে যে বিনিয়ন অত্যন্ত কঠোর মানদণ্ড নিয়ে বসেছেন, যে মানদণ্ডে পাশ করতে পারে এমন সৃষ্টি খুব কমই আছে। সেই হিসাবে, সাঁচি স্তূপ, বিশেষ করে তার তোরণভাস্কর্যগুলি বোধহয় বিনিয়ন-কথিত মহান সর্বাশ্রয়ী ঐক্য, ছন্দ ও ভারসাম্যের চূড়ান্ত নিদর্শন। এটা অবশ্য ঠিক যে অজন্তার চিত্র মুখ্যত আখ্যানধর্মী বলে এক হিসাবে অফুরন্ত। সুতরাং চিত্রের যে ধর্মে, একটা গণ্ডীর মধ্যে থেকেও সে চৌহদ্দিবদ্ধ সীমার বন্ধন থেকে ছন্দের মুক্তি, ব্যাপ্তি আর একান্ত চিত্রধর্মসুলভ কৈবল্য পাবে, সে ধরনের গুণ হয়ত অজন্তার ছবিতে গৌণ। এ সম্বন্ধে পরে আরও বলব। কিন্তু তবুও চিত্রশিল্পের ইতিহাসে অজন্তার এক বিশিষ্ট স্থান আছে। প্রথমত, এত প্রাচুর্যের মধ্যে এত সংযম খুব কম দেখা যায়। দ্বিতীয়ত, সামান্য কয়েকটি রঙের মধ্যে দিয়ে এত বৈচিত্র্যের প্রকাশ কম বিস্ময়কর নয়। তৃতীয়ত, সারা বিশ্বের একাত্মতা, সমস্ত সৃষ্টির প্রতি এত দরদ, মমতা, তীক্ষ্ণ নজর, ফর্মাল বা স্টাইলাইজ্‌ড্‌ রীতিতেও এত যথাযথ্যের প্রতি, খুঁটিনাটির প্রতি আগ্রহ খুবই কমই দেখা যায়। চতুর্থত, সামান্য কয়েকটি রঙের উপর নির্ভর করে, শুধু শেডিং বা গাঢ়-ফিকের উপর নির্ভর করে, এত ফোরশর্টনিং, অর্থাৎ সমুখ দিকটা খাটো করে দেওয়া, এত পারস্পেক্‌টিভের নৈপুণ্য, প্ল্যাস্টিকরূপে দক্ষতা, ভারতীয় চিত্রকলায় আর আছে কিনা সন্দেহ। সেই সঙ্গে উল্লেখ করতে হয় নক্‌শার, অলঙ্কারের, আল্‌পনার রেখা আর চাপ চাপ রঙের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনের, যার ফলে এসেছে সত্যকারের ডিজাইন, ডেকরেশন বা আল্‌পনা, এমন কি আধুনিক চিত্রকলার আরাধ্য ফিগর। পঞ্চমত, ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গায়, পারস্যে, ঈজিপ্টে, গ্রীসে, চীনে, মেসপটেমিয়ায় চিত্রকলার রীতিনীতি, অলঙ্কার ডিজাইন সম্বন্ধে কোথায় কি হয়েছে বা ঘটছে এ সম্বন্ধে অজন্তার চিত্রশিল্পী যে বিলক্ষণ খোঁজ খবর রাখতেন তার প্রমাণ ভুরিভুরি মেলে। সবার উপরে আছে জীবনের সম্বন্ধে একান্ত আগ্রহ, অসীম বিস্ময়, যার ফলে সংসারত্যাগী ভিক্ষু, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি জপ করতে করতেও, নির্জন, ভয়াল গুহায় সারা বিশ্বের সৃষ্টি, তার রূপ, রস, গন্ধ, সৌন্দর্য, বিস্ময়, তীব্রতা, উত্তেজনা, আবেগ ভিড় করে ঢুকিয়েছেন ; ধ্যান ভাঙ্গানোর জন্য কি ধ্যান পরীক্ষার জন্য জানি না।



সবশেষে একটি কথা বলা প্রয়োজন, যে কথা জোর করে অনেকেই বলেননি। সে হচ্ছে অজন্তার ছবিতে ভাস্কর্যের গুণ, যে গুণ থাকার দরুন অজন্তার ছবি দেখলেই ভারুত, সাঁচি, অমরাবতী, গান্ধারের কথা মনে পড়ে যায়, মাতিস ও মিউরাল পেন্টিং সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে সোভিয়েট লেখক আলেকজান্ডার রম যাকে বলেছেন মনুমেন্টালিটির গুণ, বা ছোট নক্‌শায় চৈত্যগৌরবের বা বলিষ্ঠ বিরাটত্বের সম্ভাবনা। অনেকে অজন্তার ছবির কথা আলোচনা করতে গিয়ে তাকে ভাবেন কার্ডবোর্ডে বা ক্যানভাসে আঁকা চ্যাপটা সমান ছবি, মনে রাখেন

না যে প্রতিটি ছবি গুহার এবড়ো-খেবড়ো, অসমান দেয়ালে আঁকা, যার উপর নীচ আছে, যা দূর থেকে দেখতে হয়, যে ছবি ইচ্ছামত উপর নীচে নামিয়ে উঠিয়ে, দূরে কাছে সরিয়ে দেখা যায় না, যে ছবি আঁকতে গিয়ে শিল্পী ইচ্ছামত মাপের কাগজ বা চট পাননি। অর্থাৎ মন্দির বা গির্জার স্থাপত্যের সঙ্গে যে ভাস্কর্য যায়, অজন্তার ছবিতে বাধ্য হয়েই আবশ্যিকভাবে সে ভাস্কর্যের বাধানিষেধ, আইন-কানুন এসেছে এবং এসে ছবিকে চালিত করেছে। যে জায়গাটা উঁচু আছে সে জায়গাটা নামানো যাবে না, সেখানে সেই জায়গার মতই ছবি আঁকতে হবে, অর্থাৎ সেই স্থলে ভাস্কর্য মনে করে তার আইন অনুসারে ছবি সেই মাপমত আঁকতে হয়েছে। এমন কি যেখানে দেয়ালের গা এবড়ো-খেবড়ো, অমসৃণ, বন্ধুর আছে, শিল্পীকে ছবি আঁকতে হয়েছে ঠিক সেই জমিটি স্বীকার করে, অর্থাৎ অসমান জমিতে স্থির আলো পড়লে ছবি কি রকম দেখাবে তা ঠিক মত ভেবে অনুমান করে নিয়ে। তার ফলে অনেক ছবিই এমনভাবে আঁকা যে যেদিক থেকেই দেখা যায় মনে হয় যেন ছবির লোকটি বা প্রাণীটি দর্শকের দিকে ফিরে ফিরে তাকিয়ে আছে। আরেকটি কথা আমরা প্রায়ই ভুলে যাই। তা হচ্ছে গুহার বাইরে, বারান্দার ভিতরে, থামের চারধারে যেখানে ভাস্কর্য হতে পারে, অর্থাৎ যেখানে খোদাই করা মূর্তির উপরে আলো পড়ে আলোছায়ার খেলা চলতে পারে, সেখানে ভাস্কর্যই আছে, এবং সেখানে ভাস্কর্যকে ফুটিয়ে তোলার জন্য সংযত, বিনয়ী, শিল্পী শ্রদ্ধাভরে এমন সরল আল্পনা দিয়েছেন যাতে ভাস্কর্যের মহিমা ম্লান না হয়। ভাস্কর্যের সার্থকতা সম্বন্ধে এমন শ্রদ্ধা বিনয় ও জ্ঞান অন্যত্র দুর্লভ। যেখানে আলোছায়ার খেলা নেই, যেখানে স্থির আলো পড়বে, সে সূর্যেরই হোক বা বাতিরই হোক, সেখানেই শুধু অজন্তার শিল্পী ছবি এঁকেছেন, এবং আরও বিস্ময়ের কথা যে ভাস্কর্যের গুণ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। যেমন অনেক ছবি, অনেক মুখ, অনেক শরীরই আছে যা সমুখ থেকে দেখলে একরকম ভাব ফুটে ওঠে, এধার-ওধার থেকে ভিন্ন ভিন্ন রকম দেখায়। প্যানেলগুলি এমনভাবে করা যা স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের আইন মানে। ব্র্যাকেট বা স্প্যান্ড্রিলে এমনভাবে ছবি আঁকা যা খোদাই বলেও মনে হতে পারে। স্থাপত্যের সঙ্গে যে-ভাস্কর্য সার্থক তার একটি গুণ বা সার্থকতা হচ্ছে যে সমগ্র ইমারত ঘুরতে ঘুরতে যেখানটায় মন ক্লান্ত হয়ে আসে, সুন্দর বা চমৎকার কিছু আশা করে না, যে জায়গাটা আপাতদৃষ্টিতে নিতান্তই আবশ্যক অথচ আবেগ উত্তেজনাহীন আশঙ্কা করা স্বাভাবিক, ঠিক সেইখানেই দর্শকের ক্লান্তি অপনোদন করে, তার স্তিমিত উৎসাহ, আবেগ, উত্তেজনা জাগিয়ে দিতে হঠাৎ নিতান্ত আচমকা আসে কোন আশ্চর্য ভাস্কর্যের টুকরো যা দেখে ক্লান্তি যায় ছুটে ; ফলে পুনরায় অপ্রত্যাশিতের আগ্রহে দর্শক ঘুরতে আরম্ভ করে। অজন্তার চিত্রশিল্পী সার্থক ভাস্কর্যের ঠিক এই জিনিসটি বুঝেছিলেন, যেমন বুঝেছিলেন নোতরদাম বা রীমস্, বা শার্তরের স্থপতি, যিনি অস্থানে কুস্থানে বসিয়ে দিয়েছিলেন অতি আশ্চর্য আশ্চর্য গার্গয়ল, উদ্ভট বিদ্‌ঘুটে জীবজন্তু বা অতি সাধারণ দৃশ্য। ঠিক এই অপ্রত্যাশিতের প্রসাদ এনেছেন অজন্তার শিল্পী নানা আজগুবি মজার উদ্ভট ছবি এঁকে, অথবা খুব অন্ধকার কোনও কোণে অসম্ভব রকমের উত্তেজনা, চাঞ্চল্য বা আবেগের কোন দৃশ্য এঁকে। এককথায় বিস্ময় জিনিসটাকে খুব বিস্ময়করভাবে অজন্তার চিত্রশিল্পী কাজে লাগিয়েছেন।

বাঘ

যে কোন জাতি বা সভ্যতার ভাষা ও সাহিত্য যেমন দু'-এক শ' বছরের জিনিস নয়, বহু যুগ ধরে আস্তে আস্তে আস্তে বেড়ে ওঠে, চিত্রশিল্পের বেলায় তেমনি কোন চিত্রনীতির উৎকর্ষ এক আধজনের চেষ্টায় বা কাজে হয় না, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অনেক কষ্ট, অনেকের আরাধনার ফলে হয়। কারণ চিত্রও ত মানুষের ভাষা, যেমন ভাষা কথা, সাহিত্য, গান, এমন কি স্থাপত্য, ভাস্কর্য ! আমরা যদি এই সামান্য কথাটি মনে রাখি তাহলে এটুকু বুঝতে দেরি হবে না যে অজন্তার ছবি একদিকে যেমন বহুযুগের সাধনা ও ক্রমবিকাশের ফল, তেমনি অন্যদিকে অজন্তার চিত্ররীতি একদিনে লুপ্ত হয়ে যাওয়াও অসম্ভব। তাই আমরা অজন্তা রীতির নমুনা পরবর্তী যুগে অনেক শতাব্দী ধরে এদিকে ওদিকে পাই। যেমন অজন্তার ১৬ আর ১৭নং গুহায় যখন ছবি আঁকা চলছিল প্রায় সেই সময়ে সিংহল দ্বীপের সিগিরিয়া (শ্রীগিরি ?) গুহায় সম্রাট প্রথম কাশ্যপের রাজত্বকালে (৪৭৯ থেকে ৪৯৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত) এমন কতকগুলি ফ্রেস্কো আঁকা হয় যার সঙ্গে অজন্তার ১৬ আর ১৭নং গুহার ছবির আশ্চর্য মিল

আছে। সিগিরিয়ার মাত্র দুটি গুহায় ছবি পাওয়া গেছে। সবসুদ্ধ কুড়িটি ছবি এইখানে পাওয়া গেছে, আর কিছু ছবি নেই, সবগুলিই প্রমাণ মাপের স্ত্রীলোকের তিন-চতুর্থাংশ মাপে আঁকা, কখনও একক, কখনও দু'জন মহিলা একসঙ্গে। বোধহয় সকলেই রাজা কাশ্যপের রানী। অত্যন্ত সুন্দর দাঁড়ানো ভঙ্গিতে আঁকা, তুলির কাজে স্পষ্ট বোঝা যায় যে শিল্পী আঁকার রীতিনীতি আর মডলিং-এ কত দক্ষ ছিলেন।



সিগিরিয়ার কথা সামান্য হল। এখন বাঘের কথা বলি। বাঘের গুহাগুলিতে এমন একটিও শিলালিপি বা নিদর্শন নেই যা দেখে বলা যায় ঠিক কোন সময়ে গুহাগুলি খোদাই হয়, ছবিই বা আঁকা হয়। সুতরাং ইতিহাস সম্বন্ধেও সঠিক কিছু জানা নেই। কার রাজত্বে খোদাই, শিল্পীরা কোথা থেকে এসেছিল, কিছু বলা যায় না। গুজরাট থেকে মালোয়া পর্যন্ত একটি খুব প্রাচীন রাস্তা ছিল ; গোয়ালিয়র রাজ্যে সেই রাস্তার উপর বাঘ বলে একটি ছোট গ্রামে গুহাগুলি আছে। খুবই দুঃখের কথা যে অজন্তার মতই, বাঘে খুব কম ছবিই এখন অক্ষত অবস্থায় আছে। পাথর ক্ষয়ে ক্ষয়ে গুঁড়িয়ে পড়ে, পথিকের উনুন ধরানো ধোঁয়ায়, আর যুগ যুগ ধরে নানা রকম অত্যাচারে এখনও যেটুকু আছে, সেটুকু আমাদের বহু ভাগ্য বলতে হবে। প্রথম যখন খোদাই হয় তখন নিশ্চয় অনেকগুলি গুহা ছিল। তার মধ্যে অনেকগুলি এখন ছাদ ভেঙ্গে পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। বেলেপাথরের বড় একটি পাহাড়ে গুহাগুলি খোদাই হয়, এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত মাপলে বোধহয় ৭০০ গজ হবে। স্থানীয় লোকে এই গুহাগুলিকে বলে পঞ্চ পাণ্ডু, অথবা পাণ্ডব গুফা, তার কারণ ২নং গুহায় কতকগুলি বৌদ্ধ মূর্তি আছে যাদের দেখে পঞ্চপাণ্ডব বলে ভুল হতেও পারে। গুহাগুলি দেখেই বুঝতে দেরি হয় না যে সেগুলি মহাযান বৌদ্ধদের কীর্তি। সবগুলিই বিহার ও বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মঠ, বোধ হয় ৪০০ থেকে ৭০০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে তৈরি। পিছন দিকে একটি ছোট চৈত্যও আছে তার পাশে ছোট ছোট ঘর আছে। ১নং গুহাটিই বোধহয় সবথেকে প্রাচীন, এটিতে স্তূপ বা



দাগাবা আছে। সবসুদ্ধ ন'টি গুহা উদ্ধার হয়েছে তার মধ্যে ৮ আর ৯নং এখনও প্রায় চাপাই আছে। ২নং গুহাকে গোঁসাই গুহা বলে, এখানেও এককালে ছবি ছিল, এখন সব নষ্ট হয়ে গেছে, কেবল বুদ্ধের একটি মূর্তি আর চারটি দ্বারপালের মূর্তি আছে। ৩নং গুহাকে বলে হাতিখানা। এটিতে ছবি আছে ; মাঝখানে বুদ্ধ, তাঁকে চারিদিকে ঘিরে নতজানু হয়ে বসে শিষ্যের দল। (তারা ঠিক কোন দেশের বা কোন জাতের ঠিক বোঝা যায় না) এরপর দু'শ' গজ ধরে পাহাড়ের গা। তারপরে ৪নং গুহা। ৪ আর ৫নং গুহা একসঙ্গে, তার মধ্যে ৪নং গুহাই ছবির জন্য সবচেয়ে বিখ্যাত, রঙমহল বলে পরিচিত। আকারেও চার নম্বর গুহাটি সবথেকে বড়, দৈর্ঘ্যে ৯৪ ফিট, প্রস্থেও তাই। ৫নং গুহাটি বোধহয় ধর্মোপদেশ গৃহ হিসাবে ব্যবহার হত, ৬ নম্বরে বোধহয় ভিক্ষুরা থাকতেন। ৭নং গুহাটি এখন পড়ে গেছে। ১৯১০ সালেও দর্শকরা এখানে দেয়ালে আঁকা ছবি দেখেছেন, ৮ আর ৯নং গুহার কথা ত আগেই বলেছি।

৪নং এবং অন্য দুটি গুহায় যা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাতে এটুকু বোঝা যায় যে এখানেও বেশ কয়েক শ' বছর ধরে ছবি আঁকা চলেছিল। ৪নং গুহার দেয়াল, ছাদ আর থামগুলি সমস্তই যে এককালে প্লাস্টার করা বা চুনবালি জলের লেপে মসৃণ করা কাজ (ইংরেজিতে স্টাকো বলে) আর উৎকৃষ্ট, অসীম বৈচিত্র্যপূর্ণ ছবিতে মোড়া ছিল, তা

এখনও দেখলে বোঝা যায়। এ কাজের শুধু অজন্তার সঙ্গেই তুলনা চলে। যেমন নক্শার বৈচিত্র্য, তুলির বলিষ্ঠ নৈপুণ্য, আল্পনার দক্ষতা, তেমনি সব রকম প্রাণের বিপুল বৈভব আর উল্লাস, যার মধ্যে শীর্ণ সন্ন্যাসীর রুক্ষতার লেশ মাত্র নেই। চিত্রের বিষয়েও বৌদ্ধ ধর্মের গোঁড়ামি নেই। যদিও বৌদ্ধ বলে চেনা যায়, তবুও নিতান্ত আমাদের দৈনন্দিন জগতের। যথা এক দুটি ছবিতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে 'হল্লীসক' আঁকা হয়েছে। হল্লীসক হচ্ছে একরকম বৌদ্ধ গীতধর্মী নাটক, কতকটা অপেরা বা যাত্রা বা রবীন্দ্রনাথের গীতধর্মী নাটকের মত। নাটকগুলিতে সাধারণত মেয়েরাই অধিকাংশ চরিত্র করতেন, কেবল অধিকারীর মত একজন পুরুষ নেতৃত্ব করতেন। শাস্ত্রমতে মহিলাদের সংখ্যা হবে সাত, আট অথবা দশ। কিন্তু বাঘে তাদের সংখ্যা এক জায়গায় ছয়, আরেক জায়গায় সাত। সবাই অত্যন্ত পরিপাটি করে সজ্জিত, গান গাইছে, আর পরম উল্লাসে কেউ ঢোল, কেউ ঢাক, কেউ খঞ্জনি, কেউ অন্য বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছে। এরকম গীতিমুখর, আনন্দে ভরপুর, উল্লাসময় ছবি দেখে সন্দেহ হয় এগুলি কি ধরনের বৌদ্ধগুহা ছিল যাতে এত হরদম গান বাজনা, মাতামাতি লেগে থাকত! অবশ্য মথুরার ভাস্কর্য বা ঔরঙ্গাবাদ গুহার কথা মনে রাখলে অত অবাক লাগে না, তবুও এটা ঠিক যে শখ মিটিয়ে আমোদ আহ্লাদের ছবি দেখলে বোঝা যায় যে পরের যুগের বৌদ্ধধর্মীদের লৌকিক জীবন মন্দ ছিল না।

আগেই বলেছি বাঘে এমন কোন লিপি নেই যা দেখে তারিখ নির্ণয় করা যায়। তবে আঁকার রীতি আর সাজ সজ্জার ফ্যাশন,—যথা পুরুষদের কেশসজ্জা, অথবা স্বচ্ছ, আঁটসাঁট পোশাক—দেখে এটা বলা যায় যে বাঘের ছবির সঙ্গে গুপ্তযুগের শেষদিকের ভাস্কর্যের বেশ মিল আছে, এবং বাঘের কাজ মধ্যযুগের আগের। অন্যপক্ষে এটাই ঠিক যে অজন্তার শেষ যুগের কাজের চেয়ে তা প্রাচীন নয়। বোধহয় বাঘের চিত্রকে নিরাপদে খ্রীস্টীয় ছয় শতকের মাঝামাঝি থেকে সাত শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ফেলা যায়। ছবিগুলিতে অনেক নক্শাই আছে তাতে কালো আর সাদা রঙের সঙ্গে মেটে সিঁদুর লালের (ইন্ডিয়ান রেড) রেখা আছে। আবার কিছু কাজ আছে যাতে রঙ 'অত্যন্ত জ্বল জ্বল' করছে, নীল, লাল আর হলদের পরস্পর বিরোধ ঘটানো হয়েছে। দুটি রীতি বোধহয় দুটি ভিন্ন যুগের। বাঘ গুহা সম্বন্ধে উনিশ শতকে প্রথম উল্লেখ আমরা পাই 'ট্রানজ্যাক্শন্স্ অভ দা লিটারারি সোসাইটি অভ্ বম্বে'র ২য় খণ্ডে, ১৮১৮ সালে। তারপরে জার্নাল অভ্ দা রয়াল সোসাইটির ৫ম খণ্ডে ডঃ ই ইম্পের একটি বড় লেখা বেরোয়। তারপর লেখেন ফার্গুসন্। কিন্তু বাঘ নিয়ে সবচেয়ে বেশি খাটেন কর্ণেল সি ই লুয়ার্ড।



১৯১০ সালে ইন্ডিয়ান অ্যান্টিকোয়ারি পত্রিকায় তাঁর এক বিশদ লেখা বেরোয়। বার্লিংটন ম্যাগাজিনের ১৯২৩ সালের অক্টোবর সংখ্যায় অসিতকুমার হালদার একটি প্রবন্ধ লেখেন। তারপর গোয়ালিয়রের মহারাজা ও কর্ণেল লুয়ার্ডের চেষ্টায় অনেক বিখ্যাত শিল্পীর সাহায্যে বাঘের ফ্রেস্কোর নকল হয়। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার, সুরেন্দ্রনাথ কর, এ. বি. ভোঁসলে, বি.এ. আপ্তে, এম. এস. ভান্ড ও জি.বি. জগতাপ। মূল নকলগুলি গোয়ালিয়র মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। শান্তিনিকেতনের কলাভবনে নন্দলাল বসু-কৃত দুটি বড় প্যানেলের নকল আছে। ১৯২৭ সালে ইন্ডিয়া সোসাইটির অনুগ্রহে স্যর জন মার্শাল প্রভৃতির সম্পাদনায় 'দা বাঘ কেভ্স্' বইটি লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়।



অন্যান্য গুহা

খুব সংক্ষেপে বাঘের কথা বললাম। অজন্তা, ইলোরা, বাঘ ছাড়াও বহু গুহা আছে যাতে অল্পবিস্তর গুহাচিত্র আছে। সবগুলির কথা বলা সম্ভব নয়, প্রয়োজনও নেই। বৌদ্ধ গুহাদের মধ্যে বম্বের কাছে কাহ্নেরি গুহাগুলির কথা আগে উল্লেখ করেছি। এখানে সবসুদ্ধ ১০৯টি গুহা আছে, তার মধ্যে এক আধটিতে এখনও ছবির চিহ্ন পাওয়া যায়, যেমন ১৪নং গুহায়। নাসিকের কাছে হীনযান বৌদ্ধদের পাণ্ডুলেনা বলে তেইশটি গুহার কথাও আগে উল্লেখ করেছি এখানেও কিছু ছবি আর রঙের চিহ্ন আছে। অজন্তা বৌদ্ধ গুহা। ইলোরার ১২টি গুহা বৌদ্ধ, এখানেও ছবির কিছু কিছু চিহ্ন এখনও বর্তমান। ঔরাঙ্গাবাদের ৯টি বৌদ্ধ গুহার মধ্যে ৬নং গুহায় চিত্রের চিহ্ন বেশ আছে। তারপর নাম করতে হয় বাঘের। জুনাগড়ের বৌদ্ধ গুহাগুলি খুবই প্রাচীন, সম্রাট অশোকের সময়ের (খ্রীস্টপূর্ব ২৭২ থেকে ২৩১)। কিন্তু এখানে রঙীন ছবির চিহ্ন বোধহয় একেবারেই নেই। ভুবনেশ্বরের কাছে বৌদ্ধদের উদয়গিরি গুহাগুলিতে ছবির চিহ্ন নেই। বেজওয়াদায় কয়েকটি বৌদ্ধ গুহা আছে, এখানে ৬৪৫ খ্রীস্টাব্দে হিউয়েন সাঙ এসেছিলেন, কিন্তু এখানেও এখন ছবি নেই। বম্বের মালভূলির কাছে বিখ্যাত কার্লি গুহায় কোন ছবির চিহ্ন আজ নেই, যদিও গুহার দেয়ালে প্লাস্টার আছে, তাতে মনে হয় হয়ত এককালে ছবি ছিল। ভাজা আর বেদসার বৌদ্ধ গুহাগুলি ভাজা, বেদসা বলে দুটি কাছাকাছি গ্রামে কোনটাতেই আঁকা ছবি নেই।

জৈন গুহার মধ্যে ইলোরাতে খুব বেশি ছবি নেই, ভুবনেশ্বরের কাছে খণ্ডগিরিতেও নেই। ওসমানাবাদ বলে একটি জায়গায় কয়েকটি জৈন গুহা আছে, সেগুলিতে কিংবা গোয়ালিয়রে পাথর কাটা মন্দিরেও আঁকা ছবি নেই। একমাত্র গুহাচিত্র আছে বাদামীতে। বাদামী অথবা বাতাপীপুর চালুক্য বংশের প্রথম পুলকেশীনের সময়ে (৫৫০ থেকে ৫৬৬ খ্রীস্টাব্দ) রাজধানী ছিল। এখানে ৪টি গুহা আছে, তার মধ্যে ৩টি হিন্দু বা ব্রাহ্মণ, একটি জৈন। জৈন গুহাটি সবচেয়ে আধুনিক। কিন্তু বাদামীর যে গুহায় ছবি আছে সেটি ব্রাহ্মণদের গুহা। এখানকার ছবি খুব সুন্দর, তাদের সবুজ রঙ উল্লেখযোগ্য।

আরেকটি জায়গার কথা উল্লেখ করে ছোট তালিকাটি শেষ করব। গুহাদুটি বছর পঞ্চাশেক আগে বেল্ বলে এক ভদ্রলোক আবিষ্কার করেন। এগুলি মধ্যপ্রদেশের উত্তরদিকে কুড়া উলপোতা আর আর দিম্বুল গল থেকে দক্ষিণে পুল্লিগোদা গোলকোণ্ডার মধ্যে তামান কাদুয়া বলে একটি গ্রামে। এদের মধ্যে একটিতে আছে পাঁচজন পুরুষের রঙীন ছবি, প্রত্যেকের পিছনে জ্যোতি, মাথায় তে-কোনা টুপির মত, বসে যেন ধ্যান স্তব করছেন। বেল্ লিখেছেন যে ছবির রঙ বেশ ভাল আছে। আর কিছু বিশেষ জানা নেই। যতদূর মনে হয় খ্রীস্টীয় সাত শতক বা তারও পরের কাজ।

পুরাকালের চিত্ররীতি

আগেই বলেছি যে অজন্তা বা বাঘের ছবির নিশ্চয় খুব প্রাচীন ইতিহাস আছে, ভুঁইফোড়ের মত তা হঠাৎ একদিন সকালে গজিয়ে উঠতে পারে না, এবং তারপর হঠাৎ একদিন মিলিয়েও যায়নি। সুতরাং পুরাকালের ছবির ইতিহাস সম্বন্ধে সন্ধান নিতে হবে। পুরাণের যুগেও ছবি যে খুব আদরের জিনিস ছিল তা রামায়ণ, মহাভারত পড়লেই বোঝা যায়। রামায়ণে চিত্রশালার কথা আমরা পাই, তারপরে বৌদ্ধ পালি পুঁথিতে আমরা চিত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে বিলক্ষণ আলোচনা পাই। উত্তর ভারতে মগধ, কোশলে রাজাদের পুরীতে কত সুন্দর সুন্দর কারুকার্যখচিত, বিচিত্র প্রমোদশালা ছিল তার কিছু উল্লেখ এইসব পুঁথিতে আছে। বিচিত্র ভাস্কর্য, অভিনব আল্পনার কথাও আমরা পড়ি। খ্রীস্টপূর্ব তিন বা চার শতকে লেখা বিনয় পিটকে চিত্রঘরের (চিত্তগড়) উল্লেখ আগেই করেছি। পুঁথি পড়ে যতদূর মনে হয় এগুলি বোধহয় খানিকটা আধুনিক চিত্রশালা বা আর্ট গ্যালারির মত ছিল। প্রথমে নিশ্চয় ছিল কাঠে বা পাথরে খোদাই করা মূর্তি, তারপর দেয়ালের গায়ে আঁকা ছবি, সেগুলি ক্রমশ পরে ভাস্কর্যে পরিণত হয়ে আসে ইলোরায়, এলিফান্টায়, পরে সঞ্চারিত হয় শ্যামরাজ্যের অ্যাঙ্কর ভাটে বা জাভার বোরোবুদুরে ; ভারতীয়

স্থাপত্যে, মন্দিরে। খ্রীস্টীয় পাঁচ থেকে আট শতক পর্যন্ত কালিদাস, ভাস প্রভৃতি নাট্যকার, লেখকদের লেখায় আলেখ্য, প্রতিকৃতি, চিত্রশালার উল্লেখ ঘনঘনই পাই। প্রথমে মৌর্য, তারপর গুপ্তবংশের মাটির হাঁড়িকুড়ি, পুতুল ইত্যাদি নিত্যব্যবহারের দ্রব্যে লৌকিক চিত্ররীতির নির্দশন আমরা বহু পাই, যা নিশ্চয় দুই-নদীর দেশ বালুচিস্থান আর সিন্ধু থেকে হরপ্পা মহেঞ্জোদারোর মধ্য দিয়ে আমাদের দেশে সর্বত্র ছড়িয়ে গিয়েছিল, এবং এখনও ছড়িয়ে আছে। এইসব যুগের ছবি এখন আমরা না পেলেও ছবি যে ছিল তার ভুরি ভুরি প্রমাণ পাই। সিংহলের মহাবংশে (বোধহয় খ্রীস্টীয় পাঁচ শতকে লেখা) আমরা খ্রীস্টপূর্ব ১৫০ সালে রাজা দত্তগামিনীর তৈরি রুয়নভেলি অস্থিগৃহের দেয়ালে আঁকা ছবির কথা পড়ি। শুধু যে আমাদের দেশে লেখা পুঁথিতে আমরা ছবির ঐতিহ্যের কথা পড়ি তা নয়। খ্রীস্টীয় পাঁচ, ছয়, সাত শতকে যে সব তীর্থযাত্রী চীন দেশ থেকে আমাদের দেশে আসেন, তাঁদের লেখাতেও পড়ি। উপরন্তু চিত্রনীতি ও রীতি ব্যাপারে ভারত আর চীনের মধ্যে বহুকাল থেকেই বিশেষ যোগাযোগ ছিল তার বহু প্রমাণ মেলে। যেমন খ্রীস্টীয় পাঁচ-ছয় শতকে সিয়েহো বলে একজন চীনে লেখক চিত্রনীতি সম্বন্ধে এমন সব কথা লেখেন যা নাকি আমাদের দেশের ষড়ঙ্গের সঙ্গে বেশ মেলে। স্পষ্টই বোঝা যায় আমাদের দেশের নন্দনতত্ত্ব লেখকরা যখন ষড়ঙ্গের কথা বিশদভাবে লিখছিলেন তখন চীনেও এই ষড়ঙ্গ নিয়েই আলোচনা চলছিল, কারণ চীনের চিত্রনীতিরও, মোটামুটি ভাবে বলা যায়, ষড়ঙ্গ নীতির উপরই ভিত্তি। চীনেরও ছ'টি নীতি, আমাদেরও ছ'টি, এবং তাদের মধ্যে মোটামুটি খুব মিল। অনেকের মতে চীন ভারতের কাছে ষড়ঙ্গ ধার করে, আবার অনেকের মতে ভারতই আসলে চীনের কাছে ধার করে। তবে যাতে এসব লেখা আছে সেরকম চীনে পুঁথির বয়স কম, ভারতীয় পুঁথির বয়স বেশি। এ বিষয়ে অবনীন্দ্রনাথ ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গে আলোচনা করেছেন।

অজন্তা, বাঘ প্রায় গুপ্তযুগের সমসাময়িক। গুপ্তযুগের সুশাসন আর ঐশ্বর্য চিত্রকলার খুব সহায়ক হয়। এই কয় শতাব্দী ধরে চিত্রকলার খুব বৈভব গেছে ; যা হয়েছিল, তার তুলনায় অজন্তা বা বাঘে যেটুকু আমরা এখন পাই তা নিশ্চয় সমুদ্রে গোষ্পদের মত। ফা-হিয়েন খ্রীস্টীয় ৪০০ সাল নাগাদ ভারতে পর্যটন করেন, হিউয়েন-সাঙ ঘোরেন খ্রীস্টীয় ৬২৯ থেকে ৬৪৫ পর্যন্ত। দু'জনেই ভারতের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত ঘোরেন এবং একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত দেয়ালে আঁকা চিত্র সম্ভারের কথা বার বার উল্লেখ করেন। ফা-হিয়েন কপিলাবস্তু নগরের একটি ছবির কথা উল্লেখ করেন, যাতে দেখানো আছে একটি সাদা হাতির পিঠে চড়ে ভগবান বুদ্ধ মর্তে জন্ম নেবার জন্য তাঁর মায়ের গর্ভে ঢুকছেন। ফ্রা-আঞ্জেলিকোর অনান্সিয়েশনের কথা মনে পড়ে যায়, কারণ যীশুও মেরীর গর্ভে ঠিক সাধারণ সৃষ্টির রীতি অনুসারে জন্মাননি। হিউয়েন-সাঙ অজন্তা আর অন্যান্য জায়গার উল্লেখ ত করেনই, উপরন্তু ভারতের উত্তর-পশ্চিম কোণে এক মঠের উল্লেখ করেন, যার নাকি জানালা, দরজা, দেয়ালে কাঠের পাটা, সবই অতি সুন্দরভাবে চিত্রিত ছিল। পরবর্তীকালে অবশ্য এসব অধিকাংশই নষ্ট হয়, কিছুটা কালের প্রভাবে, সাধারণ ক্ষয়ে, ধুলো, বালি, ঝড়ে জলে, কিছুটা চিত্রবিরোধী মুসলমান ধর্মের ধ্বংস কাজে। যে সব গুহা নিতান্তই অগম্য বা মাটি চাপা পড়ে গেল সেইগুলিই কিছু কিছু এখনও পর্যন্ত টিকে আছে, যেমন বাঘ, অজন্তা। তাছাড়া বোধহয় চীন নেপাল তিব্বতের প্রভাবের দরুনই হবে, ভারতে খ্রীস্ট যুগের প্রথম দিকে কাঠের বাড়িরও চল হয় (অবশ্য মহাভারতে জতুগৃহের উল্লেখ আছে)। আগেও অবশ্য চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সহস্রস্তম্ভ সভাগৃহ কাঠের তৈরি হয়েছিল। এইসব কাঠের বাড়ির দেয়ালেও যে ছবি আঁকা হত তার প্রমাণ অজন্তার কোন কোন ছবিতে আমরা পাই, আধুনিক প্রমাণ আছে দার্জিলিং, নেপাল, সিকিম, তিব্বতের কাঠের মন্দিরের ছাদে বা দেয়ালে।

খ্রীস্টীয় সতেরো শতকে তারনাথ বৌদ্ধধর্মের একটি ইতিহাস লেখেন। তাতে তিনি ভারতের বৌদ্ধধর্মের চিত্র রীতিনীতি সম্বন্ধে কিছুটা লিখে যান যা নাকি খুব বোধগম্য বা স্পষ্ট না হলেও, বিশেষ মূল্যবান। তিনি বলেন, প্রাচীন বৌদ্ধশিল্পের তিনটি যুগ ছিল, প্রথম দেব যুগ, দ্বিতীয় যক্ষ যুগ, তৃতীয় নাগ যুগ।

দেবযুগে ছিল দেব রীতি। কয়েক শতাব্দী ধরে চলিত ছিল মগধে,—তথাগতের জন্মের পর—খ্রীস্টপূর্ব ছয় থেকে তিন শতক পর্যন্ত। তারনাথ বলেন, "তখনকার কালে নশ্বর মানুষ হয়েও এই সব মহান দিক্‌পাল শিল্পীদের ঐশী ক্ষমতা ছিল, যার বলে তাঁরা আশ্চর্য আশ্চর্য শিল্পসৃষ্টি করতেন।" যেমন বিনয় আগমে এবং অন্যান্য পুঁথিতে স্পষ্ট বলা আছে যে তাঁদের আঁকা প্রাচীন চিত্র এমন আশ্চর্য রকম স্বাভাবিক হত যে সেগুলিকে নিসর্গ বলে ভ্রম হত, গাছপালা, প্রাণী সবই জীবন্ত, আসল বলে লোকের ভুল হত। সংস্কৃত ও পালি সাহিত্যেও চিত্রকলার স্বাভাবিকত্ব সম্বন্ধে অনেক উল্লেখ আছে। ছবিগুলিও প্রায়ই দেয়ালে আঁকা হত। আগে ছিল দৈনন্দিন, সামাজিক

বা রাজদরবারের চিত্র আঁকার রীতি, ক্রমে ক্রমে তা বদলে এল বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক ছবি, কিন্তু পুরো ধর্মাত্মক ছবি কখনও হল না। তিব্বতের গিয়াংসি মঠের দেয়ালে একটি ছবি ছিল, তার সম্বন্ধে একটি গল্প আছে যার থেকে বোঝা যায় প্রাচীন চিত্রকলার রীতি কিরকম ছিল। ছবিটিতে দেখা যায় একজন শিল্পী ভগবান বুদ্ধকে সমুখে মডল্ বা আসল হিসাবে রেখে তাঁরই একটা ছবি আঁকছেন, সেই ছবিটি কোন রাজার কাছে উপঢৌকন হিসাবে যাবে। ছবিটি পেয়ে ভগবান তথাগতের করুণাঘন, ধ্যানমগ্ন, মুখ দেখে প্রতিবেশী রাজার মনে এত ভাবের পরিবর্তন হল, এত বৈরাগ্য এল, যে তিনি সেই দিনই সপারিষদ বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হলেন। এই গল্প থেকেই বোঝা যায় যে ভারতের চিত্রকলার সর্বপ্রথম যুগে প্রতিকৃতি বা পোর্ট্রেট আঁকার দিকে কত ঝোঁক ছিল, যাতে আঁকা ছবি আসল বলে ভুল হত। অনিরুদ্ধের ছবি দেখে উষার ভাববিপর্যয়ের কথা আগেই বলেছি।

তারনাথের মতে এর পর এল যক্ষ যুগ। তারনাথ এই যুগকে সম্রাট অশোকের সমসাময়িক বলে বর্ণনা করেছেন, অর্থাৎ খ্রীস্টপূর্ব তিন শতক। যক্ষরা কে ছিল তা নিয়ে নানা গবেষণা সত্ত্বেও এটা সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয় যক্ষ বলতে তারনাথ এমন সুনিপুণ কৌশলী চিত্রশিল্পীদের কথা মনে করছেন যাঁদের ছবি দেখে মানুষের সাধ্য বলে মনে করতে সাহস হয় না, মনে হয় নিশ্চয় ঐশীশক্তিসম্পন্ন দেবতাজাতের লোকের কাজ। এঁরাই কি গ্রীক-ব্যাক্‌ট্রিয়ান গান্ধার দেশের থেকে এসে গান্ধার ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের সৃষ্টি করেন ?

যক্ষযুগের পর এল নাগ যুগ। বিখ্যাত দার্শনিক ও লেখক নাগার্জুন খ্রীস্টীয় ৩য় শতকের প্রথমদিকে জীবিত ছিলেন, তাঁর সময়ে চিত্র শিল্পে এই নাগরীতির চলন হয়, নাগ-শিল্পীরা এই রীতির প্রচলন করেন। এই হল তারনাথের কথা। অবশ্য সুদূর কাশ্মীর থেকে মাদ্রাজ পর্যন্ত এই নাগজাতির—যারা নাকি নাগ পূজা করত—এর কিছু কিছু চিহ্ন এখনও দেখা যায়। যেমন অমরাবতীর স্তূপে নাগপ্রভাব খুব স্পষ্ট। নাগরা নিশ্চয় শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও স্থপতি ছিলেন। তারনাথের লেখা পড়লে সন্দেহ থাকে না যে এই তিন রীতির মূল কথাই ছিল বাস্তবধর্মী, কারণ দেব, যক্ষ, নাগ শিল্পীদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করার পর তিনি বলছেন, "বহু বছর ধরে দেব, যক্ষ, নাগদের শিল্প তাদের বস্তুনিষ্ঠার জোরে দর্শকের চোখে ভ্রম ধরিয়েছে।"

তারনাথ বলেন, "যেখানে বৌদ্ধধর্ম গেছে, সেখানেই অতি নিপুণ ধর্মাশ্রয়ী শিল্পীর আবির্ভাব হয়েছে।" ঠিক যেমন আবির্ভাব হয়েছিল ইটালিতে রেনেসাঁস, বা আবার-জন্মানো যুগের প্রথম দিকে খ্রীস্টীয়ান শিল্পীদের, যথা চীমাবুয়ে, জত্তো, ফ্রা আঞ্জেলিকো, ফ্রা বার্তোলোমেও, ফ্রা ফিলিপ্পো লিপ্পি ইত্যাদির। ঠিক খ্রীস্টীয়ান মাঙ্ক-শিল্পীদের মত বৌদ্ধ শ্রমণ-শিল্পীরাও বৌদ্ধ চিত্রকলা দেশ বিদেশে নিয়ে গেলেন। চিত্রের মধ্য দিয়ে তাঁরা প্রচার করলেন ভগবান বুদ্ধের বাণী। যতদূর মনে হয় নেপাল তিব্বতের মঠের ধ্বজা বা পতাকা (ইংরেজিতে ব্যানার) যাকে তিব্বতী ভাষায় টাংকা বলে, অর্থাৎ বিচিত্র ছবি আঁকা ধ্বজা, তা ছিল ধর্ম প্রচারের পক্ষে বিশেষ সহায়ক। কারণ ধ্বজার ছবি সহজে বোঝা যায়, মুহূর্তে তা হয়ে দাঁড়ায় প্রতীক, তার জন্যে লোকে মরতে রাজি হয়, অক্ষর পরিচয়ের দরকার হয় না। কারণ ছবির ভাষা অক্ষরের ভাষার চেয়ে লোকে অনেক তাড়াতাড়ি পড়তে পারে, এবং হরফের দুস্তর বাধা সেখানে নেই। চীনের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত হল, এমন কি চীন সম্রাট মিংটির অনুরোধে একজন ভারতীয় শ্রমণ, নাম কাশ্যপমাদুংগ, খ্রীস্টীয় ৬৭ সালে নানা ধরনের শিল্পকলা, চিত্রকলার নিদর্শন নিয়ে সুদূর প্রাচ্যের দিকে রওনা হলেন। এরপর থেকে সাত শতক পর্যন্ত বরাবর রীতিমত দলে দলে শ্রমণ-শিল্পীরা ভারত আর চীনের মধ্যে যাতায়াত করেছেন, তার উল্লেখ ইতিহাসে পাই। এদের মধ্যে অনেকেই চীনে বসবাস করে ফ্রেস্কো শিল্পের প্রচার করেন। শুধু চীনে নয়, আরও পূর্বদেশে, জাপানেও, এই প্রচারের চিহ্ন পাওয়া যায়, যেমন সাত শতকের 'নারা' যুগে। আট শতকের প্রথম দিকে জাপানের হরিউজি মন্দিরের দেয়ালে যে সব বিখ্যাত ফ্রেস্কো আঁকা হয় তাতে, লরেন্স বিনিয়নের মতে, অজন্তার প্রভাব এত সুস্পষ্ট, যে সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। ফা-হিয়েন, হিউয়েন-সাঙ অবশ্য স্পষ্টই বলেছেন যে অনেক চীনে শিল্পী ভারতীয় চিত্রশিল্পগুরুর কাছে শিক্ষালাভ করতে আসতেন। এমন কি পনেরো শতকেও জাপানী 'তোষা' রীতিতে ভারতীয় প্রভাব সুস্পষ্ট।

তারনাথ বলেন, খ্রীস্টীয় ৩য় শতকের পর শিল্পের ভাঙ্গন ধরে, মনে হয় 'যেন মনুষ্য সমাজ থেকে শিল্পজ্ঞান লোপ পেল'। অবশ্য পরে একবার 'আবার-জন্মানো' যুগ আসে, এবং এই পরবর্তী যুগের বিভিন্ন রীতির কথা তারনাথ উল্লেখ করেছেন। পরের যুগেও তিনটি বিশিষ্ট ধারা এল, যথা মধ্যদেশী, পশ্চিম দেশী আর পূর্বদেশী। মানচিত্রে দেখলে মধ্যদেশীয় রীতির প্রধান কেন্দ্র হল আমাদের এখনকার উত্তরপ্রদেশ। এই মধ্যদেশীয় ধারার

প্রবর্তক হলেন এক বিখ্যাত ভাস্কর আর চিত্রশিল্পী, নাম বিম্বসার। রাজা বুদ্ধপক্ষের রাজত্বে (খ্রীস্টীয় পাঁচ কি ছয় শতকে হবে) বিম্বসার মগধে জন্মান। তারনাথ বলেন, এই ধারার চিত্রশিল্পীরা সংখ্যায় অনেক ছিলেন, এবং তাঁদের চিত্ররীতি খানিকটা পুরাকালের দেবরীতির মত ছিল। অর্থাৎ তাঁদের প্রায় হাজার বছর আগে যে চিত্ররীতির প্রচলন ছিল বিম্বসার আর তাঁর শিষ্যের দল সেই রীতি যেন আবার ফিরিয়ে আনলেন, অর্থাৎ ইওরোপের মত এই সময়ে একটি আবার-জন্মানো যুগ এল। পশ্চিম দেশের রীতির কেন্দ্র হল রাজপুতানা, এই রীতির শ্রেষ্ঠ প্রবর্তক ছিলেন শৃঙ্গধর, ইনি রাজা শিলার সময়ে মাড়োয়ারে জন্মান। শিলা খুব সম্ভবত উদয়পুরের শিলাদিত্য গুহিল, যিনি খ্রীস্টীয় সাত শতকে রাজত্ব করেন। (অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাজকাহিনীতে এঁর গল্প আছে)। তারনাথের মতে এই রীতির ছবি অনেকটা পুরাকালের যক্ষদের ছবির মত ছিল। পূর্বদেশের ধারার প্রধান কেন্দ্র ছিল বরেন্দ্রভূমে, ধর্মপাল, দেবপাল রাজাদের সময়ে। এঁরা খ্রীস্টীয় নয় শতকে নাম করেন, এবং এঁদের ধারা কতকটা নাগ ধারার মত। পূর্বদেশের সবচেয়ে বিখ্যাত শিল্পী ছিলেন দু'জন, পিতা ধীমান আর তাঁর ছেলে বীতপাল। তারনাথ বলেন এঁরা দু'জনেই ছিলেন সর্বজয়ী, যেমন চিত্রশিল্পে, তেমনি ভাস্কর্যে, তেমন ধাতু ঢালাইয়ে। তারনাথের বর্ণনা থেকে একটা কথা অনুমান করা অবান্তর হবে না, সেটা হচ্ছে চীনে চিত্ররীতির সঙ্গে ভারতীয় চিত্রনীতির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। পশ্চিম দেশের রীতির সঙ্গে চীনের সম্ভবত যোগাযোগ ছিল খোটান, মধ্য এশিয়া ও ঈরাণ তুরাণ বা পারস্যের মধ্য দিয়ে (পারস্য চিত্ররীতিতে চীনের প্রভাব পুরাকাল থেকেই খুব সুস্পষ্ট)। মধ্যদেশের রীতির সঙ্গে নিশ্চয় যোগাযোগ ছিল তিব্বতের মধ্যে দিয়ে। আর পূর্বদেশের রীতির সঙ্গে চীনের নিশ্চয় যোগাযোগ ছিল ব্রহ্মপুত্র নদের রেখা ধরে, তিব্বত, আসাম, মণিপুর নাগাদের দেশের মধ্যে দিয়ে।

পণ্ডিতপ্রবর সরসীকুমার সরস্বতী তাঁর পালযুগের চিত্রকলা (১৯৭৮) বইতে লিখেছেন তারনাথ তাঁর বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস রচনা শেষ করেন ১৬০৮ খ্রীস্টাব্দে। রচনার একটি অংশে তিনি পালযুগের চিত্রকলা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে লেখেন ধীমান আর বীতপাল দু'জনই ভাস্কর্যে, ধাতুমূর্তি গড়নে আর চিত্রকর্মে বিশেষ নিপুণ ছিলেন। বাবা ও ছেলে তখনকার শিল্পকলায় দুটি বিশেষ রীতির প্রবর্তন করেন। বীতপাল ভাস্কর্যে আর ধাতুমূর্তিতে দেশীয় রীতির প্রবর্তন করেন, পিতা ধীমান মধ্যদেশীয় রীতির। কিন্তু চিত্রকর্মে হয় ঠিক উল্টো ; ধীমান করেন পূর্বদেশীয় রীতি, বীতপাল করেন মধ্যদেশীয় রীতি। তারনাথ আরো বলেন নেপালী ভাস্কর্য ও চিত্রকর্ম পূর্বদেশীয় রীতি অনুসরণ করেছে ; অর্থাৎ নেপালী বৌদ্ধ পুঁথিপত্রে পূর্বদেশীয়, পালযুগের ছাপ সুস্পষ্ট। তারনাথ কিন্তু পূর্ব ও মধ্যদেশীয় রীতির আঙ্গিক ও গুণগত পার্থক্যের উল্লেখ করেননি। ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে মধ্যদেশের পূর্বসীমা ছিল প্রয়াগ বা বারাণসী। পূর্বদেশের পশ্চিমসীমা শুরু হয় ঐ দুই জনপদের পূব থেকে। অতএব নালন্দা, রাজগীর, বরেন্দ্রভূম পূর্বদেশে পড়ে। এই পূর্বদেশের একটি আলাদা সাংস্কৃতিক, সামাজিক সত্তা গড়ে ওঠে।

এছাড়াও অন্যান্য ধারা ছিল কাশ্মীরে, নেপালে, বর্মায়, দক্ষিণ ভারতে। কিন্তু তারনাথের মতে এসব ধারা ছিল গৌণ, খ্রীস্টীয় ছয় আর দশ শতকের মধ্যে এরা একে একে ওঠে, পড়ে ; আসল ছিল মধ্য, পশ্চিম, পূর্ব, যার পূর্বজ ছিল তাদেরও হাজার বছর আগে দেব, যক্ষ, আর নাগ ধারা।

আরেকবার তাহলে অজন্তা, বাঘের চিত্রনীতির কথা ঝালিয়ে নেওয়া যাক। নক্শা, দক্ষতা, সৌন্দর্য বোধ, রেখার সাবলীলতা, রঙের প্রাচুর্য, উল্লাস, অবাধ উন্মুক্ত কল্পনার কথা আগেই বলেছি। আবেগ আর ভাবে পরিপূর্ণ এমন ছবি দুর্লভ, প্রত্যেকটি ছবি যেন কথা কয়ে উঠছে।

অজন্তার শিল্পীদের মধ্যে অনেকেই যে চীনে পদ্ধতিতে নিতান্ত পারদর্শী ছিলেন সে বিষয়ে অজন্তার প্রতিটি গুহার ছবিতেই অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়। ইউনেস্কোর অ্যালবামটি সহজলভ্য, সুতরাং তার থেকে উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে। এখানে বক্তব্য এই যে অজন্তাচিত্রে প্ল্যাস্টিক ফর্মের যে পরাকাষ্ঠা দেখা যায়, রঙে, আলোয়, রেখায়, স্পেসে যে ঐশ্বর্য দেখা যায় তার উৎস দ্বিমুখী। প্রথম অবিসংবাদিত ভাবে ভারতীয়, যার প্রমাণ আছে অমরাবতী, ভারুত, সাঁচির ভাস্কর্যে। এইসব ভাস্কর্যের কম্পোজিশন ও পারস্পেক্টিভ খুবই সার্থকভাবে অজন্তাচিত্রে নিয়োজিত হয়েছে, এবং তার ফলে চীনের গুহাচিত্র টুনহুয়াঙের কম্পোজিশন অজন্তার পাশে অপরিণত ঠেকে। দ্বিতীয় উৎস হচ্ছে চীনে রীতিতে রঙের, আলোর, এমন কি রেখারও ব্যবহার। এমন কি লোকের মুখ, চোখ, ভঙ্গিতেও চীনে মুখ, চীনে ভুরু, চীনে ভঙ্গি ভুল করার জো নেই। ইউনেস্কো অ্যালবামের তিন, চার, পনেরো, আঠারো, একুশ নম্বরের প্লেট এ বিষয়ে সব সন্দেহের নিরাকরণ করে। কিন্তু এখানে আমরা দেহ বা মুখাবয়ব, বা মুখের ভুরু, রেখা নিয়ে ব্যাপৃত নই, আমাদের আলোচ্য অজন্তাচিত্রের প্ল্যাস্টিক ফর্ম অর্থাৎ তার রঙ,

রেখা, আলো এবং স্পেসের সমন্বয়। প্রথমেই সকলে স্বীকার করবেন যে ভারতবর্ষে এক গুহাচিত্র ছাড়া ছবিতে আলোর ব্যবহার দুর্লভ। দ্বিতীয়ত, ফার্গুসন থেকে পার্সি ব্রাউন, আনন্দ কুমারস্বামী এমন কি লরেন্স বিনিয়ন বা ব্যাজল্ গ্রে পর্যন্ত সকলে যে বলেন যে অজন্তাচিত্র মুখ্যত রেখায়িত রূপ, তার কীর্তি মূলত লিনিয়ার এফেক্ট ; ছবিতে বস্তুর ম্যাস ক্রমিকভাবে, অর্থাৎ ইংরেজিতে সিকোয়েন্সে যায়, এক ম্যাসের পিঠে আরেক ম্যাস চিত্রিত হয়ে ছবির জমক বাড়ায় না, তাঁদের এসব কোন কথাই ধোপে টেকে না। কারণ, অজন্তায় প্রতিটি গুহায় এসব যুক্তি খণ্ডনের ভূরি ভূরি প্রমাণ মেলে। অজন্তায় পারস্পেক্‌টিভ ও স্পেস কম্পোজিশনের অতি সার্থক বৈচিত্র্য ও গরিমা দেখা যায়।

প্রথমত পাওয়া যায় সরল কম্পোজিশন ; অর্থাৎ মধ্যবর্তী ফিগর, তার দু'পাশে প্রতিসাম্য রেখে আরও দুটি ফিগর বা গ্রুপ। তারপর পাওয়া যায় যোগসূত্র রচনা, ইংরেজিতে যাকে বলে কনেক্টিং-লিংক কম্পোজিশন। এই ধরনের কম্পোজিশন বাইজান্টাইন ও প্রাচীন খ্রীস্টীয়ান মজেইকে যথেষ্ট আছে, এমন কি চীমাবুয়ে এবং জত্তোতেও আছে, অর্থাৎ একই দেয়ালে দুই বা ততোধিক ভিন্ন ছবি ; প্রত্যেকটির কম্পোজিশন ভিন্ন ; যোগসূত্রস্বরূপ থাকে হয় একটি ফিগর বা গ্রুপ, নয় কোন স্তম্ভ বা স্থাপত্য, যেমন ঘরবাড়ির অংশ। এইভাবে ফিগরকে যোগসূত্র হিসাবে ব্যবহার করে শিল্পী এক আখ্যান থেকে অন্য আখ্যানে অবলীলাক্রমে চলে যান। স্থাপত্য উপাদানের যথোচিত ব্যবহারে, আবার, একই কম্পোজিশনের মধ্যে চোখের বিশ্রামের জন্য যতিপাত হয়। উপরন্তু অজন্তাশিল্পী একই দৃশ্যে একাধিক পারস্পেক্‌টিভ বিন্দু আনেন, একে ইংরেজিতে বলে মাল্টিপল্ ভিশন বা বহুমুখী দৃষ্টি। আধুনিক যুগে প্রথমে সেজান, তারপর ব্রাক, তারপর পিকাসো এর প্রবর্তন করেন। এর বলে একই বিন্দুতে দাঁড়িয়ে শরীর সামান্য ঘোরালে ভিন্ন ভিন্ন পারস্পেক্‌টিভ প্রতিভাত হয়। এর আরেকটি নাম প্রদক্ষিণ পরিপ্রেক্ষিত বা রোটেশন পারস্পেক্‌টিভ ; এর বিচিত্র ব্যবহার হয়েছে অসিরিয়ান ও ব্যাবিলোনিয়ান ভাস্কর্যে ও মজেইকে। এর ফলে ছবিতে অসম্ভব গতি আসে, দর্শক দৃশ্যে অংশগ্রহণ করে। শেষকালে বলা দরকার যে অজন্তাশিল্পী প্রাচ্য পারস্পেক্‌টিভ রীতি (যাতে দূরের বস্তুর সীমারেখা থেকে কর্ণরেখা বা ডায়াগোনালগুলি দর্শকের চোখে কেন্দ্রবিন্দু করে) ও পাশ্চাত্য পারস্পেক্‌টিভ রীতি (যাতে চোখ থেকে কর্ণরেখা বা ডায়াগোনালগুলি বেরিয়ে দিক্‌রেখায় এক কল্পিত বিলীয়মান বিন্দু বা ভ্যানিশিং পয়েন্টে গিয়ে মেশে), দুইই সমান তালে ব্যবহার করেছেন। ছবির সামান্য অংশে অসীম মিতব্যয়ে নানা চিত্রিত রঙের ও আলোর যে বুনন দেখা যায় তা শ্রেষ্ঠ ইওরোপীয় চিত্রেও দুর্লভ। দ্বিতীয়ত, ড্রয়িংই সেখানে রঙীনরূপে দেখা দেয় ; অজন্তাচিত্রে রঙ এবং রেখা আলাদা করা প্রায় অসম্ভব। উপরন্তু আরও বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে সমস্ত ফিগরটি রঙের মধ্য দিয়েই নির্মিত হয়, আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে আগে শরীরের সীমারেখা নিখুঁতভাবে এঁকে নিয়ে অর্থাৎ ড্রয়িং করে নিয়ে, তার ভিতরের জমি শিল্পী রঙে ভরিয়েছেন কিন্তু আসলে আধুনিক কালের রেণোয়ারের প্রতিকৃতির মত দেহটি রঙ দিয়ে নির্মিত, রেখা শুধু বন্ধনী বা বেষ্টনী হিসাবে ব্যবহার হয়েছে ; তাতে অবশ্য গুহার পাথরের অমসৃণ গা খুব সাহায্য করে, কিন্তু এইভাবে পাথরের গায়ের সাহায্য নেওয়াও যে শ্রেষ্ঠ শিল্পীমনের পরিচয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। রঙ, আলো, রেখা এবং স্পেসের এই অপূর্ব সংশ্লেষণের ফলে অজন্তাচিত্রে আসে বলিষ্ঠতা, গুরু ওজন, গভীরত্ব, জমক, দ্যুতি, আলো। ইউনেস্কো অ্যালবামের সাত বা ষোল নম্বর প্লেটের হরিণ বা হংসের নিছক হরিণত্ব বা হংসত্ব আনতে পারলে মহাশিল্পীও সার্থক বোধ করতেন। এগারো, বারো, কুড়ি, একুশ, তেইশ, চব্বিশ বা বত্রিশ নম্বর প্লেটের রঙ ও ফিগরের সঙ্গে শ্রেষ্ঠ শিল্পীর কীর্তির তুলনা অনায়াসে চলে। রঙের অপূর্ব বিস্ময়কর ব্যবহারের পরই উল্লেখ করতে হয় সীমারেখা বা কন্টুরের ব্যবহারের। যেমন এক নম্বর প্লেটে পাই স্পষ্ট আউটলাইন, তিন নম্বর প্লেটে দেহরেখা অস্পষ্ট, ছয় নম্বর প্লেটে মোটা রঙীন পটি, এগারো নম্বর প্লেটে রেখার দু'ধার থেকে রঙ উপচে পড়ে, ষোল নম্বর প্লেটে রেখা হারিয়ে, গলে যায়। বলা বাহুল্য স্পেস, রেখা, রঙ এবং আলোর এরকম অসমসাহসী বহুবিচিত্র সংশ্লেষণেই অজন্তাচিত্রের প্ল্যাস্টিক ফর্মে এতখানি ঐশ্বর্য আসে। বর্ণনাত্মক ছবি বলে অজন্তাচিত্রের ডিজাইনে অনেক সময়ে একটু অসন্তোষের কারণ ঘটে, কিন্তু সমগ্র দেয়াল হিসাবে বিচার করলে ডিজাইন সম্বন্ধেও খুঁত কাড়া অসাধ্য।

অজন্তার ছবির অন্যতম কৃতিত্ব হচ্ছে রেখার দক্ষতা, সাবলীলতা। এ বোধহয় সব প্রাচ্য ছবিরই বিশেষত্ব। প্রাচ্যের চিত্রকলার বিশেষত্বই হচ্ছে রেখা, যার কাছে রঙ গৌণ। এমন কি রেখার প্রাধান্য এত বেশি যে তার কাছে মড়লিং, শেডিং, পারস্পেক্‌টিভ, রঙ সবই গৌণ হয়ে গেছে, যদিও এসব সম্বন্ধে ভারতীয় শিল্পীর বিলক্ষণ জ্ঞান

ছিল। গ্রীক ভাজের (vase) ছবির রেখা অপূর্ব ; ডিউরর, হোলবাইন, লেঅনার্দো দা ভিঞ্চির রেখার তুলনা নেই, কিন্তু তবুও অজন্তার কাছে যেন হার মেনে যায়। প্রথম থেকেই ভারতীয় চিত্রকলায় রেখা প্রধান, রঙ বা রঙের গাঢ়-ফিকে, বা এক রঙের মধ্যে নিশ্চিন্তে আরেক রঙের মিল, যার থেকে ছবিতে রঙের টোন বা বর্ণালির বিশিষ্ট আমেজ বা সুর আসে তার দৃষ্টান্ত ভারতীয় চিত্রে খুব বেশি নেই। অজন্তা বা বাঘেই তবু কিছু আছে। এর কারণ অনেকে বার করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু জোর করে বলেননি। আমার মনে হয় এর এক প্রধান কারণ আমাদের গরম দেশের প্রখর সূর্যের আলো, যা এত প্রখর যে সে আলো সোজাসুজি পড়লে আলোছায়া বা রঙের খেলা খুব নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে, সে আলোর তলায় থাকে শুধু সীমারেখা, এক বস্তু থেকে আরেক বস্তু বিচ্ছিন্ন করা লাইনটুকু, আর মোটা মোটা রঙগুলি, যার মধ্যে অনেকগুলিই সূর্যের আলোর তেজে প্রায় স্বচ্ছ, তরল হয়ে আসে ; অথবা এত তীব্র হয়, যার মধ্যে রকমারি শেড বা পর্দা পাওয়া অসম্ভব। যে সব ছবি স্পষ্ট দিনের আলোয় দেখবার, সে সব ভারতীয় ছবিতে পারস্পেক্‌টিভ নামমাত্র, মডলিং প্রায় নেই, সবই প্রায় চ্যাপটা, ফ্ল্যাট, তাতে আছে শুধু সীমারেখা আর স্থানে স্থানে মোটা পর্দার রঙ যা এক মিহি পর্দার মধ্য দিয়ে আরেক মিহি পর্দায় যায় না। এর কারণ খুঁজতে হয় বিষুবরেখা অঞ্চলের প্রখর সূর্যের আলোয়, যে আলোর তীব্র তেজে শিল্পীর মিহি রঙের টোনের কাজ ব্যর্থ হতে বাধ্য, যার অত্যাচারে শুধু এক একটি আয়তন জুড়ে শুধু একটি রঙ নিজেরই রকমের গাঢ়-ফিকে পর্দা নিয়ে টিকে থাকতে পারে। ভারতীয় শিল্পী মডলিং যে বিচক্ষণ বুঝতেন, পারস্পেক্‌টিভ যে খুব ভাল বুঝতেন, আলোছায়ার গুণ যে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে শিক্ষা করেছিলেন তার অকাট্য প্রমাণ মেলে ভারতীয় ভাস্কর্যে, যার উপরে সূর্যের আলো পড়ে সর্বদা আলোছায়া, বিভিন্ন সূক্ষ্ম রঙের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে (যা বোধহয় ভারতীয় গুহাচিত্র নির্মাণে সবচেয়ে দেখা যায়)। কিন্তু দেশ সম্বন্ধে জ্ঞানের বলে চিত্রশিল্পী ছবি থেকে সূক্ষ্ম পারস্পেক্‌টিভ বাদ দেন, বাদ দিয়ে, যে রেখা প্রখর আলোয় গলবে না, হারিয়ে যাবে না, চোখে বিভ্রম ঘটাবে না, সেই রেখার আশ্রয় নেন। একটা খুব প্রণিধানযোগ্য ব্যাপারের কথা বলি। অজন্তার গুহার অভ্যন্তরে যেখানে ছবি দেখতে গেলে শুধু বাতি বা মশালের সাহায্যেই দেখতে হবে, সেখানেই শুধু অজন্তার চিত্রকর ভাস্কর্যের উচ্চাবচতা অর্থাৎ মডলিং বা পারস্পেক্‌টিভ অর্থাৎ দূর কাছের সম্বন্ধাভাস এনেছেন, ছবিতে স্থাপত্য আকারের বাহুল্য গুণ এনেছেন, রঙ গাঢ়-ফিকে করে। কিন্তু বাইরে যেখানে সূর্যের আলোয় ছবি দেখতে হবে, সেখানে মডলিং প্রায় একেবারেই নেই, পারস্পেক্‌টিভও নেই, আছে শুধু রঙীন আল্‌পনা আর নক্‌শা। এটা ভাববার কথা। ভারতবর্ষে সূর্যের আলোয় তেলরঙের ছবি চলা খুব শক্ত, কারণ তেলরঙ বড় চকচক করে, চোখকে দেখতে দেয় না, যদি না সে ছবি প্রায় অন্ধকারে দেখা হয়। গল্প আছে জাহাঙ্গীরের দরবারে স্যর টমাস রো যখন প্রথম তেলরঙের ছবি নিয়ে যান তখন বাদশা খুব চটে গিয়ে ছবি সরিয়ে নিতে বলেন, কারণ সে ছবি নাকি বড় ইতরের মত চকচক করছিল।

চিত্রশিল্পী রেখার সমস্ত গুণাগুণ আয়ত্ত করেছিলেন, ফলে শুধু রেখার মধ্যে দিয়েই তিনি যত কিছু ভাব প্রকাশ করতে শেখেন এবং সূক্ষ্ম রেখা থেকে মোটা পটি পর্যন্ত এনে রেখার মধ্যে আনেন মড়লিঙের গুণাগুণ, উঁচুনীচু বোধ, ফোরশর্টনিং, পারস্পেক্‌টিভ। রেখার মধ্যে প্ল্যাস্টিক গুণও আনেন। অজন্তার স্বর্ণযুগে এই রেখা সর্বদা বলিষ্ঠ, আত্মপ্রতিষ্ঠিত, তেজোময়।

রেখার সঙ্গে যুক্ত হয় অল্প কয়েকটি রঙ যেগুলি শুধু গাঢ় ফিকে করেই আসে অসীম বৈচিত্র্য। রঙের ঐশ্বর্যের কথা আগেই বলেছি। মানুষের গায়ের চামড়া প্রায়ই হত গোলাপী আর ধূসর। কখনও কখনও সবুজ দেখা যায়, কিন্তু সবুজ রঙ আসলে ছিল তলাকার আস্তর। রীতি ছিল প্রথমে নরম সবুজে মানুষের গা রঙ করা, তারপরে দেওয়া হত গোলাপী রঙ, ফল দাঁড়াত স্নিগ্ধ অথচ উষ্ণ স্বচ্ছপ্রায় এক ধরনের ধূসর রঙ। এ ছাড়া ব্রাউন, কালো আর লালের প্রচুর ব্যবহার ছিল।

প্রাচীন ছবির সবচেয়ে কৃতিত্ব ছিল ভাবভঙ্গি প্রকাশে, আর হাতের মুদ্রায়। হাত, আঙুল এমন সুনিপুণ ভাবে বোধহয় পৃথিবীর অন্যত্র আঁকা হয়েছে কিনা সন্দেহ, ছবির মধ্যে হাতের আঙুলে শিল্পী যেন কথা কওয়াতে পারতেন। প্রকাশ পেয়েছে নন্দনতত্ত্বের মুদ্রার সাহায্যে ভাবপ্রকাশের আশ্চর্য দক্ষতা।

কিন্তু শেষে একথা মানতেই হয় যে গুহাচিত্র ছিল মুখ্যত আখ্যানমূলক, অর্থাৎ গল্প বলা ছবি। গল্প বলা ছবিতে গল্প বা আখ্যানই হয় মুখ্য, ছবি হয় গৌণ। ছবির ছবিত্বগুণ, যেখানে সে কি বলছে তার বিশেষ মূল্য নেই (অর্থাৎ ধ্রুপদী সঙ্গীতে যেমন কথা বা ভাষার বিশেষ কোন মূল্য নেই কেবল রাগটি ধরিয়ে দেয়া ছাড়া), শুধু সেই ধরনের ছবিতেই আসে একান্ত ছবির মৌল ঐক্য বা বাঁধুনি যার একাত্মতার ছন্দ ছবির নানান বিপরীত বিষয়, রঙ ও

রেখাকে একই চৌহদ্দির মধ্যে এক সমগ্রতায় বেঁধে রাখে, নক্‌শার শ্রেষ্ঠত্ব, চিত্রের কৈবল্য বা নৈর্ব্যক্তিকতা, যা আখ্যানের উপর ভর দিয়ে থাকে না, যা নিজের জোরে সম্পূর্ণ, যা নিছক ছবি সেই হিসাবে কালজয়ী, অর্থাৎ কালকে যে অতিক্রম করে, যা দেখে মেনে হয় এ ছবিতে কাল থমকে দাঁড়িয়ে আছে, স্তব্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু আখ্যানচিত্রকেও অজন্তাশিল্পী কি পরিমাণ চিত্রগুণমণ্ডিত করেছেন দেখে বিস্মিত হতে হয়, উপরন্তু প্যানেল চিত্রে আমরা পাই শুদ্ধ আখ্যানহীন ছবি, যার উৎকর্ষ চিরকালই সব শিল্পীর ঈর্ষার বস্তু হয়ে থাকবে।



অজন্তা চিত্রের রচনা ও পরিপ্রেক্ষিত

ভারতশিল্পের ইতিহাসে কয়েকটি বিশেষ ধরনের কাজের ও অলঙ্কারে যেমন একটি সুস্পষ্ট প্রগতি ও ক্রমবিবর্তনের ধারা পাওয়া যায়, ভারতীয় চিত্রকলায় রচনা ও পরিপ্রেক্ষিত সৃষ্টির বিভিন্ন ধারাতেও তেমন একটি স্পষ্ট যোগসূত্র দেখা যায়। চিত্রকলায় কোথায় কম্পোজিশন শেষ হয়ে পারস্পেকটিভ শুরু হয়, অথবা দুটির টেকনিকের মধ্যে কোথায় তফাৎ, অথবা আদৌ আছে কিনা, বলা শক্ত, কারণ কম্পোজিশনে যে সব উপাদান দরকার হয় পারস্পেক্‌টিভ সৃষ্টিতেও তাদের স্থান বিশেষ প্রধান।

অজন্তা চিত্রের রচনা এবং পরিপ্রেক্ষিতের টেকনিক এবং ইস্‌থেটিক উদ্দেশ্য বিচার প্রসঙ্গে শুধু তার ব্যাকরণটুকু আলোচনা করলে খুবই ভুল হবে, কারণ ভারতীয় ঐতিহ্য এবং মূল আদর্শের উপরেই অজন্তা চিত্রের রচনা এবং পরিপ্রেক্ষিতের ভিত্তি বলা যায়। সুতরাং এক্ষেত্রে চিত্রের কৌশলগত যাবতীয় সমস্যার সঙ্গে ভারতীয় জীবনদর্শনের ওতপ্রোত সম্বন্ধ বর্তমান।

নয় এবং দশ নম্বর গুহার ফ্রেস্কোর পুনঃ সংস্কারের পর এখন প্রায় জোর করে বলা যায় যে অজন্তার ফ্রেস্কো শুরু হয় সাঁচি যুগে, শেষ হয় গুপ্তযুগে। এই শতকের প্রথমার্ধে ফিলিপ স্টার্ণ বলে এক ফরাসী পণ্ডিত অজন্তার স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যের প্রমাণাদির উপর নির্ভর করে ২৯টি গুহার ক্রমপঞ্জী মোটামুটি বেঁধে দিয়েছেন। কিন্তু এখানে যখনই আমরা সাধারণভাবে অজন্তা শিল্প, অজন্তা যুগ বা অজন্তা রীতির উল্লেখ করব তখনই আমাদের মনে জাগবে তার সবচেয়ে গৌরবের যুগ অর্থাৎ খ্রীস্টীয় পাঁচ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ছয় শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত। বাস্তবিকপক্ষে ভারতের নানাস্থানের ভাস্কর্যকে বুঝতে এই যুগের অজন্তাচিত্রাবলীই সবচেয়ে বেশি সাহায্য করে ; তার কারণ এর আগের যুগের ফ্রেস্কোগুলি, অর্থাৎ নয় আর দশ নম্বরের গুহার ছবিতে এমন কোন টেকনিকের নৈপুণ্য নেই যা নাকি সাঁচি, ভারুত, অমরাবতীতে নেই।

অজন্তায় গুপ্তযুগের ফ্রেস্কোগুলি প্রথম দেখলে একটু হতভম্ব হতে হয়। আষ্টেপৃষ্টে ফ্রেস্কোয় মোড়া দেয়ালগুলি প্রথমে দেখলে মনে হয় যেন পাশাপাশি দুটি চিত্রবিষয়ের মধ্যে কোন রকম সীমারেখা নেই, সীমারেখার চেষ্টাও নেই। ফলে জাতকমঞ্জরী বা মূর্তিলক্ষণাদি খুব ভাল রকম জানা না থাকলে, কোনখানে একটি আখ্যান শেষ হয়ে আরেকটি শুরু হল বলা শক্ত হয়। দেয়ালের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত অবধি, ছাত থেকে মাটি পর্যন্ত, একটুও জায়গা কোথাও ফাঁক না রেখে, সমস্ত দেয়ালময় ছবি আঁকা ; তাতে প্রথম প্রথম চোখ কোন ছবিকে আলাদা করার অবসরই পায় না। সারা দেয়ালময় নরনারী, নগর, অট্টালিকা, পাহাড়, পাথর, গাছপালা, পশুপক্ষী ভিড় করে থাকে। কিন্তু এসব জিনিস যতই ধাঁকালো হয়ে গিজগিজ করুক না কেন, কোথাও ভারস্বরূপ হয় না ; সমস্ত দেয়ালটি যেমন নিপুণ, কুশলী, তেমন বিচিত্র, সঙ্গত সুরে বাঁধা। বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলে, আস্তে আস্তে একটু একটু করে কিছু কিছু গ্রুপ চারপাশ থেকে নিজেদের ছাড়িয়ে বেরিয়ে আসে, দৃষ্টিপথে পড়ে, তাদের খুঁটিনাটি নজরে পড়তে শুরু করে। সেগুলি দেখা হলে দৃষ্টি আবার চলে যায় যেগুলি কম দরের বা কম জরুরী গ্রুপ, যেগুলি প্রধান দৃশ্যগুলির চারদিকে সাজানো আছে, তাদের দিকে। সেগুলি দেখা হলে পর চোখ আপনা আপনি, নিজের অজান্তেই আস্তে আস্তে আবার আরেকটি মুখ্য গ্রুপের উপর গিয়ে পড়ে।

এইসব কম্পোজিশনের ভিতরে কি ধরনের শৃঙ্খলা, কি ধরনের সঙ্গতি বর্তমান, তারা কোন আইনের অধীন,

সেইটুকু আবিষ্কার করাই আমাদের উদ্দেশ্য। সবচেয়ে সরলরীতির কম্পোজিশন অবশ্য হচ্ছে যেগুলিতে প্রতিসাম্য বর্তমান, অর্থাৎ মধ্যস্থলের দু'পাশে ফিগরগুলি সাজানো, যাতে ডাইনে বাঁয়ে এবং মধ্যের ফিগরগুলিতে ভারসাম্য আসে। এই ধরনের কম্পোজিশন সবচেয়ে বেশি পাই বৌদ্ধ গ্রুপগুলিতে; সেগুলির বিষয় বহু পুরনো, চিরাচরিত; অজন্তা যুগের অনেক আগে থাকতেই তাদের সূত্র স্থির হয়ে গেছে। মধ্যস্থলের দু'পাশে প্রতিসাম্যমূলক কম্পোজিশন রীতি এমন কিছু মূল্যবান নয়; কারণ বিহার, মঠ, মন্দির সর্বত্রই দেয়ালে এই ধরনের অজস্র ভাস্কর্য দেখা যায়। এই ধরনের কম্পোজিশনে বোধহয় গ্রীক-বৌদ্ধ রীতির ছাপ দেখা যায়। সে রীতিতে প্রতিসাম্য ভাঙা, ভারসাম্যতাহীন কম্পোজিশনের চেয়ে প্রতিসাম্যমূলক কম্পোজিশনই বেশি প্রশ্রয় পায়। তা সত্ত্বেও কতকগুলি পুরনো বিষয়, যেমন মারের প্রলোভন, অজন্তায় নতুনভাবে, অনেক স্বচ্ছন্দ ছাঁদে আঁকা হয়েছে। যথা, মারের প্রলোভন চিত্রে প্রতিসাম্যের আড়ষ্টতা নেই বলা যায়; সেখানে ছবির প্রসাদ ঘনবস্তু বা ম্যাসের বিশেষ বিশেষ বিন্যাসে যতটা এসেছে রেখার সংস্থানে ততটা আসেনি।

এই ধরনের সরল পদ্ধতি বা প্রতিসাম্যমূলক কম্পোজিশনের পরে আসে দ্বিতীয় পদ্ধতি, তাতে যে-কোন দৃশ্যের বিভিন্ন গ্রুপগুলি একত্রে যোগ করে গাঁথা। এই রীতির আমরা নাম দিতে পারি যোগসূত্র রচনা বা ইংরেজিতে কনেক্টিং-লিঙ্ক কম্পোজিশন। অজন্তা রীতিতে যোগসূত্র রচনা এত বেশি দেখা যায় যে এই টেকনিকটিকে আমরা অজন্তার একান্ত বৈশিষ্ট্য বলতে পারি। এই ধরনের রচনার কল্যাণে একই আখ্যানের একাধিক দৃশ্য পরের পর একই দেয়ালে সাজানো হয়, তাদের ক্রমান্বয়তার মধ্যে কোন স্পষ্ট বিরাম যা যতিরেখা থাকে না। সাধারণত চিত্রকলায় একটা মস্ত অসুবিধা এই যে তাতে উপন্যাস বা নাটক বা কবিতার মত কালাতিপাত দেখানো যায় না, কিন্তু এই ধরনের কম্পোজিশনের কল্যাণে সময়ের গতি দেখানো সম্ভব হয়, অর্থাৎ ক্রমিক পর্যায়ে ছবিতে গল্প বলা যায়।

এই ধরনের কম্পোজিশন ছিল প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। এই লক্ষণটি সুদূর প্রাচ্যে অর্থাৎ জাপানের মাকিমোনোর কম্পোজিশনেও দেখা যায়। পাশ্চাত্য শিল্পী চিরকাল যে কোন দৃশ্য বা ছবি একটি স্পষ্ট, বিশিষ্ট ফ্রেমে বাঁধা অবস্থায় দেখতে অভ্যস্ত। তিনি সেটি দেখেন একটি বাঁধাধরা, অনড় স্থান বা বিন্দু থেকে, দেখেন যেন জানালার খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে (লেঅনার্দো দা ভিঞ্চির খড়খড়ি বা ভেন্টিলেটার)। অপর পক্ষে ভারতীয় শিল্পী কোন দৃশ্য শাড়ির পাটের ভাঁজের মত খুলে খুলে দেখতে অভ্যস্ত, ঠিক যেন চলন্ত রেলগাড়ির জানালা দিয়ে দেখা ক্রমান্বয় দৃশ্য বা প্যানোরামা। তার মধ্যে বিভিন্ন আখ্যান ভাগ করতে, সেই সঙ্গে আবার তাদের মধ্যে যোগসূত্র রাখতে, সাঁচির প্রথম স্তূপের যুগ থেকেই ভারতীয় শিল্পী তাঁর ছবিতে, লেখায় যতিচিহ্ন বা পাঙ্কচুয়েশন চিহ্নের মত কতকগুলি বিশিষ্ট বিষয়ের অবতারণা করতেন। তাদের কাজই হত দুটি আখ্যানের মধ্যে সীমারেখা নির্ণয় করা। সাধারণত সেগুলি হত নগর-তোরণ, অথবা মন্দিরদ্বার, চাতাল বা অলিন্দ, গাছ, স্তম্ভ ইত্যাদি। সেই সঙ্গে তিনি আখ্যানটির মুখ্য কেন্দ্রবিন্দুর দিকে আখ্যানসংশ্লিষ্ট সব ফিগরগুলি উপযুক্ত ভঙ্গিতে এঁকে দিতেন, ইংরেজিতে যাকে বলে ওরিয়েন্টেট করে দিতেন। বস্তুত, সাঁচিতেই এই ধরনের কম্পোজিশনের প্রথম স্পষ্ট দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সাঁচির এই ধরনের কম্পোজিশনে অবশ্য সেখানকার পোর্টিকো, লিন্টেলের প্রলম্বিত আকার সাহায্য করে। এই রীতির বিশেষ উন্নতি হয় অমরাবতীতে। অমরাবতীর আল্‌সে বা ব্যালাসট্রেডের হাত রেলিং ধরে, একের পর এক দৃশ্য ক্রমান্বয়ে অনির্দিষ্ট ভাবে চলে গেছে, নগর-তোরণ, পোর্টিকোর খিলান, চবুতারা, থাম ইত্যাদি মধ্যে মধ্যে এসে তাদের স্রোত যা ভেঙ্গে ভেঙ্গে দিয়েছে।

অজন্তাশিল্পীও একই উদ্দেশ্যে তাঁর কাজে অমরাবতীর রীতি গ্রহণ করেছেন। যেমন, হয়ত একই আখ্যানের দুটি দৃশ্যের মাঝে আসে কোন নগর-তোরণ, কোন দৃশ্যের সবটাই হয়ত কোন অলিন্দের ফ্রেমে আবদ্ধ, পাথর, পাহাড় হয়ত আকাশের বিভিন্ন অংশ ভাগ করে দেয়। কিন্তু অমরাবতীর টেকনিক অজন্তা চিত্রশিল্পী এত নিপুণভাবে, স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করেন যে দেখে অবাক হতে হয়। উপরন্তু অমরাবতীর স্থাপত্যে নগর-তোরণ, পোর্টিকো বা থাম যেমন নিতান্ত আবশ্যিক এবং হাতরেলিং-এর ভাস্কর্য যেমন গৌণ, অজন্তায় তা নয়, বরং উল্টো, অর্থাৎ অজন্তায় চিত্রশিল্পী এসব উপচারকে চোখকে ক্ষণিকের বিশ্রাম দেবার জন্য আনেন, আর ছবির ঠিক এমন এমন জায়গায় তাদের উপস্থাপিত করেন যেখানে লম্বালম্বি এবং কোণাকুণি সরল রেখাগুলি মুহূর্তের জন্য ভিড় করা ফিগরকে সুসংবদ্ধভাবে আটকে রাখে, আর সেই সঙ্গে কম্পোজিশনের ছন্দ বদলে দেয়।

এগুলি যেন ধ্রুপদে তানপুরার ঝঙ্কার, গানের সঙ্গে ঠিক সম্পর্ক নেই, অথচ আলাদাভাবে গানের সঙ্গে বেজে

চলেছে, যার মৃদু গুঞ্জনের উপর অপূর্ব মূর্ছনায় ওঠে সুরের কলি। অজন্তায় এইসব সুরের কলি হচ্ছে অতি লাবণ্যময় নানা ভঙ্গিতে আঁকা নরনারীর দল, প্রথম দৃষ্টিতে তাদের এলোমেলো মনে হলেও তারাই দৃশ্যগুলির আসল বিষয়। তাদের হাবভাব, ভঙ্গি, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বক্ররেখা, সব মিলে আমাদের দৃষ্টি এবং মনোযোগ কম্পোজিশনের কেন্দ্রস্থলে ঠেলে দেয়, তার থেকে অবলীলাক্রমে পরের কম্পোজিশনে চালিত করে ; অর্থাৎ ফিগরগুলির নানাবিধ রেখাই হয় আমাদের দৃষ্টির পথপ্রদর্শক, প্রধান গ্রুপগুলির আশেপাশের ফিগরগুলি বিভিন্ন দৃশ্যের মধ্যে যোগসূত্রের কাজ করে, তাদের একপাশ থেকে দেখা ছবি বা প্রোফাইল, ত্রিভঙ্গের বাঁক, তাদের অপসৃত দৃষ্টি, যে গ্রুপের মধ্যে তারা আছে তার দিকে না দেখিয়ে পরের দৃশ্যের দিকে তাদের বাড়ানো হাত, সবই চোখকে পরের দৃশ্যের দিকে নিয়ে যায়। অর্থাৎ তারা পাশাপাশি আঁকা দৃশ্যের সেতুবন্ধন করে, ঠিক যেমন কোন রঙের ক্রমিক পর্যায় ছবিতে আলো আর ছায়ার মধ্যে সেতুবন্ধন করে।

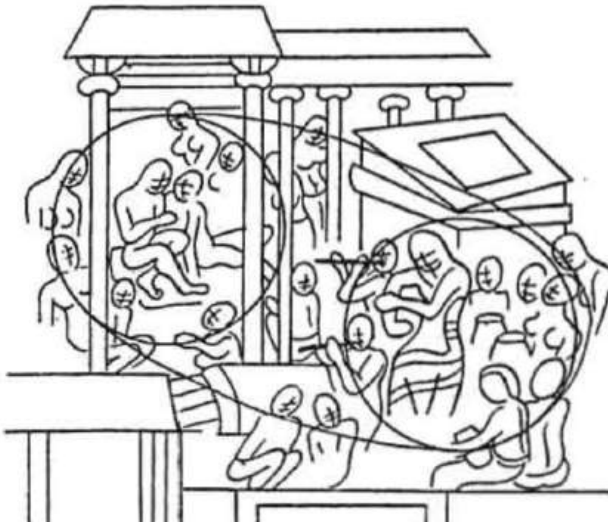
এই পদ্ধতিটি মোটেই অজন্তা চিত্রশিল্পীদের আবিষ্কার নয়, অমরাবতীতে আগে থেকেই চালু ছিল, যদিও এটুকু বলা যায় যে অজন্তাতেই তার চরম উৎকর্ষ হয়। ভারতের বাইরেও যেখানেই শিল্পে ভারতীয় প্রভাব দেখা যায়, বিশেষ করে এশিয়ায়, এই টেকনিক ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু টুনহুয়াঙের ছবি দেখলেই বোঝা যায় যে মধ্য এশিয়ায় এই টেকনিকটি বড় বেশি বাঁধাগতে দাঁড়িয়ে যায় ; সেখানে ফিগরগুলি গতানুগতিকভাবে সাজানো, বৈশিষ্ট্য নেই, কল্পনা নেই ; বিভিন্ন দৃশ্যের মধ্যে যোগসূত্র স্পষ্ট নয়, এলোমেলোভাবে সাজানো। অজন্তায় যেমন প্রতিটি ভঙ্গি, মুদ্রা, শরীরের ছন্দ, অপূর্ব ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে, টুনহুয়াঙে তা নয় ; সেখানে শরীরের বক্ররেখা, ভাবভঙ্গি নিতান্ত ছকে ফেলা, আড়ষ্ট, নেহাৎ যন্ত্রের মত এক দৃশ্য থেকে আরেক দৃশ্যে দৃষ্টিপথ চালিত করে, তাতে ব্যঞ্জনার কিছু নেই, বৈশিষ্ট্যও নেই।

এতক্ষণ আমরা দু'ধরনের কম্পোজিশনের কথা আলোচনা করেছি ; প্রথমটি সরল অর্থাৎ মধ্যস্থলের ম্যাস বা ফিগরের দু'পাশে প্রতিসাম্য রাখা আরও দুটি ম্যাস ; দ্বিতীয়টি যোগসূত্র রচনা, যাতে দৃশ্যগুলি একাদিক্রমে আসে ; খণ্ড খণ্ড আলাদা আলাদা অসম্পৃক্তভাবে নয়। এরপর আমরা তৃতীয় একধরনের কম্পোজিশন সম্বন্ধে আলোচনা করব। দ্বিতীয় রীতির সঙ্গে এর ক্রিয়াগত ঘনিষ্ঠ যোগ আছে, তাছাড়া আরও মিল আছে এই হিসাবে যে এই রীতিটিও অজন্তা চিত্রশিল্পীর নিজস্ব আবিষ্কার নয়। তৃতীয় ধরনের কম্পোজিশনকে বলা যায় চক্রাকার বা মণ্ডলাকার রচনা।

উদাহরণ দিলে বক্তব্য স্পষ্ট হবে। এক নম্বর গুহার শঙ্খপাল জাতক আখ্যানটি ধরা যাক। সমগ্র চিত্রটিতে দুটি স্পষ্ট ভাগ বা দৃশ্য আছে। ডানদিকে ব্যাধরা নাগরাজ শঙ্খপালকে আক্রমণ করে বন্দী করেছে। বাঁদিকে শ্রেষ্ঠী অলর রাজপুত্র শঙ্খরাজকে নিষাদদের হাত থেকে মুক্ত করে দীক্ষা দিচ্ছেন। রাজপুত্র ভিক্ষুর চীর গ্রহণ করেছেন। পুরো আখ্যানটি দুটি দৃশ্যে ভাগ করা ; প্রতিটি দৃশ্যের গ্রুপ আবার মধ্যবর্তী কেন্দ্রের চারধারে গোল করে সাজানো। ডানদিকের দৃশ্যে ব্যাধদের হাত একঝাঁক কর্ণরেখা বা ডায়াগোনালের সৃষ্টি করে তাদের শিকারের দিকে বাড়ানো ; নাগরাজের শরীরটি আবার লম্বা একটি পাক খেয়ে ব্যাধদের হাতের দিকে আগানো। দৃশ্যটির তলার দিকের যে ফিগরটি আঁকা তার সাহায্যে পরোক্ষভাবে শিল্পী সেই বিন্দুটি লম্বালম্বি দেখাতে চেয়েছেন যেখানে নাকি ব্যাধরা নাগরাজকে ধরে বন্দী করছে। বাঁদিকের দৃশ্যে আছে দুটি শ্রদ্ধার্হ ফিগর, তাদের মধ্যে যেটি মুখ্য, অর্থাৎ ভিক্ষু, সেটি উপরদিকে তুলে আঁকা ; উপর নীচ বা খাড়াই পরিপ্রেক্ষিত, ইংরেজিতে যাকে বলে ভার্টিকল পারস্পেক্টিভের, প্রথানুসারে তাতে বোঝায় যে নাগরাজ ভিক্ষু দর্শক থেকে আরও দূরে দাঁড়িয়ে আছেন। ফিগর দুটি অতি ধীরমন্দ ছন্দে পরস্পরের দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। ডানদিকের দৃশ্যের দ্রুত তালের গতির স্থলে বাঁদিকের ধীর ছন্দ অদ্ভুত এক বৈষম্যের সৃষ্টি করে, ফলে বাঁদিকের দৃশ্যের শান্ত সমাহিত স্তিমিত ভাব আরও বর্ধিত হয়, দীক্ষার গুরুত্ব, সৌম্য সৌন্দর্য ভাল করে ফুটে ওঠে, দর্শকের মনে ভক্তির উদয় হয়, শিল্পীর উদ্দেশ্য সার্থক হয়। মুখ্য চরিত্র দুটির পদতলে একটি স্ত্রীলোক বসে আছে, তার দেহটি ত্রিভুজের আকারে আঁকা। তার স্থানু ভঙ্গিতে চিত্রটির শান্ত সমাহিত ভাব আরও গভীর হয়, সেই সঙ্গে নারী দেহটি কম্পোজিশনের কেন্দ্রবিন্দুটি চিহ্নিত করে। জাতকটি জানা থাকলে দুটি দৃশ্য যে আলাদা তা বোঝা যায়, কিন্তু প্রথম দেখলে দুটিকে একই দৃশ্য বলে মনে হয়। তার কারণ বাঁদিকের দৃশ্যের রেখার বাঁকগুলির সঙ্গে ডানদিকের নাগরাজের কুণ্ডলীর সর্বদাই যোগাযোগ আছে ; যে গতির বশে দৃশ্য দুটি আলাদা হয়ে যায় তা প্রথমে নজরে পড়ে না ; সে হচ্ছে দুই দৃশ্যের ফিগরগুলির মাথা দুই বিপরীত দিকে ঘোরানো। একাধিক দৃশ্যের যোগ অথবা বিচ্ছেদ সূত্র হিসেবে ফিগরের মাথাগুলিকে এদিক ওদিক

ঘুরিয়ে, সুনিপুণ, সূক্ষ্ম কৌশলে খুব সার্থকভাবে আখ্যান চিত্রটি নির্মিত হয়েছে।

এই ধরনের কাজের বহু নমুনা অজন্তায় আছে। এক নম্বর গুহার মহাজনক জাতক আখ্যানটিই ধরা যাক। এই আখ্যানটিতেও দুটি আলাদা অংশ সুস্পষ্টভাবে বর্তমান। রাজপ্রাসাদে ঢাকা বারান্দার মত চাতালে রাজকুমার রাজকুমারীর সামনে নৃত্য হচ্ছে। রাজপরিবার ঘিরে রয়েছে একটি দল বা গ্রুপ, নর্তকী ও বাদ্যকরদের নিয়ে হয়েছে দ্বিতীয় দল বা গ্রুপ। দুটি দল বা গ্রুপ দুটি কেন্দ্রের চারপাশে বৃত্তাকারে রচিত। শঙ্খপাল জাতক আখ্যানের মতই এখানে প্রত্যেকটি কম্পোজিশন গোল আকারে আঁকা, প্রধান ফিগরগুলি বৃত্তের মাঝখানে। দেহের ত্রিভঙ্গে, মাথার ভঙ্গিতে ও সংস্থানে, বাহুর বঙ্কিম রেখায়,—সে প্রথম অংশের রাজানুচরীদের দেহেই হোক, অথবা দ্বিতীয় অংশের বাদ্যকর বাদ্যকরীদের দেহেই হোক,—দর্শকের দৃষ্টি অবলীলাক্রমে অথচ নিতান্ত অনিবার্যভাবে প্রতিটি গ্রুপের মধ্যস্থলের দিকে ধাবিত হয়। অর্থাৎ চারপাশের ফিগরের রেখাগুলি এমনভাবে রচিত যে তারা দর্শকের দৃষ্টিতে আপনাআপনি অক্লেশে গ্রুপের কেন্দ্রস্থলবর্তী ফিগরের প্রতি চালিত করে। ছবিটির প্রথম অংশ থেকে দ্বিতীয় অংশে যেতে দুটি ফিগর দৃষ্টিকে সাহায্য করে। প্রথম দুটি থামের মাঝখানে দাঁড়ানো অবস্থায় একজন স্ত্রীলোক, ফিগরটি রাজপুত্রের গ্রুপের মধ্যে পড়লেও তার দেহ খুব স্পষ্টভাবে নর্তকীদের দলের দিকে ফেরানো। দ্বিতীয়



ফিগরটি হচ্ছে এই নারীরই পায়ের তলায় জড়োসড়ো, উপুড় অবস্থায় পড়া আরেকটি ফিগর ; স্ত্রীলোকটির মত এও যদিও স্পষ্টত রাজপুত্রের গ্রুপে পড়ে, তবুও দ্বিতীয় গ্রুপের দিকে মাথা ফেরানো থাকার দরুন সেটি দ্বিতীয় গ্রুপের সঙ্গেই দৃঢ়ভাবে জড়িত। এ ছাড়াও দুই গ্রুপের মধ্যে আরও দূর পরোক্ষ যোগসূত্র আছে, যার মূল্য অত সহজে বা পরিষ্কারভাবে নিরূপণ করা যায় না ; সে হচ্ছে প্রথম গ্রুপের নর্তকীর দেহের বঙ্কিম ছন্দের মিল ; এই দুটি বাঁকা দেহরেখা যেন এক কল্পিত কর্ণরেখা বা ডায়াগোনালের দুটি প্রান্ত, যে কর্ণরেখাটি রাজকুমারীর ডান পা থেকে শুরু করে উপুড় অবস্থায় পড়া ফিগরের বাহুরেখাটি ধরে দ্বিতীয় গ্রুপের বাঁ দিকের বাদ্যকরদের বাঁশিগুলি বরাবর চলে গেছে।

এই ধরনের জোড়া-কম্পোজিশন শুধুমাত্র রেখায় দেখাতে হলে একটি খুব লম্বা সরু ডিম তেরছা বা কোণাকুণি করে কাগজে আঁকতে হবে। এই ডিমের সীমারেখার চারদিকে এমন করে চিহ্ন দিয়ে যেতে হবে যাতে আরেকটি বড় ডিমের আকারের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ থাকে। এই দুটি ডিমের বিপরীত প্রান্তদ্বয়ের ঠিক ভিতরে আবার থাকবে দুটি গোল বা বৃত্ত, প্রতিটি বৃত্তের কেন্দ্রকে কেন্দ্র করে সেই বৃত্তের মধ্যে আবার একটি করে গ্রুপ আবদ্ধ থাকবে।

হুবহু ঠিক এই প্যাটার্নটি পাওয়া যায় বাঘের বিখ্যাত হল্লীসক ফ্রেস্কোয়। সেখানেও পাশাপাশি দুটি বৃত্তের কেন্দ্রে থাকে দুটি নর্তকী, সেখানেও কম্পোজিশনের মোটামুটি আকারটি হচ্ছে দেয়ালে কোণাকুণিভাবে ন্যস্ত একটি

সরু ডিম। এমন কি অজন্তার কোন কোন চিত্রের কম্পোজিশন অনেক সময়ে অত স্পষ্টাস্পষ্টি বৃত্তাকারে না হলেও তাদের মধ্যে সর্বদাই বেশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাব থাকে, সেগুলি স্পষ্টত কোন মুখ্য ফিগরকে কেন্দ্র করে রচিত হয়; ঠিক যেন গোল বাটির আকারে হেলানো ফুলের পাপড়ির সারি, যাদের বাঁকগুলি চোখকে প্রায় একরকম ঠেলে মধ্যের ফিগরের দিকে নিয়ে যায়।

এখানেও অজন্তাশিল্পী কোন নতুন আবিষ্কারের দাবি করতে পারেন না। অর্থাৎ মৌলিক ডিজাইন সৃষ্টির সম্মান তাঁর প্রাপ্য নয়। ভারুতে বরাবর গোল বা বৃত্তাকার কম্পোজিশনের চেষ্টা দেখা যায়; বস্তুত ভারুতের পর থেকে গোল কম্পোজিশন প্রায় ঘুরে ফিরে আসে। তাতে অবশ্য স্থাপত্যের তাগিদ খুব সাহায্য করে, কারণ ছাতের আলসের একঘেয়ে একটানা সোজা রেখা ভাঙতে গিয়ে এসেছে ব্যালাসট্রেডের গোল পদক বা মেড্যালিয়ন; প্রয়োজন হয়েছে সেই মেড্যালিয়নকে ভাস্কর্যখচিত করার। এই ধরনের কম্পোজিশন অবশ্য অমরাবতীতেই বেশি দেখা যায়। অজন্তাতেও গোল কম্পোজিশন করা মেড্যালিয়ান পাওয়া গেছে (এটি এখন মাদ্রাজ মিউজিয়মে আছে), তার বিষয় হচ্ছে এক রাজা উপঢৌকন গ্রহণ করছেন। দৃশ্যটিতে ফিগরগুলির মাথা যেভাবে সাজানো তাতে স্পষ্টই বোঝা যায় শিল্পী বৃত্তাকার কম্পোজিশন নিখুঁতভাবে আনতে চেয়েছেন। কিন্তু এই ধরনের ফর্মে চূড়ান্ত সৌন্দর্য এসেছে অমরাবতীর আর একটি মেড্যালিয়নে। এটির বিষয় হচ্ছে দেবগণ বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্র উর্ধলোকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এখানে সমস্যা ছিল কি করে দর্শকের চোখ অবলীলাক্রমে বৃত্তের উপরদিকের অংশে অর্থাৎ ভিক্ষাপাত্রের দিকে চালিত করা যায়। সেই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ম্যাসগুলিকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে, তাদের চারদিকের রেখাগুলিকে এমন দৃঢ় অথচ লাবণ্যময় ছন্দে একরোখা করা হয়েছে, যে তাদের অপ্রতিহত নির্দেশে চোখ স্বতই ভিক্ষাপাত্রের দিকে যায়।

এটা নিশ্চিত যে এই ধরনের বৃত্তাকার কম্পোজিশনের প্রতি পক্ষপাত নিছক আকস্মিক নয়; এর মধ্যে গভীর তাৎপর্য আছে। এইসব রচনায় মণ্ডলস্থ গূঢ় তত্ত্বের কথা মনে পড়ে, যে মণ্ডলে থাকে কতকগুলি এককেন্দ্রিক বৃত্ত অথবা চৌখুপী কাটা প্রকোষ্ঠ, যার রহস্যময় মধ্যস্থলে থাকেন স্বয়ং ঈশ্বর বা ধ্যানের দেবতা। এই মধ্যস্থলে যেতে হলে চাই ধ্যান ও আরাধনা, প্রতিটি মণ্ডলের অধিষ্ঠাত্রী দেবগণ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান। এইভাবে স্তরে স্তরে মণ্ডল ভেদ করে সবশেষে সাধকের হয় চরম ব্রহ্মাস্বাদ, ঈশ্বরের সঙ্গে মরমী মিলন, যে ঈশ্বর ভ্রূণস্থিত বীজের মত বিশ্বের অন্তঃস্থলবর্তী কেন্দ্রে সদাই অপ্রকাশিত থাকেন।

এটা সম্ভবত ঠিক যে অজন্তাশিল্পীরা শুধুমাত্র ঐতিহ্যের খাতিরে, অথবা অলঙ্কারের নেশায় বৃত্তাকার রচনা প্রয়োগ করেননি; তাঁদের চোখে বৃত্তের নিশ্চয় গূঢ় রহস্যময়, মরমী গুণও ছিল। ঠিক এই গুণ, এই তাগিদই নিশ্চয় ছিল অমরাবতীর গোল পদক বা মেড্যালিয়নে। আবার ঠিক এই গুণ, এই তাগিদই বরাবর এসেছে ভারত চিত্রকলার কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক রাসমণ্ডল চিত্রাবলীতে। রাসমণ্ডল চিত্রের সবচেয়ে সার্থক নিদর্শন আছে জয়পুরের মহারাজার সংগ্রহে। এই মিনিয়েচরটির মণ্ডলবৃত্তগুলি গোপিনীদেহ দিয়ে তৈরি, তাদের কেন্দ্রস্থলে বিরাজ করেন চরম আরাধনার বস্তু, কৃষ্ণরাধা। এই মেড্যালিয়ন সবচেয়ে বেশি দেখা যায় বাংলার ইটের মন্দিরে। পাল ও সেন যুগের শত বা সহস্রদল পদ্ম অথবা মুসলমান আমলের মরমী গোলাপও টেরাকাটা মন্দিরে দেখা যায়, তারই পাশে দেখা যায় সারা দেশময় অজস্র ছোট বড় পোড়ামাটিতে মেড্যালিয়ন আকারে খোদাই অপূর্ব রাসমণ্ডল ভাস্কর্য, যার সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ববৃহৎ নিদর্শন আছে বিষ্ণুপুরের পঞ্চরত্ন মন্দিরে, বংশবাটীর বাসুদেব মন্দিরে, গুপ্তিপাড়ার রামচন্দ্র মন্দিরে। কলকাতার আশুতোষ মিউজিয়মে হাওড়ার জগৎবল্লবভপুর থেকে আনীত পোড়ামাটিতে খোদাই দুটি মেড্যালিয়ন আকারের রাসমণ্ডলও উল্লেখযোগ্য।

অজন্তাশিল্পী কি অদ্ভুত কৌশলে প্রচলিত কম্পোজিশন রীতি ব্যবহার করেছেন দেখে বিস্মিত হতে হয়; আরও অবাক হতে হয় কেমন অবলীলাক্রমে তিনি এই রীতিকে যোগসূত্র কম্পোজিশনে প্রয়োগ করেন তাই দেখে, নানা বিচিত্র রূপ এনে তার মর্যাদা যে কত বৃদ্ধি করেন তার যেন ইয়ত্তা নেই।

পারস্পেক্‌টিভের সমস্যা নিরাকরণ ব্যাপারেও অজন্তাশিল্পীরা ঠিক এই ধরনের সুষমা, সঙ্গতি, সংযম, ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগ দেখিয়েছেন। একদিকে কম্পোজিশনের প্রাচীন আইনকানুন তাঁরা যেমন মেনেছেন, তেমনি দুর্লভ কৌশল প্রয়োগে তাঁদের মর্যাদাও তাঁরা বাড়িয়েছেন। তাই তাঁদের কীর্তি ভাল করে বুঝতে হলে প্রাচীন ভারতীয় শিল্পী কী চোখে এই সমস্যাগুলিকে দেখতেন তা জানা দরকার।

ভারুতের নতোন্নত ভাস্কর্য বা রিলিফের মত অত প্রাচীন কাজেও পরবর্তী যুগের ভারতীয় কীর্তির সবকটি লক্ষণ

প্রায় বর্তমান। আখ্যানের প্রতি বিশেষ পক্ষপাত থাকায় (গুপ্তযুগের অজন্তাচিত্রেও এই লক্ষণটি সর্বিশেষ প্রবল) ভারুত শিল্পীরা পাণ্ডিত্যের প্রমাণ যত না দিয়েছেন তত দিয়েছেন পরিচ্ছন্ন যুক্তির। তাঁরা দৃশ্যমান জগতের বিবিধ লক্ষণকে বড় বেশি সরল করেছেন ; সেই সরলীকরণের মধ্যে শুধুমাত্র নৈপুণ্যের অভাব ঢাকা ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যও বোধহয় ছিল। ঘনবস্তুর গভীরত্ব ফুটিয়ে তোলার আইনকানুনের প্রতি বিন্দুমাত্র উৎসাহ না দেখিয়ে তাঁরা বস্তুকে সমগ্রভাবে, পুরোপুরিভাবে দেখালেন, তাদের নিজস্ব বিশিষ্ট ভঙ্গির পরিচয় দিলেন, উপরন্তু যে সব ভঙ্গি সবচেয়ে সহজে প্রতিফলিত করা যায় সেগুলি দিলেন। কিন্তু ভারুত শিল্পীকে চট করে অপটু বা মূর্খ ভাবাও হঠকারিতা হবে। তাঁরা নিজেদের কাজ বিলক্ষণ জানতেন, ক্ষমতাও ছিল যথেষ্ট ; প্রয়োজনমত তাঁরা কিছু কিছু লক্ষণ খুব ভালভাবেই চাপা দিতে পারতেন, কিন্তু তা যে স্বেচ্ছায় করতেন না তা নয়, কেন যে করতেন তার কারণও তাঁদের কাজে তাই পাওয়া যায়। প্রথমত তখনও তাঁরা প্রতিমার যাদুকরী শক্তিতে বিশ্বাসী করতেন, অর্থাৎ তাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠার কথা ভাবতেন, তাঁরা প্রকৃতির নকল অর্থাৎ ফোটোগ্রাফিক প্রতিচ্ছবি করতেন না, অন্তরের মানস প্রতিমাকে রূপ দিতেন। প্রতিমার যাদুকরী শক্তির অর্থই হচ্ছে যে তাতে এমন শক্তি থাকবে যার কৃপায় মঙ্গল বা অমঙ্গল ঘটতে পারে। ফলে প্রতিমা যদি অসম্পূর্ণ হয় তবে তাতে না থাকবে তার পরিপূর্ণ কারিকাশক্তি, না থাকবে তাতে প্রতিমার নিঁখুত গুণাগুণ। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে ঠিক এই কারণেই প্রাচীন যুগের শিল্পে কোন প্রাণীর পাশ থেকে দেখা ছবিতেও অর্থাৎ প্রোফাইলেও শিল্পী তার দুটি চোখ, দুটি কান, দুটি শিংই গোটাগুটি স্পষ্ট করে দেখাতেন। এর অনেক পরে, পশ্চিম ভারতের মিনিয়েচর চিত্রশিল্পীরা সদাসর্বদা একপাশ করা প্রোফাইলে ফিগর আঁকলেও তাতে দুটি চোখই গোটা গোটা করে এঁকে দিতেন, ফলে কোটর থেকে দূরের চোখটি বেরিয়ে গিয়ে ছবির জমিতে পড়ত। এই রীতি অনুসৃত হয়েছে জৈন ও অন্যান্য ধর্মীয় পুঁথিচিত্রে, ভারতীয় মিনিয়েচরে কৃষ্ণলীলা চিত্ররাজিতে সবথেকে আশ্চর্যভাবে বাশোলি কলমে। এই রীতিটি বাংলার পটুয়াদের পটে বিশেষ প্রচলিত, আর প্রচলিত বাংলা কাঁথায় ; তাছাড়া সবচেয়ে বেশি প্রচলিত ছোট ছেলেদের আঁকা ছবিতে, যাদের দৃষ্টির নিষ্কলুষতা এখনও অক্ষুণ্ণ, যাদের জগতে ম্যাজিক এবং রিয়ালিটির ভেদসূত্র অস্পষ্ট। প্রাচীন ভারতশিল্পে প্রোফাইলের ব্যবহার যদিও বিরল, তবুও অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিমা যেভাবে আঁকা বা খোদাই হয়েছে তাতে সাধারণত যে অঙ্গগুলি শুধুচোখে একপাশ থেকে দেখা সম্ভব নয়, সেগুলিও আঁকা বা খোদাই করা হত। তাতে চক্ষুবিজ্ঞানের আইনকানুন ভাঙ্গা হত বটে কিন্তু চিত্রে অসম্পূর্ণতাদোষ থাকত না। ঠিক এইখানে ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য শিল্পীর মধ্যে প্রভেদ শুরু হল : এইখানেই স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে ভারতীয় শিল্পী চোখে যেমনটি দেখছি তেমনটি, অর্থাৎ প্রতিচ্ছবিমূলক চিত্র আঁকার চেষ্টা করেননি, অর্থাৎ ফোটোগ্রাফের গুণ আনার চেষ্টা করেননি, বরং তাঁদের মানসে যে সব প্রতিমা তাদের বিশিষ্ট মৌলিক গুণে প্রতিভাত হত তাই আঁকবার চেষ্টা করেতন। বিশ শতকে জগদ্বিখ্যাত চিত্রশিল্পী পাবলো পিকাসো যেভাবে করেন।

এবং যেহেতু প্রথম যুগের শিল্পীরা এই আদর্শে কাজ করে যান, সেহেতু উত্তরগামীরাও তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, অতীব যত্নসহকারে সেই পদ্ধতিকে বাঁচিয়ে রাখেন, বিধিবদ্ধ করেন, ঐতিহ্য ভাণ্ডারে সসম্মানে স্থান দেন।

খ্রীস্টযুগের তিনশতকে শিল্পের ষড়ঙ্গ নামে যে শাস্ত্র লেখা হয় এবং পরবর্তী যুগে ষড়ঙ্গের যে সব ব্যাখ্যা এবং টীকা তৈরি হয় তার থেকে এইটুকু প্রমাণ হয় যে নতোন্নত ভাস্কর্য অথবা প্রাচীন চিত্রকলার যে ব্যাখ্যা এখানে উপস্থাপিত হল তা আদৌ ভুল বা কষ্টকল্পিত নয়। যথা ষড়ঙ্গে রূপভেদ বা রূপের অর্থই হচ্ছে মানস প্রতিমার অন্বেষণ, বাস্তবের সত্যরূপ অথবা রিয়ালিটির প্রতিভাস, ঔপন্যাসিক মার্সেল প্রুস্তের মত সবকিছুকে মনের মধ্যে নতুন করে দেখে, সেই জগতের সঙ্গে মিলিয়ে পুনসৃষ্টি করা। মরমিয়া সাধক ধ্যানের বলে সমাধিলাভ করেন ; তদ্গত ধ্যানের ফলে শিল্পীরাও চেতনায় যখন অনুরূপ শূন্যভাব সহজ হয়ে আসে তখন যে রূপটি তিনি ফুটিয়ে তুলতে চান সেটি ক্রমে ক্রমে তাঁর চেতনায় প্রবেশ করে প্রতিভাত হয়, দানা বাঁধে। ধ্যানবলে এইভাবে যা কিছু সৃষ্ট হয় তাই হচ্ছে প্রকৃত রূপ, ইংরেজিতে যাকে বলে ফর্মসৃষ্টি।

প্রাচীন শিল্পীরা যেহেতু মানসপ্রতিমাকেই ছবিতে রূপ দেবার চেষ্টা করতেন, সেহেতু লেঅনার্দো দা ভিঞ্চির পরে পাশ্চাত্য চিত্রকলায় যা হল ভারতবর্ষে তা হয়নি, অর্থাৎ চোখের চেনা জানা মত ছবি না হলেই শিল্পীকে অপটুত্ব বা অজ্ঞতার বদনাম কিনতে হত না। সুতরাং একই কম্পোজিশনে, একই ফিগর, বস্তু বা ঘরবাড়িকে বারবার নানা কোণ থেকে দেখাতে তাঁদের বাধত না। আর তাই দেখাতে গিয়ে প্রতিবারই তাঁরা প্রতিটি ফিগর, বস্তু বা ঘরবাড়ির সবচেয়ে বিশিষ্ট রূপটি দেখাতেন। ফলে তাঁরা একই কম্পোজিশনে একই ফিগরের সমুখ থেকে আঁকা ছবি, পাশ

থেকে আঁকা প্রোফাইল, অথবা অর্ধেকের বেশি দেখা যায় এমন কোণ থেকে আঁকা ছবি, ইংরেজিতে যাকে বলে প্ল্যানে-ফেলা ছবি, পাশাপাশি এঁকে দেখাতে একটুও দ্বিধা করতেন না, সে ধরনের কাজের অসঙ্গতি নিয়ে তাঁরা বিন্দুমাত্র ভাবিত হতেন না। এবং হতেন না বলেই তাঁদের ছবি দেখে মনে হয় যেন দর্শকের দৃষ্টিকোণ ক্রমাগত বদলে যাচ্ছে। ব্যাপারটির তাৎপর্য যে কত গভীর তা অজন্তা নিয়ে আলোচনা করলেই বোঝা যাবে।

এত গেল ফিগরের কথা ; জড়বস্তুর চিত্রণেও অজন্তাশিল্পীরা অনবরত একই বস্তুর প্ল্যানে দেখা আর প্রোফাইলে দেখা রূপ একসঙ্গে পাশাপাশি চিত্রিত করতেন, তাতে সমচতুর্ভুজ অথবা লম্বাটে অসমচতুর্ভুজ বা রেক্ট্যাঙ্গলকে একাধিকভাবে দেখানো সম্ভব হত। যেমন বসবার আসন বা সিংহাসনগুলিকে পায়ার থেকে উপরদিকে লম্বায় বাড়িয়ে দেওয়া হত, যাতে ভাল করে নজরে পড়ে ; তেমনি কোন দৃশ্যের পশ্চাদ্‌পট, মধ্যপট এবং সম্মুখপট একের পর এক আরোপ করে, গভীরত্ব বা ডীপ স্পেসের অনুমান না এনে, এক সারের তলায় আরেক সার, তার তলায় আরেক সার, এইভাবে থাক থাক করে আঁকা হত (ঈজিপশন রীতির সঙ্গে এ বিষয়ে যথেষ্ট মিল আছে)। যেগুলি লম্বালম্বি খাড়াই অর্থাৎ ভার্টিকাল, সেগুলি প্রোফাইলে আঁকা হত, যেগুলি আড়াআড়ি বা হরিজন্টল সেগুলি খাড়াই বা ভার্টিকাল করে প্ল্যানে-দেখা করে আঁকা হত ; গাছের মাথাগুলি চোখের সমান সমান করে, অর্থাৎ ইংরেজিতে আই-লেভ্‌ল্‌-এ, আঁকা হত ; কিন্তু সরোবর, নদী এবং অন্যান্য নিসর্গচিহ্ন যা নাকি মাটির সঙ্গে সমান, তা এমনভাবে ছড়িয়ে আঁকা হত যেন সেগুলি আকাশ থেকে দেখে আঁকা হয়েছে।

প্রাচীন যুগে, যথা ভারুতে, আমরা যাকে প্রাচ্য পরিপ্রেক্ষিত বা পারস্পেক্‌টিভ বলি তাই প্রয়োগ করা হত। সকলেই জানেন প্রাচ্য পারস্পেক্‌টিভের নিয়মকানুন পাশ্চাত্য পারস্পেক্‌টিভের একেবারে বিপরীত এমন কি পরিপন্থী। ব্রনেলেস্‌কো এবং পিয়েরো দেলা ফ্রাঞ্চেস্‌কার পর লেঅনার্দো দা ভিঞ্চি পাশ্চাত্য পারস্পেক্‌টিভের আইনকানুন স্পষ্ট ও প্রায় চূড়ান্তভাবে বিধিবদ্ধ করেন। লেঅনার্দো-প্রণীত আইন মতে, দৃষ্টির কর্ণরেখা বা ডায়াগোনালগুলি আমাদের চোখ থেকে বেরিয়ে এক কল্পিত রেখা, যাকে দিকরেখা বলি, তারই এক দূর বিন্দুতে মেশে ; তাকে বলে বিলীয়মান বিন্দু, ইংরেজিতে ভ্যানিশিং পয়েন্ট। পাশ্চাত্য পারস্পেক্‌টিভ এই বিলীয়মান বিন্দুর যথাযথ নির্দ্ধারণের উপর একান্তভাবে নির্ভর করে। কিন্তু প্রাচ্য পারস্পেক্‌টিভে কর্ণরেখা বা ডায়াগোনালগুলি দৃশ্যবস্তু থেকে বেরিয়ে আমাদের চোখে এসে মেশে ; অতএব কর্ণরেখা বা ডায়াগোনালগুলির কাজ এই দুই রীতিতে ঠিক উল্টো। যথা, প্রাচ্য পারস্পেক্‌টিভ অনুযায়ী চৌকি পা পালঙ্কের যে ধারটি আমাদের থেকে সবচেয়ে দূরে সেটিই ছবিতে সবচেয়ে চওড়া দেখানো হবে, যে ধারটি সবচেয়ে কাছে সেটি হবে সবচেয়ে সরু। অপরপক্ষে পাশ্চাত্য পারস্পেক্‌টিভ অনুযায়ী যে ধারটি আমাদের সবচেয়ে কাছে সেটিই সবচেয়ে চওড়া দেখাবে, আর সবচেয়ে দূরেরটি সবচেয়ে সরু দেখাবে। আধুনিক মহান শিল্পী পল সেজান ঠিক এইভাবে তার তাস-খেলোয়াড় ছবিটির টেবিল এঁকেছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে অজন্তায় এবং সমসাময়িক ভাস্কর্যে ও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় পারস্পেক্‌টিভ রীতিই পাশাপাশি প্রয়োগ করা হয়েছে। একদিকে যেমন উপর থেকে নীচে, থাকে থাকে, পশ্চাদপট ও সম্মুখপট আঁকার রীতি আস্তে আস্তে চলে গিয়ে ছবিতে গভীরত্ব বা ডীপ স্পেসের আভাসের সূত্রপাত হল, অন্যদিকে তেমনি ঘরবাড়ি আঁকার ব্যাপারেও পাশ্চাত্য পারস্পেক্‌টিভ প্রায় পুরোপুরিভাবে এল। অপরপক্ষে আবার চোখের স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী যেমন কাছের ফিগর বড় দেখায়, দূরের ফিগর ছোট দেখায়, এবং সেই চাক্ষুষ অনুমানের উপর ভিত্তি করে, আকার ছোট বড় করে, শিল্পী সাধারণত যেমন দুই বা ততোধিক ফিগরের পারস্পরিক সম্বন্ধ এবং দূরত্ব দেখান, প্রাচীন ভারতীয় শিল্পী কিন্তু অনুরূপ টেকনিকের সাহায্যে তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ, দূরে-কাছে দেখাবার কোন চেষ্টাই করেননি। পাশ্চাত্য রীতি অনুযায়ী দূরের জিনিস অস্পষ্ট দেখানো হয়, খুঁটিনাটি দেখা যায় না, রঙ আস্তে আস্তে ম্লান, অপরিস্ফুট করা হয়, যার ফলে দূরত্ব সম্বন্ধে ধারণা জন্মায় ; অজন্তায় কিন্তু এভাবে দূরত্ব দেখানোর কোন প্রয়াস নেই। ঈজিপশন পদ্ধতির মত প্রাচীন ভারতীয় শিল্পেও যে ফিগর যত মুখ্য সে ফিগর স্বাধিকার বলে ছবিতেও তত বড় করে আঁকা, অর্থাৎ বড় বড় ঠাকুরের বড় বড় বপু। এবং ঠিক এই জন্যই মুখ্যচরিত্রগুলির দেহ অন্যান্য ফিগরের চেয়ে সর্বদাই বড় করে আঁকা বা খোদাই করা।

অজন্তাশিল্পী এইসব প্রচলিত প্রথার কোনটাই ত্যাগ করেননি, বরং পূর্বগামীদের চেয়ে তাঁরা সেগুলি অনেক বেশি নিপুণভাবে ব্যবহার করেন, যার দরুন প্রথম দৃষ্টিতে তাঁদের কাজে পাশ্চাত্য পারস্পেক্‌টিভ মানদণ্ডের কোন ত্রুটি সহজে ধরা পড়ে না, অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলে তবে তাদের মধ্যে পারস্পেক্‌টিভের বা

দৃষ্টিবিজ্ঞানবিরুদ্ধ গোলযোগ কিছু কিছু বৈলক্ষণ্য ধরা পড়ে।

এক আধটি দৃষ্টান্ত দিলে কথাটি পরিষ্কার হবে। আপাতদৃষ্টিতে সবচেয়ে বেশি পাশ্চাত্যরীতি অনুযায়ী আঁকা একটি স্তম্ভশোভিত ঢাকা বারান্দার মত প্যাভিলিয়ন নেওয়া যাক। এর যে-সব রেখা দিক্‌রেখার দিকে গেছে সেগুলি যদি পিছন দিকে আরও বাড়িয়ে দেয়া যায় তাহলে দেখব ভিন্ন ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতের বিলীয়মান স্তরগুলি (ইংরেজিতে বলে ভ্যানিশিং ট্রেস) দিকচক্রবালের কয়েকস্থানে মিশেছে। এ দিকে অট্টালিকার সমুখের আড়াআড়ি (হরিজন্টল) সমান্তরাল রেখাগুলি কর্ণরেখা বা ডায়াগোনালে রূপান্তরিত হবে, দু'পাশের তেরছা রেখাগুলি আরও সুস্পষ্ট হবে, বাড়িটি আরও গভীর, অর্থাৎ ভিতরদিকে অনেক বেশি বিস্তৃত দেখাবে। উপরন্তু পিছিয়ে যাওয়া রেখাগুলি যে সব বিন্দুতে মিশেছে সেগুলি ধরে দর্শক ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন তা অনায়াসে বার করা সম্ভব



হয়। কিন্তু যে উদাহরণটি আমরা নিয়েছি সেখানে যদিও পাশ্চাত্য পরিপ্রেক্ষিতের আইন মোটামুটি মানা হয়েছে, তবুও নানা রকম মজার কাণ্ড আছে। যেমন প্যাভিলিয়নের সম্মুখপট বা ফাসাডটি সমুখোসমুখি দেখানো হয়েছে, যেন দর্শক সমুখের ঠিক মাঝখানে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দেখছেন ; অথচ সঙ্গে সঙ্গে অট্টালিকার যে ধারটি পিছন দিকে চলে গেছে সেটি দেখে মনে হয় দর্শক যেন প্যাভিলিয়নের কোণাকুণি দাঁড়িয়ে দেখছেন। এই বিভ্রমটি ঘটেছে তার কারণ শিল্পী সত্যকারের কোন বাড়ি দেখে আঁকেননি বা নকল করেননি ; বাড়ির রূপটি মানস চক্ষে দেখে তার প্রতিটি খুঁটিনাটি সম্পূর্ণভাবে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করেছেন মাত্র।

কিন্তু অজন্তাশিল্পীর রীতিকে শিশু বা আদিম শিল্পীর সরল, অশিক্ষিতপটু রীতির সামিল মনে করা খুবই ভুল হবে। শিশু বা আদিম শিল্পী আড়াআড়ি অর্থাৎ হরিজন্টলভাবে সমুখোসমুখি দেখা ফাসাড এবং একপাশ থেকে দেখা প্রোফাইলের নিজের দৃষ্টিমত অথবা অপটুত্বজনিত জগাখিচুড়ী করেই খুশি হয়। কিন্তু অজন্তাশিল্পীর সৃষ্টি হচ্ছে বস্তুকে নিজের মত করে দেখার অভিজ্ঞতার ফল, তার নিজস্ব প্রজ্ঞার উপর প্রতিষ্ঠিত ; চারু শাস্ত্রের বহুমুখী দৃষ্টি বা ইংরেজিতে যাকে বলে মাল্টিপ্‌ল্ ভিশনের টেকনিকের সঙ্গে অজন্তাশিল্পীর টেকনিকের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

পাশ্চাত্য চিত্রকলায় খ্রীস্টীয় চোদ্দ শতকের পর উনিশ শতকের শেষ অবধি বহুমুখী দৃষ্টি বা মাল্টিপ্‌ল্ ভিশনের টেকনিকে কাজ আর হয়নি বলা যায়। এসেছে উনিশ শতকের শেষে বিশ শতকের প্রথমে সেজান, ভ্যান গখ, মনে প্রভৃতি ফরাসী শিল্পীর যুগান্তকারী কাজে। এই টেকনিকের কল্যাণে দর্শক একই ছবি যেন একাধিক স্থান থেকে দাঁড়িয়ে দেখার সুযোগ পান, অর্থাৎ একই ছবির বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত বিন্দু থেকে আঁকা, সুতরাং একই ছবিতে একাধিক পারস্পেক্‌টিভ পয়েন্ট থাকায় ছবিতে অসম্ভব গতি আসে, স্থাণু বা অনড়ভাব কেটে যায়। অর্থাৎ দর্শক যেন ঘুরে ঘুরে দৃশ্যটি দেখবার সুযোগ পান। ভারতীয় শিল্পে এই টেকনিকটি প্রায় আবহমান কাল থেকে আছে। বস্তুতপক্ষে পাশ্চাত্য ক্লাসিকাল ঐতিহ্যে দর্শক সব সময়ে একটি নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে ছবির দৃশ্যটি দেখবেন ; সেই স্থান বা বিন্দুটি একেবারে মাপজোক করে ঠিক করা, তার নড়চড় হবার নয় ; সুতরাং দর্শক ও দৃশ্য উভয়েই যে যার স্থানে চিত্রার্পিতবৎ স্তব্ধ হয়ে থাকবে, ঠিক যেন চলন্ত দৃশ্যের একটি খণ্ডমুহূর্তের ফটোগ্রাফ, যেখানে দর্শক বা দৃশ্য দুইই মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে, যে যেখানে আছে জমে যায়। কিন্তু অজন্তায় ঠিক বিপরীতটি ঘটে, সেখানে দর্শককে একেবারে ছবির মধ্যে প্রবেশ করানো হয়, দর্শকের স্থান ছবির মধ্যে : ছবিতে ঢুকে তিনি ইচ্ছামত

ঘুরে ফিরে বেড়ান, আস্তে আস্তে দৃশ্যের পর দৃশ্য যখন উন্মোচিত হয় তখন তিনি নিজের মত করে ঘুরে ঘুরে দেখবার জন্য আমন্ত্রিত হন ; ফলে দৃশ্যের যত কিছু জটিল ঘটনার মধ্যে তিনি মিশে যান, দৃশ্যের বাইরে দর্শক হিসেবে অস্তিত্ব তাঁর আর থাকে না।

ব্যাপারটি একবার তলিয়ে বুঝলে পাশ্চাত্য রীতির কথা মন থেকে বাদ দিয়ে ভারতীয় রীতিটি আমরা আরও খুঁটিয়ে দেখতে পারি। আরেকটি দৃষ্টান্ত নেয়া যাক। এক নম্বর গুহার ভিতরদিকের দেয়ালে যেখানে দুটি প্যাভিলিয়ন পাশাপাশি চিত্রিত আছে সে দুটি ধরা যাক। দৃশ্যটির একটি অংশে আছে রাজ অন্তঃপুরে রাজপুত্র মহাজনকের অভিষেক ; দ্বিতীয় অংশে বৌদ্ধবিহারে তাঁর তপস্যা। প্যাভিলিয়ন দুটির যে-রেখাগুলি পিছনের দিকে গেছে সেগুলি যদি আরও পিছনের দিকে বাড়ানো যায় তাহলে ফল এইরকম দাঁড়াবে ; বাড়ি দুটির রেখাগুলি সমানভাবে দুই দিকে বেরিয়ে দুটি বিপরীত বিলীয়মান বিন্দুর দিকে ধাবিত হয়েছে। তার থেকে এই সিদ্ধান্ত করতে হয় যে দর্শকের স্থান প্যাভিলিয়ন দুটির ফাঁকে গলির মত জায়গার মুখে ঠিক নয়, বরং যেন তিনি দুটি বাড়ির মাঝবরাবর ভিতর দিকে ঢুকে দাঁড়িয়ে আছেন, যার জন্য বাড়ি দুটি ভাল করে দেখতে গিয়ে তাঁকে একবার বাঁদিকে ঘুরে দেখতে হচ্ছে, সেটি দেখা হয়ে গেলে আবার ডানদিকে ঘুরে দ্বিতীয়টিকে দেখতে হচ্ছে। এই পারস্পেক্টিভ পদ্ধতিটি খুবই প্রাচীন, একে বলে প্রদক্ষিণ পরিপ্রেক্ষিত বা ইংরেজিতে রোটেশন পারস্পেক্টিভ। অসিরিয়ান এবং ব্যাবলোনিয়ান চিত্রে এবং ভাস্কর্যে এর যথেষ্ট প্রচলন ছিল। এক নম্বর গুহার চিত্রটি থেকে বোঝা যায় ভারতীয় শিল্পী এই টেকনিকটিকে কত সূক্ষ্ম ও অদ্ভুতভাবে ব্যবহার করেছেন ; আরও বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে অজন্তাশিল্পী যদি এই টেকনিকে আরও অগ্রসর হতেন তাহলে আধুনিক যুগে মাল্টিপল্ ভিশন টেকনিকে যে সমস্ত কাজ হয়েছে তার সঙ্গে অজন্তাচিত্রের খুব নিকট সম্বন্ধ দেখা যেত।



পরিশেষ

এইভাবে বিচার করলে গুপ্তযুগে অজন্তাশিল্পী কয়েকটি বিষয়ে যে চরম কাজ করে গেছেন তা স্বীকার করতেই হয়। অতীতের উত্তরাধিকারকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করে ঐতিহ্য ও প্রথাসিদ্ধরীতির যথাযোগ্য সংশ্লেষণ করে অজন্তাশিল্পী অতি অদ্ভুত নৈপুণ্যে প্রাচীরচিত্রের কাজে তাঁর শিক্ষাদীক্ষা প্রয়োগ করেন। অজন্তাশিল্পী একই সঙ্গে সমানতালে একদিকে মধ্যবর্তী পিণ্ডের দু'পাশে প্রতিসাম্যমূলক সরল কম্পোজিশন, অন্যদিকে বৃত্তাকারে সাজিয়ে যোগসূত্র রচনা কনেক্টিং-লিঙ্ক কম্পোজিশন প্রবর্তন করেন। দুই অংশের মাঝখানে যোগসূত্র হিসাবে কোন ফিগর এঁকে এক আখ্যান থেকে আরেক আখ্যানে অবলীলাক্রমে পাড়ি দেন ; অন্যদিকে আবার স্থাপত্য নিদর্শনের যথাযোগ্য যোজনায় একই কম্পোজিশনের বিভিন্ন অংশের মধ্যে এমন স্পষ্ট ভাগ করে দেন যাতে চোখের বিশ্রাম হয়, ছবিতে যতিপাত হয়। শেষে আবার একই দৃশ্যে একাধিক পরিপ্রেক্ষিত বিন্দুর অবতারণার দ্বারা অজন্তাশিল্পী ছবিকে বেগমুখর করেন, উপরন্তু দর্শককে চিত্রের মধ্যস্থলে উপস্থাপিত করেন ও চিত্রের ঘটনায় তাঁকে অংশগ্রহণ করান।

এইসব কথা একে একে আলোচনা করলে অজন্তাচিত্র এবং প্রাচীন ভারতীয় রঙ্গমঞ্চের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আবিষ্কার করা যায়। ভারতীয় রঙ্গমঞ্চেও ক্রমান্বয়ে একের পর এক দৃশ্য আসে, দুই দৃশ্যের মধ্যে কোন ফাঁক বা যতি পড়ে না, সেখানেও নটনটীর ছন্দ হয় মৃদুমন্দ ; অথচ মুখের সাবলীল হাবভাবের চেয়ে মাথা হাতের সঞ্চালনেই ভঙ্গি প্রকাশ হয় বেশি। তাই ভারতীয় রঙ্গমঞ্চের রীতির সঙ্গে অজন্তাচিত্রের যোগসূত্র কম্পোজিশনের টেকনিকের এত মিল।

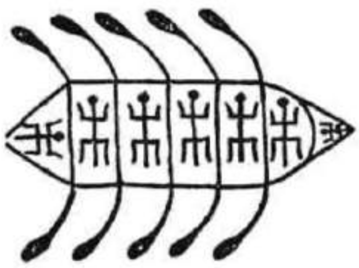
ভেবে দেখলে এই মিলে কিছু আশ্চর্য হবার নেই, কারণ ভারতের যাবতীয় রসশাস্ত্রেরই মূলসূত্র হচ্ছে এক ; ইওরোপের মত এখানে ভিন্ন ভিন্ন শিল্প যোগাযোগহীন বিচ্ছিন্ন জগতের মধ্যে আবদ্ধ নয়। ভারতীয় রসশাস্ত্রের মূল উৎস হচ্ছে ম্যাজিকে অর্থাৎ যা নয় তাই মনে করা এবং সেইমত মূল্য আরোপ করার মধ্যে। মনের গভীরে থাকলেও ভারতীয় শিল্পী একথাটি কখনও ভোলেন না। শব্দশাস্ত্র ও মুদ্রাশাস্ত্রের মত, চারুকলাতেও শিল্পী সর্বদা দেবাসুরসুলভ গুণাগুণ ফুটিয়ে তোলার জন্য ব্যস্ত ; চারুশিল্প হচ্ছে তাঁর সাধনার আধার। ঠিক এই কারণে তিনি খণ্ডিতচিত্রে কখনও সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না, এবং তার জন্যই তিনি বহুমুখী দৃষ্টি বা মাল্টিপল্ ভিশনের আশ্রয় নেন। চারুশিল্পের সূত্রানুযায়ী শিল্পী ঐশীশক্তির বাহনমাত্র, তাঁর মধ্যে দিয়েই দেবলোকের গুণাগুণ মর্তে প্রতিভাত হয়, তাঁর মধ্যে দিয়েই অর্থাৎ তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমেই ঈশ্বরের বৈভব দর্শককে সঞ্চারিত হয়। সুতরাং শিল্পী এবং নট উভয়ে সমতুল্য। নটের মতই শিল্পী জ্ঞাত বস্তুর উপর ভিত্তি করে কাজ আরম্ভ করেন, 'দৃষ্ট' বস্তুর উপর নয় ; অর্থাৎ তাঁর হাতিয়ার দর্শন নয়, জ্ঞান। তাই তিনি চোখের-চেনা-জানাটুকু প্রতিফলিত করার জন্য মোটেই ব্যস্ত হন না, তিনি ছোটেন বাস্তবের সত্যরূপটুকু ফুটিয়ে তুলতে। সে উদ্দেশ্যে উপায় উপকরণ, ভাষার ঝুলি তিনি ইচ্ছা করেই সংক্ষিপ্ত করে নেন, যা নাকি সকলেই সহজে বুঝবে, এমন কতগুলি ভঙ্গি ও রূপ বেছে নেন যা চিরপ্রচলিত, সকলের জ্ঞাত, তাদের বৈশিষ্ট্যগুলিকে তিনি ইচ্ছামত কমান, বাড়ান। নটের মত চিত্রশিল্পীরও উদ্দেশ্য হল দর্শকের মনে এমন এক ভাব বা স্বাদের সঞ্চার করা যাকে শিল্পশাস্ত্রে বলে রস। এর মূলে কিন্তু আছে বাহ্য জগতের অন্তঃস্থিত গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটনের প্রয়াস, দর্শকের স্নায়ুতে এমন এক ঐতিহ্যসিদ্ধ মানসপ্রতিমার সঞ্চার যার কৃপায় দর্শকের মনে একান্ত ব্যক্তিগত ভাব বা রসের উদ্রেক হয়। নটের মত শিল্পীরও উদ্দেশ্য হল দর্শকের মনে এমন কতকগুলি ভাবের সঞ্চার করা যা শুধু মনেরই ব্যাপার, বাস্তবে যার অস্তিত্ব নেই, অথচ মনে সঞ্চারিত হয়ে যা চিত্তশুদ্ধি ঘটাবে। অতএব রঙ্গমঞ্চের মত চিত্রেও যাবতীয় উপাদান এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যাতে প্রকৃত অকৃত্রিম রসটির সঞ্চার হয়। সম্ভবত এই ধরনের নিতান্ত আবশ্যিক কারণেই অজন্তাশিল্পী বৃত্তাকার রচনার প্রতি আকৃষ্ট হন। নৃত্যশাস্ত্রের মত চারুকলাতেও বৃত্ত বা মণ্ডলের আছে মরমী আবেগ এবং ব্যঞ্জনা, নৃত্যের ছন্দে যেমন বিশ্বসৃষ্টি হয়, তেমনি মণ্ডলের ছন্দেই হয় শিল্পীর সৃষ্টি। সুতরাং অজন্তাচিত্রে যে ধরনের কম্পোজিশন ও পারস্পেকটিভ প্রয়োগ হয়েছে তা ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রের নিতান্ত গোড়ার কথা, যার মূল সমস্যা হচ্ছে কি করে ভাবজগৎকে স্থূল প্রতিভাসে রূপান্তরিত করা যায় এবং সেই প্রয়াসই হচ্ছে ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

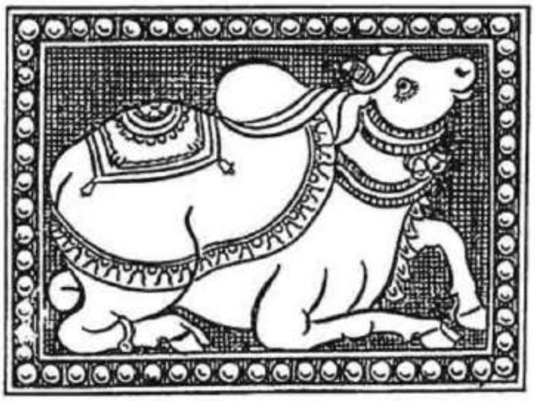
ইলোরা, কাহ্নেরি, ভাজা, বেদসা, বাঘ, বাদামী, জুনার, এলিফান্টা, অজন্তা নামগুলি যেন জপমন্ত্রের মত কাজ করে। আওড়ালে, কবি কীট্সের ভাষায় মনে হয় যেন দুস্তর ধূ ধূ সমুদ্রের ওপারে পরীর দেশের উপর জানলাগুলি যাদুমন্ত্রে খুলে গেল। সব গুহার মধ্যে দুর্লভতম মধ্যমণি হল বাঘ ও অজন্তা। তাদের চিত্ররীতির এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অজন্তা ও বাঘের নিজস্ব অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যগুলি সম্বন্ধে কিছু না বলে শেষ করা যায় না। এই আশ্চর্য সৃষ্টিরাজির সূক্ষ্ম, অলৌকিক লক্ষণ হচ্ছে, যাকে ডি. এইচ. লরেন্সের ভাষায় বলা যায়, চিত্রস্থিত নরনারীর আশ্চর্য দ্যোতনাময় দেহরেখা। সাধারণ ভাষায় যাকে আমরা দেহের আকার-রেখা বলি, এ রেখা তা নয়। ড্রয়িং বলতে যা বুঝি শুধু তাই নয়। এ হচ্ছে যাকে বলা যায় বহতা দেহলাবণ্যের সমোন্নতি-রেখা যার অস্তিত্ব পারিপার্শ্বিক মণ্ডলে কি করে হঠাৎ বিচ্ছুরিত হয়ে মিলিয়ে যায়, বোঝা যায় না। এই ধরনের মিলিয়ে যাওয়া দেহরেখা আমরা আমাদের যুগে পেয়েছি রেণোয়ারের ছবিতে।

অজন্তা গুহাচিত্রে আমরা যে সব গুণ অপর্যাপ্ত পরিমাণে পাই তার কয়েকটির উল্লেখ এখানে করা যায়। প্রথমেই ধরুন, অত্যাশ্চর্য মিতব্যয়িতায় অপরিমেয় ঐশ্বর্যের প্রকাশ। দ্বিতীয়ত, একাধিক পরিপ্রেক্ষিতরীতির যুগপৎ প্রয়োগের এত দক্ষতা নিতান্তই বিরল। তৃতীয়ত, কয়েকটিমাত্র মূল রঙের প্রয়োগে তাদের বর্ণালিবিভঙ্গের আশ্চর্য ব্যাপ্তি ও অনাহত ক্রমিক প্রকাশ। উপরন্তু রঙের বিভিন্ন মাত্রার তারতম্যে বর্ণালিবিভঙ্গের সাহায্যে এত সার্থক মড়লিং বা সুঠাম আকৃতি সৃষ্টিও একান্ত দুর্লভ। সেই সঙ্গে উল্লেখ করতে হয় অঙ্কন বা ড্রয়িং-এর উৎকর্ষ, অলঙ্কারের নয়নাভিরাম প্রয়োগ, অঙ্কনলিপির কুশলতা, নানা চাপ চাপ রঙের একের পর এক সুসমঞ্জ আরোপ ও বিন্যাস সব কিছু মিলিয়ে যা সৃষ্টি করে অনবদ্য দ্যোতনাময় চিত্ররূপ বা ডিজাইন। বুঝতে দেরি হয় না, পৃথিবীর সর্বত্র প্রাচীরচিত্র নির্মাণের জগতে কোথায় কি ধরনের চরম উৎকর্ষ ঘটেছে, অজন্তাশিল্পী আদ্যোপান্ত অবহিত ছিলেন, কি ভারতের অন্যত্র অথবা পারস্যে, মেসোপটেমিয়ায়, চীনে, মিশরে, গ্রীসে। পঞ্চমত, নতোন্নত ভাস্কর্যের গুণাগুণ বিষয়ে অসামান্য অধিকার থাকার ফলে অজন্তাশিল্পীর মনুমেন্টাল ফর্ম বা কিভাবে দেহের মাপজোপ

সার্থকভাবে বাড়াতে কমাতে হবে, সেবিষয়ে সম্যক ব্যুৎপত্তি ছিল। তার উপর পাথরকাটা গুহার দেয়ালের স্বভাবত অমসৃণ, এবড়ো-খেবড়ো গায়ে আলোছায়ার প্রতিফলন কিভাবে হতে পারে, সে বিষয়ে অজন্তাশিল্পীর সহজাত বোধ ছিল বলা যায়। ভারতীয় গুহাচিত্রের ঐতিহ্যে এই সবগুলির সমন্বয় বারংবার দেখা যায়।

সবশেষে উল্লেখ করতে হয়, সারা বিশ্বের হৃদ্‌স্পন্দনের প্রতি শিল্পীর অদম্য উৎসাহ ও শ্রদ্ধা, সৃষ্টির প্রতিটি কণার প্রতি অতুল বিস্ময়, সৃষ্ট জগতের সঙ্গে সর্বব্যাপী একাত্মতা, তুচ্ছতম খুঁটিনাটির প্রতি অগাধ উৎসাহ। এসবই সম্ভব হয়েছে একদিকে ধর্মীয় ও নন্দনতত্ত্বগত নেতিবাচক নিষেধের নানা প্রতিবন্ধক, অন্যদিকে তাঁর অভীষ্টসিদ্ধির পরিপন্থী শাস্ত্রীয় আদেশের নিগড় সত্ত্বেও। এইসব বাধা নিষেধের শিকলে বাঁধা থেকেও অজন্তাশিল্পী নির্জন ভয়াল গুহায় সারা বিশ্বের তথা দৃশ্যমান জগতের যত সৌন্দর্য, বিস্ময়, আকুলতা, গভীরতা, আসক্তি, অনুরাগ কি তাগিদে তার কাজে উজাড় করে দিলেন, ভাবলে দর্শকের মনে স্বতঃই এই প্রশ্ন বারবার না জেগে পারে না ; কি তাগিদে শিল্পী এত ঐশ্বর্যের সৃষ্টি করলেন ! সে কি ধ্যান ও ত্যাগের বাণী প্রচার করে সংসারে অনাসক্তি ঘটানোর জন্যে, না সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর প্রাণে সংসারের প্রতি অসীম মমতা ও আসক্তি নতুন করে জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে ? এককথায় বলতে গেলে, তিনি কি নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন ঐশী জগত ও মাটির পৃথিবীর মিলন ঘটাতে, স্বর্গ ও মর্ত্যের পরিণয় সাধনে ?





তৃতীয় অধ্যায়

মধ্যযুগের গুহা ও প্রাচীর চিত্র : খ্রীস্টীয় ৭০০-১৫০০

ভূমিকা

ভারতবর্ষের ইতিহাসের সন তারিখ যখন থেকে ঠিক মত স্থির হয়েছে তখন থেকে এদেশের চিত্রকলা সম্বন্ধে মোটামুটি ধারাবাহিক নজির প্রমাণ খ্রীস্টীয় ৭০০ সাল অবধি পাওয়া গেছে। কেন যে নজির প্রমাণ ভারতবর্ষের নানান গুহাতেই কেবলমাত্র পাওয়া গেছে, তাও বলেছি। তার সঙ্গে আরও দেখেছি যে প্রাচীন সাহিত্যের নানা জায়গায় ছবি সম্বন্ধে যে উল্লেখ আমরা পাই তাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে ছবি ছিল এখনকার থেকেও তখন মানুষের জীবনের নিত্য উপকরণ। প্রাসাদে, রাজদরবারে বড় বড় চিত্রশালা ত ছিলই, উপরন্তু ছিল সাধারণ বাড়িতে, নিত্যব্যবহার্য জিনিসে, যেমন হাঁড়িকুড়ি, পুতুল, সরা, মালসায়। এটাও আমরা জেনেছি যে সাত শতক পর্যন্ত চিত্র কাজের যে নমুনা এখনও আমরা পাই, তাতে তারনাথের কথা মানতে আমাদের কিছুমাত্র দ্বিধা হয় না। রঙ, রেখা, নক্‌শা, প্রতিকৃতি, আল্‌পনায় ষড়ঙ্গের সব রীতি নীতিরই যে বেশ চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়েছিল তাও বোঝা যায়।

পূর্বভারতে নালন্দার পুঁথিচিত্র ছাড়া মধ্যযুগের চিত্রকলার যা কিছু নিদর্শন পাওয়া যায় তা প্রায় সবই দাক্ষিণাত্যে। খুব সংক্ষেপে সে সব সম্বন্ধে উল্লেখ প্রয়োজন।

তাঞ্জোরের মন্দির খ্রীস্টীয় দশ শতকে তৈরি হয়। ১০১১ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ তাঞ্জোরের মন্দিরের ভিতরের পাঁচিলে কিছু ফ্রেস্কো আঁকা হয় যা স্পষ্টত অজন্তা বা বাঘ রীতির সামিল। এর পরে তেরো শতকে নায়ক রাজাদের সময়ে তাঞ্জোর মন্দিরে আবার কিছু ফ্রেস্কো আঁকা হয়। কিন্তু ইলোরার পর বিজয়নগর রাজ্য ও দক্ষিণে ত্রিবাঙ্কুরই ফ্রেস্কো রীতির ঐতিহ্য রক্ষা করে। ১৩৮৭-৮৮ সালে বিজয়নগরের রাজা দ্বিতীয় বুক্কী রায়ার মন্ত্রী ও সেনাপতি ইরুগাপ্পার আদেশে তিরুপতি তিরুমাল কুন্দরম মন্দির তৈরি হয়। এই মন্দিরের সঙ্গীত মণ্ডপের ছাতে ও দেয়ালে যে সব ফ্রেস্কো আছে তাতে অজন্তার প্রভাব যদিও গভীর তবুও কেরলদেশের প্রভাবও বেশ দেখা যায়। তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণ তীরে ছিল বিজয়নগর শহর ; উত্তর তীরে ছিল পুরনো রাজধানী আনেগুণ্ডি। এই আনেগুণ্ডির উচয়াপ্পা মঠের দেয়ালে এবং ছাতে এখনও কিছু চিত্র অবশিষ্ট আছে। এই সঙ্গে বিজয়নগরের লেপাক্ষী মন্দিরের প্রাচীর চিত্রেরও কিছু উল্লেখ করতে হয়।

তিরুপতির কুন্দরমের ছবিতে ইলোরার প্রভাব যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও দক্ষিণের পহ্লব প্রভাবও বেশ পাওয়া যায়। পহ্লব ভাস্কর্য থেকে এসেছে তন্বী ফিগর, তির্যক গতিভঙ্গির তীব্র বেগ, শরীরের বাঁকা রেখার ছন্দ। মুকুট এবং অন্যান্য অলঙ্কারও সরাসরি পহ্লব ভাস্কর্য থেকে নেওয়া। উচয়াপ্পা মঠের চিত্রে কালো সাদা বর্ণের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, তার মধ্যে প্রথম-নক্‌শার লাল সীমারেখার প্রমাণও আছে। উচয়াপ্পার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চিত্র একটি দেয়ালের কুলুঙ্গির নীল জমির উপর আট পাপড়ির একটি পদ্মফুল, তার হৃদয়টি হলদে, চারদিকে লাল। ভিতরের

ছাতে স্ত্রীপুরুষের প্যানেলও আছে, তার কম্পোজিশন খানিকটা বাঘ গুহার মত, যদিও মেয়েদের শরীরের উপরভাগ নগ্ন নয়, জামা পরা, শাড়ি কাঁধের উপর তেরছা ভাবে ফেলে ঘুরিয়ে পরা ; শরীরের ছন্দে যথেষ্ট তনু, সুকুমার, ভাব বর্তমান। হঠাৎ দেখলে মনে হয় এখনও ঐ অঞ্চলে যে সব গ্রামের স্ত্রী-পুরুষ দৈনন্দিন জীবনে দেখা যায়, তাদেরই মডল হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, বুঝতে একটুও বিলম্ব হয় না যে পোশাক, বসনভূষণ, সজ্জার পারিপাট্য, চোখের চাউনি, দাঁড়াবার ভঙ্গি, সাতশ' বছরেও বিন্দুমাত্র বদলায়নি। উচয়াপ্পার ছাতের দুটি প্যানেলের সামান্য বর্ণনা পড়লে হয়ত ভাল লাগবে। একটিতে আছে একটি ফুলফোটা ঝোপ, একটি কাঠবিড়ালী, দু'জন নারী, তাদের পায়ের কাছে দুটি ছোট অস্পষ্ট ফিগর (বোধ হয় শিশু), সঙ্গে দুটি পুরুষ। উপরের কোণে বড় বড় পদ্মফুল। বোধ হয় রাস্তা দিয়ে দুটি কৃষক পরিবার হেঁটে চলেছে। দ্বিতীয় প্যানেলে আছে একটি পালকি ; দুটি মেয়ে-বেহারা বইছে, সমুখের মেয়ে বেহারাটি পিছন ফিরে পিছনের মেয়ে বেহারাটির দিকে তাকাচ্ছে। তার পিছনে একটি ছোট ফিগর, তার হাতে একটি পদ্মকুঁড়ি। উপর থেকে পদ্মমালা ঝোলানো। এই দুটি প্যানেলের পাড় হিসাবে যে সব প্যানেল আছে তাতে আছে পদ্মলতার আল্পনা। এই ঘরেরই দেয়ালে আবার মাথায় মুকুটপরা দাড়িওলা একটি পুরুষের ছবি আছে ; উটের পিঠে সওয়ার অবস্থা, সমুখে হাতি দৌড়োচ্ছে। ছাতেরই আরেকভাগে আরও দুটি প্যানেল আছে। একটিতে কিছু লিপি আছে ; ছবির মধ্যে আছে হাতির পিঠেচড়া দাড়িওলা একটি পুরুষ। হাতিটি বড় মজার ; পাঁচটি নারীর দেহ দিয়ে হাতিটি আঁকা ; ঠিক যেমন কিছুদিন আগে পর্যন্ত অনেক বাড়িতে মানুষের ছবি দিয়ে গৃহকর্তার নাম কাঁচের ফ্রেমে বাঁধানো থাকত। এই হাতির আগে হাতে একটি কাপড় নাড়তে নাড়তে চলেছে আরেকটি নারী। উপর থেকে সারি সারি পদ্মমালা ঝোলানো। দ্বিতীয় প্যানেলে আছে ঐ ধরনেরই ছবি, একই ধরনের দাড়িওলা একটি পুরুষ, পাঁচটি নারীর শরীর দিয়ে আঁকা একটি ঘোড়ার পিঠে চলেছেন। উপর থেকে পদ্ম ঝোলানো, চারপাশে পদ্ম ছড়ানো, ঘোড়ার সমুখে হাতে ছাতি ধরে একটি মেয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে, আরেকজন মেয়ে পাখা হাতে আসছে ঘোড়ার পিছনে।

ত্রিবাঙ্কুরের চিত্রকলার যা কিছু অবশিষ্ট আছে তা আরও পুরনো। সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায় দক্ষিণ ত্রিবাঙ্কুরের পাহাড়ের গা কেটে তৈরি তিরুনান্দিক্করা গুহামন্দিরে। গুহাটির তারিখ খ্রীস্টীয় নয় শতক। ভিতরের গা এককালে নিশ্চয় ফ্রেস্কোয় মোড়া ছিল। অবশ্য অধিকাংশই এখন লুপ্ত হয়েছে। সাতটি প্যানেলের কিছু কিছু এখনও আছে। তাদের নকল ত্রিবান্দ্রামের সরকারি চিত্রশালা শ্রীচিত্রালয়মে রক্ষিত আছে।

সন তারিখ হিসাবে তার পরের নিদর্শন আমরা পাই ত্রিবান্দ্রামের শ্রীপদ্মনাভস্বামী মন্দিরের তিরুভম্পতি বলে উপমন্দিরের দেয়ালে। মন্দিরগুলির কিছুটা ১৩৭৫ সালে ত্রিবাঙ্কুরের রাজা আদিত্যবর্মা সর্বাঙ্গিনাথের রাজত্বকালে নির্মিত। ছবিতে ফিগার অধিকাংশই মেয়েদের, তাদের পরনে বিচিত্র বসন, অঙ্গে নানারকম অলঙ্কার। একটি প্যানেলে কয়েকটি মহিলা নানারকম বাদ্যযন্ত্র নিয়ে জলসা করছেন ; বাঘের হল্লীসকের কথা মনে পড়ে যায়।

উত্তর ত্রিবাঙ্কুরে এট্টমানুর বলে একটি শৈব মন্দির আছে। এটির সিংহদ্বার বা গোপুরমে একটি চিত্র আছে। চিত্রটি ষোল শতকের পরের নয়। ডঃ কুমারস্বামী একবার ছবিটিকে 'প্রাচীন দ্রাবিড় চিত্রকলার একমাত্র নিদর্শন' বলেন। ফ্রেস্কোটি ১২ ফিট লম্বা, ৮ ফিট চওড়া। মন্দিরের বয়স ষোল শতক, সুতরাং ছবিটিও বোধ হয় সমসাময়িক। নটরাজের চিত্র।

ভাইকোমের শিব মন্দিরের গর্ভগৃহে এই যুগের কিছু ফ্রেস্কোর অবশিষ্ট এখনও আছে। প্রায় কুড়িটি প্যানেল আছে, তাতে সবসুদ্ধ প্রায় চল্লিশটি দেবদেবীর ফিগর আছে।

ত্রিবাঙ্কুরে ফ্রেস্কো চিত্রকলার স্বর্ণযুগ আসে সতেরো আর আঠারো শতকে। এই সময়ে পদ্মনাভপুরম বলে ত্রিবাঙ্কুরের একটি রাজধানী স্থাপিত হয়। পদ্মনাভপুরমের চারতলা প্রাসাদের সর্বোচ্চ তলায় একটি ঘরের চারদেয়ালে একান্ত স্থানীয় দেশজরীতিতে পঞ্চাশটি পৌরাণিক চিত্র আঁকা হয়, সেগুলি এখনও আছে। এরকম সম্পূর্ণ ফ্রেস্কো ভারতবর্ষের খুব কম স্থানে আছে। প্রাসাদ চিত্রিত হবার কিছু পরে তিরুভত্তরের আদি কেশব মন্দিরের দেয়ালেও কিছু ছবি আঁকা হয়। এগুলির তারিখ সতেরো শতকের গোড়ার দিকে। অনেকগুলি নষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু এখনও বেশ কিছু আছে। আঠারো শতকে দ্রাবিড় ফ্রেস্কোর পরিপূর্ণতা আসে ত্রিবান্দ্রামের পদ্মনাভস্বামী মন্দিরে। এগুলি আঠারো শতকের প্রথম ভাগে আঁকা। এদের রীতি একেবারে দেশজ। ছবি দেখলেই বোঝা যায় ভারতের অন্যত্র কোথাও এ রকম ছবি হয়নি। তাছাড়া উল্লেখযোগ্য ফ্রেস্কো আছে ত্রিচুরের গুরুভায়ুর মন্দিরের বাইরের ও ভিতরের দেয়ালে, ভাইকোম আর এট্টমানুরের কাছে মূলাকুলমের তিরুমুঝিকুলমে,

অরুণমালার বিষ্ণুমন্দিরে, ত্রিবান্দ্রামের দুর্গের প্রাসাদে, কৃষ্ণপুরম প্রাসাদে, মান্নারের পনয়ন্নরকভু মন্দিরে।

মধ্যযুগের ভাস্কর্য ও চিত্র

তবুও বলতে হয় সাত শতকের পর ভারতের প্রাচীরগাত্রস্থ চিত্রধারা হঠাৎ ক্ষীণ হয়ে যেন হয় থেমে গেল, না হয় হারিয়ে গেল। সাত শতকের পর ভারতবর্ষে যেই বৌদ্ধধর্মের প্রভাব কমতে আরম্ভ করল, বড় সাধারণগম্য ছবিও গেল কমে। এমন কি এও বলা যায় সাত শতক থেকে চোদ্দ শতকের মধ্যে আঁকা খুব বেশি ছবির হদিশ আমরা পাই না। যা কিছু আছে সে অবশ্য কিছুটা মন্দিরের দেয়ালের গায়ে ও পুঁথির চিত্রে ; সেগুলিও খ্রীস্টীয় চোদ্দ শতকের খুব আগেকার নয়। পুঁথিচিত্র অবশ্য তার আগে থেকেই বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। কিন্তু এও বিশ্বাস করা অসম্ভব যে চিত্রকলা বৌদ্ধধর্মেরই একচেটিয়া ছিল, এবং বৌদ্ধধর্মের পরাজয়ের পর বিশেষভাবে উত্তর ভারতে প্রাচীরে আঁকা চিত্ররীতিও লুপ্তপ্রায় হল। কারণ ঠিক এই মধ্যযুগেই (খ্রীস্টীয় সাত থেকে পনেরো শতক) এল ভারতীয় স্থাপত্য আর ভাস্কর্যের স্বর্ণযুগ ; ভারতের যত বিখ্যাত বিখ্যাত মন্দির, যত বিখ্যাত বিখ্যাত ভাস্কর্য তার অধিকাংশ এই যুগেই হয়েছে, এবং যেহেতু ভারতীয় ভাস্কর্যের সঙ্গে ভারতীয় ছবির আশ্চর্য মিল, সেহেতু এটা মানতে বাধে না যে ছবিও নিশ্চয় ছিল। হয়ত এ যুগে ছবি বেশি আঁকা হত বসত বাড়ির দেয়ালে, অথবা তালপাতায়, অথবা কাগজে, যা অযত্নে, জলহাওয়ার দোষে নষ্ট হয়ে গেছে। বসত বাড়ির দেয়ালে ছবি আঁকার ঐতিহ্য উত্তর, পশ্চিম, মধ্য ও পূর্ব ভারতে কয়েক শ' বছর ধরেই প্রচলিত আছে সন্দেহ নেই, বিশেষত ধনীব্যক্তি, রাজামহারাজার প্রাসাদগৃহের ভিতরের দেয়ালে। এও ঠিক যে এযুগে স্থাপত্য, ভাস্কর্য চরমে উঠেছিল বলে ছবিকেও যে সেই সঙ্গে উঠতে হবে তার কোন মানে নেই। বরং এও সম্ভব যে চার-পাঁচ শ' বছর ধরে ভারতের সর্বত্র মন্দির আর মূর্তি গড়ার এমন ঢেউ এল যে শিল্পীরা শাশ্বত আকারে, অর্থাৎ পাথরে বা পোড়া মাটির ইঁটে বা টালিতে নিজেদের প্রতিভার প্রমাণ রেখে যেতে ব্যস্ত হলেন বেশি ; যে জিনিস লোকের ব্যবহারে, অল্প অযত্নে, হাত, ধুলোবালি, জলহাওয়ায় সহজে নষ্ট হয়ে যায় সেদিকে নজর দিলেন কম। চিত্রিত বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দুগুহার একটি চলনসই তালিকা আগেই দিয়েছি, সবেতেই ভাস্কর্যের সম্ভার ছবির সম্ভারের চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু মধ্যযুগে যত মন্দির তৈরি হয়েছিল তার যদি বর্ণনা না দিয়ে শুধু তালিকাই দিই, শুধু জায়গাগুলির নাম করে যাই তাহলেও বহু পৃষ্ঠা হয়ে যাবে, তবুও শেষ হবে না। ভারতীয় মন্দিরের গায়ে যেসব ভাস্কর্য পাওয়া যায় তার মধ্যে অধিকাংশই বেস-রিলিফে খোদাই সে কথা আগেই বলেছি। বেস-রিলিফ বা নতোন্নত ভাস্কর্য হচ্ছে সেই ধরনের খোদাই যা মানুষের শরীর যতখানি পুরু তার অর্ধেকেরও কম গভীর করে খুদে পাথরের গা থেকে বের করা। অর্থাৎ যদি ধরা যায় মানুষের বুকের খাঁচা সাধারণত আট ইঞ্চি পুরু, বেস-রিলিফের রীতিতে পাথরে মানুষের মূর্তি খোদাই করার সময়ে মূর্তিটি চেঁচে ফেলা জমি থেকে চার ইঞ্চি বা তারও কম জাগিয়ে রাখলেই হবে। সেই সঙ্গে যাকে বলে হাই-রিলিফের ভাস্কর্যের প্রাচুর্যও কম নয়। হাই-রিলিফ বলে সেই ভাস্কর্য যাতে শরীরের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ ভাগই সুডৌল খোদাই করে পাথর থেকে বার করে দেখানো হয়। বাকি এক-চতুর্থাংশ আদি পাথরে একাত্ম হয়ে থাকে। বেস-রিলিফের নীতিতে মানুষের সম্বন্ধে প্রযোজ্য এই মাপের সঙ্গে মিলিয়ে আনুষঙ্গিক অন্যান্য মূর্তিও খোদাই করতে হবে। ভারতীয় ভাস্কর্যে এই বেস-রিলিফের প্রাধান্য খুব বেশি। যাকে বলে পুরোটি খোদাই করা, অর্থাৎ ইংরেজিতে 'স্কাল্পচার ইন দা রাউণ্ড', বা সমস্ত শরীরটি পুরোপুরি, সবটুকু গভীরত্ব রেখে, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, গভীরতায় সমস্তটা খুদে মূর্তি করা, ভারতীয় মন্দির শিল্পে তারও প্রমাণের অভাব যেমন একদিকে নেই, তবু একথা স্বীকার করতে হয় যে এ দেশের ভাস্কর্যে বেস-রিলিফের কাজই প্রায় শতকরা আশিটা। সমান জমির উপর রঙ রেখায় আঁকা ছবির গুণ বেস-রিলিফে আনা খুব সহজ। প্রথমত, বেস-রিলিফ হলেই পাথরের গা খোদাই করে গর্ত করে জমি তৈরি করে নিতে হবে, যার উপরে ভাস্কর্যটি উঁচু হয়ে জেগে থাকবে। সুতরাং জমি এইভাবে তৈরি করতে গেলেই ছবির মত একটি চৌহদ্দি বা ফ্রেম আপনা আপনিই খোদাই হয়ে সর্বপ্রথম পাথরের গা থেকে তফাৎ হয়ে যাবে, যার মধ্যে খোদাই করা মূর্তি আটকা পড়ে থাকবে। দ্বিতীয়ত, ছবিতে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, গভীরত্ব আনার জন্যে, যাতে ছবির প্রাণীটি তার সমস্ত অস্থি মজ্জা কঙ্কাল, সমস্ত ওজন সমস্ত গভীরত্ব নিয়ে দাঁড়াতে পারে তার

জন্যে, চিত্রশিল্পীকে শিখতে হয় ছবির মড়লিং, ফোরশর্টনিং, পরিপ্রেক্ষিত, যে দেহ নড়ে-চড়ে চলে-ফিরে বেড়াচ্ছে তার বিশেষ একভঙ্গিতে দেখা রূপ, যা দেখেই মনে হবে যে সে দেহের রূপ পর মুহূর্তে একটু নড়লেই বদলাবে। এইসব গুণ ছবির মধ্যে এনে ধরে রাখতে হলে দরকার হয় রেখা, রঙ, রঙের গাঢ়-ফিকে করা অথবা বিরোধ ঘটানো, রেখার বৈচিত্র্য, যার মধ্যে দিয়ে সমান কাগজের জমির উপর পারস্পেক্টিভ, গভীরত্ব, আকার, গড়ন, রূপ ফুটে ওঠে। চিত্রকারের প্রধান সমস্যা হচ্ছে বস্তুর উপরে আলো পড়লে বস্তুটির অনুমান চোখে কি রকম লাগবে তা সম্যকভাবে জানা এবং ছবি এঁকে তা দেখানো। এই সমস্যা বহুগুণ কঠিন হয় যদি বস্তুটি সজীব হয় এবং মুহূর্তে নড়াচড়ার ফলে তার গায়ের অসংখ্য সমতলে বা স্তরে আলোছায়া নড়ে-চড়ে খেলে বেড়ায়। তখন সমস্যা হয় ঠিক কোন অবস্থায় শিল্পী বস্তুটিকে তুলিতে ধরে নিয়ে ছবির জমিতে বেঁধে দেবেন। আবার, বলা বাহুল্য আলোছায়ার হেরফেরে রঙও বদলায়, টকটকে লালে একদিক থেকে আলো পড়লে দেখায় টকটকে লাল, আরেকদিক থেকে পড়লে দেখায় গাঢ় বা বেগ্‌নে লাল, তৃতীয় কোন দিক থেকে আলো পড়লে হয়ত দেখায় কালো বা কালচে ব্রাউন। সে সবও আরেক সমস্য। চিত্রে রঙ আর রেখার মধ্যে দিয়ে আলোছায়ার যে সমস্যার সমাধান করতে হয়, অর্ধখোদিত ভাস্কর্য বা বেস-রিলিফে অথবা পুরোপুরি চার-তরফ খোদাই করা ভাস্কর্যেও সে সমস্যার সমাধান করতে হয়, কিন্তু অন্য প্রকারে। তখন ভাস্করের সমস্যা হয় কোন জায়গার কতখানি খোদাই করে কি ধরনের সমতল বা স্তর বার করা হবে, যার উপর এই এইভাবে আলো পড়লে কি ধরনের দেখাবে, তার উপরে আলোছায়ার খেলা কত রকম হতে পারে। বেস-রিলিফে খোদাই আর সমান জমিতে ছবি তৈরির সমস্যা



কতকটা এক, অন্তত আলোছায়া কায়দা করার ব্যাপারে। কারণ ছবিতে যত ভাল মড়লিংই হোক, কখনও তা দেখে মনে হবে না যে সেটি পুরোপুরি ছবির সমান জমি থেকে বেরিয়ে এসে সরাসরি সশরীরে আমাদের চারিদিকে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে। খুব জোর যদি হয় তবে মনে হবে সৃষ্টির খানিকটা এক জায়গায় কিছুটা গেঁথে আটকে রেখেছে। যত ভাল পারস্পেক্টিভই হোক তবুও মনে হবে চোখই একের পিছনে আরেক জিনিস সবটুকু অনুমান করে নিচ্ছে, অথচ সত্যই জিনিসগুলি ওখানে একের পিছনে অন্যটি নেই, অর্থাৎ একটির পিছনে আরেকটিকে ঘুরে ফিরে দেখা যাবে না। বেস-রিলিফেও তাই বস্তুগুলি আলাদা আলাদাভাবে ঘুরে ফিরে চারদিক থেকে দেখা যাবে না, সেগুলি একত্র করে যেন এক জায়গায় একটি চৌহদ্দির মধ্যে গাঁথা, খানিকটা জেগে বেরিয়ে আছে, বাকিটা ঢুকে গেছে, যার উপরে আলোছায়া পড়ে প্রতি মুহূর্তে নানা রকম অনুমানের সৃষ্টি করছে। ভারতে বেস-রিলিফের প্রাচুর্যের দরুন বলা শক্ত ভাস্কর্য থেকে ছবি এসেছে, না ছবি থেকে ভাস্কর্য এসেছে, দুটি এতই একান্তভাবে অন্যোন্যনির্ভর, আর দুটি শিল্পেরই নিজ নিজ সমস্যার মধ্যে এত রকম মিল। এজন্য অধিকাংশ বেস-রিলিফে ছবিত্ব গুণ খুব সুস্পষ্ট। ভাল ভাল হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের ঘরে টেবিলের উপর একরকম আলো ঝোলানো থাকে, তাকে বলে ছায়াহরণ আলো (ইংরেজিতে শ্যাডোলেস ল্যাম্প), যার তলায় কাটাকুটি করার সময়ে কোন জায়গায়ই কোন গভীর ছায়া পড়ে না। স্বাভাবিক আলোয় তোলা ছাপা ফোটোতে ভারতীয় বেস-রিলিফের ছবিসুলভ গুণ খুব স্পষ্ট নজরে পড়ে। তার উপরে যদি এই ধরনের ছায়াহরণ আলো দিয়ে ছবি তোলা যেতে পারত তাহলে বোধহয় ভারতীয় ছবির সীমারেখা শেডিং-এর রীতির সঙ্গে বেস-রিলিফের আরও বেশি মিল ধরা পড়ত। আবার যে সব খোদাই বেস-রিলিফের চেয়েও কম গভীর, যেমন পূর্বভারতের মন্দিরের টালি বা পাটা, যথা বাংলায় মন্দিরের টালি, সে পাহাড়পুরেরই হোক বা বিষ্ণুপুরেরই হোক—সে সবে ছবিত্বগুণ ভাস্কর্যগুণকে ছাপিয়ে গেছে। সুতরাং একথা অনায়াসে বলা যায় যে মধ্যযুগের চিত্রের নমুনা এখন খুব কম থাকলেও, তার চরিত্র এবং গুণাগুণ কি রকম ছিল তাঁর আন্দাজ আমরা ভারতীয় মন্দিরের বেস-রিলিফে বিলক্ষণ পাই। তাছাড়া পাই ইঁটের মন্দিরের টালিতে,

এনামেলের উপর চিত্রকরা রঙীন টালিতে, পুঁথিতে, আর কিছু কিছু জায়গায় মন্দিরের দেয়াল চিত্রে। তবুও এব থেকেই যায় যে মধ্যযুগের ছবির নিদর্শন এখন ভারতবর্ষে খুব বেশি নেই। ভারতে না থাকলেও আশেপাে দেশের ছবিতে ভারতীয় মেজাজের ছবি বেশ দেখা যায়। দুটি দেশে ভারতীয় চিত্রের সঙ্গে মিল খুব সুস্পষ্ট, এব পূর্ব তুর্কীস্থান বা খোটান, অন্যটি তিব্বত। খোটান একসময়ে ভারত সাম্রাজ্যের মধ্যে ছিল, এবং অরেল স্টা আর ল' কক বহু পরিশ্রমে যে সব নজির প্রমাণ বার করেছেন তাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে খ্রীস্টীয় প্রথম কে শতকে খোটানে, গ্রীক, ভারতীয়, পারসিক আর চীনে সভ্যতার খুব আদান-প্রদান ঘটে। খোটান এবং মধ্য এশি থেকে দু'জন পণ্ডিত যে সমস্ত চিত্রের নমুনা উদ্ধার করেছেন তা দেখে বিস্মিত হতে হয়। খোটানের গুহাচিে অধিকাংশই টুনহুয়াঙ ও অজন্তার কথা মনে পড়িয়ে দেয়, এবং এটা মনে রাখা দরকার যে খোটানের গুহা অজন্তার পরে (খ্রীস্টীয় আট শতকে) আঁকা। খোটানের ছবি বৌদ্ধ, তার রেখার দার্ঢ্য আর দক্ষতা স্পষ্টই ি থেকে পাওয়া এবং অজন্তার সঙ্গেও তার বেশ মিল। সেই হিসাবে ভারতীয় চিত্রশিল্পের ইতিহাসে যে যুগের নমুনা আমাদের হাতে বিশেষ নেই, ঠিক সেই যুগে খোটানে ছবিতে কি ঘটছিল তা দেখে আমরা ভারতের অবস্থার খানিকটা আন্দাজ করতে পারি। স্টাইন আর ল' কক দেখিয়েছেন কিভাবে মধ্যযুগে খোটান ছিল অনেকগুলি সভ্যতার মিলনস্থল। অর্থাৎ খোটানের চারপাশের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন চিত্ররীতির আলাদা আলাদা নমুনা খোটানে খুব স্পষ্টভাবে পাওয়া গেছে। তার মধ্যে দণ্ডন-উলিখ বলে একটি জায়গায় ও তার আশেপাশে যে সব ফ্রেস্কো বা প্রাচীর চিত্র আবিষ্কার হয়েছে, তাদের তারিখ খ্রীস্টীয় আট শতকের পর থেকে। অরেল স্টাইন খোটান থেকে কিছু প্রাচীর চিত্র বা ফ্রেস্কো অতি সযত্নে উদ্ধার করে আনেন। তার কিছু সংরক্ষিত আছে দিল্লির জাতীয় মিউজিয়মে ও আর্কিয়লজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার পুরাতত্ত্ব বিভাগের সংগ্রহালয়ে। এগুলি তাঁর লেখা বইয়ে প্রকাশিত হয়েছে।



সেগুলি দেখে একদিকে টুনহুয়াঙের শিল্পী অন্যদিকে অজন্তার শিল্পীর আঁকা বলে ভুল হলে কিছু দোষ হয় না, কিছু কিছু জায়গায় তুলির কাজ এতই এক ধরনের। খোটানেরই চিউ-জি বলে একটি জায়গায় ল' কক কতগুলি চিত্র-করা ধ্বজা আবিষ্কার করেন, যা তিব্বতী ধ্বজার (টাংকা) সামিল। টাংকার ইতিহাস নিশ্চয় খুব প্রাচীন, কিন্তু এ পর্যন্ত তিব্বত থেকে খুব কম টাংকাই পাওয়া গেছে যা নাকি খ্রীস্টীয় সতেরো শতকেরও আগে তৈরি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ও পরে ইটালিয়ান পণ্ডিত জুসেপ্পে তুচ্চি একাধিক খণ্ডে 'টিবেটান স্ক্রোল পেন্টিং' বলে একটি বহুমূল্য বই প্রকাশ করেছেন, তাতে টাংকা বা অন্যান্য তিব্বতী চিত্রের কয়েকটি প্রাচীন নমুনার ছবি ছাপিয়েছেন। কিন্তু তিব্বতে যা পাওয়া গেছে তার কোনটাই চিউ-জির ধ্বজার চেয়ে প্রাচীন বলা যায় না, কারণ চিউ-জির ধ্বজাগুলি খ্রীস্টীয় আট শতকের, তাতে টাংকা শিল্পের প্রাচীন রীতিনীতির হদিশ পাওয়া যায়। টাংকা যে সে সময়ে শুধু তিব্বতে বা খোটানেই হত তা নয়, ভারতবর্ষেও যে হত তার উল্লেখ পাই এগারো শতকের এক সমালোচকের লেখায়, তাঁর নাম টেং-চুন, তিনি সে সময়ে বাংলার অন্তর্গত নালন্দা বিহারে এসেছিলেন। তিনি লিখে গেছেন যে 'নালন্দার শ্রম পশ্চিম দেশের কাপড়ের উপর বুদ্ধ আর বোধিসত্ত্বের ছবি আঁকেন।' খ্রীস্টীয় দশ শতকেরও আগে থেকে তিব আর বাংলার মধ্যে যে বেশ আদান-প্রদান ছিল তার অনেক প্রমাণ আছে।

তিব্বতের বিহার আর মন্দিরের দেয়ালে চীনে বা অজন্তা রীতিতে যে অনেক ফ্রেস্কো আঁকা হত, তার প্রমা অভাব নেই। সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই যে এখনও যে সব প্রাচীন তিব্বতী বিহার বা মন্দিরের দেয়ালে ফ্রে

বর্তমান সেগুলিতে চীনে এবং অজন্তা রীতির ছাপ সুস্পষ্ট। তিব্বতী টাংকার সঙ্গেও প্রাচীন অজন্তা চিত্ররীতির মিল আছে। কারণ এক হিসাবে টাংকাকেও ফ্রেস্কো বলা যায়, যেহেতু সেগুলি মোটা চট বা কানাতের উপর টেম্পেরায় আঁকা, প্রাচীর চিত্রে জমি যেভাবে তৈরি।

অজন্তার ছবির রঙের কথা সামান্য বলেছি। বৌদ্ধ শিল্পী সর্ব প্রথমে ছবির মড়ল করে নিতেন পরিষ্কার একরঙা শীতল ছাইরঙে, যার মধ্যে দিয়ে ছবির গভীরত্ব ফুটে ওঠে। এটি হল ছবির কোরা অবস্থা। তার উপরে দিতেন মাংসের রঙের গোলাপী টলটলে রঙ, তাতে ফল দাঁড়াত একধরনের উষ্ণ, স্বচ্ছপ্রায় ছাই রঙ। এই ধরনের অনুপান অবশ্য সব ক্ষেত্রে চলত না, যেমন আদিবাসী বা হাবসীর গায়ের রঙ হত কালো, ব্যাধের রঙ হত গাঢ় লাল। রঙের বহু বৈচিত্র্য ছিল, যেমন ১৭নং গুহায় মহাহংস জাতক থেকে আঁকা ছবিটিতে হাল্কা রঙের শরীরগুলি গাঢ় সবুজ শূন্যের পটভূমিতে গ্রুপ করে আঁকা, যে গাঢ় সবুজ নীচের দিকে প্রায় কালো হয়ে গেছে। এর উপর নানা ছোটখাটো বস্তু নানা রঙে আঁকা, যার ফলে সমস্তটা জোরালো দেখালেও, অতিরঞ্জিত মনে হয় না। ছবির নীচের দিকটা সবুজ রঙের নানা পর্দায় মিলিয়ে আঁকা, যাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মাঝে মাঝে সাদা আর নরম লাল রঙে আঁকা কিছু কিছু অংশ দিয়ে।

অজন্তার একটি ছবির রঙের সামান্য একটু অবতারণার মধ্যে দিয়ে আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে অজন্তার ছবিতে এমন কোন হিসাবের সন্ধান মেলে না যাতে মনে হয় কোন বিশেষ জিনিসের কোন বিশেষ ধরনের ভাব ফোটাতে গেলে, এক বিশেষ রঙ দিতেই হবে। অর্থাৎ বিষয় হিসাবে ছবির ভিন্ন ভিন্ন অংশে রঙের বাঁধা গৎ তখনও তৈরি হয়নি। কিন্তু তার কিছু পরেই তিব্বতী ছবিতে কখন, কিসে, কোন বিষয়ে, কি ধরনের বস্তুতে বা ভাববিন্যাসে কি রঙ ব্যবহার করতে হবে তার প্রায় বাঁধাধরা ছক তৈরি হয়ে গেল। খ্রীস্টীয় সাত শতকে তিব্বতের রাজা সংসান গাম্পোর আদেশে তিব্বতী ভাষায় বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ে একটি বই প্রণীত হয়, তার নাম মনিকাজুম। তাতে বিখ্যাত 'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ' মন্ত্রটির বিশ্লেষণ করে বলা হয় যে এই মন্ত্রটি বার বার উচ্চারণ করলে জীব ছয় অবস্থার যেটিতেই থাকুক তার প্রতিটি থেকেই পুনর্জন্মের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে। ছয় অবস্থা হচ্ছে, দেব, অসুর, মানুষ, জন্তু, ভূত, আর নরকস্থ অধিবাসী। মন্ত্রটির প্রতিটি শব্দের আবার ভিন্ন ভিন্ন প্রতীক রঙ আছে, যেমন ওঁ অথবা স্বর্গীয় অবস্থার রঙ হচ্ছে সাদা (যার মধ্যে সব রঙই আছে), ম অর্থাৎ অসুর অবস্থার রঙ হচ্ছে নীল ; নি বা মানুষী অবস্থার রঙ হল্‌দে : পদ্ বা জন্তুর অবস্থার রঙ সবুজ ; মে বা আশাহীন ভূতের অবস্থার রঙ হচ্ছে লাল ; হুঁ অথবা নরকস্থ অধিবাসীর রঙ কালো। বৌদ্ধদের কাছ থেকে হিন্দু শিল্পীদের মধ্যেও ক্রমশ বিভিন্ন রঙের আলাদা ছক কাটা মানে স্থির হয়ে যায়। যেমন বৌদ্ধ আর হিন্দু দুই রীতিতেই সাদা রঙ মানে স্বর্গীয় শুভ্রতা ও শান্তি। হিন্দু চিত্রে সাদা শিব ও হিমালয়ের রঙ, শিবের স্ত্রী পার্বতীরও রঙ। সাদা আবার জলেরও রঙ। আকাশের রঙ হচ্ছে নীল ; নীল বিষ্ণু, কৃষ্ণ, রামের রঙ, প্রত্যেকেই ছিলেন পালক আর রক্ষক। বৌদ্ধদের মতে হল্‌দে হচ্ছে মানুষী অবস্থার রঙ, তাই বৌদ্ধ শ্রমণরা হল্‌দে রঙের পোশাক পরেন। বুদ্ধ, মৈত্রেয়, মঞ্জুশ্রীর দেহের রঙ সোনালী হল্‌দে ; পৃথিবীর প্রতীকও আবার হলুদ রঙ। বৌদ্ধদের মতে প্রাণী অবস্থার রঙ সবুজ, হিন্দুদেরও তাই। বৌদ্ধদের আশাহীন ভূতের অবস্থার রঙ লাল। হিন্দুদের কাছে লাল হচ্ছে সূর্য বা ব্রহ্মা বা সৃষ্টিকর্তা আর সৌরমণ্ডলের রঙ, যে মণ্ডলে মর্ত্যজীবনের শেষে অদেহী আত্মারা বাস করেন। বৌদ্ধ পুঁথিতে পড়া যায় যে সম্রাট হর্ষের বাবা প্রতিদিন একটি চুনির পাত্রে নিজেরই হৃৎপিণ্ডের মত লাল এক গুচ্ছ পদ্মফুল সূর্যদেবকে অর্ঘ্য দিতেন। লাল, সাদা আর নীলের সংযোজনে হয় হিন্দু ত্রিমূর্তির সৃষ্টি (ব্রহ্মা শিব আর বিষ্ণু), অথবা এই মূর্তিরই বৌদ্ধ সংস্করণ। বৌদ্ধদের কাছে নরকস্থ অধিবাসীর রঙ হচ্ছে কালো। হিন্দুদের কাছে কালো হচ্ছে ব্যাপ্তচরাচরের প্রতীক, হিন্দুশাস্ত্রমতে সৃষ্টির আগে রূপহীন নিরবস্থার রঙ ছিল কালো, যার থেকে কালীর রঙ হয় কালো, যিনি একদিকে আদ্যাশক্তি, অন্যদিকে সংহার শক্তি।

রঙের ছক ঠিক হয়ে যাবার পর আসে নানারকম ভঙ্গি আর মুদ্রার ছক, যার ফলে সৃষ্টি হয় বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু মূর্তি নির্মাণের নানা চুলচেরা বিধি প্রকরণ। এই মূর্তি নির্মাণের বিধি প্রকরণকে ইংরেজিতে বলে আইকনোগ্রাফি। অবশ্য মূর্তি নির্মাণের বিধি প্রকরণ যে শুধু প্রাচ্যেই প্রচলিত ছিল তা নয়, পশ্চিমে অর্থাৎ ইওরোপেও বিলক্ষণ ছিল।

পশ্চিম দেশ অর্থাৎ মাড়োয়ারে রাজা শিলা বা শিলাদিত্য গুহিলের সময়ে প্রাচীন যুগের যক্ষরীতির পুনরাবৃত্তি সম্বন্ধে তিব্বতী পণ্ডিত তারনাথ কি লিখে গেছেন সে সম্বন্ধে আগের অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি। ভারতীয়

চিত্ররীতিতে চীনে প্রভাব কত বেশি তারও কথা সংক্ষেপে বলেছি, কি করে পশ্চিমদিকে মধ্য এশিয়া এবং পারস্যের মধ্যে দিয়ে এই প্রভাবের আদান-প্রদান চলে ; মধ্যদেশে নেপাল তিব্বতের মধ্যে দিয়ে, পূর্বদেশে ব্রহ্মপুত্র নদের তীর ধরে ধরে আসাম, মণিপুর, পূর্ববঙ্গের মধ্যে দিয়ে। দুঃখের বিষয় রাজপুতানায় অথবা রাজস্থানে খুব প্রাচীন প্রাচীর চিত্র বা ফ্রেস্কো একটিও অবশিষ্ট নেই। বিকানীরের পুরাতন প্রাসাদে শুধু সতেরো শতকের প্রথম দিকে আঁকা প্রাচীর চিত্র এখনও কিছু বাকি আছে। একটি ছবিতে চীনে প্রভাব খুব স্পষ্ট, বিশেষত মেঘ আর বিদ্যুতের নক্‌শায় চীনে প্রভাব খুবই প্রকট। দূর প্রাচ্যের প্রভাব রাজস্থানী চিত্রশিল্পে থেকে থেকে প্রায়ই এসেছে, বিশেষত বিকানীরে। বিকানীরের গালার কাজ করা পুরনো ঢালে যে সব মেঘের ছবি আছে সে মেঘ ভারতবর্ষের নয়, পুরোপুরি চীনের। উদয়পুরে জলের মাঝখানে প্রাসাদগুলির দেয়ালে যে সব চিত্র সেগুলি আঠারো শতকের হলেও তাতেও চীনে প্রভাব সুস্পষ্ট। চীনে প্রভাব পাহাড়ী ছবিতেও আছে। কিন্তু রাজপুত ছবিতে চীনে প্রভাব হঠাৎ আসে, পারসিক বা মুঘল ছবির মত অত স্থায়ী আর চরিত্রগত নয়। আনন্দ কুমারস্বামী মনে করেন যে রাজপুত ছবিতে চীনে প্রভাব নৌ বাণিজ্যের ফল। কারণ গুজরাটে চিরকালই চীনে পণ্য আমদানী হয়েছে, এখনও হয়, ফলে এখনও পশ্চিম ভারতের বহু জায়গায় মাঝে মাঝে ছুঁচের কাজ করা কাপড়ে বিশুদ্ধ ভারতীয় কাজের পাশাপাশি বহু প্রাচীন চীনে কাজও দেখতে পাওয়া যায়।

সংক্ষেপে এই প্রসঙ্গের অবতারণা করলাম শুধু এই বলার জন্যে যে ইতিহাসের প্রথম যুগে ভারত আর চীনের চিত্ররীতি নীতিতে যে আদান-প্রদান শুরু হয় তা যুগ যুগ ধরে চলে এসেছে, যার প্রথম প্রমাণ পাই অজন্তার চিত্রে। কিন্তু এখানে আমার প্রধান বক্তব্য হচ্ছে যে মধ্যযুগে এবং তারপরে রাজপুত ছবি যে ভাবে আঁকা হত, সেই আঁকার পদ্ধতিতে অজন্তার পদ্ধতিই নিযুক্ত হত। রাজপুত ছবিও মুখ্যত রেখারই ছবি। সে ছবির ভাষা হচ্ছে খুব প্রাণবন্ত, বলিষ্ঠ, প্রাচীন রেখা। রাজপুত ছবির সীমারেখা গ্রীক ভাজ, অজন্তা অথবা মিনোয়ান ফ্রেস্কোর মতই দৃঢ় আর সুস্পষ্ট ; নক্‌শা আর রঙীন চিত্র যে একাত্ম, অভিন্ন হতে পারে তার প্রমাণ। প্রথমে সীমারেখাটি, সে ছোট বড় যে-কোন ছবিতেই হোক, তুলি দিয়ে লাল রঙের সাপ্‌টা করে আঁকা হত ; এর উপর পড়ত সাদা আস্তর, যার মধ্যে লাল নক্‌শাটি ফুটে বেরোত। তার উপরে মিহি তুলি দিয়ে দ্বিতীয়বার সীমারেখাটি আঁকা হত, প্রায়ই প্রথম রেখাটি ইচ্ছামত বদলে। এই দ্বিতীয় রেখাটি খুব যত্নে আঁকা হত কারণ এটিই হত চূড়ান্ত নক্‌শা, যার অদল বদল হত না। রঙীন ছবিতে শেষ পর্যন্ত যা থাকবে তার সবই এতে উচ্চারিত হত। এই রেখা সম্পূর্ণ হবার পর, পটভূমি অর্থাৎ ছবির 'পিছন'টায় রঙ দেওয়া হত ; প্রথমে আকাশ, ঘরবাড়ি, তারপর গাছ। অনেক উল্লেখযোগ্য রাজপুত নক্‌শা আছে যেগুলি এই পর্যন্তই আঁকা, তারপর আর আঁকা হয়ে ওঠেনি। পরিশেষে, আকারগুলি রঙ দিয়ে ভরানো হত, তারপর আবার সীমারেখা স্পষ্ট করে আঁকা হত। সাদা আস্তরে আসত ঔজ্জ্বল্য, জ্বলেজ্বলে ভাব, তার সঙ্গে মসৃণ পালিশকরা মিহি প্ল্যাস্টার করা দেয়ালের মত জমি, যার উপরে দ্বিতীয়বার রেখা পড়ত। প্রথমবারের রেখাতে কাগজে দাগ পড়ত। আস্তর লাগানোর পর কাগজে আর দ্বিতীয়বারের রেখার দাগ পড়ত না। যে রঙ লাগানো হত সে রঙ কাগজের উপর পাতলা খোসার মত লেগে থাকত। কাগজ একটু ঘসলে বা মুড়লেই খোসাটি চটা উঠে পড়ে যেত, উঠে গিয়ে বেরিয়ে পড়ত নীচের রেখা। সুতরাং পদ্ধতিটি নিতান্তই অজন্তার টেম্পেরা পদ্ধতির সামিল।

অজন্তার চিত্র-নির্মাণ রীতি কি করে রাজপুত ছবি-নির্মাণ পদ্ধতির মাধ্যমে পরবর্তী যুগে ভারতীয় ছবি আঁকার পদ্ধতি প্রকরণকে চালিত করে তা সংক্ষেপে বল্‌লুম। এখন অজন্তার চিত্র বিষয় কিভাবে পরবর্তী যুগের চিত্র বিষয়কে প্রভাবিত করেছে তা অল্প কথায় বলব।

অজন্তা প্রভাবের চারধারা

অজন্তা ছবির বিষয় মোটামুটি চার ধরনের। প্রথম হচ্ছে আখ্যান বা গল্প, যেমন জাতকের গল্প, শিবিরাজার গল্প ইত্যাদি। এই আখ্যানমূলক চিত্র দেয়ালে চিত্রে বা বইয়ে বরাবরই দেখা যায়। পরবর্তী যুগে এর যেভাবে রূপান্তর হয় তার নিদর্শন আছে মাদ্রাজের প্রাচীন মন্দির আনেগুণ্ডি ও তিরুপতি তিরুমাল কুন্দরমের ছাতে আঁকা চোদ্দ শতকের ছবিতে। আনেগুণ্ডির ছবি বা দশ এগারো শতকে তাঞ্জোরের মন্দিরের গায়ে আঁকা ছবির সঙ্গে অজন্তা রীতির বেশ মিল আছে মনে হয়। কিন্তু তিরুপতির ছবি যাকে বলে বাংলা পটুয়া চিত্রকরদের জড়ানো পটের আদি বা পূর্বপুরুষের চিহ্ন। আধুনিক যুগের খবরের কাগজে ছোটছেলেদের জন্যে আঁকা কমিক ছবির মত, একটার পর একটা 'ক্রমশ প্রকাশ্য' রীতিতে আঁকা ; অজন্তার ১৭নং গুহার মহাহংস জাতকের ছবি যার মূল। এর ফলে সাধারণ লৌকিক নীতিতে আসে পটুয়ার আঁকা, সস্তার জড়ানো পট ; আর দরবারী ঐতিহ্যে শুরু হয় ধারাবাহিক চিত্র। সেই ধারাবাহিক চিত্র পরে পর্যবসিত হয় কোনও বিশেষ বিষয় বা আখ্যান অবলম্বন করে আঁকা ছবির বইয়ে, যাতে ছবিগুলি একের পর এক নম্বর করা থাকত, ছবি উল্টে উল্টে গেলে আপনিই গল্পটি পড়া হয়ে যেত, আধুনিক যুগের ফ্ল্যাশ কার্ড বা ফিল্ম স্ট্রিপের মত। এই বিষয়-রীতির আরেকটি সংস্করণ হয় 'রাগমালা' বা 'নায়িকা' চিত্রে যার কথা পরে বলব।

'দ্বিতীয় হচ্ছে মুখ্যত নক্শা বা আল্পনামূলক ছবি যার উত্তরাধিকার সূত্র সঞ্চারিত হয়েছে মন্দির ভাস্কর্যে, ছবির পাড়ে, সযত্নে লেখা পুঁথির অলঙ্কারে, নিত্য ব্যবহার্য ঘট, কলসি, হাঁড়িকুড়ি, থালায়, পুতুলে, মাটির দেয়ালের আল্পনায়, দৈনন্দিন জীবনের পূজাব্রতের আল্পনায়, ছুঁচের কাজে, গৃহসজ্জার অলঙ্কারে। এগুলি আবার ঘুরে ফিরে আসে ইঁটের টালিতে, বাসনে, এনামেল করা রঙীন টালিতে, পটারিতে।

তৃতীয় হচ্ছে চিত্রপ্রধান ছবি, যার মধ্যে আখ্যান নেই, আছে মুখ্যত ছবিত্বগুণ, যার উদ্দেশ্য গল্প বলা ততটা নয়, যতটা চিত্ররূপের পরীক্ষা। রঙ, রেখা, আকার যার অম্বিষ্ট। এ রকম ছবি আছে অজন্তার চৌখুপি প্যানেলে। পরবর্তী যুগে এই রীতির একদিক যায় পুঁথিচিত্রে, যা প্রথম দেখা যায় পশ্চিম ভারতীয় পুঁথিতে, তারপর আস্তে আস্তে অন্যান্য পুঁথিতে। অন্য এক ধারা যায় মন্দিরের ভাস্কর্যে, তার থেকে ইঁটের মন্দিরের পাটায়, টালিতে ; তারপর ফের আসে রাজপুত, পাহাড়ী, মুসলমান ছবিতে, লৌকিক পটে।

চতুর্থ হচ্ছে নরনারীর প্রেমের চিত্র। এই বিষয়টি অজন্তার বহু আগে শুরু হয়ে অজন্তার ছবিতে নিয়ে আসে কয়েকটি উৎকৃষ্ট ছবি। তারপরে ক্রমশ নিতান্ত খোলাখুলিভাবে যায় মন্দিরের ভাস্কর্যে, শরীরের মিলনাত্মক মিথুন খোদাইয়ে। চিত্ররীতিতে প্রেম, মিলন, বিরহ, প্রতীক্ষার ছবি যেমন ভাবে, বিন্যাসে ও দ্যোতনায় অসীম, তেমনি সংখ্যায় অগুণতি। পরে এই বিষয়ের ভাস্কর্যসুলভ নিষ্পাপ বলিষ্ঠতা আর প্রাণবন্তুতার বিকার আসে চিত্রপটে। বিলাসীদের প্রমোদভবনে নিছক কামোদ্দীপক বন্ধমালার ছবিতে পর্যবসিত হয়। পরবর্তী যুগে এই বিষয়ের অনেক ছবিতে নক্শার অসাধারণ দক্ষতা সত্ত্বেও এর উদ্দেশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয়ে পড়ে নিতান্ত হেয় ও কুরুচিপূর্ণ।

মধ্যযুগে অর্থাৎ খ্রীস্টীয় ৭০০ থেকে ১৫০০ পর্যন্ত এই চারটি ধারার নমুনা কোথায় কি রকম পাওয়া গেছে খুব অল্প কথায় তার উল্লেখ করব। প্রথমত আখ্যানমূলক ছবির রীতি নানাভাবে আসা যাওয়া করে শ্যামে, জাভায়, খোটানে, তিব্বতে। ভারতবর্ষে এই রীতি নানান সূত্রে যায় দাক্ষিণাত্যে, রাজস্থানে, নেপালে। প্রাচীন মন্দির তিরুপতি তিরুমাল কুন্দরমের ছাদে আঁকা ফ্রেস্কোয় এই ছবি কি রকম আশ্চর্যভাবে বাংলার জড়ানো পটের কথা মনে করিয়ে দেয় তার উল্লেখ করেছি। তিরুপতিতে একটি ফ্রেস্কো আছে, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম। এটি গুরুসদয় দত্তের সংগ্রহে প্রাপ্ত একটি জড়ানো পটের যমজ বললেও ভুল হয় না। আখ্যানমূলক ছবি এইভাবে সারা ভারতময় জনসাধারণের সম্পত্তি হয়ে যায়। এরই এক ধরনের সংস্করণ পরে হয় রাগমালা চিত্রে, অথবা রঙীন চিত্রের অ্যালবামে, যাতে একই বিষয় একের পর এক ছবিতে আস্তে আস্তে খুলে বলার রীতি চালু হয়।

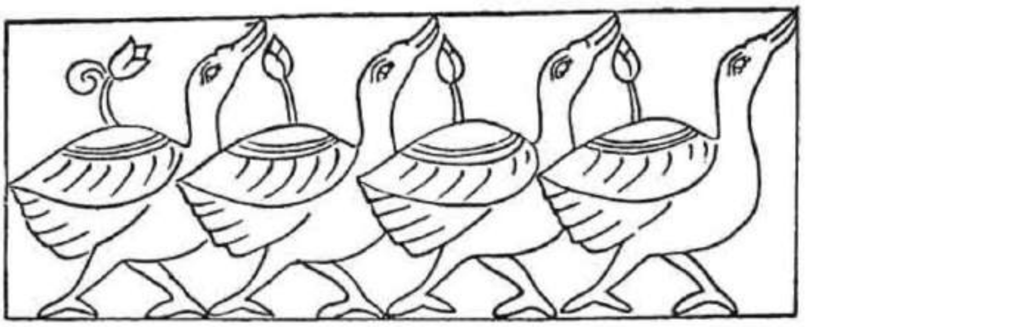
দ্বিতীয় রীতি, অর্থাৎ নক্শা বা আল্পনা, যে-কোন মধ্যযুগের মন্দিরে এত প্রচুর যে বিশদভাবে বলা এখানে দুঃসাধ্য। তাই মন্দিরের কথা উল্লেখ না করে এনামেলের উপর নক্শা করা টালি (ইংরেজিতে টাইল) দু'-এক জায়গায় যা পাওয়া গেছে তার কথা বলব। প্রথমে উল্লেখ করতে হয় মালদহ জেলার গৌড়ে তাঁতিপাড়া আর লোটন মসজিদের টালির কথা (খ্রীস্টীয় ১৪৭৫ থেকে ১৪৮০)। কিন্তু লন্ডনের ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়মে তারও আগেকার কিছু টালি গৌড় থেকে সঞ্চয় করে রক্ষিত আছে, যেগুলি 'স্পষ্টই হিন্দু প্রভাব

সম্বলিত, এদের চরিত্র মুসলমান যুগের টালি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, মুসলমান টালির নক্শাসুলভ নীল, রুইতনের আকারে ডায়ামন্ড কাটা অথবা পটি আঁকা এতে নেই। এগুলি মুঘল আমলের জ্যাবড়া কাজ করা টালির থেকে তফাৎ'। এই টালিগুলি ছাড়া আর বিশেষ কিছু নমুনা বর্তমানে নেই।

তৃতীয় রীতি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে পশ্চিম ভারতের চিত্রিত পুঁথির উল্লেখ করেছি। সবচেয়ে প্রাচীন যে পশ্চিম ভারতীয় পুঁথির উল্লেখ পাওয়া যায় তা ১১২৭ খ্রীস্টাব্দের, তারপরে যে তিনটি পুঁথির উল্লেখ পাওয়া যায় সে তিনটিই হচ্ছে একই বই, কল্পসূত্রের তিনটি নকল। সবচেয়ে প্রাচীন নকলটি আছে পাটান গ্রন্থাগারে। তার তারিখ হচ্ছে খ্রীস্টীয় ১২৩৭ সাল। পরের দুটির একটি আছে লন্ডনের কমনওয়েল্থ্ লাইব্রেরিতে (১৪২৭) অন্যটি ব্রিটিশ মিউজিয়মে (১৪৬৪)। কলকাতার শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষের কাছে একটি পুঁথি ছিল, তার বয়স ১৪৮০ খ্রীস্টাব্দ। জৈন বা অন্যান্য ভারতীয় পুঁথিচিত্র কিন্তু সব সময়ে ইওরোপীয় পুঁথিচিত্রের মত বইয়ের বিষয় বা আখ্যানকে চিত্ররূপ দেয় না। ভারতীয় পুঁথিচিত্রের অধিকাংশই বইয়ের বিষয়ের সঙ্গে বিশেষ কোন সম্বন্ধ রাখে না। এগুলি সাধারণত শিল্পীর খেয়াল-খুশিমত আঁকা, পুঁথির যেখানে সেখানে ঢুকিয়ে দেওয়া। তাই এগুলি আখ্যানমূলক নয়, মুখ্যত চিত্রধর্মী। গুজরাটী বা জৈন পুঁথিচিত্রের সঙ্গে মধ্যযুগের নেপালী ছবির খুব সম্বন্ধ দেখা যায়। আবার অন্যপক্ষে জৈন চিত্ররীতি অতি অদ্ভুতভাবে নানা আঁকাবাঁকা পথে বাংলা জড়ানো পটে অথবা চৌকো পটেও দেখা দেয় ; যেমন বাবু হয়ে, পা মুড়ে বসা অবস্থায় কাপড় বা শাড়ির ভাঁজের রীতি, পাশ বালিশ আঁকার রীতি, পাশ বালিশে হেলান দেবার রীতি ইত্যাদি। উড়িষ্যার পুঁথিতে আর পটে গুজরাটী প্রভাব বেশ দেখা যায়। কিন্তু বাংলা পুঁথিচিত্রের রীতি আবার কিছুটা আলাদা হয়ে পড়ে, বোধহয় নেপালী ও তিব্বতী প্রভাবে। এছাড়া মন্দিরের পাথরে, ইঁটের টালিতে চিত্রধর্মী ছবির খুব চলন হয়।

চতুর্থ ধরনের ছবি ভারতের সর্বত্র নানাভাবে, নানা রীতিতে পাওয়া যায়। বিশদভাবে বলা এখানে নিষ্প্রয়োজন।





চতুর্থ অধ্যায়

মধ্যযুগের পুঁথিচিত্র : খ্রীস্টীয় ৭০০-১৫০০

পালযুগের পুঁথিচিত্র

ঐতিহাসিকদের মতে মধ্যদেশে গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্থানের সঙ্গে বৈদিক সংস্কৃতি ও বর্ণাশ্রম আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এই সংস্কৃতির পরিচয় ছিল শৈবধর্ম। লৌকিক বৌদ্ধধর্মের প্রাক্তন প্রভাব ক্রমশ স্তিমিত হতে শুরু করে খ্রীস্টীয় পাঁচ শতকের প্রায় প্রথম থেকে। বৌদ্ধধর্মের প্রধান আকর্ষণ ছিল, আপামর সকলের সে ধর্মে দীক্ষিত হবার, যে কোন বৌদ্ধ ধর্মস্থানে প্রবেশের ও শিক্ষালাভের অধিকার। অনুশীলন, আচার, ধর্মচর্চা ও সাধনার উপরেই সকল আধ্যাত্মিক উন্নতি নির্ভর করে, জন্ম, শ্রেণী বা বর্ণের উপরে নয়। রাজা ও প্রশাসনের আনুকূল্যে বা ভিক্ষাবৃত্তিতে যা কিছু সঞ্চয় হবে তার বড় অংশ যাবে বিহার বা ধর্মস্থানের বৈভব ও কীর্তিপ্রসারে। খ্রীস্টীয় পাঁচ শতক পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মের মন্ত্র ছিল 'সবারেই করি আহ্বান'। গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীনে প্রভাব কিছুটা ক্ষুণ্ণ হলেও ভারতের বহু অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের আধিপত্য কিছু কম ছিল না। গুহাচিত্রের আলোচনায় আমরা দেখেছি, মঠ বা চৈত্যগুলি ছিল লোকশিক্ষা ও দীক্ষার কেন্দ্র, সাধনার ত বটেই। শ্রমণ ও ভিক্ষুদের ব্যক্তিগত বিত্তহীনতা, এমন কি ভিক্ষাবৃত্তি ও অকৃতদার জীবন ছিল বৌদ্ধধর্মের প্রধান শক্তি। বড় বড় প্রাচীরচিত্রাদি, সে গুহাতেই হোক বা মানুষের তৈরি বিহারেই হোক, ছিল ধর্মশিক্ষার বিশেষ সহায় ও উপকরণ, দেয়ালের ছবি দেখে ও শ্রমণের কাছে তার ব্যাখ্যা শুনে সাধারণ লোকের পুরাণ, জাতক ও ধর্মের বাণী আয়ত্ত হত, ঠিক যেমন এখনও ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক সমাবেশে চিত্রদর্শন বা ধর্মীয় কথকতার চলন আছে।

যে-কোন মহৎ প্রভাবের সুফল সুপ্রতিষ্ঠিত হলে, তার ক্ষয় হতেও সময় লাগে। ফলে, রাজশক্তির আশ্রয় হারালেও বৌদ্ধধর্মের প্রভাব সারা ভারতে স্তিমিত হতে আরো চার-পাঁচ শতক লাগে, বিশেষত প্রত্যন্ত প্রদেশগুলিতে। বৌদ্ধধর্মের কৃপায় শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের ফলে আপামর সকলের মনে সামাজিক ও রাজনৈতিক গণতন্ত্রভাব সঞ্চারিত হয়। মহারাজ হর্ষবর্ধনের রাজত্ব পর্যন্ত এর সুফল সারা ভারতে মোটামুটি প্রতিফলিত হয়, সেই সঙ্গে আসে সর্বধর্মসহিষ্ণুতা। বৌদ্ধধর্মে জনসাধারণভিত্তিক সমতার সঙ্গে গণতান্ত্রিকভাবের বলিষ্ঠ জাগতিক প্রকাশ আমরা দেখি খ্রীস্টীয় আট শতকে ভারতের পূর্বদেশে (বারাণসীর পূর্বে বিহার ও বঙ্গে)। প্রসিদ্ধ খালিমপুর তাম্রলিপিতে দেখি পূর্বদেশের দীর্ঘ অরাজকতার অবসান ঘটাতে 'জনসাধারণ মাৎস্যন্যায় উৎখাত করার সংকল্পে রাজন্যবর্গের মুকুটমণি মহিমময় গোপালকে ভাগ্যলক্ষ্মীর হাতে সঁপে দিলেন।' এইভাবে বঙ্গের পালবংশ খ্রীস্টীয় আট শতকের প্রথমার্ধ থেকে বারো শতকের শেষ পর্যন্ত পূর্বদেশে আপন রাজত্ব ও বৌদ্ধধর্মের মর্যাদা রক্ষা করে। কতখানি মর্যাদা ও প্রতিপত্তি ছিল তার প্রমাণ পাই তারনাথের ১৬০৮ খ্রীস্টাব্দে রচিত পুঁথিতে।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রসার সত্ত্বেও ভারতের নানা প্রদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রতিপত্তি আরো কয়েক শতক মোটামুটি

অক্ষুণ্ণ ছিল। উপরন্তু বৌদ্ধধর্মের আওতায় অন্যান্য সমন্বয়কারী ধর্মীয় আন্দোলনও প্রশ্রয় পায় : যথা, জৈন ও বৈষ্ণবধর্ম। জৈনধর্মের একটি বিশেষ জাগতিক নীতিও ছিল। বৌদ্ধধর্মের জাগতিক নীতির থেকে কিছুটা তফাৎ। জৈনধর্মের এক প্রধান অঙ্গ হল, জাগতিক বা সামাজিক কর্তব্য, উন্নতি, সমৃদ্ধি-উদ্যম উদ্দীপিত করা। একদিকে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক বিলাসে যেমন মিতব্যয়িতা থাকবে, দৃষ্টিকটু জাঁকজমক যেমন কম হবে, অন্যদিকে ধর্মানুষ্ঠানে জৈন সংঘের পরিপোষণকল্পে উপাসনা ক্ষেত্রে ও মঠগুলিতে যথাসম্ভব দান করতে হবে। উপরন্তু, পরের যুগের মুসলমান ধর্মের মত, ব্যক্তিগত আয়ের নির্ধারিত অংশ নিয়মিতভাবে পরার্থে দান করতে হবে। সেই বিধানে, জৈন সংঘ, মন্দির, সাধারণ হিতার্থে অর্থভাণ্ডার, নানাবিধ লোকহিতকর সংস্থার যৌথ তহবিলগুলি সমৃদ্ধিলাভ করত। ব্যক্তিগত দান খয়রাত শুধু নিজের পুণ্যার্জনের নিদর্শন নয়, সামাজিক ও ধর্মীয় কর্তব্যও। জন্মাবধি প্রকৃতিতে এই নীতিবোধ গেঁথে যাবার দরুন, সকলের সঙ্গে যথাসম্ভব সদ্ভাব জীবনের আদর্শ হিসাবে মনশ্চক্ষে রেখে, অনুশীলনের দ্বারা ঈর্ষা, দ্বেষ, শ্লেষ প্রবৃত্তি দমন করে, সমাজে ও পরিবারে সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করা, জৈনদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। গুজরাট ও রাজস্থান জৈনধর্মাবলম্বীদের বহু শতাব্দীর নিজস্ব ভূমি। এই প্রদেশগুলিতে অর্থোপার্জন, সঞ্চয়, জনসাধারণের উন্নতিকল্পে দানধ্যান করার মধ্যে কোন বিরোধ নেই। সেইজন্যেই এই দুই প্রদেশে রাজা বা শাসকরা বংশানুক্রমে ক্ষত্রিয় হলেও জৈনধর্মের পরিপোষণে কোন বাধা কখনও হয়নি। বরং জৈনসংঘের অর্থে ও আনুকূল্যে রাজস্থানী ও গুজরাটী সমাজ সবদিক দিয়ে সাচ্ছল্য ও উন্নতিলাভ করে।

পশ্চিমভারতে যেমন জৈনপুঁথি, পূর্বভারতে তেমনি বৌদ্ধপুঁথির প্রতিষ্ঠা ও গৌরব বৃদ্ধি পায়। পালবংশের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম ও সমাজ বিশেষ সমৃদ্ধিলাভ করে। খ্রীস্টীয় ৭৫০ সালে যদি পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল দেশবাসীর আগ্রহে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন ধরা যায়, তাহলে ৭৫০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ৮৫০ খ্রীস্টাব্দে যখন দেবপালের শাসন শেষ হয়, এই একশ' বছরের মধ্যে পালবংশের সাম্রাজ্য সবথেকে বিস্তীর্ণ হয়, তার যশ তুঙ্গে ওঠে : উত্তর, এমন কি উত্তর-পশ্চিম ভারতেও পালবংশের প্রতাপ পৌঁছয়। খ্রীস্টাব্দ ৯৫০ থেকে ১০৫০-এর মধ্যে দুই পাল রাজা দ্বিতীয় বিগ্রহপাল ও প্রথম মহীপাল যথাক্রমে ২৬ ও ৪৮ বছর রাজত্ব করেন। প্রথম মহীপালের ছেলে নয়পাল খ্রীস্টাব্দ ১০৩৮ থেকে ১০৫৫ পর্যন্ত যখন সিংহাসনে আসীন ছিলেন তখন কলচুরীরাজ লক্ষ্মীকর্ণের সঙ্গে বহু বছর ধরে যুদ্ধের ফলে পালরাজ্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তা সত্ত্বেও পালবংশ ১১৫৫-৬০ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করে, শেষ রাজা ছিলেন গোবিন্দপাল। পালবংশের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে পূর্বভারতে বহু বৌদ্ধ সংঘ ও কেন্দ্র প্রতিষ্ঠালাভ করে। তাদের শিরোমণি অবশ্য ছিল নালন্দা, এসব সংঘে ও কেন্দ্রে বিদ্যাচর্চার চূড়ান্ত হয়, তার সঙ্গে যাবতীয় চারুকলা ও শিল্পের উন্নতি, যার ঐশ্বর্যময় ঐতিহ্য ১৬০৮ সালেও তারনাথকে বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় অভিভূত করে। কিন্তু পশ্চিমভারতের জৈন সমাজের সঙ্গে পূর্বভারতের রাজনৈতিক ও সমাজ ব্যবস্থার কতগুলি মোটারকম তফাতের দরুন পশ্চিমভারতে পুরাতত্ত্ব সংরক্ষণ যেভাবে সম্ভব হয়, পূর্বভারতে বৌদ্ধ কীর্তিসম্পদ রক্ষার অনুরূপ ব্যবস্থা সম্ভব হয়নি। এগুলির মধ্যে দুটি কারণ প্রধান ছিল। প্রথম, পূর্বদেশের জলহাওয়া, বিশেষ করে তার আর্দ্রতা, যার দৌরাত্ম্যে সংরক্ষণ ব্যবস্থা দুঃসাধ্য। দ্বিতীয়ত, পূর্বভারতের কৃষি-ঐশ্বর্য ও স্বাভাবিক উর্বরতা হেতু পরাক্রান্ত আক্রমণকারীদের হাতে বারবার বিধ্বস্ত হয় ; বিশেষত, ধনী ও সম্পন্ন অঞ্চল ও জনপদগুলি। নালন্দা, পাটলিপুত্র, বা রাজগীরের মত সমৃদ্ধ স্থানগুলি বারবার আক্রান্ত হয়ে লুঠ ও ধ্বংসের লক্ষ্য হবে, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ফলে, পশ্চিমভারতে চারুকলা, পুঁথি, ও শিল্পের সংরক্ষণ যতখানি সম্ভব হয় পূর্বভারতে তা হয়নি। পণ্ডিতপ্রবর সরসীকুমার সরস্বতীর 'পালযুগের চিত্রকলা' নামে অমূল্য বইয়ে দেখি তিনি কত কষ্ট স্বীকার করে তাঁর পূর্বজ গবেষকরা এবং তিনি নিজে যে সব নিদর্শন নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি এশীয় দেশে, পরন্তু সারা পশ্চিম ভূখণ্ডের নানা সংগ্রহালয়ে পালযুগের চিত্রিত পুঁথি পাওয়া গিয়েছে, তার নির্ঘণ্ট তৈরি করেছেন। সেই অনুপাতে মধ্যযুগের পশ্চিমভারতের জৈন ও বৈষ্ণব পুঁথিচিত্র অনেক ভাল অবস্থায় নানা সাম্প্রদায়িক বা ধর্মীয় ভাণ্ডারে সুরক্ষিত আছে।

সরসীবাবু যে সব সংরক্ষিত স্থানের পালপুঁথির উল্লেখ করেছেন তার অতি সামান্য আমি দেখেছি, মুখ্যত দিল্লীর জাতীয় মিউজিয়মে, কাশীর ভারত কলাভবনে, কলকাতার ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে। জৈন পুঁথিচিত্র আমি দেখেছি মুখ্যত দিল্লীর জাতীয় মিউজিয়মে। বাকি সবই মুদ্রিত বইয়ে। তবুও আমার মত অদীক্ষিত পাঠকের সরসীবাবুর 'পালযুগের চিত্রকলা' বইয়ে ছাপা অথবা মোতিচন্দ্র ও উমাকান্ত পি শা'র 'নিউ ডকুমেন্টস্ অভ জৈন পেন্টিং'

বই-এর পুরনো পুঁথি ও পুঁথিচিত্রের লিপির সৌন্দর্য ও চিত্ররূপ উৎকর্ষ দেখে মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই। আমরা যাকে ইন্ডিয়ান ব্ল্যাক বলে অভিহিত করি তা তৈরি হত গাঢ় চোখের কাজল থেকে তৈরি। সেই নিবিড় কৃষ্ণকজ্জল মোটা খাগের কলমে চৌকো আকারের অক্ষরে অপূর্ব ক্যালিগ্রাফির সমান হরফে পুঁথিতে দুই ভাগে কাগজের বাঁয়ে ডাইনে লেখা হত, যা সহজেই স্পষ্ট ও সম্যকভাবে চেঁচিয়ে আবৃত্তি করে পড়া যায়, চোখের ভ্রমে পাঠের সময়ে কোন ভুল হয় না। যাঁরা দেবনাগরী হরফ পড়তে জানেন, তাঁরা একটু অভ্যাস করলেই স্পষ্ট সংস্কৃতে লেখা শ্লোক পড়তে পারবেন। কিছু কিছু পাল বা নেপালী পুঁথি নেওয়ারি দেবনাগরী হরফে লেখা, তাও সামান্য অভ্যাসে অনায়াসে পড়া যায়। পূর্বভারতের পুঁথিতে এই লিপি পেয়েছে আশ্চর্য সৌন্দর্য, প্রতিটি অক্ষর যেন পাথরে খোদাই, না হয় ছাঁচে ঢালা আর গাঢ় কালো কাজলকালিতে রঙ করা। যার উপরে লেখা হত, সরসীবাবুর বইতে পড়ি, সেগুলি হত 'তাল' বা 'তাড়' পাতা। দুই শ্রেণীর তালপাতা, 'খড় তাড়' ও 'শ্রী তাড়' : বাংলা ও ভারতের পূর্বাঞ্চলে যাকে যথাক্রমে বলে 'তাল' ও 'তেরেট'। তা ছাড়াও থাকত নেপালী ভূর্জপত্র থেকে তৈরি তুলোট কাগজ। পূর্বভারতে তেরেট পাতাই পুঁথির কাগজ হিসাবে ব্যবহৃত হত, এই শ্রেণীর পাতার স্থায়িত্ব বেশি। নমনীয় ও সম্প্রসারণশীল কাগজগুলি সমানভাবে লম্বালম্বি ফালি করে কাটা। সাধারণত কমবেশি ৭½ সেন্টিমিটার চওড়া হত এবং ৯০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা হত। সবক্ষেত্রেই লেখার পংক্তি সাজানো হত দৈর্ঘ্যের সমান্তরালে। সরসীবাবু বলেন, প্রতি পাতায় থাকত পাঁচ থেকে সাত পংক্তি। চিত্রবিহীন পুঁথিতে এই পংক্তি হত অবিচ্ছিন্ন, দুই অন্তে পুঁথি বাঁধবার ছিদ্রের ক্ষেত্র বাদে। চিত্রিত পুঁথিতে সাধারণত লেখা একাধিক চতুষ্কোণ ক্ষেত্র মধ্যে ফাঁক রেখে। পুঁথি লেখার সময়ে লিপিকর ছবির চতুষ্কোণ ক্ষেত্রগুলি খালি রেখে দু'পাশে লিখতেন। পুঁথি লেখার শেষে চিত্রকর শূন্য ক্ষেত্রগুলি ছবি এঁকে পূরণ করতেন। চিত্রিত পুঁথি সম্পূর্ণ হত লিপিকর ও চিত্রকর পরপর দুইজনের কাজে। পুঁথিলেখা বা চিত্র আঁকা কঠোর অনুশীলন ও শ্রমসাধ্য ছিল। লিপিকররা নিজেদের সম্বন্ধে লিখে গেছেন 'ভগ্নপৃষ্ঠ, কটিগ্রীব, বদ্ধমুষ্ঠি, অধোমুখ ; কষ্টে লিখিত, সুতরাং অতিযত্নে পরিপালন কর্তব্য।' পুঁথির পাতার দৈর্ঘ্য হত প্রস্থের অনুপাতে প্রায় বারো তের গুণ। পাতার দু'পাশে প্রস্থের মাঝামাঝি থাকত দুটি ছোট ফুটো, পুঁথিবাঁধার সুতো গলানোর জন্য। প্রত্যেক পুঁথির পাতাগুলি সাজিয়ে দুই পাশের দুই ফুটোর মধ্যে সুতো পরিয়ে উপরে নিচে কাঠের পাটার সমকেন্দ্রে ফুটোর মধ্যে দিয়ে আবার গলিয়ে শক্তভাবে পুঁথি বাঁধা হত। লম্বা পুঁথিতে অনেক সময়ে ঠিক মাঝখানে আরেকটা ফুটো থাকত। অনেক সময়ে দু'দিকে দুটো করে চারটি ফুটোও থাকত। 'শিথিল বন্ধন থেকে পুঁথি রক্ষা করবে' এই সতর্কবাণী অনেক পুঁথিতে থাকত। পুঁথির উপর নিচে প্রতি পাটার দুই পিঠে পুঁথির রীতিতে প্রায় সারা পাটাটিই ছবি আঁকা থাকত। এই ছবিগুলিও সমৃদ্ধিগুণে পুঁথির চিত্রের ঐশ্বর্য থেকে কিছু কম হত না।

প্রতিটি চিত্রিত পাতায় সাধারণত তিনখানি চিত্রিত ছবি দেখা যায়, একটি ঠিক মাঝখানে, বাকি দুটি দুই পাশে। কোন কোন পাতায় আছে ঠিক মাঝখানে মাত্র একটি বড় লম্বা ছবি, আবার কিছু পুঁথিতে শুধু দুটি ছবি দেখি। পাতার দু'পাশে মধ্যিখানে টানা লম্বা লেখা। পরবর্তীকালের পুঁথিতে অনেক সময়ে পুঁথির ধারের ফুটোর চারদিকে ছবি বা অলঙ্কার দেখা যায়। কোন কোন পুঁথিতে আবার অধ্যায়ের শেষে খালি জমিতেও অলংকৃত নক্শা থাকত। পুঁথির মত পুঁথির পাটার প্রতিটি পিঠেই ছবি থাকত। পুঁথিগুলি নিয়মিত পুজো করা হত। আমাদের ছেলেবেলায় আমরা যেমন সরস্বতীপুজোর দিন মূর্তির পায়ের কাছে বই রেখে দিতুম, প্রতিমা পুজোর সঙ্গে বই পুজোয় আমাদের বিদ্যা বাড়বে এই আশায়। পুজোর অনুষ্ঠানে ঘি সিঁদুর চন্দনের প্রলেপে পাটার উপর ও নিচ দিক দুটির ছবি অনেক সময়ে অস্পষ্ট বা নষ্ট হয়ে গেলে, নতুন করে চিত্রিত পাটা তৈরি হত।

প্রতিটি ছবির দুই পাশে দুটি অতিসুন্দর ভাস্কর্যগুণমণ্ডিত লিপির স্তবক, মধ্যস্থলে থাকত যেন দুই পাশে দুই প্রশস্ত অপূর্ব অলংকৃত ফ্রেমে বাঁধা পুঁথির ছবির সারি। প্রতিটি ছবির দুই পাশের কালো হরফে লেখা ফ্রেমে বাঁধা ছবির সাদা (সিত, ধবল, শ্বেত), হলুদ (পীত), নীল (শ্যাম), লাল (রক্ত অলক্তক), কালো (কৃষ্ণ, কজ্জল), সবুজ (হরিত) এবং এদের সংকর বর্ণ কালি দিয়ে চিত্রিত অংশগুলির রঙ বিস্ময়কর ভাবে উচ্চকিত হয়ে ফুটে ওঠার ফলে সমস্ত পাতাটি একটি অখণ্ড চিত্র বলে মনে হয়। পূর্বভারত বা নেপালী পুঁথিতে সমগ্র লিপিটি সমান গাঢ় কাজলকালিতে লেখা হত। অনেক জৈনপুঁথিতে দেখি, লিপির একই স্তবকে কালির গাঢ়ত্বে একটি গাঢ় আর ফিকের মিশ্রণ। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হতে পারে পালপুঁথির তুলনায় পাতায় লিপি ও চিত্রের সামগ্রিক ডিজাইন যেন কিছুটা ব্যাহত হয়েছে, কিন্তু একটু মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করলেই বোঝা যাবে হাল্কা গাঢ় লেখার ছন্দ সম্ভবত

ভিতরের ছবির গাঢ়-হাল্‌কা রঙগুলির সঙ্গে সঙ্গতি ও ভারসাম্য রাখার জন্যে।

পালযুগের অথবা জৈন, বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব পুঁথিচিত্র বিষয়ে যে সব প্রামাণ্য দেশীবিদেশী গবেষণামূলক ছাপা লেখা বা বই আমি দেখেছি তার কোনটিতেই খ্রীস্টীয় ৭ থেকে ১০ শতকে আঁকা কোন পুঁথিচিত্রের নিদর্শন আমি পাইনি। পুঁথিচিত্রের ইতিহাসে একদিকে প্রাচীর চিত্রের স্বর্ণযুগ অন্যদিকে পুঁথিচিত্রের শুরুর মধ্যে তিন শতকের এই বড় ছেদের ফলে আমরা ঠিক জানি না বৌদ্ধগুহাচিত্রের শৈলী কি কি ধাপে পুঁথিচিত্রের শৈলীতে কতখানি রূপান্তরিত হয় বা হয়নি। অর্থাৎ মিউরাল বা প্রাচীর চিত্রের বিশিষ্ট আঙ্গিকগুলি—যেমন কনেক্টিং-লিংক কম্পোজিশন, একাধিক পরিপ্রেক্ষিত বা মাল্টিপল্ ভিশন কিভাবে সংক্ষিপ্ত অথবা রূপান্তরিত হয়ে, মিনিয়েচরের আঙ্গিক কিভাবে দ্বিমাত্রিক চিত্ররীতিতে সার্থকতা লাভ করল, এমন কি দেহের মডলিং ও প্ল্যাস্টিক গুণাদি (যাকে সরসীবাবু বলেছেন বর্তনাব্যঞ্জনা) কি করে দ্বিমাত্রিক ফিগারে পর্যবসিত হল, ছায়াতপ বা কিয়ারোস্‌কিউরো সরলীকৃত হল, সবশেষে ভারতীয় মিনিয়েচরে বর্ণালী-বিভঙ্গ কমিয়ে একক রঙের প্রাধান্য ও সবশেষে ছায়াই উবে গেল। সেই সঙ্গে একটি মোটা সত্য মনে রাখতে হবে। বৌদ্ধগুহাচিত্রের মূল বিষয় ছিল জাতক উপাখ্যান, অর্থাৎ বিনা ছেদে ক্রমান্বয়ে এক জাতকের গল্প থেকে অন্য জাতকের গল্পে বিচরণ। সেই কারণে গুহাচিত্রে ছিল কনেক্টিং-লিংক কম্পোজিশনের প্রাবল্য (যার আলোচনা আগেই করেছি), রোটেশন পারস্পেক্‌টিভ, যার সাহায্যে দর্শকের চোখে এক গতিশীল ঘটনা থেকে পরবর্তী ঘটনার অনুধাবনে যায়। অজন্তা বা অন্যান্য গুহাচিত্রের মূল গুণই ছিল গতিশীলময় আখ্যান পরম্পরা। কিন্তু দশ শতকের পরে রচিত যে সব পাল বা নেপালী বৌদ্ধপুঁথিচিত্র আমরা পাই তাতে আখ্যান বা গল্প-বলা ছবি খুবই কম। অধিকাংশ চিত্রই যাকে বলে আইকন বা দেবদেবীর ধ্যানমূর্তি, যার সঙ্গে একক ভাস্কর্যের সম্বন্ধ খুবই নিকট : যে ধ্যানমূর্তি সাধককে ধ্যানে নিবিষ্ট করে, যাঁর আশেপাশে সংশ্লিষ্ট কিছু কিছু শিষ্য বা অনুগামীদের দেখা যায়। প্রাচীর চিত্রসুলভ আখ্যান বলা বা শিক্ষাদান উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং অধিকাংশ পাল, নেপালী ও ১৪০০ সাল পর্যন্ত জৈন পুঁথিচিত্র ডাইনে বাঁয়ে পুঁথির পাঠের ফ্রেমে আবদ্ধ এবং অনেক সময়ে ছবির মধ্যের প্রধান মূর্তির ভারসাম্য রেখে তার দু'পাশে শিষ্য বা প্রাণীদের চিত্রে এঁকে ভারসাম্য রেখে স্থির অচঞ্চল ধ্যানমগ্ন কম্পোজিশন হয়। গুহাচিত্রের মত চলন্ত গল্প-বলা, নায়কনায়িকা, ঘটনায় পূর্ণ একাদিক্রম আলেখ্য নয়। প্রতি চিত্রই স্বয়ংসম্পূর্ণ, আত্মসমাহিত। ভঙ্গি প্রায়ই ত্রিভঙ্গ, স্টেলা ক্রামরিশ যাকে বলেছেন শশিকলার ছন্দে ও আকারে, শরীর বঙ্কিম করে, আঁকা ; মূলত ভারতীয় নন্দনতত্ত্বের ত্রিভঙ্গ। রীতি পোর্ট্রেটের, অধিকাংশই ভার্টিকাল, চিত্র ফিগার দর্শকের মুখোমুখি করে সম্পূর্ণভাবে আঁকা, পাশ ফেরা নয়। একক ফিগারের ক্ষেত্রে ত বটেই, একাধিক, পরস্পর সংযুক্ত আখ্যানের ফিগারগুলিও। তাতে মনে হয় চরিত্রগুলি যেন নিজেদের মধ্যে আলাপ বন্ধ রেখে সোজা হয়ে হয় দর্শককে দেখছেন, না হয় চিত্রমধ্যস্থিত প্রধান চরিত্রকে আরাধনার দৃষ্টিতে দেখছেন। সেই দেখা হবে সম্পূর্ণ, অর্থাৎ দুই চোখ ভরে, এবং সেইজন্যই সম্ভবত ১৭ শতক বা তারও পরে আঁকা জৈনপুঁথিতে আমরা দেখি, প্রধান কেন্দ্র পুরুষের বা নারীর, চারপাশের নরনারী-যদিও পাশফেরা, বা শোয়া অবস্থায় দেখানো, এবং তাদের মুখটি প্রোফিলে বা অর্ধ বা সিকি প্রোফিলে, তবুও তাদের দুটি চোখ, মধ্যের প্রধান চরিত্রের দিকে অথবা দর্শকের দিকে ফেরানো বা দেখানো অর্থাৎ, দর্শক থেকে অথবা ছবির প্রধান চরিত্র থেকে যেটি দূরের চোখ সেটিও সম্পূর্ণভাবে আঁকা যার ফলে দূরের চোখটি মুখের পরিমণ্ডল ছাপিয়ে শূন্যে আলম্বিত হয়েছে। আঁকা পুঁথিচিত্রে এই যে তফাত, ভক্তিপূর্ণ সম্পূর্ণ দৃষ্টির ঐতিহ্য সেটি কৃষ্ণলীলাবিষয়ক পাহাড়ী মিনিয়েচরেও আমরা বাশোলি শৈলীতে উনিশ শতক অবধি দেখি।

সরসীবাবু তাঁর 'পালযুগের চিত্রকলা'য় কোন রীতিকে মার্গশৈলী বলে অভিহিত করেছেন সেটি উদাহরণ দিয়ে তিনি স্পষ্ট করেননি। ৭ শতকের আগের গুহাচিত্রকে যদি মার্গচিত্র বলে মনে করেন, তবে তাঁর মতে পুঁথিচিত্রের রীতি হল মধ্যযুগীয় পুঁথি শৈলী। দুই রীতির উদ্দেশ্য আলাদা। গুহাচিত্রের স্পষ্ট উদ্দেশ্য ছিল নবীন সাধক, আগন্তুক এমন কি অশিক্ষিত পথিককে একের পর এক আখ্যানের মধ্যে দিয়ে, মন, দৃষ্টি ও চিত্তবিনোদনের সঙ্গে, চেতনাকে পরিশুদ্ধ করে, বৌদ্ধধর্মের জাতকাদি মহাকাব্যের সঙ্গে পরিচিত করা। কথকঠাকুর যেভাবে আখ্যানের সাহায্যে গূঢ়তত্ত্বে শ্রোতাকে দীক্ষিত করেন, গুহাচিত্র ও তার ব্যাখ্যাই অনভিজ্ঞকে দীক্ষিত করবে।

অন্যপক্ষে পুঁথির উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ আলাদা। তার উদ্দেশ্য নিরক্ষর, অশিক্ষিত বা চঞ্চলমতি নবদীক্ষিতের কাছে চিত্তবিনোদনকারী আখ্যান উপস্থাপিত করে তাকে ধর্মে আকৃষ্ট বা আপ্লুত করা নয়। পুঁথির গূঢ় বক্তব্যের সঙ্গে মিলিয়ে সেই বক্তব্যের সর্বগুণসম্বলিত চিত্রের চরিত্রের চাক্ষুষ ব্যাখ্যা, পুঁথির লেখার সহায় হিসাবে উপস্থাপিত করে,

অধ্যয়নশীল পণ্ডিতের মন ও চেতনা অনুরণিত করা। নালন্দা বা অন্যান্য পূর্বদেশীয় বিহারে অতীতের মার্গরীতিতে, অথবা পালযুগে, অর্থাৎ ভারতেতিহাসের মধ্যযুগে, কি ধরনের প্রাচীর চিত্র ছিল তার নিদর্শন না থাকায় বৌদ্ধ বা গুপ্তযুগের আদিকালের গুহাচিত্রের সঙ্গে এইসব প্রাচীর চিত্রের শৈলীসম্বন্ধ কি ধরনের ছিল, তার স্পষ্ট ধারণা সম্ভব নয়, এমন কি সে বিষয়ে চীনা পর্যটকদের বিবরণেও কোন বিস্তৃত আলোচনা পাই না।

সরসীবাবু তার বইয়ে চিত্রকর্মের অধ্যায়ে সমরাঙ্গণ সূত্রধার বর্ণিত চিত্রকর্মের আটটি অঙ্গের উল্লেখ করেছেন, (১) বর্তিকা—বর্তিকা অবশ্য প্রক্রিয়া পর্যায়ে পড়ে না। বর্তিকা একধরনের লেখনী বা কলম যার সাহায্যে চিত্র আঁকা, মুখ্যত প্রাচীর চিত্র আঁকা, শুরু হয়; (২) ভূমিবন্ধন—অর্থাৎ চিত্রের জমি বা কাগজটি তৈরি করা; (৩) লেখ্য; (৪) রেখাকর্ম, যাকে আমরা এখন ইংরেজিতে বলি ড্রয়িং বা কোরা ছবি; (৫) বর্ণকর্ম, অর্থাৎ রঙগুলি পরপর কিভাবে লাগাতে হবে বা পরস্পরের সঙ্গে মেশাতে হবে; (৬) বর্তনাক্রম, ইংরেজিতে যাকে বলা যায় ফিগরের মডলিং ও প্লাস্টিক পূর্ণতা আনা; (৭) লেখন বা লেখকরণ বা ড্রয়িং-এর পরও রেখা দিয়ে প্রতিটি আকারে সম্পূর্ণভাবে প্লাস্টিক গুণ আনা। সরসীবাবু লিখেছেন: "এই রেখা অঙ্কিত হয় অবয়বের রঙের বিপরীত বর্ণে, আর এই রেখাঙ্কনে চিত্রের রেখা চূড়ান্তভাবে স্থিরীকৃত হয়। আমাদের চিত্রে এই রেখা আঁকা হয়েছে কালো অথবা লাল রঙে।" তারপরে আসে (৮) দ্বিককর্ম, ইংরেজিতে যাকে বলে 'ফিনিশিং টাচ': অর্থাৎ শিল্পীর ঈপ্সিতভাবের প্রকাশে যে সব 'আরো-কিছু' প্রয়োজন হয় চিত্রের সমাপ্তিতে, যথা আভাস-সৃষ্টি, উজ্জ্বলতা-সম্পাদন প্রসাদগুণ বর্ধন ইত্যাদি, যার ফলে হয় চিত্রের পূর্ণ উদ্ভাসন। সরসীবাবু বলেন এই পরিপ্রেক্ষিতে "দ্বিককর্ম' পাঠটির পরিবর্তে এই অঙ্গটির সঙ্গত পাঠ 'দীপকর্ম' হতে পারে বলে মনে হয়।'

সরসীবাবু তাঁর বইয়ে মার্গ চিত্রঐতিহ্যের তুলনায় পাল পুঁথিচিত্রে বর্তনাব্যঞ্জনার অপেক্ষাকৃত প্রভাব আছে, এই মর্মে মন্তব্য করেছেন। মন্তব্যটি বোধ হয় সাধারণভাবে ভারতীয় মিনিয়েচরের ইতিহাসের শুরু থেকে সব ছবিতেই খাটে, কারণ দ্বিমাত্রিক ছবি কথাটি বর্তনাব্যঞ্জনা, ছায়াতপ ও বর্ণালিবিভঙ্গের অপেক্ষাকৃত অভাব থেকেই ওঠা সম্ভব এবং মিনিয়েচর ছবির রঙে ছায়াতপ ও বর্ণালিবিভঙ্গ খুবই সীমিত, যার ফলে মড়লিংও নিটোলভাব সম্পূর্ণ পরিস্ফুট নয়, বরং চ্যাপটা ভাবই বেশি আসে। যে বর্তনাক্রম এবং দ্বিককর্ম আসে তার মূলে থাকে প্রথমত 'লেখা কর্ম' ও পরে লেখাকরণ বা বিশদ রেখায় সমস্ত মূর্তিটি ফুটিয়ে তোলা। কালো কোরা রেখায় যে বর্তনাব্যঞ্জনা সম্পূর্ণভাবে সার্থক হতে পারে, এবং পাল পুঁথিচিত্রকর সে সার্থকতা তাঁর পুঁথিচিত্রে বিশদভাবে এনেছেন তার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাই সরসীবাবুর বইয়ের ১৬৫, ১৬৭, ১৬৯, ১৭১, ১৭৩, ১৭৫, ১৭৭ ও ১৭৯ পৃষ্ঠার ছবিগুলিতে। তার মধ্যে ১৭১, ১৭৩, ১৭৫, ১৭৭ ও ১৭৯ পৃষ্ঠার ছবিগুলি মূলে সাদাকালোয় আঁকা কিনা আমার জানা নেই। তবে ১৬৫ ১৬৭, ১৬৯ পৃষ্ঠার ছবিগুলি, যাদের উল্লেখ সরসীবাবুর বইয়ের ২২-২৩ পৃষ্ঠায় 'রেখাচিত্র' বলে পাই, সেগুলি স্পষ্টত 'কোরা' ছবি অর্থাৎ প্রথম (বর্তিকা) দ্বিতীয় (ভূমিবন্ধন) তৃতীয় (লেখ্য) এবং সপ্তম অঙ্গ লেখন ব লেখকরণেই আবদ্ধ, বর্ণক্রম বা রঙের সাহায্যে 'বর্তনাক্রম' আরোপ করা হয়নি। বর্তমান ভাষায় যাকে বলা যায় কাগজের উপর কালো কালি বা পেন্সিল বা কাঠকয়লার আঁকা, শুধু রেখা নয়, জমি ও লেখন ও দ্বিককর্মে অর্থাৎ ফিনিশিং টাচে সম্পূর্ণ এই ছবিগুলি আশ্চর্যরকমে যামিনী রায় মহাশয়ের ছবি স্মরণ করিয়ে দেয়। কাপড়ের অর্থাৎ কাগজের উপর সাদা-কালো রেখা ড্রয়িং-এর নিটোল সম্পূর্ণ ভাবে মড়লিং করা, প্লাস্টিকগুণসম্পন্ন সম্পূর্ণ চিত্রের সঙ্গে তুলনায় কোন অংশে কম যায় না। এই তিনটি ছবিতেই, উপরন্তু ১৭১ থেকে ১৭৯ পৃষ্ঠার সাদাকালো ছাপা ছবিতে ও স্পষ্টই বোঝা যায় ভারতীয় মিনিয়েচরে কি করে ছায়াতপ, উচ্চাবনত, মড়লিং ও প্লাস্টিক গুণ দ্বিমাত্রারীতিতে চিত্রিত রঙীন ছবিতেই এসেছে। এই আঙ্গিক থেকেই বোঝা যায় পালযুগের চিত্রকলার সঙ্গে ১৭ শতকের পরের ভারতীয় মিনিয়েচর, বিশেষত উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের মিনিয়েচর কি পরস্পরায় আত্মীয়সম্বন্ধে আবদ্ধ।

যাঁরা অরেল স্টাইন, শোয়েন হেডিন বা টুনহুয়াং গুহাচিত্রগুলির প্রাচীর চিত্র ও ভাস্কর্যের বই দেখেছেন তাঁরা হয়ত আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, তিব্বত, নেপাল বা চীন থেকে বিদগ্ধ ও গুণী ভিক্ষু ও সাধক এসে তাঁদের দেশের চিত্র ও ভাস্কর্যের আদর্শ ও তত্ত্ব পালযুগের মহারথী পুঁথিচিত্রকর ও ভাস্করদের সঙ্গে আলাপ করে তাঁদের প্রভাবিত করতেন। পাল পুঁথিচিত্রে ভাস্কর্যভিত্তিক গুণাগুণ যেভাবে প্রকট, জৈন পুঁথিতে তা দেখি না। জৈন পুঁথির অধিকাংশ ছবি ছবির আইন মেনে চলে, ভাস্কর্যের নয়। সেই কারণে বোধ হয় জৈন পুঁথিচিত্র থেকে ষোল সতেরো শতকের রাজস্থানী, মুঘল ও পাহাড়ী মিনিয়েচরের উত্তরণ অনেক স্বাভাবিক ও সমগোত্রীয় মনে হয়, য

পালপুঁথি দেখে মনে হয় না।

তার অবশ্য বিষয়গত কারণও আছে। জৈন পুঁথিচিত্রে জৈনধর্মের মূর্তিচিত্র ও ধ্যান ছাড়াও হিন্দুধর্মাশ্রয়ী ও লৌকিক পুরাণ ও আখ্যানচিত্র পাই। অথচ পাল পুঁথিচিত্রের প্রধান উপজীব্য বিষয় হল বৌদ্ধতন্ত্রাশ্রয়ী দেবদেবীর আলেখ্য বা তাঁদের বৈভব ও কীর্তির বিবরণ। এমন কি বোধিসত্ত্ব, জাতক, বুদ্ধের জীবনের ঘটনাবিষয়ক ছবিও কম। বুদ্ধদেবের জীবনবৃত্তান্ত বিষয়ে সরসীবাবুর বইতে মাত্র এই কটি ছবি আছে: ১। ভগবান বুদ্ধের জন্ম, (তিনটি), ২। নালগিরি (মত্তহস্তী) বশীকরণ, ৩। মৈত্রেয়-বুদ্ধ (দুটি), ৪। মহাপরিনির্বাণ ৫। দেবাবতরণ (দুটি) ৬। ধর্মচক্রপ্রবর্তনরত ভগবান বুদ্ধ, ৭। ধর্মদেশনা। মোট এগারটি। অপরপক্ষে বকি ৪৭টি ছবির অধিকাংশ বিষয়ই হচ্ছে প্রজ্ঞাপারমিতা, বসুধারা, মহাশ্রী তারা, মহাসাহস্রপ্রমর্দনী, মহাপ্রতিসরা, বজ্রপর্য্যঙ্কোপবিষ্ট দেবী, নৈরাত্মযোগিনী, মৃত্যুবঞ্চন তারা, মহামায়ূরী, রক্ষা মহাদেবী, প্রজ্ঞাপারমিতা উদ্ধার, বজ্রসত্ত্ব, কুরুকুল্লা, তান্ত্রিক দেবতা, তান্ত্রিক দেবী, বজ্রপাণি, লোকনাথ, অরপচন-মণ্ডল, অমোঘসিদ্ধি-বুদ্ধ, মঞ্জুঘোষ, অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা, পঞ্চবিংশতিসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা। সুতরাং অধিকাংশ উপপাদ্য বিষয়ের প্রতিটি যখন একাত্মক তখন তার প্রকাশভঙ্গিও একক ভাস্কর্য বা আলেখ্যঘেঁষা হতে বাধ্য।

আরেকটি বড় কারণ আছে। যার উপরে ছবি আঁকা হত সেটি হত তাড়পত্র বা তেরেট। স্বাভাবিক তালপাতার শিরাউপশিরা থাকে, তার উপর সূক্ষ্ম তুলি যথেচ্ছ লীলায়িত করে আঁকা কষ্টকর হয়, বর্তনাগুণ, কি রঙে, কি রেখায়, আনায় বিঘ্ন ঘটা স্বাভাবিক। সেই হিসাবে সরসীবাবু যে-মন্তব্য করেছেন, যে পাল পুঁথিচিত্রে বর্তনাময় গুণের থেকে রেখার প্রাধান্য (linear effect) ছিল বেশি, তার একটি স্থূল প্রাকৃতিক কারণ ছিল। মার্গচিত্রের জমি ছিল দেয়াল এবং প্ল্যাস্টার, যার উপরে রেখা ও রঙ অবলীলাক্রমে তুলির অনাহতগতিতে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব। কিন্তু তালপাতার মত উপাদানে সেটি সম্ভব নয়। তা সত্ত্বেও কোরা তেরেটের উপর ভূমিবন্ধন করে কালি বা কাঠকয়লা দিয়ে যে অপূর্ব লেখন ও দ্বিককর্ম পাই, যার উল্লেখ একটু আগেই করেছি, তারপরে পালপুঁথিতে বর্তনাব্যঞ্জনার অভাব আছে একথা স্বীকার করতে বাধে। তা সত্ত্বেও, পালযুগের পুঁথিচিত্রের বিষয়সম্ভার বৌদ্ধতন্ত্রশাস্ত্রের আরাধ্য দেবদেবীর প্রতিমাচিত্রণে এতই সীমিত যে পার্থিব জীবনের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে তাকে অদীক্ষিত সর্বসাধারণের মধ্যে চিত্র হিসাবে সমাদরযোগ্য করা শক্ত। ভাগ্যক্রমে ধর্মীয় চিত্রের পদানুসরণে জৈন পুঁথিচিত্র, সমসাময়িক কাব্যের উপাখ্যান চিত্রণে যে-পরিমাণ স্বচ্ছন্দগতি প্রকাশ করেছে তার ফলেই জৈন পুঁথিচিত্রকে মুঘল ও রাজপুত মিনিয়েচরের পূর্বপুরুষ হিসাবে অনায়াসে ধরা যায়।

এখন পালযুগের চিত্রকলার সন তারিখের কিছু হিসাব দিয়ে শেষ করে, জৈনপুঁথির আলোচনায় যাওয়া যাক।

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর 'হিসটরি অভ বেঙ্গল' প্রথম খণ্ডে পালবংশের প্রধান রাজাদের রাজত্বকাল এইভাবে নির্ধারিণ করেন।

পালবংশের সংক্ষিপ্তপঞ্জী

নাম	রাজত্ব-কাল	সিংহাসন আরোহণের তারিখ খ্রীস্টীয়	নাম	রাজত্ব-কাল	সিংহাসন আরোহণের তারিখ খ্রীস্টীয়
১। গোপাল	..	৭৫০	৯। নয়পাল	১৫	১০৩৮ (-৫৫
২। ধর্মপাল	৩২	৭৭০	১০। বিগ্রহপাল (৩)	..	১০৫৫ (-৭০?)
৩। দেবপাল	৩৯(৩৫?)	৮১০ (৮৫০)	১১। মহীপাল (২)	..	১০৭০ (-৭৫)
৪। নারায়ণপাল	৫৪	৮৫৪ (-৯০৮)	১২। রামপাল	৪২	১০৭৭ (-১১২০)
৫। রাজ্যপাল	৩২	৯০৮ (-৯৪০)	১৩। কুমারপাল	...	১১২০ (-২৫)
৬। গোপালদেব (২)	১৭	৯০৮ (-৯৬০)	১৪। গোপাল (৩)	১৪	১১২৫ (-৪০)
৭। বিগ্রহপাল (২)	২৬ ?	৯৬০ (-৯৮৮)	১৫। মদনপাল	১৪	১১৪০ (-৫৫)
৮। মহীপাল (১)	৪৮	৯৮৮ (-১০৩৮)	১৬। গোবিন্দপাল	৪	১১৫৫ (-৫৯)

যে আঠাশটি তারিখযুক্ত পুঁথিচিত্রের কথা সরসীবাবু আলোচনা করেন, তার মধ্যে প্রাচীনতম ছবিটির তারিখপুষ্পিকায় যা আছে তার খ্রীস্টীয় তারিখ হচ্ছে প্রথম মহীপালের ষষ্ঠ রাজ্যাঙ্কে অর্থাৎ আনু ৯৯৪ খ্রীস্টাব্দ এবং সর্বশেষ তারিখ হচ্ছে খ্রীস্টাব্দ ১৪৫৫। পুঁথিচিত্রক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য রাজপৃষ্ঠপোষকতা হয়, এঁদের সময়ে : মহীপালদেব (১); নয়পালদেব; মহীপালদেব (২); রামপালদেব; গোপালদেব (৩); মদনপালদেব; গোবিন্দপালদেব; গোমীন্দ্র (পালদেব); মধুসূদনদেব। শেষ দু'জনের রাজত্বকাল তারিখ ঠিকমত পাওয়া যায় না।

জৈন পুঁথিচিত্র ৭০০ (-১৮০০)

পালপুঁথি আমি যদিও বা কিছু দেখে থাকি, দুর্ভাগ্যক্রমে মূল জৈন পুঁথিচিত্র দেখেছি আরো কম। উপরন্তু যে-কয়খানি সংরক্ষিত জৈন পুঁথি আমি দিল্লীতে দেখেছি সেগুলি খুঁটিয়ে দেখার অবসর আমার ঘটেনি। অতএব আমি এই অনুচ্ছেদের জন্য মুখ্যত নির্ভর করেছি ডঃ মোতিচন্দ্র ও ডঃ উমাকান্ত পি শা'র অতি উৎকৃষ্ট বই নিউ ডক্যুমেন্ট অভ জৈন পেন্টিং-এর উপর। বইটি ১৯৭৫ সালে শ্রী মহাবীর জৈন বিদ্যালয় বম্বে থেকে প্রকাশিত হয়। ডঃ মোতিচন্দ্র তাঁর ভূমিকায় বলেছেন জৈনভাণ্ডারগুলিতে রক্ষিত জৈন পুঁথিগুলি পণ্ডিতদের দ্বারা পরীক্ষার ব্যবস্থা হবার আগে পশ্চিমভারতের চিত্রেতিহাস যা কিছু জানা ছিল তাদের তারিখ প্রায় সবই ১১০০ থেকে ১৫৫০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে। খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতকে সারা গুজরাটব্যাপী ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। কালের করাল গ্রাস থেকে জৈন পুঁথিগুলি রক্ষার্থে বালভি শহরে ৪৫৩ খ্রীস্টাব্দে দেবর্ষিগণির সভাপতিত্বে জৈন সাধু ও ভিক্ষুদের এক বিরাট মন্ত্রণা-পরিষদ আহূত হয়। সেই সভায় জৈনশাস্ত্র পুঁথিবদ্ধ করে তাদের সংরক্ষণ ব্যবস্থাদি বিষয়ে কতকগুলি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এই সংরক্ষণ কাজে জৈন বণিক ও ধনীব্যক্তিরা তাঁদের যথাসাধ্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। এইভাবে যুগে যুগে সন্ন্যাসী ও শাস্ত্রপ্রচারকারীদের লিখিত পুঁথিগুলি জৈনভাণ্ডারগুলিতে ন্যস্ত হয়। সেই সংগ্রহকাজে উৎসাহদানের জন্য কিছু বছর অন্তর অন্তর বড় করে জ্ঞান-পূজা অনুষ্ঠিত হত। এই কাজে গুজরাটের দুই রাজা সিদ্ধরাজ জয়সিংহ ও কুমারপালের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রবাদ আছে জয়সিংহ (১০৯৩-১১৪৩) প্রায় তিন শত পুঁথিকার প্রতিপালন করেন, যাঁরা বেছে বেছে পুঁথিউদ্ধার করে রাজপুস্তককোষের জন্য পুঁথি নকল করতেন। এক একটি পুঁথির কয়েকটি করে কপি হত, জয়সিংহ সেগুলি বিভিন্ন মঠের পুঁথি-আগারে বিলি করতেন। এইভাবে কুমারপাল তাঁর রাজত্বে (১১৪৩-১১৭৫) সারা ভারতে একুশটি জ্ঞানভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করেন, এবং প্রায় সাতশ' পুঁথিলেখক নিযুক্ত করেন। তাঁরই সময়ে সোনার কালিতে পুঁথি লেখা হত। এই দুই বিদ্যোৎসাহী সোলাঙ্কি রাজাদের নির্দেশ তাঁদের কয়েকজন প্রধান জৈন মন্ত্রী বিশেষভাবে পালন করেন : তাঁদের নাম বাস্তুপাল ও তেজপাল। তাঁদের দুইজন মহান গুরু ছিলেন : বিজয়সেনসূরী ও উদয়প্রভাসূরী। দুই গুরুর নির্দেশমত দুই মন্ত্রী তিনটি বিরাট গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠার পিছনে তখনকার দিনের কয়েক অযুত টাকা ব্যয় করেন। আরো পরের যুগে, মাণ্ডুপগড় ওরফে মাণ্ডুগড়ের পরমার রাজ জয়সিংহের মন্ত্রী পেথর শাঁ (সং : পৃথ্বী ধর) ১২১৩ খ্রীস্টাব্দে গুজরাটের সাতটি নগরে জৈন পুঁথিভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করেন, তার মধ্যে প্রধান ছিল বরোচ, দেবগিরি, মাণ্ডু ও আবু।

জৈনভাণ্ডারগুলি জৈনদের কীর্তি হলেও, সেই সব গ্রন্থালয়ে জৈনধর্ম বহির্ভূত অন্যান্য সম্প্রদায়ের শাস্ত্রাদি ও কাব্যগ্রন্থাদিও রক্ষিত হত। উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় পুঁথি ও সংস্কৃত ধর্ম ও কাব্যগ্রন্থের তর্ক ও আলোচনার পক্ষে এই ধরনের গ্রন্থাগার বিশেষ সাহায্যে আসবে। জৈনভাণ্ডারগুলি জৈনসংঘ বা সম্প্রদায়ের সম্পত্তি বলে স্বীকৃত হত। শ্বেতাম্বর জৈনদের জ্ঞানভাণ্ডারগুলি ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিল : গুজরাট, রাজস্থান, মালোয়া ও উত্তরপ্রদেশের দিল্লী-আগ্রাতেও, অর্থাৎ যে সব অঞ্চলে জৈনদের ব্যবসা, আর্থিক আধিপত্য ও প্রতিষ্ঠা ছিল। দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়ের জ্ঞানভাণ্ডারগুলি ছিল মুখ্যত দিল্লী-আগ্রায় ও রাজস্থানে। কিন্তু বিস্তৃত ছিল পূর্বে নাগপুর প্রদেশের করঞ্জ ও দক্ষিণ মাদ্রাজের মুদাবিদ্রি পর্যন্ত। শ্বেতাম্বর ভাণ্ডারগুলির মুখ্য কেন্দ্র ছিল

পাটান, ক্যাম্বে, জয়সলমীর, বরোদা, আমেদাবাদ, ইদর, সুরাট, কচ্ছ, চান্‌স্‌মা, লিমডি, ছানি, ইত্যাদি। এসব গ্রন্থাগারে তালপাতা ও তুলোট কাগজের পুঁথি সংরক্ষিত হত। কিন্তু বিশ শতকের প্রথমাংশের আগে এইসব জৈনভাণ্ডারে পুঁথি দেখার বা পরীক্ষা করার কোন সুবিধা সুযোগ সম্প্রদায়বহির্ভূত কোন ব্যক্তিকে বা পণ্ডিতকে দেয়া হত না। এই শতকের প্রথম চতুর্থাংশে পণ্ডিতপ্রবর গ্লাসেনাপ ও আনন্দ কুমারস্বামীর অক্লান্ত চেষ্টায় কিছু কিছু ব্যক্তিগত মালিকানার সংগ্রহের পুঁথি সংগৃহীত হয়। কুমারস্বামী তাঁর 'ক্যাটালগ অভ দি ইন্ডিয়ান কালেক্‌শন্‌স্ ইন দি মিউজিয়াম অভ ফাইন আর্টস্' বোসটন, চতুর্থ খণ্ডে প্রথম পশ্চিমভারতের জৈন পুঁথিচিত্র সংগ্রহের তালিকা প্রকাশ করেন। সেই ক্যাটালগের কল্যাণে নর্মান ব্রাউন, এন সি মেহতা, মুনি শ্রীপুণ্যবিজয়জী, ও সি গাঙ্গুলি, অজিত ঘোষ, এস এম নবাব, এম আর মজুমদার, মোতিচন্দ্র, ইউ পি শা', প্রমোদচন্দ্র প্রভৃতি জৈন পুঁথিচিত্রের আলোচনার শুরু করেন। এর পর ১৯৩৫ সালে মুনি শ্রীপুণ্যবিজয়জী ও সারাভাই নবাব গুজরাটী ভাষায় জৈনকল্পদ্রুম, প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন। বইটিতে কয়েকটি দুর্গম জ্ঞানভাণ্ডার থেকে অনেকগুলি আহৃত কাপড়, তালপাতা ও কাগজের পুঁথিতে আঁকা পুঁথিচিত্র প্রকাশ করেছেন। এর পর আরো অনেকগুলি চিত্রিত পুঁথি দ্রুত আবিষ্কৃত হয়, অধিকাংশেরই তারিখ ১১০০ থেকে ১৫৫০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। এদের মধ্যে অনেকগুলি ছিল পুঁথির পাটার উপর চিত্রিত ছবি, কাপড়, তালপাতা ও কাগজের উপর আঁকা পুঁথিতে।

এসব প্রমাণ ও নজির থেকে মোতিচন্দ্র তাঁদের বইয়ে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, আগে পণ্ডিতদের মধ্যে যে ধারণা ছিল যে পশ্চিমভারতের পুঁথিচিত্রে খ্রীস্টীয় পনেরো শতক পর্যন্ত নিতান্ত ধর্মীয় ও যাজকীয় চিত্র হিসাবে মোটামুটি কতগুলি বাঁধা গতে ও ধরাবাঁধা মূর্তিলক্ষণের নিয়মে তৈরি হত, ফলে চিত্রে অলঙ্কার বা বিন্যাসের (কম্পোজিশনের) অদলবদল নিষিদ্ধ ছিল, সে ধারণা আদৌ ঠিক নয়। বিশ শতকের প্রথমার্ধে ও পরে ভাণ্ডারগুলি থেকে যে সব পুঁথিচিত্র প্রকাশিত হয়েছে তাতেই বোঝা যায় জৈন পুঁথির চিত্রকরদের কীর্তি কত বিচিত্রমুখী ছিল।

আবিষ্কৃত পুঁথিগুলি থেকে বোঝা যায় পশ্চিমভারতের চিত্রেতিহাসে পনেরো শতকটি ছিল উন্মেষের যুগ। এই উন্মেষের শুরু হয় চোদ্দ শতকের শেষ চতুর্থাংশে। এই সময় থেকেই পুঁথিচিত্র নতুন মহিমায় মণ্ডিত হতে শুরু করে নানা রঙ, লেখন-রীতি ও নতুন নতুন অলঙ্কারের উদ্ভাবন হয় এবং বিষয় বৈচিত্র্য উদ্ভাবন ও প্রকাশনা বিষয়ে চিত্রকররা অনেক বেশি স্বাধীনতা অর্জন করেন।

পণ্ডিতরা মনে করেন পুঁথিচিত্রের প্রধান এমনকি আদি কেন্দ্র ছিল শ্রী পাটান (আমেদাবাদ থেকে প্রায় ১২৫ কি. মি. উত্তর-পশ্চিমে)। কারণ ডঃ ইউ পি শা' পাটানেই সবথেকে প্রাচীন—অর্থাৎ আনুমানিক বারো শতকে লিখিত জৈন অম্বিকা দেবীর ছবিআঁকা জ্ঞাতাসূত্র বলে একটি পুঁথি আবিষ্কার করেন। এটিই তাঁর মতে সবথেকে প্রাচীন চিত্র যা এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে। পাটান ছাড়াও অন্যান্য বিশিষ্ট কেন্দ্র ছিল, আমেদাবাদ, ভাদনগর, চাম্পানের (চম্পকদুর্গা)। সম্প্রতি ডঃ শা' আবিষ্কার করেছেন শিরোহি রাজ্যেও একটি বিশিষ্ট চিত্ররীতি ছিল। শিরোহি হচ্ছে গুজরাট ও রাজস্থানের সীমাস্থলে, ডুঙ্গড়পুর বা বাঁশওয়াড়া রাজ্যের মত। শিরোহি রীতির সঙ্গে আমঝাড়া (ডুঙ্গড়পুর, রাজস্থান) ও গুজরাটের পূর্বেকার সমালাজি (পুরনো ইদর রাজ্য) রীতির মিল আছে।

মোতিচন্দ্র ও ইউ-পি শা'র বই থেকে মনে হয় মধ্যযুগে পুঁথিচিত্রকরদের সবথেকে বড় ঘাঁটি ছিল গুজরাট, সব অনুপ্রেরণার কেন্দ্র। মালোয়ার মাণ্ডুতে ছিল দ্বিতীয় প্রধান কেন্দ্র। দিল্লীর জাতীয় মিউজিয়মে রক্ষিত কল্পসূত্র পুঁথি থেকে পশ্চিমভারতের পুঁথিচিত্রের প্রগতি সম্বন্ধে কিছু কিছু নতুন তথ্য পাওয়া গেছে। এই পুঁথিতে বলা আছে গুর্জরাটীতে চিত্রিত পুঁথিকে বলত 'কলাপুস্তক'। এনামেলের নানা উজ্জ্বল রঙে আঁকা ছবিতে ফুটে ওঠে চিত্রকরদের বলিষ্ঠ লেখনরীতি। মানবদেহের সুচারু বৈভবপ্রকাশে যাজকীয় ঋজুতা বা কাঠিন্য আর থাকল না, এল নমনীয়তা, মণ্ডন, বর্তন ও সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস। এর কিছুদিনের মধ্যে আরেকটি উল্লেখযোগ্য পুঁথি মাণ্ডুতে হয়, নাম কালকাচার্য-কথা। তারিখ খ্রীস্টাব্দ ১৪১৪, বোধহয় পাটানে লিখিত, দ্বিতীয় একটি কালকাচার্য-কথা আরো মূল্যবান ও ধনাঢ্য লিপি এবং চিত্রে ভরা। তৃতীয় আরেকটি কালকা-কথা সম্প্রতি আবিষ্কার হয়েছে, তার তারিখ ১৩৪৬ খ্রীস্টাব্দ, সেটিই বোধহয় সবথেকে পুরনো কপি ; ছবিগুলিতে ঢালাও হাতে সোনার রঙ ব্যবহৃত হয়েছে। পনেরো শতকের প্রথম দিকে আরেকটি প্রচুরভাবে ছবি-আঁকা পুঁথি লিখিত হয় : নাম সুপাসনাচার্য। লেখার তারিখ ১৪২৩ খ্রীস্টাব্দ। লিখিত হয় মেবারের উদয়পুরের সন্নিকট দেলভাদায়।

পনেরো শতকে পশ্চিমভারতে চিত্রিত পুঁথির আদর বাড়ার ফলে পুঁথিচিত্রণ কাজ দুই হিসাবে সমৃদ্ধিলাভ করে। প্রথম জৈনধর্মবলম্বী ব্যাঙ্কিংকাজে লিপ্ত বড় বড় পরিবারগুলি তাঁদের নিজেদের শ্লাঘা ও তৃপ্তির উদ্দেশ্যে

প্রভূতভাবে চিত্রিত বহুমূল্য কল্পসূত্র কালকাচার্য-কথা পুঁথির অনেকগুলি করে নকল করান। সোনা, ইন্দ্রনীল (ল্যাপিজ ল্যাজুলাই), কার্মাইন (রক্তিম রত্ন) প্রভৃতি বহুমূল্য ধাতু রত্ন, আগে যা অল্প পরিমাণেই পুঁথির চিত্রণে ব্যবহৃত হত, সেগুলির এখন মুক্তহস্তে ব্যবহারের প্রচলন হল। এইসব রঙে চিত্রিত পুঁথির সংখ্যাও বেড়ে গেল। উপরন্তু প্রতিটি ছবির পাড় হিসাবে বিশদভাবে স্থাপত্য, বহুমূল্য বস্ত্রের ও কার্পেটের নক্শা ও অলঙ্কার বিচিত্রভাবে নানা রঙে আঁকা হত। উপরন্তু পুঁথির প্রতি পাতারই পাড় হিসাবে নৃত্যরত, বাদ্যরত ভক্ত ও সন্ন্যাসীর সারি বা দল দিয়ে ভর্তি করা হত। এসব চিত্রে পারসীক চিত্ররীতির প্রভাব সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে, প্রাকৃতিক প্রেক্ষাপট বা সামাজিক দৃশ্য আঁকারও রেওয়াজ হল। এইসব লক্ষণাদি বারোচের সন্নিকটে গান্ধার বন্দরের কাছে আনুমানিক ১৪৭৫ খ্রীস্টাব্দে লিখিত একটি পুঁথিতে সবথেকে বেশি পাওয়া যায়। কিছুদিনের মধ্যে এই গান্ধার বন্দরের পুঁথিটি হয়ে উঠল অন্যান্য পুঁথিচিত্রণের আদর্শ। এই ধরনের প্রভূতভাবে অলঙ্কৃত ও চিত্রিত আরেকটি পুঁথি তৈরি হয়, সেটি আছে জামনগরের অঞ্চলগচ্ছ সংগ্রহে। এটি পাটানে লিখিত ও চিত্রিত হয়, তারিখ আনু. ১৫০১ খ্রীঃ। যে জোয়ারটি এল তার ঢেউ বহুবিস্তীর্ণ হল। পুঁথিচিত্র আর শুধুমাত্র জৈনধর্মীয় পুঁথিতে আবদ্ধ রইল না। বৈষ্ণবধর্মীরাও এটি অবলম্বন করলেন। তৈরি হল নতুন করে চিত্রিত গীতগোবিন্দ ও বালগোপালস্তুতি পুঁথি। জৈন শৈলীতে আঁকা হলেও এইসব বৈষ্ণব পুঁথিতে এল এক নতুন প্রাণবন্ত, গতিশীলভাব, অভিব্যক্তিক সুগভীর আবেগ ও মানবিক প্রত্যয়। চিরাচরিত নীরস, দারুভূতভাবে চিত্রিত জৈন প্রতিকৃতি বা গতিহীন মূর্তিপ্রতিমা ভাব নেই।

এই নতুন আন্দোলনের ফলে শুরু হল লৌকিক বিষয়াশ্রয়ী পুঁথিরও জড়ানো চিত্রিত পটের ধারা। এই রীতিতে আঁকা সবথেকে পুরনো পুঁথির তারিখ হল ১৪৫১ খ্রীস্টাব্দ, নাম বসন্তবিলাস। এটি যে একক পুঁথি নয়, উলটে একটি নতুন ধারার প্রবর্তন করল তার প্রমাণ হল পরপর আরো কয়েকটি লৌকিক পুরাণ বিষয়ক পুঁথি, যেমন দময়ন্তীকথা, মাধবানন্দ কামকণ্ডলা। এই নতুন ধারা শুধু যে গুজরাট, মালোয়া বা রাজস্থানে প্রবল হল তা নয়, ছড়িয়ে পড়ল সুদূর উত্তরপ্রদেশেও।

লৌকিক পুরাণ বা অন্যান্য গীতিকাব্য চিত্রিত পুঁথিতে লেখার চলন শুরু হওয়ার ফলে পুঁথি লিখন ও চিত্রণ শৈলীর ঐতিহ্য অনেক বদলে গেল। যথা, যেহেতু প্রাচীন পুঁথির উপজীব্য বিষয় ছিল মুখ্যত মহাবীর ও তীর্থঙ্করগণ এবং তাঁদের ঐশীশক্তিসম্পন্ন শিষ্যশিষ্যারা, সেহেতু তাঁদের মুখ আঁকার সময়ে, মুখ পাশ ফেরানো থাকলে দূরের চোখটি মুখের রেখা থেকে বেরিয়ে শূন্যে প্রলম্বিত হত। এ বিষয়ে আগেই বলেছি। দু'শ বছরে চিত্ররীতির প্রগতির ফলে এই পূর্ণ প্রলম্বিত চোখে ক্রমশ সংকুচিত হয়ে স্থান পেল প্রলম্বিত চোখের আভাসমাত্র হিসাবে। ঠিক কোন যুগে বা সনে এই শূন্যে প্রলম্বিত চোখ আঁকার রীতি উঠে গেল বলা শক্ত, কিন্তু মোটামুটি ১৫০০ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ এই রীতি প্রায় লুপ্ত হল। মোটামুটি এই যুগেই পারসীক কাব্যগুলি বিষয় হিসাবে জৈন পুঁথি লিখনে ও চিত্রণে স্থান পেতে শুরু করে। কার্ল খান্ডালাওলার মতে জৈন পুঁথিচিত্রকর তাঁর পুঁথিচিত্রের সঙ্গে ভারতীয় ও পারসীক অঙ্কনরীতি ও প্রসাদগুণের সমন্বয় ঘটাতে তৎপর হন। ডঃ মোতিচন্দ্র বলেন পশ্চিমভারতীয় রীতি পনেরো শতকের মধ্যে মধ্য ও পূর্বভারতেও ছড়িয়ে পড়ে, এমন কি নেপালের পুঁথিচিত্রেও তার ছাপ রাখে, তার প্রমাণ এই যে এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধের নেপালী পুঁথিচিত্রেও দেখা যায় দূরের চোখটি মুখের বেষ্টন ছাড়িয়ে শূন্যে প্রলম্বিত হয়েছে। এমন কি তামিলনাড়ুর উত্তর আর্কট জিলার তিরুমালাই পর্বতের নেমিনাথের মন্দিরের প্রাচীরচিত্রেও এই ধরনের চোখ দেখা যায়। আরেকটি মজা হল, মাণ্ডুতে যখন মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হল তখন নিমতনামা পুঁথির চিত্রে কল্পসূত্র, কালকাচার্যকথার চিত্ররীতির সঙ্গে শিরাজ কলমের প্রভাবও স্পষ্ট দেখা দিল। তা সত্ত্বেও আদি গুজরাটে এবং রাজস্থানে প্রাচীন মূল জৈন ঐতিহ্য তার পূর্বকালের যাজকীয় আড়ষ্টতা ও ঋজুতা আরো কিছুকাল বজায় রাখল।

ষোল শতকে শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের তুলনায় দিগম্বর সম্প্রদায় তাঁদের পুঁথিতে এই যাজকীয় ঋজুতা আরো ভেঙ্গে দিলেন। শ্বেতাম্বরদের কল্পসূত্র পুঁথিচিত্রে যতটা ঋজুতা ও ঐতিহ্যবাহী ধারা দেখা গেল, দিগম্বররা তাঁদের মহাপুরাণ ধর্মগ্রন্থ পুঁথিগুলিতে সে ধারা অনেক ভেঙ্গে দিলেন। পালামে আঁকা ১৫৪০ খ্রীস্টাব্দ তারিখের মহাপুরাণ পুঁথির চিত্রে দেখি দূরের শূন্যে প্রলম্বিত চোখ আর নেই, যদিও বর্ণক্রম, দ্বিকাত্বকে মানবদেহের অঙ্কনে পুরনো রীতির ঐতিহ্য বজায় আছে।

পশ্চিমভারতে মুঘল আমলে জৈন ধর্মীয় বিষয়ে পুঁথিচিত্রে কি পরিবর্তন এল তার নিদর্শন অনেক আছে।

আকবরের চিত্রকর্মশালায় গুজরাটী চিত্রকররা বিশেষ সম্মানের আসন লাভ করলেন। তদানীন্তন লোকপ্রিয় এবং দ্রুতবিস্তারী মুঘল কলমে স্বীয় অবদান রাখার জন্য এবং জীবিকার্জনের আশায় গুজরাট ও রাজস্থানী পুঁথিচিত্রকররা দলে দলে মুঘল দরবারে গেলেন। ফলে নতুন এক শৈলী ও বিষয় সংস্থানের যুগ এল। পশ্চাদ্‌পটের নিসর্গ বা প্রাকৃতিক দৃশ্য, তার সঙ্গে মানুষের অবয়ব ও পোশাক অলঙ্কার ও দাঁড়ানো চলনবলন যদিও কিছুটা হল গতিবান ও মুঘলঘেঁষা, তবুও বর্ণক্রম ও পশ্চাদ্‌পট মুখ্যত রইল পুরনো জৈনঐতিহ্যবাহী। দুটি রীতি বা শৈলীর পাশাপাশি চল হল : প্রথম জনপ্রিয় চলতি মুঘলরীতি, কিছুটা মুঘল ও জৈনরীতির সরলীকরণ ; দ্বিতীয় লৌকিক ঐতিহ্যভিত্তিক রীতি, যা আপাতদৃষ্টিতে মুঘলরীতির অনুকরণ মনে হয় কিন্তু মূলত সাধারণ সমাজের বিনোদনার্থে তৈরি।

উমাকান্ত শা' জৈন পুঁথিচিত্রের ইতিহাসে প্রতিযুগের উল্লেখযোগ্য পুঁথিগুলির তারিখ দিয়ে এইভাবে ভাগ করেছেন। আমি তারিখ অনুযায়ী তাঁর বর্ণিত ৩য় ভাগ ৭ম ভাগ বলে বর্ণিত করেছি। সেইভাবে অন্যভাগে সংখ্যা দিয়েছি।

১। আদিযুগ (১) কল্পসূত্র : তারিখ ১৩৪৬ খ্রীঃ (২) কালকা-কথা : মাণ্ডুরীতি আনু. ১৪৪০ খ্রীঃ।

২। ২য় যুগ : শত্রুঞ্জয় মাহাত্ম্য : আনু. ১৪২০ খ্রীঃ, সুপাসনাচর্যম, মেবার (দেলভাদা) ১৪২২-২৩ খ্রীঃ। পুঁথি লিখন ও চিত্রকর হীরানন্দ। (৩-১০) শান্তিনাথ চরিত্র (আনু. ১৩৯৬ খ্রীঃ) ; দময়ন্তীকথা চম্পূ (১৪০০-১৪৩৫ খ্রীঃ) ; কল্পসূত্র (১৪৯০, ভাদনগর) ; উত্তরাধ্যয়ন-সূত্র (১৪৯২, পাটান), মাধবানল-কামকণ্ডলা-কথা (১৪৯৩, পাটান), চন্দ্রপ্রভা-চরিত্র (১৪৯৮, পাটান), জামনগর কল্পসূত্র, কালকা-কথা (১৫০১, পাটান), কল্পসূত্র (১৫১২, ভাবনগর)।

৩। (১) সংগ্রহণী-সূত্র (১৫৮৩, মাতার মধ্য-গুজরাট, চিত্রকর গোবিন্দ) (২) সংগ্রহণী-সূত্র (১৫৮৭, ক্যাম্বে) (৩) সংগ্রহণী-সূত্র (১৬৩৭), উত্তরাধ্যায়ন সূত্র (আঞ্জারা কচ্ছ, ১৬০০)।

৪। (১) উপদেশমালা বালাববোধ (১৭০৮ ?—১৭ শতকের শেষ, ইউ পি শা') (২) জম্বুদ্বীপ প্রজ্ঞপ্তি-প্রমেয়রত্নমঞ্জুষা-টীকা (১৬৯২, রাজস্থান, বালাতারা), (৩) কৃষ্ণভোলী (১৬৫০), (৪) নলদময়ন্তী-রস (অসম্পূর্ণ ১৭ শতক ? মুনি পুণ্যবিজয়সংগ্রহ), (৫) আর্দ্রকুমার-রস (১৭ শতকের শেষভাগ), (৬) সংগ্রহণী-সূত্র (১৬৫০, বিকানীর নবহরনগর), (৭) সংগ্রহণী (তারিখহীন, ১৬৮৫ ?)।

৫। (১) কুমারসম্ভব (১৬৪৪, গৌতমপুর), (২) মেঘদূত (১৬৬৯, অশনিকোটা)।

৬। (১) চন্দরাস (১৬৫৫, ব্যাঘ্রসেনপুর, গুজরাট ?), (২) চন্দিরাস (১৬৫৯, সুরাট), (৩) দেবীমাহাত্ম্য (১৭১৯, সুরাট), (৪) হরিবল চৌপদী (১৬৮৭, ধরগ্রামে লিখিত)।

৭। শ্রী চন্দরাজানো রাস (১৮১২, দক্ষিণী, পুণায় লিখিত)।

মোতিচন্দ্র ও ইউ পি শা'র বইটির চিত্ররাজি শুরু হয়েছে ১৩৪৬ খ্রীস্টাব্দে লিখিত কল্পসূত্র এবং ১৪৪০ সালে লিখিত কালকাকথা থেকে দুটি রঙীন পুঁথিচিত্র দিয়ে। প্রথমটি মহাবীরের জন্ম : উপর ও নিচ দুটি সমান্তরালভাবে ভাগ করা : ঊর্ধ্বলোকে দেবী নৃত্য করছেন, পিছনে ছত্রধারিণী মাথার পিছনে ছত্র ধরে আছে ; সমুখে ভূতপ্রেত পালাচ্ছে, পিছনে অনুচরগণ। নিচের দ্বিতীয় ভাগে মাতা দর্শকের দিকে ফিরে পালঙ্কে প্রলম্বিত শায়িতা, ডানবাহুতে শিশু মহাবীর, পরিচারিণী বাতাস করছেন। প্রাচীন চিরাচরিত রীতি মতে উপরে পশ্চাদ্‌পট ও সম্মুখপট ভাগ করা। ছবিতে যথেষ্ট গতি বর্তমান, ভাবও কোমলভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে, কিন্তু শৈলী, অঙ্কন, ও বর্ণনীতি ঐতিহ্যবাহী, অন্য-চোখটি মুখের সীমা থেকে শূন্যে প্রলম্বিত। দ্বিতীয় ছবিটিতে একটিই প্রেক্ষাপট : কালকাচার্য ও ইন্দ্রের সাক্ষাৎকার ও কথোপকথন। এখানেও যথেষ্ট গতি আছে, যদিও মানবদেহের ভঙ্গি ও সবকিছু লক্ষণ যাজকীয় সূত্রে বাঁধা। বস্ত্র একেবারে সাদা। উপবিষ্ট ও দণ্ডায়মান দেহের রেখাঙ্কনে ও বর্ণক্রমে বর্তন্ন বেশি ফুটে, যদিও সীমিত, মাথার উপরে মেঘাবৃত আকাশ শুধুই অলঙ্কার হিসাবে শোভা পাচ্ছে। দুটিরই ভূমি যাকে বলে ইন্ডিয়ান রেড, অর্থাৎ গাঢ় সিঁদুর রঙ। একেবারে চাঁচাপোঁছা ভাবে লাল রঙ দেয়া। পালঙ্ক ও ইন্দ্রের সিংহাসন এবং নিচের পাড় সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত। এই ধরনের প্রাচীন জৈনরীতি ও শৈলী চলে প্রায় ১৫১২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত আঁকা সব ছবিতে। ছবির জমিটি উপর নিচে প্রায় সমান্তরাল অংশে, এবং আশেপাশের অংশগুলির লম্বালম্বি প্রকোষ্ঠে ভাগ করে ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্য, মানুষ, পশু, পাখি গাছপালা পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে আঁকা, যার মধ্যে কনেক্টিং-লিঙ্ক কম্পোজিশনের পুরো নিশান পাওয়া যায়। ১৫১২ খ্রীস্টাব্দে চিত্রিত কল্পসূত্র পুঁথিতে

'নেমিনাথের বিবাহ' চিত্রটি এই ধরনের কম্পোজিশনে নয়নাভিরামভাবে পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সবথেকে নয়ন-তৃপ্তিকর হয়েছে প্রতিটি মানব ও জীবের দেহে সোনার প্রলেপ এবং জমিটিময় ইন্দ্রনীল রত্ন থেকে তৈরি রঙের প্রলেপ। তার উপর সাদা অলঙ্কার, চামর, হাতির দাঁত অপূর্বভাবে ফুটে উঠে ছবিটিকে অত্যন্ত উজ্জ্বল ও উদ্ভাসিত করেছে। এইভাবে সাদা অলঙ্কার হাইলাইটের কাজ ত করেছেই, তাকে অধিকন্তু সাহায্য করেছে টকটকে লাল রঙের সার্থক প্রয়োগ—মাথার পিছনে জ্যোতিতে, অলঙ্কারে জীবজন্তুদের শরীরে। ১৫১২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত যত ছবি মোতিচন্দ্র-শা'য়ের বইতে মুদ্রিত আছে সবগুলিতেই প্রকৃতির চিত্রণ হয়েছে নিতান্ত সরল, ইংরেজিতে যাকে বলা যায় সূক্ষ্মকাজবিহীন, স্টাইলাইজ্‌ড। তবে প্রতি ছবির ফিগরগুলিতে—মানুষই হোক বা জীবজন্তুই হোক—গতিবেগ বা প্রাণস্পন্দন বেশ ফুটে উঠেছে। যে নিশ্চলতা বা স্তব্ধতা চোদ্দ পনেরো শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত ছিল, তা আর নেই। প্রকৃতির—যেমন গাছপালা, ফল ফুলের যথাযথ স্ফুরণ দেখা যায় ষোল শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এবং পরে রচিত চিত্রাদি থেকে। সতেরো শতকে চিত্রিত পুঁথি 'উপদেশমালা'য় পারসীক প্রভাব বেশ স্পষ্ট, বিশেষত নিসর্গচিত্রণে এবং জলধারা বা জলপ্রপাতের ছবিতে। পারসীক ছাঁচে ঢালা স্টাইলাইজ্‌ড় রীতি বেশ প্রকট। পারসীক ও মুঘল এবং রাজস্থানী চিত্রনীতি, রীতি ও শৈলী ষোল শতকের মাঝামাঝি থেকে জৈনপুঁথি চিত্রে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেলেও যখনই বিশুদ্ধ জৈনধর্মবিষয়ক পুঁথি চিত্রিত হয়েছে, যেমন ১৬৭৫ খ্রীস্টাব্দের সংগ্রহণীসূত্রপুঁথির 'বিমান'চিত্রে, ১৫৫৯ খ্রীস্টাব্দের 'চন্দরাজনো-রস' চিত্রিত পুঁথিতে, সেখানে প্রাচীন জৈনচিত্রণরীতি পুরোপুরি ফিরে এসেছে, প্রকোষ্ঠ ভাগ, অলঙ্কার, পাড়, কম্পোজিশন, রঙের ব্যবহার, স্টাইলাইজেশন, সব কিছুই। আঠারো শতক থেকে যে সব জৈনপুঁথি চিত্রিত হয়েছে, সেগুলি প্রায়ই মুঘল ও রাজপুত চিত্ররীতির সামিল হয়ে গেছে, চোখের আকৃতি ও তাকাবার রীতি কেবল জৈন বলে মনে হয় কিন্তু দূরের চোখটি মুখের সীমা থেকে প্রলম্বিত নয়। তবে প্রতি ছবিতে গতিবেগ, প্রাণবন্ততা, টানটান ভাব বা টেন্‌শন, মুঘল, রাজপুত ও পাহাড়ী ছবির সামিল হয়ে গেছে।



বৈষ্ণব পুঁথিচিত্র ৭০০-১৫০০

বৈষ্ণব পুঁথিচিত্রের উপর কোন প্রামাণ্য গবেষণা এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। সেজন্য আমার পক্ষে এ বিষয়ে কিছু লেখা সম্ভব নয়। ১৯৪১ সালে আমি যখন কৃষ্ণনগর শহরে শিক্ষানবিশীর জন্যে এক বছর ছিলাম, তখন মাসে অন্তত একবার নবদ্বীপ গিয়ে বৈষ্ণব আখড়াগুলির কিছু কিছু দেখেছি। বৈষ্ণবশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত হিসাবে ললিতা সখীর বিশেষ খ্যাতি ছিল, তাঁর কাছে বেশ কিছু পুঁথি দেখেছি, কিন্তু পুঁথির ছবিগুলির মহিমা, জৈন বা পাল পুঁথির মত ঐশ্বর্যমণ্ডিত মনে হয়নি, প্রায়ই রেখাঙ্কন। সবথেকে সমৃদ্ধ বৈষ্ণব পুঁথিভাণ্ডার প্রাপ্তির সম্ভাবনা জগন্নাথপুরীর মন্দিরে ও সংলগ্ন আখড়াগুলিতে, ভুবনেশ্বরে ও কটকে। কিন্তু কটকের স্বর্গীয় নিত্যানন্দ কানুনগো ও প্রসিদ্ধ পাণিগ্রাহী পরিবারে আমি চিত্রিত পুঁথি দেখিনি। আরেকটি সম্ভাব্য প্রাপ্তিস্থান বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর, বর্ধমানের দাঁইহাট প্রভৃতি জনপদে। কিন্তু সেখানকার পুঁথিচিত্রেরও কোন বিশদ বিবরণী প্রবন্ধ হিসাবে সম্প্রতি কোথাও বেরিয়েছে বলে দেখিনি বা শুনিনি।

মথুরা বৃন্দাবন বৈষ্ণবদের সর্বপ্রধান তীর্থভূমি। তার চারিদিকে বিস্তীর্ণ ব্রজভূমি। উত্তরপ্রদেশে ত বটেই, মধ্যপ্রদেশেও কথ্যভাষা হচ্ছে ব্রজভাষা, খাঁটি হিন্দী নয়। মথুরাপুরীর চতুর্দিকে কৃষ্ণলীলা ক্ষেত্র : দক্ষিণ থেকে পূর্ব উত্তর পশ্চিম দিক ঘুরে আবার দক্ষিণে এলে যথাক্রমে পড়ে মধুবন, মহাবন বা গোকুল, লোহবন, বেলবন, ভাণ্ডিরবন, ভদ্রবন, বৃন্দাবন, কামবন, বহুলাবন, কামোদবন, তালবন। বৈষ্ণবধর্ম উত্তরে বিস্তীর্ণ হয়েছে হিমাচলপ্রদেশের বিভিন্ন রাজ্যে, পশ্চিমে আলোয়ার, কিষণগড়, বুঁদি, কোটা, কাঁকরোলি, যোধপুর, উদয়পুর, সুদূর দ্বারকা ; পূর্বে আগ্রা থেকে শুরু করে বারাণসী ; দক্ষিণ-পূর্বে ভারতের সীমান্তে পুরী ; আরো পূর্বে সুদূর শ্রীহট্ট, আসাম, মণিপুর। দক্ষিণভারতের বিভিন্ন বৈষ্ণব কেন্দ্রগুলির কথা আমার ভাল জানা নেই। ভারতের সর্বত্র নানা বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের বহু প্রাচীনকাল থেকেই প্রভাব বিস্তৃত, সুতরাং সংরক্ষিত চিত্রিত পুঁথি পাওয়ার সম্ভাবনা মোটেই কষ্টকল্পনা নয়। বৈষ্ণবশাস্ত্রের মত সমৃদ্ধ লিখিত শাস্ত্র কমই আছে। বৈষ্ণব ভাবধারা বৈষ্ণব দর্শন, রাজস্থানের বহু জনপদে, হিমাচলপ্রদেশে, দিল্লী-আগ্রার চতুর্দিকে এমন কি বাংলার চিত্রকলায় কিভাবে প্রভাব রেখে গেছে তার উল্লেখ ও কিছু কিছু আলোচনা এই বইয়ে পরে করার সুযোগ হবে। তবে এই ভাগে সুপ্রাচীন বৈষ্ণব পুঁথিচিত্র সম্বন্ধে বিশদভাবে লিখতে না পেরে আমি বিশেষ সংকোচ বোধ করছি, পাঠক আমাকে মাপ করবেন।

এই পরিচ্ছেদে মধ্যযুগের জৈন পুঁথিচিত্র, পাল পুঁথিচিত্র ও বৈষ্ণব পুঁথিচিত্রের আলোচনা আমরা ষোল শতকের প্রথম পর্যন্ত নিয়ে গেলুম। কিন্তু এই যুগের পুঁথিচিত্রণের রীতি পরবর্তী ঐতিহাসিক যুগে রূপান্তরিত হয়ে মুঘল, রাজপুত বা পাহাড়ী প্রাচীর চিত্র এবং মিনিয়েচর চিত্রকে কিভাবে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে, নানা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে, তার আলোচনা পরের অধ্যায়ে করা যাবে।

উপসংহার

ভারতবর্ষে যদিও আট থেকে পনেরো শতকের মধ্যে চিত্রিত ভারতীয় চিত্রকলার নমুনা খুবই কম পাওয়া যায়, তবুও ভারতবর্ষ ও আশে পাশের দেশগুলিতে চীনে ও তিব্বতী চিত্ররীতির প্রভাব যে বেশ ছড়িয়েছিল তার প্রমাণ সে সব দেশের ঐ যুগের আবিষ্কৃত ছবিতে সুস্পষ্ট। কিছু কিছু উল্লেখ আগেই করেছি, যেমন দণ্ডন-উলিখের ফ্রেস্কোর ; বিশেষত বিখ্যাত জলপরীর আখ্যানটি যেটির বর্ণনা হিউয়েন-সাঙও করেন। গল্পটি হচ্ছে কেমন করে একজন মন্ত্রী এক নাগ রাজার বিধবাকে বিয়ে করেন এই আশায় যে বিবাহের ফলে খোটানে এক জলধারা আসবে। এ ছাড়াও তুরফানের পশ্চিমে ইয়ার-খোটোতে স্টাইন কতকগুলি সিল্কের উপর আঁকা ছবি আবিষ্কার করেন যার বৌদ্ধ ছবিগুলি স্পষ্টতই ভারতীয় প্রভাবে পূর্ণ। ল' কক বাসাক্লিক বিহারে কতগুলি ফ্রেস্কো পান যেগুলি মাটি আর কুচি কুচি খড়ের প্রলেপের উপর আঁকা। অজন্তাতেও ঠিক এই উপায়ে তলাকার জমি তৈরি হত। চিক্কন কোল আর টোয়োক বলে দুটি জায়গায় যে ছবি পাওয়া গেছে তা প্রাচীন ভারতীয় রীতিতে আঁকা।

অন্য প্রভাবও সুস্পষ্ট। আসলে খোটানে নানা দেশের চিত্ররীতির মিলন ও মিশ্রণ ঘটে। তবুও এটা ঠিক যে চীনে ও জাপানী ছবিতে যেখানেই বৌদ্ধবিষয়ক চিত্রের আধিক্য দেখা যায়, সেখানেই সে সব ছবির চিত্ররীতি যে ভারত থেকে খোটানের মধ্যে দিয়ে প্রথমে চীনে তারপরে কোরিয়ার মধ্যে দিয়ে জাপানে গিয়েছিল তা বোঝা যায়। এর অবশ্য ঐতিহাসিক নজিরও আছে। চীনের সম্রাট ইয়াং-টির সময়ে (খ্রীস্টীয় ৬০৫ থেকে ৬১৭) তাঁর দরবারে দু'জন ভারতীয় ভিক্ষু আসেন, তাঁদের নাম কবোধ আর ধর্মকুক্ষ। এই দু'জন ভিক্ষু যাবার পরই অনেক শিল্পী নানা দেশ থেকে চীনে যান ; তাঁদের মধ্যে একজনের নাম ছিল বাজ্না। বাজ্নার দেশ ছিল খোটান। বাজ্নার ছেলে ওয়াই-চি-আই-সঙ কোরিয়া হয়ে জাপান যান। চীনে লেখকদের মতে বাজ্না আর তাঁর ছেলে দু'জনেই 'বিদেশী' রীতিতে ছবি আঁকতেন। বিদেশী মানে ভারতীয়, আর বৌদ্ধ শিল্পী হিসাবে তাঁদের খুব নামযশও ছিল। প্রাচীন জাপানী চিত্রে সুস্পষ্ট ভারতীয় প্রভাবের কথা আগেই বলেছি। তবে এইটুকু নজির হাতে নিয়ে অনেক ভারত-উৎসাহী পণ্ডিত প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লেগে যান যে ভারতীয় প্রভাব আসার আগে চীনে চিত্রকলা ছিল নিতান্ত অপরিণত, এবং ভারতীয় চিত্ররীতি ও নীতি আমদানির পরই কেবল চীনের চিত্রকলার পুষ্টি ও প্রসার ঘটে। ভারত-উৎসাহী বন্ধুদের হাতে ভারতীয় চিত্রকলার রীতিনীতির লাঞ্ছনা ঘটেছে সবচেয়ে বেশি। আসলে ব্রিটিশ মিউজিয়মে চীনে ছবির যে সবচেয়ে প্রাচীন দৃষ্টান্ত আছে, সেটি খ্রীস্টীয় চার শতকে কু কাইচির আঁকা, এবং তাতে ভারতীয় বা গ্রীক কোন প্রভাবই নেই। আমরা সাধারণত ভুলে যাই যে চীনের চিত্রকলায় বৌদ্ধ বিষয়ক ছবি নানান চিত্রবিষয়ের মধ্যে মাত্র একটি। প্রফেসর জাইল্সের মতে চীনে চিত্রবিষয়ের সাতটি বড় বড় ভাগ আছে : (১) ইতিহাস, (২) ধর্ম (বৌদ্ধ ও টাও), (৩) নিসর্গ বা প্রাকৃতিক দৃশ্য (ল্যান্ডস্কেপ), (৪) ফুল, (৫) পাখি, (৬) জন্তু জানোয়ার, ও (৭) প্রতিকৃতি বা পোর্ট্রেট। দ্বিতীয়োক্ত ভাগে বৌদ্ধ নক্শা বা আল্পনার রীতি ছাড়া ভারতীয় শিল্পীর কাছে চীনে চিত্রশিল্পীরা আর বিশেষ কিছু শিখেছিলেন কিনা সন্দেহ। একথা যদি স্বীকার নাও করা যায় যে চীনই এশিয় চিত্রকলার জনক তবুও এটা বোধ হয় ঠিক যে চিত্রকলার পূর্ণ বিকশিত ফুল চীনেই আমরা সর্বপ্রথম পাই।

খ্রীস্টীয় সাত শতকের পর অজন্তার ফ্রেস্কোরীতি যে কিছুটা রাজপুতানায় গিয়ে পৌঁছয় তা আগেই বলেছি। জয়পুর, বিকানীর, যোধপুর, উদয়পুরের প্রাসাদে ফেস্কোর চলন ছিল, এখনও সে পদ্ধতি রাজপুতানায় চালু আছে। জৈন পুঁথিতেও কিভাবে চিত্রঐতিহ্য বজায় ছিল তারও উল্লেখ করেছি। তবুও এটা ঠিক যে মুঘলদের আসার আগে রাজপুত চিত্রকলার উৎকৃষ্ট নমুনা আমরা একটিও পাই না। যখন মুঘল চিত্রকলা প্রায় একশ বছর ধরে বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করে, যখন সম্রাট আকবর অতি সাদরে হিন্দু চিত্রশিল্পীদের অভ্যর্থনা করে তাঁর দরবারে স্থান দেন, তারপরেই শুধু রাজপুত ছবির প্রমাণ আমরা পাই, তার আগে নয়। হয়ত এও সম্ভব যে নিতান্ত দেশজ বলে রাজপুত চিত্রকলা স্বদেশে ছিল অনাদৃত, বিদেশী যখন এসে তাকে সম্মান দিল তখন গেঁয়ো যুগী ভিখ পেল। কারণ দেশে যে ভাল চিত্রকর ছিল, তার প্রমাণ ইতিহাসের পাতায় আছে। যেমন আট শতকের প্রথম দিকে মহম্মদ বিন কাশিম যখন সিন্ধুদেশ জয় করেন, তখন তাঁর অনুচরদের একজনের লেখায় জানা যায়, একদল হিন্দু শিল্পী কাশিমের কাছে তাঁর আর তাঁর সেনাপতিদের ছবি আঁকার প্রস্তাব করে। এটা সামান্য উল্লেখ হলেও খুব মনে রাখার কথা, কারণ এতেই বোঝা যায় তখনকার দিনেও ভাল পোর্ট্রেট আঁকা হত। এতে আরও প্রমাণ হয় যে রাজপুতদের অধীনে যখন দেশ ছিল তখন চিত্রকলার বিশেষ স্থান ছিল, যে স্থান পরে রাজনৈতিক পরাজয়ে হয়ত হারিয়ে যায়, পুনরায় মুঘলদের উৎসাহে নিজের দেশেই উজ্জীবিত হয়। সুতরাং আমরা ইতিহাসের নজির প্রমাণ অনুযায়ী প্রথমে পাঠান মুঘল চিত্রকলার আলোচনা করব, তারপর রাজপুত এবং রাজপুত প্রভাবান্বিত চিত্রকলার।



পঞ্চম অধ্যায়

মুঘল যুগ

ভূমিকা

ফতেপুর সিক্রি আর লাহোরের দেয়ালে আঁকা ফ্রেস্কো ছাড়া ভারতবর্ষে মুসলমান চিত্রের যা কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে তা সবই ছোট আকারের ছবি, যাকে বলা যায় ক্ষুদ্রকায় সূক্ষ্মালেখ্য, ইংরেজিতে বলে মিনিয়েচর। এসব ছবি দূরে বা উঁচুতে দেয়ালে টাঙিয়ে রেখে দেখার জন্য আঁকা হয়নি ; এগুলি হাতে ধরে, চোখের কাছে এনে, অথবা কোলে পেতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভাল করে নিরীক্ষণ করার উদ্দেশ্যে আঁকা, ঠিক যেমন চোখের কাছে ধরে পুঁথি পড়তে হয়, সুতরাং এগুলি প্রায়ই তুলির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কাজে পূর্ণ হত। ক্ষুদ্রাকার ছবি আঁকার রীতি মূলত পারস্য থেকেই এসেছে। একদিকে যেমন আমাদের দেশে আসে, অন্যদিকে তেমনি ইউরোপে যায়। যে সময়ে ভারতবর্ষে আকবর বাদশার দরবারে বিখ্যাত বিখ্যাত ক্ষুদ্রকার ছবি আঁকা হচ্ছিল, ঠিক একই সময়ে ইংলন্ডের রানী এলিজাবেথের দরবারেও হিলিয়ার্ড প্রভৃতি চিত্রশিল্পীরা বিখ্যাত মিনিয়েচর আঁকছিলেন। প্রথমেই মনে রাখা ভাল যে আমাদের দেশে হাতির দাঁতের পাতে যে সব ক্ষুদ্রাকার বা মিনিয়েচর ছবি আঁকা হয়েছে তার উৎস হচ্ছে বিলেতী বা ইওরোপীয় মিনিয়েচর। অর্থাৎ হাতির দাঁতের পাতে বিদেশী মিনিয়েচর দেখে তবে এদেশের শিল্পীরা হাতীর দাঁতের পাতে ছবি আঁকা শুরু করেন। পারস্য চিত্রনীতি ইতিহাসের যুগ অনুসারে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায় : মংগোল, তৈমুরিদ আর সাফাভিদ। মুসলমান ধর্মে প্রতিকৃতি আঁকা নিষিদ্ধ, কারণ শাস্ত্রে লেখা আছে, মানুষ বা জন্তুর প্রতিকৃতি যে আঁকবে, শেষবিচারের দিনে তাকে নিজের আত্মা ঐ প্রতিকৃতিকে দিয়ে দিতে হবে, অর্থাৎ তার নিজের আর উদ্ধার নেই। ঠিক এই কারণে খুব প্রাচীন আরব পুঁথিতে কোন ছবি নেই। পরে যখন গোঁড়ামি খানিকটা কেটে গেল, যখন আইয়ুবী সুলতানরা এলেন, তখন মুসলমান জীবনে চিত্রকলা ফের দেখা দিল। কারণ আইয়ুবী সুলতানদের মুদ্রার উল্টোপিঠে বাইজানটাইন খ্রীস্টের মাথা দেখা দিল। ঠিক যেমন রোমান সম্রাট কন্‌স্ট্যানটাইনের (যিনি প্রথম খ্রীস্টীয়ান হন) অব্যবহিত আগে রোমের গৃহসজ্জার দ্রব্যে, যথা আয়নার পিঠে, খ্রীস্টীয় ক্রসের ছবি খোলাখুলিভাবে দেখা দিল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে প্রাচীন পুঁথিতে প্রথম ছবি দেখা যায় তার নাম মকমত-ই-হরিরি, এটি ১২৩৭ সালে লেখা। এর মধ্যে যে সব ছবি আছে তাতে স্পষ্ট বোঝা যায় এক প্রাণবন্ত দেশজ চিত্রভাব বিদেশী ক্ষীয়মান রীতিতে আত্মপ্রকাশ করবার খুব চেষ্টা করছে। ছবিগুলিতে বাইজানটাইন প্রভাব নিতান্ত স্পষ্ট : পিছনের জ্যোতি, বসন, ভূষণ, কাপড়ের ভাঁজ, পিছনে ঘর বাড়ির স্থাপত্য, সবই সরাসরি বাইজানটাইন ছবি থেকে তুলে আনা। কিন্তু সেই সঙ্গে আছে প্রাচীন পারসীক মৃৎশিল্পীদের পটারিচিত্রের চিহ্ন, আর পারস্যের নিজস্ব ঐতিহ্যের স্মৃতি, যা নাকি ছিল অসিরিয়, গ্রীক, ব্যাক্‌ট্রিয়, ভারতীয়, সাসানিয়ান, চীনে ধারার মিশ্রণের ফল। এই মিশ্রণ সম্ভব হয়েছিল বাণিজ্যের কৃপায়, কারণ পুরাকালে সব

বাণিজ্যের পথ ছিল পারস্যের মধ্যে দিয়ে। তাই মংগোলরা পারস্য জয় করে সে দেশের চিত্রনীতিকে ইসলাম ধর্মের বিধি নিষেধের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার আগেই বাণিজ্যের প্রভাবে পারসীক চিত্রকলায় অজ্ঞাতসারে অনেক পরিবর্তন ঘটে, নতুন জিনিস আসে। ফলে প্রথম দিকে পারসীক ছবিতে বিদেশী প্রভাব প্রধান হলেও নক্শার রীতি ছিল দেশী আর কৌতূহলোদ্দীপক ; বিশেষ করে মামুলি বিষয়, যথা ঘোড়া, ঘোড়সওয়ার, আসবাবপত্র, অভিজাতদের বংশচিত্র (কোট অভ আর্মস্) ইত্যাদির চিত্রে দেশজ পৌরুষ যথেষ্ট স্পষ্ট।

আব্বাসিদদের যুগে, টাইগ্রিস উপত্যকার শহরে, বাগদাদে, বসিটে, বস্রায় চিত্রকলার উৎকর্ষ দেখা যায়। ঠিক যে সময়ে খালিফেত আপন মহিমার সপ্তশীর্ষে, অর্থাৎ ১২৫৮ সালে, সেই সময়ে মংগোল আক্রমণ দুর্নিবার পার্বত্য জলপ্রপাতের মত মধ্য এশিয়া থেকে নেমে আসে। বান নেমে যাবার পর থেকে গেল উর্বর পলি। মংগোলরা আসার ফলে চীন আর পারস্যের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হল। পূব দিক থেকে আগত সংস্কৃতির স্রোতের মুখে মৃতপ্রায় বাইজানটাইন প্রভাব দূরে গেল ; যদিও মধ্য এশিয়ায় চীনের প্রভাব ছাড়া, খ্রীস্টীয়ান বা ইওরোপীয় আর ভারতীয় প্রভাব যথেষ্ট ছিল, তবুও পারসীক ছবিতে চীনে প্রভাব মুখ্য হয়ে দাঁড়াল। চীন থেকে এল চিত্রের রীতি-পদ্ধতি, চেতনা, আগ্রহ। শুধু যে চীনে বাসন-পত্র, বসন-ভূষণ, সিল্কে ছুঁচের কাজ, ট্যাপেস্ট্রির মধ্যে দিয়ে এ প্রভাব পরোক্ষে পারস্যে ছড়িয়ে পড়ল তা নয়, সরাসরি চীনে কারিকর, মৃৎশিল্পী, ছুঁচের কারিকর, চিত্রশিল্পী পারস্যে আমদানি হল। ফলে মারাঘান, সুলতানিয়া, তাব্রিজ, ইত্যাদি নগরে এক গৌরবময় যুগের সূচনা হল।

তৈমুর বংশ

মংগোল যুগের (১২৫৮-১৩৩৫) ঝড়ঝঞ্ঝার পর আরম্ভ হল তৈমুরের বংশ। ফলে অক্সাসতীরের নগরগুলিতে, বোখারায়, সমরকন্দে সভ্যতা ও শিল্প যেন নতুন করে জন্মাল। তৈমুরের বংশে এলেন ভারতের প্রথম মুঘল সম্রাট বাবর। তৈমুরিদ যুগে পারস্যে স্থাপত্যের স্বর্ণযুগ আসে। ওদিকে তৈমুরের কবি ছেলে হিরাটের শাহরুখ নিজের দরবারে চিত্রশিল্পী রাখা শুরু করলেন, এদের মধ্যে একজন সম্রাটের দূতের সঙ্গে চীনে যান। পনেরো শতকের শেষের দিকে সুলতান হুসেন মির্জা নিজের দরবারে সবচেয়ে বিখ্যাত বিখ্যাত চিত্রশিল্পী জড়ো করলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন জগদ্বিখ্যাত চিত্রশিল্পী বিহ্জাদ।

১৫০৬ সালে হুসেন মির্জার মৃত্যুর পর বিহ্জাদ সাফাবিদ সম্রাট ইস্মাইলের কাছে কাজ নিলেন। নতুন বংশে তৈমুরিদ যুগের পরিষ্কার, তরতরে কাজ, রেখা আর রঙের সংযম, স্বচ্ছ, ঋজু রীতি চলে গিয়ে এল প্রগল্ভতার যুগ, নক্শার প্রাচুর্য আর রঙের ছড়াছড়ি। যাকে ইংরেজি ভাষায় বলা যায় রোমান্টিসিজমের প্রসাদ, ধ্রুপদী রীতির বদলে খেয়াল। ষোল শতকের শেষের দিকে শাহ্ আব্বাসের সময়ে এই রীতি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে গেল।

১৯৫৬ সালে বর্তমান বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তখনও লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে যে বিরাট চিত্র সংগ্রহ্ আছে তার পুরো তালিকা ও বিবরণ তৈরি বা প্রকাশিত হয়নি। ১৯৮১ সালে দু'জন ইংরেজ বিশেষজ্ঞ ও চিত্ররসিক টোবি ফ'ক (বানান Falk) ও মিলড্রেড আর্চারের সম্পাদনায় রয়াল কোয়ার্টো সাইজে একটি বিরাট বই অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ৫৫৯। তারমধ্যে ১৬টি পৃষ্ঠা রঙীন ছবির : প্রথম তিনটি আকবরের'রাজত্বে আঁকা, পরের একটি জাহাঙ্গীরের আমলে, তার পরের চারটি শাজাহানের রাজত্বে। তার পরের ছয়টি মুঘল সাম্রাজ্যের আওতায় বিভিন্ন প্রদেশের, যেমন, ফৈজাবাদ, ফরুক্কাবাদ, মুর্শিদাবাদ, গোলকোণ্ডা, হায়দ্রাবাদ (২)। শেষপৃষ্ঠায় দুটি ছবি, দুটিই মেবারের উদয়পুরের, (১) অশোক বনে সীতা ও রাবণ এবং উপরে হনুমান, (২) হনুমানকে বেঁধে রাবণের দরবারে আনা হয়েছে। তাছাড়া বইয়ের ৩৫৭ পৃষ্ঠা থেকে ৫৫৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত আছে অজস্র একরঙা ছবি, প্রত্যেকটির বিশদ বিবরণ, উৎস, বর্ণনা ও মন্তব্য ছবির অংশের আগে মুদ্রিত আছে। সূচনায় দেখি এই বই সম্পাদনার প্রথম প্রস্তাব হয় ইণ্ডিয়া অফিসের গ্রন্থাগারিক ই ডব্লিই টমাসের সময়ে (১৯০২-২৭)। ১৯২৫ সালে ভারতের সেক্রেটারি অভ স্টেটের কাছে প্রথম প্রস্তাব পেশ হয়। ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৯ সালে এই প্রস্তাব পুনরুজ্জীবিত করা হয় এবং রিচার্ড জন্সন, ফ্লেমিং, বুকানন হ্যামিল্টন সংগ্রহ, দারা শিকো অ্যালবাম এবং তার সঙ্গে একটি রাগমালা সেটের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লেখা

হয়। তার ঠিক পরেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে কাজে বাধা পড়ে এবং সংগ্রহগুলি ধ্বংসের আশঙ্কা থেকে রক্ষার জন্যে ইয়র্কশিয়ারে রক্ষিত হয়। ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণার পর এ বিষয়ে নতুন করে আগ্রহ হয়। ১৯৪৭-৪৮ সালে রয়াল একাডেমিতে 'দি আর্ট অব ইণ্ডিয়া এণ্ড পাকিস্তান' বলে একটি প্রদর্শনী হয়। তার একটি ক্যাটালগ বেরোয়। স্বাধীনতার পর ভারতীয় সংগ্রহ সম্বন্ধে উৎসাহ আরো বাড়ার ফলে ১৯৫৪ সালে সুবিখ্যাত শিল্পরসিক ও পণ্ডিত ডব্লিউ জি আর্চার, ইন্ডিয় অফিস লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক এস সি সাটনের সঙ্গে কাজ শুরু করেন। সুবৃহৎ গ্রন্থের সম্পাদনা সম্পূর্ণ করতে লাগে পঁচিশ বছর। এই দীর্ঘ পঁচিশ বছর মিলড্রেড আর্চার গবেষণা ও সম্পাদনা তৈরির কাজে একাগ্রভাবে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৭৪ সালে টোবি ফ'ককে সমস্ত কিছু কাজ ফিরে ফিরতি খুঁটিয়ে দেখে চূড়ান্ত সম্পাদনার জন্য নিযুক্ত করা হয়। বইতে মোট ১৭০০টি ছবির বিশদ বিবরণ ও পরিচয়, সম্ভব হলে তারিখ ও চিত্রকর, তার সঙ্গে প্রাপ্তিস্থান, মাপ ইত্যাদি সম্পূর্ণ করা হয়। এসবের শেষ ফল হচ্ছে বইটি। ১৯৮০ সালে যে-বইটি পাঠকের হাতে তুলে দেওয়া হল ধরতে হবে তার বীজ বোনা হয়েছিল ১৯২৫। এই স্থানে একটি মাত্র বইয়ের এত বড় ভণিতা হয়ত একটু বেমানানভাবে লম্বা হয়ে গেল। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য দুটি। এক, বইটি অমূল্য ; দুই, আমি খুব আশা করি এই দৃষ্টান্ত মনে রেখে এই ধরনের কাজ আমাদের দেশেও সম্ভব হবে।

আগ্রহী পাঠকের সাহায্যার্থে আরেকটি সংগ্রহের উল্লেখ এই সঙ্গে করি : নাম কোর্ট পেন্টিংস অভ ইন্ডিয়া : ১৬-১৯ শতক। গ্রন্থকার প্রতাপাদিত্য পাল। বড় কোয়ার্টো সাইজ। নতুন দিল্লীর কুমার গ্যালারি থেকে ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত হয়। মোট ৩৩৪ পৃষ্ঠার বই। সবসুদ্ধ ১৯২টি ছবি, প্রতিটি আলাদা পাতায় : তার মধ্যে লেখকের মতে উৎস অনুসারে : (১) ৭৫টি প্রাকমুঘল ও মুঘল, (২) ১৬টি দক্ষিণী, (৩) ৫৬টি রাজস্থানের বিভিন্ন রাজ্যে আঁকা ; (৪) বাকি ৪৫টি হিমাচল প্রদেশের রাজপুত রাজ্যগুলিতে। একটি বড় ভূমিকায় লেখক তাঁর মতামত ও পরম্পরের সম্বন্ধ নির্ণয় করেছেন, তবে গবেষণা ও সম্পাদনা কাজে প্রথম বইটির পাশে এর নাম করা যায় না, জাত আলাদা। রঙীন ছবিগুলির মুদ্রণ এই বইটিকে দুর্লভ মর্যাদা দিয়েছে, আগের বইয়ের রঙীন ছবিগুলিতে এত সুন্দরভাবে রঙ খোলেনি।

আরও তিনটি নতুন বইয়ের উল্লেখ এখানে অবশ্য কর্তব্য। তিনটিই একই গ্রন্থকারের রচনা : গ্রন্থকারের নাম মালো ক্লীভল্যান্ড বীচ ; আমেরিকার ওয়াশিংটনের স্মিথসোনিয়ান সংস্থার বিখ্যাত ফ্রিয়র ও স্যাকল্যার গ্যালারিগুলির অধ্যক্ষ। পর পর প্রকাশিত তিনটি বইই অমূল্য। ১৯৭৮এ প্রকাশিত ইম্পিরিয়াল পেন্টিংস ইন ইন্ডিয়া, ১৬০০-১৬৬০ ; ১৯৮১-তে প্রকাশিত দি ইম্পিরিয়াল ইমেজ-পেন্টিংস ফর দ্য মুঘল কোর্ট। বই দুটি মুখ্যত মুঘল সংগ্রহের সটীক ক্যাটালগ। তৃতীয়টি ১৯৯২ সাল প্রকাশিত দ্য নিউ কেমব্রিজ হিস্টরি অভ ইন্ডিয়া সিরিজে প্রকাশিত 'মুঘল এন্ড রাজপুত পেন্টিং'। সুবৃহৎ, গভীর, তীক্ষ্ণ ও বিদগ্ধ অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ আলোচনাময় ইতিহাস। যেমন সশ্রদ্ধ তেমনি বিস্তারিত। মুঘল ও রাজপুত ছবি বোঝার ও উপভোগ করার পক্ষে অমূল্য।

প্রথম ছয় সম্রাট

১৫২৫ সালে বাবর ভারত জয়ে মন দিলেন। পাঁচ বছর পরে মারা যান। যদিও এদেশের বর্ষাকাল ছাড়া কোন কিছুতে তাঁর মন উঠত না, অধিকাংশ জিনিসই অশিক্ষিত, বর্বর বলে মনে হত, তবু তিনি চারুশিল্পের উন্নতির দিকে মন দেন। বাবর বিহ্‌জাদের খুব ভক্ত ছিলেন, নিজের রোজনামচায় লেখেন 'বিহ্‌জাদ চিত্রশিল্পীশ্রেষ্ঠ'। বিহ্‌জাদের ছবি ভারতবর্ষে কার কাছে আছে ঠিক জানা নেই। কিন্তু মহম্মদ তুঘলকের দরবারে খোরাসানের শিল্পী শাপুরের ১৫৩৪ সালে আঁকা 'গানের জলসা' বলে একটি ছবি কলকাতার মিউজিয়মে আছে, সেটি যেমন নিপুণ হাতে আঁকা তেমনি তাতে রঙের বাহার। ছবিটি দেখে আন্দাজ করা যায় যে দ্বিতীয় শ্রেণীর শিল্পীর কাজ যখন এত ভাল ছিল তখন শিল্পীশ্রেষ্ঠ বিহ্‌জাদের ছবি নক্‌শায়, রঙে, তুলির কাজে কতই না উৎকৃষ্ট ছিল। এই ছবিটি ই বি হ্যাভেল তাঁর ১৯০৮ সালে প্রকাশিত 'ইণ্ডিয়ান স্কাল্পচার অ্যান্ড পেন্টিং' বইয়ে তুলে দিয়েছেন, তার সঙ্গে দিয়েছেন 'আহত সিংহ' বলে আরেকটি ছবি, যেটি সত্যই অতুলনীয়। এটিতে বহু প্রাচীন অসিরিয় ভাস্কর্যের প্রভাব নিতান্ত সুস্পষ্ট। এটিও ষোল শতকের মাঝামাঝি আঁকা, কলকাতায় রক্ষিত আছে।

বাবরের ছেলে হুমায়ুন ১৫৪৬ সালে ভারতের রাজত্ব হারিয়ে ১৫৫৫ সাল পর্যন্ত পলাতক হয়ে এদেশে সেদেশে

ঘুরে বেড়ান। এই সময়ে এক বছর তিনি তাব্রিজের সাফাবিদ দরবারে আশ্রয় নেন, তখন শাহ্ তামাস্প্ ছিলেন সাফাবিদ বাদশা। বিহ্জাদ তখন মারা গেছেন, কিন্তু বিহ্জাদের সমসাময়িক বিখ্যাত চিত্রশিল্পী বাদাকশানের মীর মনসুরের ছেলে মীর সয়ীদ আলির তখন উঠ্তি বয়স, খ্যাতিও আস্তে আস্তে হচ্ছে খুব। আরেকজন উঠ্তি শিল্পীর কাজও হুমায়ুনের নজরে পড়ে, তাঁর নাম আবদুস সামাদ।

১৫৫০ সালে দু'জনেই কাবুলে হুমায়ুনের দরবারে এসে ভর্তি হলেন। চিত্রশিল্পের প্রতি হুমায়ুনের এতই দরদ ছিল যে নিজে গরীব অবস্থায় নির্বাসনে থেকেও সন্তানসম্ভবা স্ত্রীকে উপাহারার্থে তিনি মীর সয়ীদ আলিকে দাস্তাঁ-ই-আমীর হাম্জা বলে কাব্যের ছবি আঁকার ফরমায়েস দিলেন। হুকুম হল ছবি বারো খণ্ড বইয়ে শেষ হবে, প্রতি খণ্ডে থাকবে একশটি ছবি। উমরকোটে তাঁবুর মধ্যে আকবরের জন্মের পর স্ত্রীর মৃত্যু হলে দাস্তাঁ-ই-আমীর হাম্জার প্রথম খণ্ডটি স্বর্গতা স্ত্রীকে উপহার উৎসর্গ করেন। আমীর হাম্জা ছিলেন হজরত মহম্মদের কাকা। বিশেষ যত্ন করে তৈরি করা তুলোর কাপড়ের উপর টেম্পেরায় আঁকা এঁরই ষাটটি ছবি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে ভিয়েনায় ছিল, আর পঁচিশটি আছে ভিক্টোরিয়া অ্যাণ্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়মে। সবগুলি নিশ্চয় মীর সয়ীদ আলির হাতের আঁকা নয়, হয়ত তাঁর তত্ত্বাবধানে অন্য শিল্পীদের তৈরি, যেমন র‍্যাফেইল বা রুবেন্স করতেন। হুমায়ুনের মৃত্যুর পর মীর সয়ীদ আলি আকবরের দরবারে রয়ে গেলেন, একবার হজ করতে গেছিলেন। গোড়ার দিকের মুঘলচিত্রের রীতি প্রায় সবটাই বিদেশী, অর্থাৎ সাফাবিদ, কিন্তু তবু এই অল্প সময়ের মধ্যে নানা পরিবর্তন ও নতুন নীতির উদ্ভব চোখে পড়ে। পণ্ডিতরা বলেন বিহ্জাদ প্রতিকৃতি আঁকায় বিশেষ নৈপুণ্যের সৃষ্টি করেন, তাঁর হাতেই পোর্ট্রেট ঈরাণী রীতিতে নতুন মর্যাদা পায়। এই প্রতিকৃতি রীতি মুঘল চিত্রশিল্পে বিশেষ উন্নতি লাভ করে। তার সঙ্গে আসে পটভূমির অন্যান্য গৌণ বস্তু থেকে মুখ্য বিষয়টিকে বিশেষ করে ফুটিয়ে তোলার রীতি (যাকে ইংরেজিতে বলে রিলিফ); এবং সঙ্গে সঙ্গে রঙের অভূতপূর্ব বৈচিত্র্য। যদিও এই যুগের ছবিকে সাধারণত ঈরাণী কলমের ছবি বলা হয়, এবং যদিও তাতে তৈমুরিদ ছাপ সুস্পষ্ট, তবু ব্যাকগ্রাউণ্ড বা ছবির 'পিছন'টি আঁকার মধ্যে যে গাছপাতা, ফুলফল দেখা যায়, তার রীতি নিতান্ত এবং নিঃসংশয়ভাবে ভারতীয়, তার মধ্যে পারসীক কিছু নেই। এইসব ছবির মধ্যে এমন একটি সারল্য, ঋজুতা, দরাজ নক্শা ছবির খুঁটিনাটির প্রাচুর্যকে আয়ত্তে রাখে; পোশাক ও অন্যান্য সরঞ্জামের এমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কাজও ফুটে বেরোয়; দেয়াল, কার্পেট ও পিছনের স্থাপত্য ভাস্কর্য সুদ্ধ এমন সযত্নে আঁকা হয় যে সমস্ত ছবিটি নানা জিনিসে ভর্তি থাকলেও চোখকে কখনও পীড়া দেয় না, বরং আনন্দ ও বিস্ময় জোগায়। এসব ছবি সাধারণত বিশেষ একধরনের কাপড়ে চিত্রিত হত। কাগজ খুব কম পাওয়া যেত, বড় সাইজের কাগজ প্রায় পাওয়া যেত না।

এককথায় ষোল শতকের প্রথম অর্ধেকের মুঘল ছবি, সাফাবিদ রীতি বা ঈরাণী কলমেরই অপভ্রংশ বলা যায়, শিল্পীরা বিহ্জাদের শিষ্য ছিলেন। কিন্তু মুখ্যত ঈরাণী কলম হলেও, অত প্রথম দিকের ছবিতেও ভারতীয় বৈশিষ্ট্য এল প্রাকৃতিক দৃশ্যে, ফুলে, লতাপাতায়, গাছে; যাতে বুঝতে দেরি হল না যে ঈরাণী কলম ভারতের জমিতে শিকড় নিয়ে শীঘ্রই ফুলে ফলে পূর্ণ হবে।

আবুল ফজল যখন আইন-ই-আকবরী লেখেন তখন দাস্তাঁ-ই-আমীর-হাম্জার ছবি আঁকা শেষ হয়ে গেছে। ছবিগুলিতে শরীরের গড়ন কিছু কিছু পারসীক, কিন্তু বর্ণবিন্যাস রীতিতে যে ঐক্য ও ঐশ্বর্য দেখা যায়, ছবির জমি যেভাবে ভরানো হয়েছে, স্তর থেকে স্তর যেভাবে ছবি বিস্তার পেয়েছে, যার ফলে ছবিতে পশ্চাদ্‌পট নেই বললেই হয়, তা নিতান্তই ভারতীয়। ছবিতে পশ্চাদ্‌পটের বদলে আছে মুখ্য ছবির আশেপাশে ছোট ছোট গৌণ ছবি; এ রীতি নিতান্ত ভারতীয়। শরীরের গড়নে পারসীক আমেজ থাকলেও, মুখের গড়নে ভারতীয় ছাপ স্পষ্ট। যদি আমরা এই সূত্রে মনে রাখি যে বিজয়নগর রাজ্য ধ্বংসের পর অনেক হিন্দু ও দক্ষিণী শিল্পী উত্তর ভারতে কাজ পেয়ে চলে যান, তাহলে দাস্তাঁর ছবির ঘরবাড়ির স্থাপত্যে যে সুন্দর মিনে করা টালির কাজ, গাছপালার পত্রপুষ্পের প্রাচুর্য ও রঙের ঐশ্বর্য দেখা যায় তাতে মনে হয় কিছু কিছু দক্ষিণী শিল্পী নিযুক্ত হয়েছিলেন। অবশ্য অনেক ছবিতে গাছের কাণ্ড ও নিষ্পত্র শাখায় পারসীক প্রভাব স্বীকার করতেই হয়। কিন্তু মোটামুটি বলতে গেলে এসব ছবিতে যে অপূর্ব কর্মব্যস্ততা, গতিবেগ দেখা যায়, তা নতুন মুঘল রীতির সূচনা করে।

প্রথম যুগের মুঘল ছবিতে রঙের বাহাদুরি আশ্চর্য। সারা ছবিটি সাধারণত হত প্রাচ্যের ঝকমক করা লাল, নীল আর সোনালির জড়োয়া। ওরই মধ্যে আবার রঙের সেরা রঙ হত নীল; বৃষ্টির পর রোদে ঝকমক করা আকাশের নীল বা বৃষ্টিধোয়া দূর পাহাড়ের নীল, যা আসত ইন্দ্রনীল বা ল্যাপিজ ল্যাজুলাই পাথর থেকে। অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের

মধ্যে থাকত প্রতিটি জিনিস অতি নিখুঁতভাবে নজর দিয়ে আঁকা, যা ভাল করে তারিফ করতে হলে প্রায় আতস কাঁচের সাহায্য নিতে হয় (অনেকটা জার্মান শিল্পী ডিউরর বা ক্রানাখের কাজের মত) ; অলঙ্কারবহুল কম্পোজিশন ; অতি সুন্দর, সূক্ষ্ম অথচ 'হ্রস্ব' রেখা ; পোষাকে এবং 'পিছনে' সোনালির প্রচুর ব্যবহার ; আর বসনে, ভূষণে, গৃহসজ্জায়, আসবাবপত্রে জটিল, বিশদ নক্শা। তাতে চিত্রের চেয়ে নক্শার গুণই বেশি।

এই ছিল আকবরের আগে পর্যন্ত ভারতে ঈরাণী কলমের ছবি। ক্রমে ঈরাণী প্রভাব, তার জড়োয়া চিত্র চলে গেল ; এল মুঘলদের উপর ক্রমশ ভারতীয় প্রভাব। তার ফলে যে সব চিত্র হল তাতে এল আরও স্বাধীনতা, বাস্তবতা, স্বচ্ছন্দ গতির আত্মবিশ্বাস। দেশজ রাজপুত রীতি আর পারসীক রীতির মিলনের ফলে হল একটি নতুন সৃষ্টি, পণ্ডিতরা যার নাম দেন মুঘল ক্ষুদ্রকায় ছবি বা মুঘল মিনিয়েচর। এই ছবিতে দুই ঐতিহ্যের সংমিশ্রণের ফলে যা সৃষ্টি হল তার একান্ত নিজস্ব একটি চরিত্র হল। নিছক রঙীন নক্শা রূপান্তরিত হল হৃদয়গ্রাহী চিত্রে। তার কারণ ঈরাণী রীতি ইতিমধ্যে ভারতীয় আবহাওয়ায় বেড়ে উঠেছে, ভারতের অংশ হয়ে উঠেছে। অবশ্য রাজপুত চিত্রের লৌকিকভাব বা চরিত্র যে মুঘল ছবিতে এল তা নয়, কিন্তু তবুও তা ভারতীয় ছবিই হয়ে দাঁড়াল, ঠিক যেমন আকবর বাদশা ও তাঁর বংশধররা আর সমরকন্দী রইলেন না, ভারতীয় হয়ে গেলেন।

কি করে এটা সম্ভব হল ? কি করে একটি সম্পূর্ণ বিদেশী রীতি খুব অল্প সময়ে বিশিষ্ট ভারতীয় রীতিতে পর্যবসিত হল ? কি করে সম্ভব হল এই পরিবর্তন, পুনর্জন্ম ?

সম্ভব হল আকবর আর জাহাঙ্গীর বাদশার জন্য। তাঁরা নিজেদের দেশের বিখ্যাত শিল্পীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন এদেশের বিখ্যাত শিল্পীর ; দু'জনকে লাগিয়ে দিলেন একত্রে, একসঙ্গে, একই কাজে। মীর সয়ীদ আলি, আবদুস সামাদের সঙ্গে একত্রে একই দরবারে বসে কাজ করতে লাগলেন বসাওঅন, দশ্যন্থ, কেশুদাস। উভয়েই পেতে লাগলেন সমান রাজানুগ্রহ। এর ফল হল অদ্ভুত, ভারতের চিত্র ইতিহাসে আশ্চর্য।

সম্ভব হল আমার মতে, সম্রাট আকবরের দুটি চরিত্রগত কারণে। এক, তদানীন্তন ধারণা এমন কি প্রমাণমতে, মহান সম্রাট আকবর সারাজীবনই ছিলেন প্রায় নিরক্ষর, পড়তে পারতেন না। লেখাপড়া শেখার সময় তাঁর কোন দিনই হয়ে ওঠেনি। অথচ পৃথিবীর ফুলফল, কীটপতঙ্গ, ঘটনাবলী, ইতিহাস, দর্শন, চিন্তা, কাব্য, মানুষের যাবতীয় কীর্তি সম্বন্ধে ছিল তাঁর অসীম উৎসাহ ও কৌতূহল, হৃদয়ঙ্গম করার মত বিনয়, শ্রদ্ধা ও বোধশক্তি, মস্তিষ্ক দিয়ে বোঝার, অধিকার করার মত মেধা ও স্মরণশক্তি। তার উপর ছিল তাঁর শৌর্য, বীর্য, যুদ্ধের প্রবৃত্তি, শিকারের প্রতি উৎসাহ, জীবের প্রতি অসীম কৌতূহল ও মমতা, সর্বধর্মসমন্বয়ের ইচ্ছা, সারা সাম্রাজ্যকে ভ্রাতৃসৌহার্দ্যে বেঁধে রাখার আগ্রহ। দ্বিতীয়ত ছিল মানুষের সৃষ্ট যত কিছু জ্ঞান ও কল্পনা তার সঙ্গে পরিচিত হওয়া। সে জ্ঞান তিনি আহরণ করার সিদ্ধান্ত করলেন, বর্ণপরিচয় থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে বই ও লিপির মধ্যে দিয়ে অনুশীলনের পদ্ধতিতে নয়, বহু ধরনের কাজ করার মধ্যে, তারই ফাঁকে, লোকের মুখে কাব্য, দর্শন, লোকগাথা, পুরাণ আবৃত্তি শুনে এবং চিত্রের মাধ্যমে সেই সেই জগতের পরিচয়ের মধ্যে দিয়ে। উপরন্তু পৃথিবীর যত পণ্ডিত, যত মত, যত দর্শন তাদের মুখপাত্রদের একত্রে সংগ্রহ করে তাঁদের বিচারে আলাপে প্রবৃত্ত করে, স্বকর্ণে তাঁদের কথোপকথন, বাদানুবাদ ও আলোচনা শুনে। তাঁর পক্ষে দার্শনিক তত্ত্ব আয়ত্ত করার উপায় হল, যে সব পুরাণ, ইতিহাস, তত্ত্ব, গল্পের ও উপাখ্যানের কৃপায় মানবমনের গহন থেকে বিচার ও বিশ্বাস বেরিয়েছে তাকে যথাসম্ভব চিত্রমাধ্যমে দৃশ্যরূপে ফুটিয়ে সম্যকভাবে হৃদয়ঙ্গম করা।

এই ধরনের মনের আকৃতি তাঁর সারা জীবনে ক্রমাগত কিভাবে পরিতৃপ্তি পেল, কি পরিণতি পেল তার ক্রমিক পরিচয় পাই তাঁর দরবারের চিত্রকরবাহিনী ও পণ্ডিতদের একের পর এক কী ধরনের শিল্প সৃজনের আদেশ ও নির্দেশ তিনি দিলেন, তারই হদিশ পাই আবুল ফজলের রচিত আকবরের জীবনীতে।

রাজ্যহৃত, নির্বাসিত, প্রায় নিঃস্ব ও কৃপানির্ভর অবস্থায় থেকেও পিতা প্রাক্তন সম্রাট হুমায়ুনের চিত্রকর্ম সম্বন্ধে কী অদ্ভুত উৎসাহ ছিল তার উল্লেখমাত্র একটু আগে করেছি। এই আগ্রহ ও উৎসাহ তাঁর ধমনীতে হুমায়ুন পিতা বাবরের কাছে পেয়েছিলেন। পিতা ও পুত্র দু'জনেরই ধমনীতে ছিল অভারতীয় রক্ত। দু'জনেই ভারতে এত কম দিন রাজত্ব করেন যে ভারতের রীতিনীতি ত বটেই, স্থানীয় প্রতিভাবান শিল্পী ও জ্ঞানী-গুণীজনের সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হবার সুযোগ হয়নি। ১৫২৬ সালে পানিপথ যুদ্ধের পর বাবর দিল্লীর মসনদে থাকেন মাত্র চার বছর, ১৫৩০ পর্যন্ত। হুমায়ুন বাদশা হন ১৫৩০ সালে। শের শাহের সঙ্গে যুদ্ধে হার হয়ে দেশ ত্যাগ করেন ১৫৪২ সালে। রাজ্য ফিরে পান ১৫৫৫ সালে। মৃত্যু হয় ফিরে আসার ছয় মাসের মধ্যে দিল্লীর পুরাণা কিল্লায়

তাঁর পুস্তকালয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামার সময়ে পা পিছলে পড়ে যাওয়ায়। মাত্র বারো-তেরো বছরের রাজপুত্র, আকবর, পিতানিযুক্ত বৈরাম খাঁকে পদচ্যুত করে নিজে সম্রাট হলেন ১৫৫৬ সালে। বাবর, হুমায়ুনের জন্ম হয় বিদেশে। আকবরই প্রথম সম্রাট যাঁর জন্ম হয় ভারতের উপকণ্ঠে উমরকোটে। তবে তিনি হলেন যাকে বলে বাপকা বেটা। দস্তাঁ-ই-আমীর হামজা সম্পূর্ণ করার কল্পে বাবার নির্দেশ তিনি ভুললেন না। হুমায়ুনের সঙ্গে পারসীক যে চিত্রকররা এসেছিলেন তাঁদের তিনি কাজে লাগিয়ে দিলেন। তাঁদের সাহায্যার্থে তিনি দরবারের দেশজ অমাত্যদের লাগিয়ে খুঁজে খুঁজে বার করে নিজের অধীনে নিয়োগ করলেন সেরা সেরা ভারতীয় শিল্পীদের। এই হল শুরু।

এখন কি কি ছবির অ্যালবামের অনুক্রমে এই অপূর্ব সমন্বয়মূলক বিপ্লব ও রূপান্তর সম্ভব হয় তার পর পর ধাপের ও সৃষ্টির উল্লেখ করি। আকবরের পরে তাঁর ছেলে জাহাঙ্গীর, যিনিই প্রথম সম্রাটপুত্র সম্রাট হিসাবে ভারতের মাটিতেই জন্মান, তিনি কী ধারায় এই বিপ্লব চালিত করে সমৃদ্ধ করলেন, এবং তাঁর পরে তাঁর ছেলে শাজাহান তাকে কি মোড় দিলেন, এবং সেই ধারা শাজাহানের পুত্র ঔরঙ্গজেবের ঔদাসীন্যে, এমন কি অবহেলায়, কিভাবে ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে গেল ; মুঘল দরবারের গুণী শিল্পীরা আস্তে আস্তে কিভাবে জীবিকার খোঁজে রাজস্থানে, মুঘল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে, হিমাচলে ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ে সেইসব প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক চিত্ররীতি ও ঐতিহ্যকে নির্বাপিত প্রদীপের মত আবার উচ্চকিত করলেন তার সন তারিখ ও শিল্পীদের নামের উল্লেখ করে পথটির ইঙ্গিত করব। সেই সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর আমরা আবার আকবর জাহাঙ্গীর থেকে শুরু করব।

আকবর (১৫৫৬-১৬০৫)

মসনদে উঠে আকবর পিতার আদেশ যে ভুলে যাননি, বরং সেই আদেশ পালনে তৎপর হলেন তার প্রমাণ হিসাবে হুমায়ুন যে দুইজন প্রতিভাবান শিল্পীকে ঈরাণ থেকে সঙ্গে এনেছিলেন তাঁদের উপর এই কাজের ভার দিলেন ; যদিও শীঘ্রই এই বিরাট প্রচেষ্টা সম্পাদনে ভারতীয় শিল্পীদেরও দলে দলে নিযুক্ত করা হল।

১। পিতার আদিষ্ট কাজ দস্তাঁ-ই-আমীর-হাম্জার নতুন নাম হল হাম্জানামা। সর্বপ্রথমে আঁকা যে ছবিটি এখনও সংরক্ষিত আছে তার তারিখ ১৫৬২, শেষ হয় ১৫৭৭ সালে। প্রথমদিকে তুলোর জমি বা তুলোট কাগজের অ্যালবাম সাইজের প্রমাণ ছবিতে পাই আগে যার উল্লেখ করেছি সেই লক্ষণগুলির : যেমন স্থির অলঙ্কার হিসাবে মেঘের ও আকাশের আভাস, সেইমত গাছপালা ও বড় বড় গাছ-পাতাবিহীন নগ্ন, মামুলি পারসীক ধরনে সাজানো পাহাড়। ছবির চরিত্রগুলির আদানপ্রদানের মধ্যে স্তব্ধ আড়ষ্ট ভাবভঙ্গি, রঙের বৈচিত্র্য ও ব্যবহারে পারসীক ঐতিহ্যবহ সীমাবদ্ধতা। ১৫৭৭ সালে যখন হাম্জানামার বারটি খণ্ড ১৪০০টি প্রমাণ সাইজের ছবিতে শেষ হয়ে পর পর অ্যালবাম তৈরি হয় তখন দেখা গেল, শেষের দিকের খণ্ডগুলিতে সবদিক দিয়ে এক অপূর্ব বৈচিত্র্য, দ্যোতনা, অভিব্যক্তি, গতি ও আবেগ ক্রমে ক্রমে লাভ করেছে, যা হাম্জানামার প্রথম কয়েকটি খণ্ডে নেই। এই রূপান্তরের কথা উপরে লিখেছি। তখনকার ভাষায় অ্যালবামের নাম ছিল মুরাক্কা, সম্ভবত আধুনিক মরোক্কো-বাঁধাইয়ের এটি উৎস কথা।

ইতিমধ্যে ভারত ও পশ্চিম এশিয়ার লোকসাহিত্যে আকৃষ্ট হয়ে আকবর ১৫৬০ সালে আরেকটি পুঁথি তৈরির নির্দেশ দেন : নাম তুতিনামা বা অবনীন্দ্রনাথ যাকে বলেন তোতাকাহিনী। এই অ্যালবাম তৈরি হয় ১৫৬০-৬৫ সালে। এটি ক্লীভল্যান্ড মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। এই তুতিনামার সূত্রপাতেই এল, হাম্জানামার মাঝের ও শেষ কয়টি খণ্ডে অভূতপূর্ব নাটকীয় উত্তেজনাময় পরিস্থিতি, অসম্ভব গতি, আবেগের প্রকাশ ও সবকটি চরিত্রে এমন কি জীবজন্তুর মুখে দেহে হর্ষ, যন্ত্রণা, ক্রোধ, আক্রোশ ইত্যাদি। হাম্জানামা এইভাবে যে ঐতিহ্যের সৃষ্টি সাধন করল তার দৃষ্টান্ত ভারতীয় প্রাচীর বা পুঁথিচিত্রে বা মিনিয়েচরে আগে ছিল না। পারসীক ছবির মত তুলার উপর ছবিগুলি আঁকা হলেও পারসীক চিত্ররীতি কোথায় যে পড়ে রইল, তার পদচিহ্ন অবশ্য হাম্জানামায় আছে, কিন্তু সে চিহ্ন যেন তলিয়ে গেল।

১৫৭০ থেকে শুরু হল বিচিত্র খাস আকবরী যুগের মুঘল চিত্র। এতগুলি জীবনী ও পুরাণ-ভিত্তিক চিত্রের অ্যালবাম সৃষ্টি হল যে আবুল ফজলের মত জীবনীকারের পক্ষেও তারিখের হিসাব রাখা অসাধ্য হয়। প্রতি জীবনী ও পুরাণের অ্যালবামে এতগুলি ছবি আঁকা হয়, এত সংখ্যায় গুণী প্রতিভাবান শিল্পীরা নিযুক্ত হন এবং সেইসব অ্যালবামের প্রতিটিই ভাগাভাগি হয়ে এত মিউজিয়মে ও সংগ্রহালয়ে ছড়িয়ে গেল যে কোনটি কবে শুরু হয় এখন

নির্ণয় করা শক্ত। তবে অ্যালবামগুলি সম্পূর্ণ করার তারিখ প্রায় সবই ১৫৮৯ থেকে ১৬০৫-এর মধ্যে পড়ে। যেহেতু বাবর ছিলেন আকবরের ঠাকুর্দা, সেহেতু মনে হতে পারে বাবরনামা হয়ত আকবরনামার আগে আঁকা শুরু হয়। কিন্তু দুই নামার শেষ করার তারিখ প্রায় এক : ১৫৮৯-১৫৯০। আগে পরে মিশিয়ে যাবার এবং আগে পরে আসল ও নকলের সম্পর্ক নির্ণয় করা কত শক্ত তার একটি দৃষ্টান্ত দিলেই পরিষ্কার হবে। ফ'ক ও আর্চারের বইয়ে একটি ছবি আছে ঈদ উৎসবে বাবর তাঁর দরবারে অমাত্যদের সম্ভাষণ করছেন, তারিখ আছে আনু. ১৫৯৫। আরেকটি ছবি আছে, হুমায়ুন অমাত্যদের স্বাগত জানাচ্ছেন। পুঁথির তারিখ বলা আছে ১৫৭০-৮০। দুটিতেই পশ্চাদ্‌পটে প্রকৃতির স্থির ও প্রথাসিদ্ধ চিত্র বা রীতি সুস্পষ্ট, অথচ আকবরনামার একটি ছবি যা প্রতাপাদিত্য পাল তাঁর বইয়ে ছাপিয়েছেন তার বিষয় হচ্ছে পোষা চিতাবাঘ নিয়ে আকবর শিকার করছেন। ছবিটির পশ্চাদ্‌পটে পারসীক রীতির ছাপ থাকলেও, সমস্ত ছবিটিই গতি, কম্পোজিশনের ঐশ্বর্য ও সমন্বয়ে, প্রতিটি ভাগের সঙ্গে অন্য সমস্ত ভাগের অবিচ্ছেদ্য অভিন্ন গতিমণ্ডিত আবর্তে, জীবজন্তু, শিকার করা পশু ও শিকারী চিতা বাঘ, ঘোড়া ও অশ্বারোহীর ঘূর্ণায়মান গতিতে, প্রতিটি মানবচরিত্রের 'দেহভঙ্গিতে, যে অপূর্ব পারস্পরিক সজীব ও প্রাণবন্ত সম্বন্ধ প্রতিভাসিত হয়েছে, তা একান্তই আকবরনামা অর্থাৎ ১৫৯০ যুগের। অতএব কোন্ নামা ঠিক কোন্ সালে শুরু হয়েছিল, সে চেষ্টা না করে আবুল ফজল বর্ণিত আকবর বাদশার ধর্মচর্চার কালাকাল ও সব ধর্মে আগ্রহ ও সমন্বয় সাধনের প্রগতির ইতিহাসের উপর নির্ভর করাই বোধ হয় বেশি ঠিক হবে। যথা

১। তুতিনামা—১৫৬০-৬৫ তুলা কাপড়ের উপর আঁকা
২। হাম্‌জানামা—১৫৬২-৭৭ তুলা কাপড়ের উপর আঁকা
৩। বাবরনামা—সম্পূর্ণ হয় ১৫৮৯, কাগজের উপর আঁকা
৪। আকবরনামা—সম্পূর্ণ হয় ১৫৯০ ? কাগজের উপর আঁকা
৫। হরিবংশ—সম্পূর্ণ হয় আনু. ১৫৯০ আকবর ও যুবরাজ সেলিম (জাহাঙ্গীর)
৬। রজ্‌মনামা (মহাভারত) (যুদ্ধের বই)—সম্পূর্ণ হয় আনু. ১৫৯৮ ঐ

এইসব অ্যালবাম চিত্রণে আকবর বাদশা, যুবরাজ সেলিম, পরে বাদশা জাহাঙ্গীরের নিজস্ব চিত্রশালা বা কারখানায় যে সব শিল্পী নিযুক্ত ছিলেন তাঁদের নাম করলেই বোঝা যাবে আকবর এবং জাহাঙ্গীর তাঁদের সাম্রাজ্যে জাতীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মধ্যে একাত্মতা এনে, শিল্পকলাসৃষ্টির পিছনে কী অপরিসীম বিনয়ে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর আত্মনিবেদনের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আরো বাড়ে যখন আমরা স্মরণ করি আকবর তাঁর চিত্রশালা শুরুর সময়ে যদিও তাঁর বাবা হুমায়ুনের পারস্য রাজদরবার থেকে আনা শিল্পীদের দিয়ে শুরু করেন, জাহাঙ্গীর প্রায় একান্তভাবে নির্ভর করেন ভারতীয় শিল্পীদের উপর। অর্থাৎ তাঁর রাজত্বকাল আকবর এমন চিত্রশিল্পী তৈরি করে যান, যার ফলে যুবরাজ সেলিম, পরে বাদশা জাহাঙ্গীরের পক্ষে, তাঁর নিজের অভিপ্রেত রুচি মেটাতে কোন অসুবিধা হয়নি।

আকবরের রাজত্বে প্রখ্যাততম শিল্পীদের নাম একে একে বলি : আবদুস সামাদ (পারস্য), আবুল হাসান, আকা রিজা, আকিল খান (?), বসাওন, ভবানীদাস (?), বিচিত্র, বিহ্‌জাদ (পারস্য), বিহ্‌জাদ (আবদুস সামাদের পুত্র), বিষেণদাস (?), দশ্যন্তু, গোবর্ধন, কমল কাশ্মীরী, কেশু খুর্দ, মনোহর, মনসুর (?), মীর সঈদ আলী, মিশকিন, নয়নসুখ, রুকনুদ্দিন, সাহিবদিন, সুদর্শন, রঞ্জা।

জাহাঙ্গীর (১৬০৫-১৬২৭)

আকবর বাদশা তাঁর অমাত্য আবদুর রহিম খানখানানের উপর যুবরাজ সেলিমের চিত্রকলায় রুচি, জ্ঞান ও বোধ উদ্বুদ্ধ করার ভার দেন। আবদুর রহিম খানখানানের তত্ত্বাবধানে চিত্রালঙ্কৃত রামায়ণ প্রস্তুত হয়। চিত্রিত রামায়ণটি এখন ওয়াশিংটনের ফ্রিয়ার গ্যালারিতে রক্ষিত আছে। অনেকে মনে করেন আবদুর রহিম রজ্‌মনামা চিত্রণের জন্যেও দায়ী (১৫৯৫ ?)।

ফলে আকবরকে যদি সাংসারিক বুদ্ধিতে প্রবীণ, অথবা সম্ভব-অসম্ভব সম্বন্ধে বিশেষ সজ্ঞান অথচ অপেশাদারী শিল্পোৎসাহী বলি, অর্থাৎ ধরে নিই যে শিল্প সম্বন্ধে তাঁর যা জ্ঞান ও উৎসাহ ছিল তার থেকে বেশি জ্ঞান ও বোধ ছিল চিত্রশিল্পের উপপাদ্য বিষয়ে, এবং তার যথাযথ চিত্রণে, এবং তাঁর সাম্রাজ্যের সব কিছুতে—শাসন থেকে

চিত্রকর ঠিকমত বাছাই করার ব্যাপারেও—ছিল তাঁর সমান উৎসাহ, তাহলে তাঁর ছেলে জাহাঙ্গীর পিতার আনুকূল্যে ভাল ভাল গুরু ও শিক্ষক ও শিল্পীদের কাছে শিক্ষা পেয়ে হলেন প্রকৃত শিল্প ও চিত্ররসিক। তাঁর রুচি ছিল যথোচিত শিক্ষা ও অনুশীলনের উপর প্রতিষ্ঠিত। তার উপরে ছিল আবদুর রহিম খানখানানের নিবেদিতপ্রাণ তদারকি। আবদুর রহিমের চেষ্টায় তাঁর হাতে কলমে সর্বোত্তম শিল্পীদের সান্নিধ্যে হয় শিক্ষার শুরু। পিতার সঙ্গে বিরোধের পর তিনি যখন এলাহাবাদে গিয়ে নিজের এক্তিয়ারে ১৫৯৯ থেকে ১৬০৪ পর্যন্ত থাকেন, সেখানেও তিনি নিজের মনোমত করে গড়লেন চিত্র রচনার কারখানা, নিয়ে এলেন বহু বিখ্যাত শিল্পী। তাঁর নির্দেশে আঁকা অনেক পুঁথি এখন কিছু আমেরিকার বল্টিমোরের ওয়ালটার্স আর্ট গ্যালারি ও ডাবলিনের চেস্টার বিঁটি (Beatty) সংগ্রহে আছে। ১৬০৫ সালে পিতার সময়েই তিনি চিত্ররসিক ও রসজ্ঞ ব্যক্তি হিসাবে যথেষ্ট খ্যাত হন।. তাঁর তুজুকী-ই-জাহাঙ্গীরী বা জাহাঙ্গীরনামায় তাঁর চিত্র সম্বন্ধে জ্ঞান, চিত্রসৃষ্টি কাজে তাঁর অবদান, ও সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকরদের একত্র করার বিষয়ে বিশদভাবে লেখা আছে। চিত্রজগতে তাঁর প্রধান অবদান প্রকৃতিচিত্রণে ও নরনারীর প্রতিকৃতিতে এবং বিদেশী, বিভিন্ন ধর্মের বিষয়ে। খ্রীস্টীয় ধর্ম বিষয়ে ছিল তাঁর প্রগাঢ় উৎসাহ। আতিপাতি করে খুঁজে তিনি সেইসব চিত্রকর আবিষ্কার করতেন যাঁরা একাধারে প্রকৃতির সৃষ্ট যত সুন্দর, কুৎসিত, বিচিত্র, দুষ্প্রাপ্য, বড়, ছোট, মহান, সাধারণ ফল, ফুল, গাছপালা, লতা, জীব জন্তু, কীট, পতঙ্গ ও বিচিত্র চরিত্রের নরনারী আছে তাঁদের নিখুঁত চিত্রণে, এবং সেই হুবহু চিত্রণে তাঁদের স্বকীয়তা ও অনুপমতা ফুটিয়ে তুলতেন। তাঁর রাজত্বের (১৬০৬-১৬২৭) সবথেকে লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিত্রশিল্পীদের নাম হল : ওস্তাদ অনন্ত ; নাদির-উল-জামান ; মনসুর ; মহম্মদ আলি ; ওস্তাদ মিশকিন ; মাসুদ ; হুনহার, ওস্তাদ মোদী ; বিচিত্র ; গোবর্ধন ; হাশিম। এঁদের মধ্যে অনেকেই সম্রাট শাজাহানের সময়ে আরো পরিপক্কতা লাভ করেন।

শাজাহান (১৬২৮-১৬৫৭)

সম্রাট শাজাহানের সময়ে মুঘল চিত্ররীতির মহিমা তুঙ্গে ওঠে। তার কারণ সম্রাট হুমায়ুন, আকবর ও জাহাঙ্গীরের আগ্রহে যে সব ওস্তাদ শিল্পীদের মুঘল সম্রাটের চিত্র কারখানায় একত্র করে তাঁদের শুধু উৎসাহ নয়, যাবতীয় সুখ-সুবিধা দেওয়া হয়, সম্রাট শাজাহান তার সুফল উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে লালন করেন।

শাজাহানের সময়ে সম্রাটের ও তাঁর অমাত্য সচিবদের প্রতিকৃতি আঁকার উৎকর্ষ তুঙ্গে ওঠে। জাহাঙ্গীরের জীবন পর্যন্ত মুঘল মুরাক্কা বলতে বোঝাতো সযত্নে চিত্রিত এমন একটি চিত্রসংগ্রহ যার মধ্যে যে কোন বিষয়েই হোক না কেন, তার শ্রেষ্ঠ কীর্তি একত্রিত করা থাকবে। শাজাহানের সময়ে মুরাক্কা মানে বোঝাতো সেই অ্যালবাম যাতে সম্রাটের প্রতিকৃতি এবং তার সঙ্গে তাঁর প্রিয় আমীর অমাত্যদের ও বিখ্যাত সুন্দরী রমণীদেরও প্রতিকৃতিও থাকবে। শুধু প্রতিকৃতি নয়, পোশাক অলঙ্কারের জাঁকজমকও যথাসম্ভব থাকবে। অর্থাৎ সবদিক দিয়ে মুঘল দরবারে উপস্থিত মান্যগণ্য ব্যক্তিদের কাছে উপস্থাপিত করার যোগ্য হবে। শাজাহানের রাজত্বের সবথেকে উল্লেখযোগ্য মুরাক্কা হচ্ছে শাজাহানের বড় ছেলে ও যুবরাজ দারা শিকোর নামে যে অ্যালবাম প্রসিদ্ধিলাভ করেছে। এটি এখন ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির সংগ্রহে। দারা শিকো এই মুরাক্কাটি একত্রে সম্বলিত করে তাঁর স্ত্রী নাদিরা বানু বেগমকে ১৬৩০এর দশকে উপহার দেন। আকবরের ছেলে জাহাঙ্গীরের মত, শাজাহানের ছেলে দারা শিকোও ছিলেন চিত্ররসিক ও চিত্রকলার বিচক্ষণ সুপণ্ডিত ও বিশেষ বিচারবুদ্ধি ও রুচিসম্পন্ন। যুবরাজ হিসাবে অবশ্য তিনি শাজাহানের শিল্পীদের দিয়ে নিজের কাজ করাতে পারতেন না, তবে তাঁর নিজস্ব কারখানায় ছিলেন শিল্পী মুহম্মদ খান, বিখ্যাত চিত্রকর মনোহর, যিনি আকবরের সময়েই বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেন। মনোহরের আঁকা দারা শিকোর ঘোড়া দিল্‌পসন্দ-এর ছবির মত অত ভাল ঘোড়ার ছবি পৃথিবীতে দ্বিতীয় আছে কিনা সন্দেহ। অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে নতুন উল্লেখযোগ্য নাম হচ্ছে রামদাস, বুলচাঁদ।

জাহাঙ্গীরের মত শাজাহান যে খ্রীস্টীয় ধর্মীয় ছবি এবং তার সঙ্গে ইওরোপীয়দের প্রতিকৃতি আঁকিয়ে ছিলেন তা নয়, শাজাহানের দরবারে রাগমালা চিত্ররাজিও চিত্রিত হয়। যে সব রাগমালা চিত্র শাজাহানের সংগ্রহে ছিল তার থেকে পঁচিশটি চিত্র ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে। সংগ্রাহক রিচার্ড জনসন এই চিত্রগুলি বারাণসীর ইব্রাহিম আলি খানের কাছ থেকে সংগ্রহ করেন, এগুলি সবই শাজাহানের সময়কার দিল্লী অঞ্চল থেকে সংগৃহীত। এই সংগ্রহের ফলে এই অনুমান অসঙ্গত নয় যে রাজপুত চিত্রঐতিহ্যে রাগমালা যে স্থান পেয়েছে শাজাহানের

রাজত্বে এই রীতি ও বিষয় সমান সম্মান পেয়েছে, এমন কি মুঘল দরবারে রাগমালা চিত্ররাজি এত আদর পাওয়ার দরুনই সম্ভবত রাজপুত চিত্রজগতে রাগমালার বিষয় ও প্রতি রাগের চিত্রপ্রতীকগুলি এত সম্মান ও স্বীকৃতি পায়। পঁচিশটি রাগমালার যথাক্রমে নাম হচ্ছে : ভৈরব রাগ ; ভৈরবী রাগিণী ; পটমঞ্জরী রাগিণী ; ললিতা রাগিণী ; মালকোষ রাগ ; খাম্বাবতী রাগিণী ; মালশ্রী রাগিণী ; রামকেলী রাগিণী ; বিলাওল রাগিণী ; তোড়ি রাগিণী ; দেশাখ্য রাগিণী ; দেবগান্ধার রাগিণী ; মধুমাধবী রাগিণী ; দীপক রাগ ; ধনশ্রী রাগিণী ; বসন্ত রাগিণী ; কামোদ রাগিণী ; শ্রীরাগ ; পঞ্চম রাগ ; আশাবরী রাগিণী ; বাঙ্গালী রাগিণী ; কেদারা রাগিণী ; কামোদ রাগিণী ; বিভাস রাগিণী ; শ্বেতমল্লার বা সুধামল্লার রাগিণী।

ঔরঙ্গজেব (আলমগীর) (১৬৫৮-১৭০৭)

১৬৫৮ সালে পয়ঁষট্টি বছর বয়সের সম্রাট শাজাহানকে তাঁর ছেলেরা তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে আগ্রা দুর্গে বন্দী করে রাখেন। তাঁর ছেলেরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া শুরু করে। অবশেষে ১৬৫৮ সালে পাণিপথের যুদ্ধে ভাই দারা শিকোকে হারিয়ে আলমগীর মুঘল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন। নাম নিলেন ঔরঙ্গজেব। দাক্ষিণাত্য জয়ে মন দিলেন। সাধারণত আমাদের ধারণা ঔরঙ্গজেব চিত্রকলা বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন না। কথাটা অর্ধসত্য বলা যায়। আকবর, জাহাঙ্গীর, শাজাহানের তুলনায় চিত্রকলায় ঔরঙ্গজেবের জ্ঞান বা উৎসাহ অবশ্য কমই ছিল, কিন্তু কথায় বলে বাপকা বেটা, সেপাহীকা ঘোড়া, কুছ নেই তো থোড়া থোড়া। তাঁর পূর্বপুরুষরা যে প্রতিভাশালী ও গুণী শিল্পীদের তৈরি করে, সংগঠিত করে, সম্রাটের চিত্রকারখানায় সম্মানের আসনে বসিয়ে গেছিলেন, তাঁরা এবং তাঁদের শিষ্য অথবা সন্তানসন্ততিরা ত কিছু না কিছু কাজ করবেন। সুতরাং শাজাহান তাঁর রাজত্বে মুঘল চিত্রকলার যে উৎকর্ষ এনেছিলেন প্রতিকৃতি বা পোর্ট্রেটে এবং প্রকৃতির অনুধাবনে, তার রেশ খুব ভাল ভাবে টিকে থাকল। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের প্রতিকৃতি ইত্যাদির বিরুদ্ধে ইসলামীয় গোঁড়ামি যখন ক্রমে ক্রমে বাড়তে লাগল তখন প্রতিকৃতি নির্মাণ জগতে এই উৎকর্ষেরও অবনতি হতে লাগল। কারণ যে সংস্কৃতি একজন সর্বময় কর্তাকে ঘিরে এবং তাঁর কাছ থেকে সঞ্জীবনী রস টানে, সেই সর্বময় কর্তার জ্ঞান, উৎসাহ, পৃষ্ঠপোষকতা ও নির্দেশের উপরই সেই জগৎটি বাঁচে অথবা জীর্ণ হয়। ঔরঙ্গজেব উত্তরাধিকারসূত্রে যে সব জগদ্বিখ্যাত শিল্পীদের তাঁর দরবারে পেলেন, তাঁরা সম্রাটের কাছ থেকে তাঁর বাবা ঠাকুর্দার মত চিত্র বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টি, সমঝদারি, তারিফ, বিচার ও উন্নতিকল্প সমালোচনা পেলেন না। ফলে তাঁরা কিছুটা নিরুৎসাহিত হলেন। কাজ করে চললেন ঠিকই, কিন্তু প্রাণমন একটু ঢিলে হয়ে গেল।

তবুও যাকে বলে মরা হাতি লাখ টাকা। পোর্ট্রেটে জাহাঙ্গীর বা শাজাহান আমলের সে গভীর অন্তর্দৃষ্টি, চরিত্রচিত্রণ, সূক্ষ্ম তুলির মুখে সেই রেখা, যা এক অর্ধস্ফুট বা অস্ফুট আঁচড়ে চিত্রিত ব্যক্তির অন্তরাত্মা এক নিমেষে উদ্ভাসিত করে, সেই অন্তর্দৃষ্টি ও তুলির ঐশী শক্তি স্তিমিত হলেও, ঔরঙ্গজেব আমলের প্রতিকৃতিতে যা দেখা গেল তাও অমূল্য। (পরিচ্ছেদের শেষে পাদটীকা দেখুন) ঔরঙ্গজেবের প্রধান অবদান হল দাক্ষিণাত্য জয়ের পর এক রীতিমত তাৎপর্যপূর্ণ দক্ষিণী বা ডেকানী চিত্ররীতি তৈরি হল, যা নাকি মুঘলরীতির সার্থক প্রাদেশিক অপভ্রংশ বলে স্বাধীন মর্যাদা পেল।

এদিকে শাজাহানের প্রতিকৃতিরীতি ঔরঙ্গজেবের সময়ে কিছু কিছু বদলে গেল। একদিকে যেমন সূক্ষ্ম কাজ ও কারিগরির বাহাদুরি বাড়ল এবং জাকজমক পোশাকের উপর এল বেশি ঝোঁক, অন্যদিকে চরিত্রচিত্রণে সে অন্তর্দৃষ্টি স্তিমিত হল। এর প্রধান কারণ সম্ভবত বাদশার নিজের চোখের তীক্ষ্ণতা ও বিচারের অভাব। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সমস্ত কিছু বোঝার ইচ্ছা বা সময়ের অভাব। ব্যতিক্রমও আছে। সম্রাটের নিজের অতি উৎকৃষ্ট একটি পোর্ট্রেটে দেখি সম্রাট পাশ ফিরে বসে আছেন, শরীরটি প্রোফিলে, মুখ ও দুটি চোখ সমুখে স্পষ্ট ইওরোপীয় ভঙ্গিতে ফেরানো, ডান কব্জির উপর একটি বড় টিয়াপাখি (বাজ নয়, কারণ বাজের ঠোঁট আরও বড়, বেঁকানো ও তীক্ষ্ণাগ্র) : আপত্তির কিছু নেই, কিন্তু জাহাঙ্গীরের আমলের চরিত্রস্ফুরণ নেই, পোশাক ইত্যাদির পারিপাট্যের ধাঁচের উপর নজর বেশি। ঔরঙ্গজেবের কালেই ইওরোপীয় রীতিতে বা ধাঁচে আঁকা অনেক প্রতিকৃতি দেখা যায়, এর কিছু কিছু অবশ্য দিল্লী কলম, কিন্তু তার অনেকগুলিই দক্ষিণী কলমের, কারণ দাক্ষিণাত্যেই অনেক বিদেশী বণিক ব্যবসা করতেন, এবং শিল্পীরা তাঁদের চাহিদা মেটাতেন। এইভাবে একটি মিশ্র মুঘল-দক্ষিণী রীতি গড়ে উঠে বিস্তৃতি লাভ করে।

জন্‌সন্‌ অ্যালবামে অনেক ছবি পাই যা দাক্ষিণাত্যে সম্পূর্ণ করা হয়, নানা দক্ষিণী লক্ষণও আছে, অথচ মূলত মুঘল কলম। একটি ছবিতে দেখি সিংহাসনে আসীন সম্রাট ঔরঙ্গজেব, তাঁর বাঁ পাশে দ্বিতীয় পুত্র আজম শা দাঁড়িয়ে, সম্মুখে দাঁড়িয়ে একজন অমাত্য। শিল্পীর নাম ক্ষেমানন্দ। মুঘল রীতিতে আঁকা হলেও, ছবির সিংহাসনে ও পোশাকে সোনার কাজ থেকে বোঝা যায় দক্ষিণী প্রভাব।

এই মুঘল-দক্ষিণী রীতি ভারতের চিত্রকলার ইতিহাসে ঔরঙ্গজেবের অবদান বলা যায়। ঔরঙ্গজেব যেহেতু চিত্রকলায় অত উৎসাহী ছিলেন না সেহেতু অনেক শিল্পী মুঘল সম্রাটের নিজস্ব কারখানা আস্তে আস্তে ছেড়ে দিয়ে প্রাদেশিক রাজধানীতে গিয়ে সেগুলির সমৃদ্ধিসাধন করলেন। সেই সঙ্গে চিত্রিত পুঁথি বা মুরাক্কা অ্যালবামের সৃষ্টিকাজও দ্রুত কমে গেল। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে উৎকৃষ্ট প্রতিকৃতির সংখ্যা কিছু কম হয়নি, কিন্তু তাদের অধিকাংশই আগেকার মত প্রাণবন্ত, অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ রইল না।

ঔরঙ্গজেবের রাজত্বে মুখ্য শিল্পীদের নাম হল : ফকির-ই-হকির আমাল-ই-ক্ষেমানন্দ (বেচারী কৃপাপাত্র গরীব ক্ষেমানন্দ); রঘুনন্দন ; রায় চিতরমন ; মধুপুত্র ইলিয়াস বাহাদুর ; জ্ঞানচাঁদ ; অনুপ চত্তর ; রায় ফৎ চাঁদ ; হুনহার ; ছাট মল ; রায় চাতা'মল ; ওস্তাদ গোলাব রায় ; চেৎ ; আফজল আলি খান ; মাসুদ ; লছমন সিং প্রমুখ।

মুঘলচিত্রকলার পশ্চাদ্‌পট হিসাবে বাবর, হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর, শাজাহান, ঔরঙ্গজেব, পর পর ছয় মুঘল সম্রাটের বিষয়ে কিছু কিছু সন তারিখ, সংবাদ এবং নামের সঙ্গে পরিচয় থাকলে নিচের বক্তব্য বিচার করতে পাঠকের সম্ভবত সুবিধা হবে এই আশায় এই বইয়ের আগেকার পরম্পরা ভেঙ্গে উপরোক্ত তথ্যগুলি পেশ করে প্রয়োজন জ্ঞানে এবার পুরনো বক্তব্যে ফিরে যাই।

সম্রাটের কাজই হচ্ছে দেশ শাসন। বিশেষত যে সব সম্রাটকে নিজে দেশ জয় করে শাসন করতে হয় তাঁদের শাসনের দায়িত্ব যে কত, বিশেষত ভারতবর্ষের মত বিশাল, জটিল দেশে, তা সাধারণ মানুষের পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব নয়। আকবর, জাহাঙ্গীর, শাজাহান বাদশার ছিল এই ধরনের দায়িত্ব, মাথায় নিশ্চয় ঘুরত রাজ্যের চিন্তা, ভাবনা, কূটনীতি, কত রকম শাসন চক্রান্তের কথা। এ সত্ত্বেও পৃথিবীর ইতিহাসে এই চার সম্রাটের মত চারুশিল্পের মহান পৃষ্ঠপোষক খুব বেশি পাওয়া যাবে না। স্তম্ভিত হতে হয় তাঁদের নিখুঁত রুচিবোধে, সৌন্দর্যপিপাসায়, প্রতিভার স্বীকৃতি দেখে। পৃথিবীর চিত্রজগতে মুঘল মিনিয়েচরের সৃষ্টি তাঁদের জন্যই সম্ভব হয়েছে একথা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

আকবর, জাহাঙ্গীর, শাজাহান, ঔরঙ্গজেব বাদশাহের আমলে চিত্রসৃষ্টির আলোচনা

আগের অনুচ্ছেদের অনেক উক্তি বা মন্তব্যের বিস্তারিত আলোচনা এই অনুচ্ছেদে দেবার চেষ্টা করেছি। কিছু কিছু অংশ পুনরুক্তি বলে মনে হতে পারে। সে অভিযোগের আশঙ্কা সত্ত্বেও একটি সুমহৎ যুগের সামগ্রিক আলোচনা হিসাবে কিছু কিছু পুনরাবৃত্তি ইচ্ছা করেই রেখেছি।

আকবর বাল্যকালে বাদশা হলেন। বাবর বা হুমায়ুন কেউই ভারতে জন্মাননি, আকবর জন্মান। আর ভারত থেকে বোখারা বা সমরকন্দ বহুদূর। ১৫৬৯ সালে ফতেপুর সিক্রি যখন গড়লেন সেই সঙ্গে ভারতের ইতিহাসে এল এক নতুন যুগ। স্থপতি, ভাস্কর, রাজমিস্ত্রির পর ডাক পড়ল চিত্রশিল্পীর। ফতেপুর সিক্রির প্রাসাদের দেয়ালে ছবি আঁকতে হবে। ছবি যা আঁকা হল তা হল ক্ষুদ্রকায় ছবিরই বৃহদাকার সংস্করণ, অজন্তার ছবির সঙ্গে তার বিশেষ সম্বন্ধ নেই ; যদিও প্রায় একই সময়ে বিকানীর, জয়পুর, উদয়পুরের প্রাসাদের দেয়ালে যে ছবি আঁকা হল সে ছবিতে অজন্তার রীতি আর প্রভাব অতি স্পষ্ট। ফতেপুর সিক্রিতে বেলে পাথরের উপর সাদা রঙের প্রলেপ দেওয়া হত, তার উপরে দেওয়া হত রঙ। কতকগুলি ছবি হল একেবারে ঈরাণী রীতিতে আঁকা, কতকগুলি ভারতীয়। স্পষ্টই বোঝা যায় যে বহু শিল্পী নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং প্রত্যেকেই নিজের মত করে কাজ করে গেছেন। এইভাবে সম্রাটের দরবারে নানা ধর্মের নানা রীতিপথের চিত্রশিল্পীরা কাজ করতেন, যাদের সকলের উপরে অবশ্য ছিলেন মীর সয়ীদ আলি আর আবদুস সামাদ। আবদুস সামাদ কালে ফতেপুরের টাঁকশালের কর্তা হন এবং পরে মুলতানের দেওয়ান হন। তাঁর ছেলে জাহাঙ্গীরের দরবারে আমীর-উল-ওমরার পদ পান।

ফতেপুরের প্রাচীর চিত্র সম্বন্ধে যে ই ডব্লিউ স্মিথের একটি প্রামাণ্য বই আছে, তার নাম 'দা মুঘল আর্কিটেক্‌চার

অভ ফতেপুর সিক্রি'। এই প্রাচীর চিত্রগুলির রীতি হচ্ছে সমান, চ্যাপটা, বা ফ্ল্যাট ; গভীরত্ব নেই, রঙ গাঢ়-ফিকে করা নেই। একটি ছবি আছে, তাকে স্থানীয় প্রদর্শকরা বলেন, 'দি অনান্‌সিয়েশন' (মেরির গর্ভে যীশু জন্ম নেবেন, এক দেবদূত কর্তৃক তার ঘোষণা)। চীনে ড্র্যাগন আকারের মেঘ স্পষ্টত পারসীক উত্তরাধিকার, বুঝতে দেরি হয় না। তুর্কী সুলতানার বাড়ির দেয়ালে অনেকগুলি বেস-রিলিফের প্যানেল আছে, তাতে ফুলফোটা গাছ আর জন্তু জানোয়ারের খোদাই যেমন সজীব তেমনি বাস্তবধর্মী ; স্পষ্টই বোঝা যায় যে চিত্রশিল্প আর ভাস্কর্যের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। কিন্তু তবুও একথা বলতেই হয় যে ফতেপুর সিক্রির প্রাচীর চিত্রের সঙ্গে বিকানীর, উদয়পুরের বা অজন্তার প্রাচীর চিত্রের জাতিগত কোন সম্বন্ধে নেই। বরং সেগুলি মুঘল মিনিয়েচরেরই অতিকায় সংস্করণ।

ভারতীয় অন্যান্য চিত্ররীতির সঙ্গে মুঘল ক্ষুদ্রকায় চিত্ররীতির একটি বিশেষ পার্থক্য আছে, যার ফলে মুঘল ছবির যে বিদেশে জন্ম তা বেশ বোঝা যায়। এই বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ছবির সীমারেখায় চিত্র-প্রায় হস্তলিপির প্রসাদগুণ, যাকে ইংরেজিতে বলে ক্যালিগ্রাফির গুণ। একদিকে পারস্যে, অন্যদিকে চীনে, যেহেতু এক একটি অক্ষর ছিল এক একটি ছবি, সেহেতু অক্ষর আঁকতে হত তুলি দিয়ে (আমাদের দেশে উল্টো : ছবি আঁকা হত কলম দিয়ে, ফলে ছবির নাম ছিল আলেখ্য, যার জন্যে আমাদের দেশে সর্বত্র চিত্রে প্রথম থেকেই এল রেখার প্রাধান্য)। তাই চীনে আর পারস্যে তুলি দিয়ে অক্ষর আঁকার দরুন চিত্রশিল্পীর আঁকার রীতিনীতি, হাতে তুলি ধরার নিয়ম, প্রথম থেকেই ভারতের থেকে ছিল তফাৎ। পারস্যের এই বৈশিষ্ট্য ঈরাণী কলমের মধ্যে দিয়ে মুঘল চিত্রে এল, ফলে মুঘল মিনিয়েচর বরাবরই প্রথম থেকে অন্যান্য ধরনের ভারতীয় চিত্র থেকে হল তফাৎ। পারস্যে, চীনে, ভারতে পুঁথি লেখকদের খুব সমাদর ছিল। তাঁরা পুঁথি লিখে তারিখ দিয়ে সই করতেন, বিখ্যাত লেখকদের পুঁথি বড়লোকরা সযত্নে সংগ্রহ করতেন। আবুল ফজল আকবরের দরবারের পুঁথি লেখকদের এক তালিকা দিয়েছেন, তার মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন কাশ্মীরের মহম্মদ হুসেন, তিনি আকবর মারা যাবার পরও ছ' বছর বেঁচে ছিলেন। অনেক পুঁথি আছে যাদের ভিতরকার ছবির চেয়ে হস্তলিপিরই আদর বেশি। নানা ধাঁচের নানা চালের চোখ জুড়োন হস্তলিপি হত। আবুল ফজল আট রকম হস্তলিপি রীতির উল্লেখ করেছেন, যা নাকি ষোল শতকে ঈরাণে (পারস্যে), তুরাণে (তুর্কীস্থানে), ভারতে, তুর্কীতে চালু ছিল। অক্ষরের সোজা আর গোল রেখার হারাহারের নানা রকমফেরের উপর এই রীতিগুলির পার্থক্য নির্ভর করত। যেমন একদিকে ছিল কুফিক, যার নাকি ছ'টির মধ্যে পাঁচটি রেখাই তীর্যক, খোঁচা খোঁচা, সোজা। অন্যদিকে ছিল নাষ্টালিক, যার সব হরফই হত গোল গোল। নাষ্টালিক ছিল আকবর বাদশার প্রিয় হরফ। কুফিক যেমন মধ্য এশিয়ার রুক্ষতার সঙ্গে মেলে, নাষ্টালিক তেমনি আবার ভারতের সজল গাছপালার গোলগাল ভাবের সঙ্গে বেশ খাপ খায়। নানা কারণে মুঘল মিনিয়েচরে ক্যালিগ্রাফির গুণ প্রধানভাবে এসে পড়ে, বিশেষত এইসব ছবির পাড়ের কাজে। আবুল ফজল বুঝে সুঝেই তাঁর আইন-ই-আকবরীর ৩৪ অধ্যায়ের নাম দিয়েছিলেন 'হস্তলিপি ও চিত্রশিল্প', যেখানে তিনি প্রথম যুগের ভারত-পারসীক ইতিহাস আলোচনার সঙ্গে আট রকম ক্যালিগ্রাফির রীতিরও অবতারণা করেন।

যে ভারত সম্রাট মুসলমান হয়েও অল্প বয়সে মোল্লাদের বিরুদ্ধাচরণের মধ্যে সর্বধর্মসমন্বয় করে দীন ইলাহির প্রবর্তন করেন, তিনি যে তাঁর একান্ত শিক্ষিত ও উদার মন নিয়ে দেশে চারুশিল্পের উৎস খুলে দেবেন এতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে। আকবর এক অভূতপূর্ব কাজ করলেন। মীর সয়ীদ আলি ও আবদুস সামাদ আগে থেকেই ছিলেন, তা সত্ত্বেও এলেন ফররুখ কলমাক, আবদুল সামাদ শিরাজী, আরও অনেকে। তারপর তিনি জাত্যাভিমান ভুলে গিয়ে কাজ দিলেন হিন্দুদের ; যাঁদের মধ্যে এলেন বসাওঅন, দশ্যান্ত, কেশুদাস। এঁদের দিলেন সমান সম্মান, ফরমায়েস দিলেন কবি নিজামীর কাব্যের ছবি আঁকতে। মুসলমান ও হিন্দু রীতি পরস্পর হাত মেলানোর ফলেই সৃষ্টি হল নতুন মুঘল চিত্রনীতি, যার জন্যে আকবরের প্রতিভা, ঔদার্য, দূরদর্শিতা মুখ্যত দায়ী। আবদুস সামাদ আর তাঁর মুসলমান সহকর্মীদের কাজ হিন্দু শিল্পীরা এত তাড়াতাড়ি আয়ত্ত করে ফেললেন, এবং তারপর নানা জাতের অসংখ্য হিন্দু শিল্পী তাকে এমন রূপায়িত করলেন, যে স্পষ্টই বোঝা যায় যে দেশে মহা মহা

হিন্দু শিল্পী অনেক ছিলেন, যাঁরা কোন নতুন জিনিস দেখামাত্র আয়ত্ত করতে পারতেন। যতই হোক, আকবর বাদশা বড় জোর হিন্দুদের জড়ো করতে পারতেন, কিন্তু গাধা পিটিয়ে ত ঘোড়া করতে পারতেন না। মুসলমান ও হিন্দু শিল্পীদের কি রকম সমান আদর ছিল, তা আবুল ফজলের ৩৪ নং আইন থেকে এই অনুবাদটুকু পড়লেই বোঝা যাবে। আবুল ফজল লিখছেন : "যাঁরা খ্যাতির রাজপথে পথপ্রদর্শক হয়েছেন তাঁদের মধ্যে এঁদের নাম করতে পারি।

"১। তাব্রিজের মীর সয়ীদ আলি। তাঁর বাবার কাছে কাজ শিখেছিলেন। রাজদরবারে যেদিন ভর্তি হয়েছেন সেইদিন থেকেই সম্রাটের কৃপারশ্মি তাঁর উপর পড়েছে। নিজের শিল্পে তিনি বিখ্যাত হয়েছেন, বহু সাফল্যলাভ করেছেন।

"২। খাজা আবদুস সামাদ, লোকে বলে শিরীন কলম, অর্থাৎ মধুর কলম। শিরাজে দেশ। যদিও দরবারে অভিজাত পদ পাবার আগেই তিনি তাঁর শিল্প ভালমত শিখেছিলেন, তবুও তিনি শ্রেষ্ঠত্বের চূড়ায় উঠলেন সম্রাটেরই এক ঝলক নজরের বিস্ময়কর ফলে, যার দরুন আগে যা ছিল শুধু রূপ তা হয়ে গেল শুদ্ধ আত্মা। খাজার কাছে শিক্ষা পেয়ে তাঁর শিষ্যরা এক একজন দিকপাল হয়ে গেছেন।

"৩। দশ্যন্ত (দুষ্যন্ত) পাল্‌কি বেহারার (কাহার) ছেলে। সমস্ত জীবন শিল্পের সেবায় নিয়োগ করেছেন, নিজের পেশা এত ভালবাসতেন যে দেওয়ালে সুদ্ধ ছবি আঁকতেন, রঙ করতেন। একদিন সম্রাটের চোখ তাঁর উপর পড়ল ; তাঁর প্রতিভা ধরা পড়ল, তাঁকে খাজার হাতে তুলে দেওয়া হল। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি সব চিত্রশিল্পীকে অতিক্রম করে গেলেন, এবং তাঁর কালে তিনি অদ্বিতীয় হলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর প্রতিভার আলো মস্তিষ্কবিকৃতির ছায়ায় ম্লান হয়ে গেল ; তিনি আত্মহত্যা করেন। অনেক সেরা সেরা কাজ রেখে গেছেন।

"৪। বসাওআন। পটভূমি আঁকায়, অবয়ব-আঁকায়, রঙের সংস্থানে, পোর্ট্রেটে, এবং আরও কয়েকটি শাখায় তিনি অপরাজেয়, ফলে অনেক সমালোচক তাঁকে দশ্যন্তের উপরে স্থান দেন।"

আবুল ফজলের এই আইনটির (৩৪ নং) চিত্রনীতির অংশটি এত ছোট অথচ এত মূল্যবান যে সবটুকু অনুবাদ করে না দিলে অন্যায় হবে : "কোন জিনিসের প্রতিকৃতি আঁকাকে বলে তসবীর। নিতান্ত অল্প বয়স থেকেই সম্রাট এই শিল্পের প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন, যথাসম্ভব উৎসাহ দিয়েছেন, কারণ তাঁর মতে এই শিল্প শিক্ষা ও চিত্তবিনোদন, দুইয়েরই উপায়। ফলে চিত্রশিল্প খুব সমাদৃত আর বহু চিত্রশিল্পী বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছেন। দারোগা আর কেরানীরা প্রত্যেক সপ্তাহে সমস্ত শিল্পীর কাজ সম্রাটের সম্মুখে নিয়মিতভাবে মেলে ধরে : তখন তিনি কাজের শ্রেষ্ঠত্ব অনুযায়ী হয় পুরস্কার দেন, না হয় মাসিক বেতন বাড়িয়ে দেন। শিল্পীদের যে সব দ্রব্য প্রয়োজন তার আহরণের যথেষ্ট ভাল ব্যবস্থা ছিল ; এবং সেগুলি যাতে ঠিক দামে পাওয়া যায় তার দিকে নজর রাখা হত। বিশেষ করে উন্নতি হয়েছে রঙের মিশ্রণের। ফলে ছবিগুলির অভূতপূর্ব জৌলুস খোলে। অতি উৎকৃষ্ট ছবি এখন পাওয়া যায়, এবং সেরা সেরা ছবি, যা এমন কি বিহ্জাদের যোগ্য, তা অনায়াসে জগদ্বিখ্যাত ইওরোপীয় শিল্পীদের আশ্চর্য কাজের পাশে রাখা চলে। খুঁটিনাটির প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি, শেষ করার পারিপাট্য, সার্থক নির্মাণের নিঃসঙ্কোচ স্পর্দ্ধা ইত্যাদি গুণ অধুনা ছবিতে যে রকম দেখা যায় তার তুলনা নেই। এমন কি প্রাণহীন বস্তুকেও দেখে মনে হয় যেন সজীব। চিত্রশিল্পে একশ'র বেশি শিল্পী শ্রেষ্ঠত্বের খ্যাতি লাভ করেছেন, আর যাঁরা সে পথে এগোচ্ছেন অথবা মাঝামাঝি স্থানে আছেন, তাঁদের সংখ্যা অনেক। এটা খাটে বিশেষ করে হিন্দুদের সম্পর্কে ; তাদের ছবি আমাদের বস্তুবিষয় সম্বন্ধে ধারণাকেও অতিক্রম করে যায়। সারা পৃথিবীতে এমন খুব কমই আছেন যাঁরা এঁদের সমকক্ষ।"

এরপর আসে চারজন শিল্পী সম্বন্ধে অংশটি, যা আগেই অনুবাদ করে দিয়েছি। তারপর :

"নিম্নলিখিত চিত্রশিল্পীরাও খ্যাতিলাভ করেছেন : কেশু, লাল, মুকুন্দ, মিশকিন, ফররুখ কলমাক, মধু, জগন, মহেশ, খেমকরণ, তারা, সাওলা, হরিবাস, রাম। এঁদের প্রত্যেকের শ্রেষ্ঠত্বের বিবরণ দিতে গেলে অনেক লম্বা হয়ে যাবে। আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে, একটি মাঠ থেকে একটি ফুল তুলব, একটি ফসলের গোছা থেকে একটি শিষ তুলব।

"এটা বলা দরকার যে বস্তুর আকার নিরীক্ষণ করে তার প্রতিকৃতি আঁকা, অনেকের মতে নিরর্থক বা অলসের কাজ হলেও, সুপরিচালিত, সুশিক্ষিত মনের কাছে, প্রজ্ঞার উৎস, এবং অজ্ঞানবিষের প্রতিষেধক। গোঁড়ামিতে অন্ধ হয়ে যাঁরা শাস্ত্রবাক্যের অনুসরণ করেন, তাঁরা চিত্রশিল্পের বিরোধী ; কিন্তু তাঁদের চোখও এখন সত্যদর্শনে সমর্থ

হয়েছে। একদিন বন্ধুদের একটি নিভৃত জলসায় সম্রাট কয়েকজনকে তাঁর নিকটে আসার আনন্দদান করে বললেন, অনেকে চিত্রশিল্পীদের ঘৃণা করেন, কিন্তু যাঁরা ঘৃণা করেন তাঁদের আমি পছন্দ করি না। আমার মনে হয় ঈশ্বরকে চিনে বার করার এক অদ্ভুত উপায় চিত্রশিল্পীদের আছে, কারণ চিত্রশিল্পী যখন কোন প্রাণী আঁকতে বসেন, বসে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, অবয়ব, একের পর এক এঁকে, সব সত্ত্বেও তার মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা দূরে থাক, তার একান্ত একক বৈশিষ্ট্যটি দিতেও অসমর্থ হন, তখন তাঁর মন নিশ্চয়ই ঈশ্বরের চিন্তায় মগ্ন হয়, যে ঈশ্বর প্রাণ দেন। ফলে তাঁর প্রজ্ঞা বাড়ে।

"চিত্রশিল্প উৎসাহ প্রেরণা পাবার ফলে, শ্রেষ্ঠ চিত্রের সংখ্যাও গেল বেড়ে। পারসীক গদ্য ও পদ্যের বই চিত্র দিয়ে অলঙ্কৃত করা হয়, এবং এইভাবে বহু সংখ্যক চিত্র তৈরি হয়। হামজানামা বারো খণ্ডে প্রস্তুত হয়, নিপুণ শিল্পীরা আখ্যানটির বিভিন্ন অংশ অবলম্বন করে আশ্চর্য আশ্চর্য ছবি এঁকে দেন, তাদের সংখ্যা চোদ্দশ'র কম নয়। চিঙ্গিজনামা, জাফরনামা (এই বইটি শরফউদ্দিন-ই-ইয়াজদের প্রণীত তৈমুরবংশের ইতিহাস), রজমনামা, রামায়ণ, নলদমন (নলদময়ন্তী) কলীলা দমনা (কালীয় দমন ?) অয়ার দানিশ ইত্যাদি সবেরই ছবি আঁকা হয়। সম্রাট স্বয়ং তাঁর প্রতিকৃতির জন্যে বসেন, এবং তাঁর রাজ্যের সকল সম্ভ্রান্ত লোকের যাতে প্রতিকৃতি আঁকা হয় তাঁর হুকুম দেন। এইভাবে এক প্রকাণ্ড অ্যালবামের সৃষ্টি হল ; যাঁরা এখন আর জীবিত নেই তাঁরা নতুন জীবন পেলেন, যাঁরা এখনও জীবিত তাঁরা অমরত্বের প্রতিশ্রুতি পেলেন।

"চিত্রশিল্পীরা পরিপালিত হবার সঙ্গে সঙ্গে অলঙ্কারশিল্পীরা, মিনে ও সোনার জল করা কারিকররা, রেখার আঁকিয়েরা, দপ্তরী, কাগজিরাও উপার্জনের পথ পেলেন।

"এই বিভাগে বহু মনসবদার, আহাদী এবং অন্যান্য সৈন্যরা কাজে বহাল আছেন। পদাতিক সৈন্যের মাহিনা ৬০০ থেকে ১২০০ দাম পর্যন্ত হয়।"

এইভাবে আগ্রা, দিল্লী ও অন্যান্য জায়গায় সম্রাটের হুকুমে গ্রন্থাগার তৈরি হয়। তাতে এশিয়ার সাহিত্যের যা কিছু উৎকৃষ্ট সবই, আসল ভাষায় ও পারসী অনুবাদে রক্ষিত হয়। প্রত্যেকটি বইয়ের মহামূল্য বাঁধাই হয়, খরচের পরোয়া না করে তাদের ক্ষুদ্রকায় ছবি দিয়ে চিত্রিত করা হয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যায় রজমনামার। এটি মহাভারতের সংক্ষিপ্ত ফারসী অনুবাদ, ১৫৮৮ সালের তারিখ দেওয়া মুখপত্র আছে। এখন এটি জয়পুরে। তৈরি করতে লেগেছিল প্রায় চল্লিশ হাজার পাউন্ড। ওয়াশিংটনে কর্নেল হান্নার কাছে যে রামায়ণটি আছে সেটি তৈরি করতে খরচ পড়েছিল কমপক্ষে বিশ হাজার পাউণ্ড। আকবরনামাও ঐ ধরনের মূল্যবান ছিল। এর থেকে ১১৭টি বড় বড় চিত্র এখন ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়মে আছে। ১৬৪১ সালে স্প্যানিশ পাদ্রী সিব্যাস্টিয়ান মান্‌রিক আগ্রায় ছিলেন। তিনি লিখে গেছেন যে তখন আগ্রায় সম্রাটের গ্রন্থাগারে ২৪,০০০ বই ছিল, এদের মোট মূল্য শুনলে মাথা ঘুরে উঠবে : ৬৪,৬৩,৭৩১ টাকা অথবা ৭,২০,০০০ পাউণ্ড। তার মানে গড়ে একেকটি বইয়ের দাম পড়ল তখনকার টাকায় ৩৭০ টাকা, তখনকার তুল্য মূল্যে ৩০ পাউণ্ড। একেই বলে রাজকীয় বিদ্যোৎসাহিতা।

আকবর যে সব গ্রন্থাগার করে গেলেন, জাহাঙ্গীর, শাজাহান, ঔরঙ্গজেব সেগুলির তত্ত্বাবধান করে বাড়িয়ে গেলেন। এমন কি তাঁদের বংশধররাও সেগুলির খুব যত্ন নেন। কিন্তু আঠারো আর উনিশ শতকের যুদ্ধ বিগ্রহে সেগুলি ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। এখন টুকরো টুকরোভাবে পৃথিবীর যত্র তত্র ছড়িয়ে গেছে, কিন্তু যেটুকু যেখানে পাওয়া যায় সেটুকু ভারত-পারসীক ক্যালিগ্রাফি আর মিনিয়েচর চিত্রের মহান ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বয়ে বেড়াচ্ছে। এর মধ্যে অনেকগুলি চিত্রের এতদিন পর্যন্ত টিকে থাকার ইতিহাসও অদ্ভুত।

আকবরের পর সম্রাট জাহাঙ্গীর মুঘল চিত্রকলা পরিণতির শীর্ষে নিয়ে যান। জাহাঙ্গীরের রক্তে বাবরের রুচি আর শালীনতা বিশেষভাবে ফুটে উঠল। নিজের দরবারের চিত্রশিল্পীদের সম্বন্ধে তাঁর নির্মল গর্ব ও অহঙ্কার উপভোগ করার মত। তাঁর আত্মজীবনীতে দেখা যায় তিনি তাঁদের সম্বন্ধে, তাঁদের কাজ সম্বন্ধে কত উৎসাহ নিতেন, খবর রাখতেন, তাঁদের কত স্নেহ করতেন। তাঁর দরবারে ইওরোপীয়রা আসতে শুরু করলেন ; সম্রাটের চিত্রশিল্প সম্বন্ধে উৎসাহের কথা তাঁদের অনেকেই লিখে গেছেন। দরবারের শিল্পীদের অনেকের প্রতিই তিনি বন্ধুর মত ব্যবহার করতেন। আবদুস সামাদের ছেলে শরীফ খাঁকে তিনি প্রথমে, যুবরাজ থাকতেই, খাঁ উপাধি দেন, পরে আমীর-উল-ওমরা করেন। রাজত্বের ত্রয়োদশ বছরে তিনি আত্মজীবনীতে লিখলেন :

"আজ আমাদের চিত্রশিল্পী আবুল হাসান, যাঁর উপাধি নাদিরুজ্জমান, আমার দরবারের একটি ছবি আমাকে

উপহার দিলেন। তিনি এটিকে জাহাঙ্গীরনামার মুখচিত্র হিসাবে লাগিয়ে এনে দিলেন। চিত্রটি সত্যই প্রশংসার যোগ্য বলে আমি তাঁকে উপঢৌকনে ভূষিত করলুম। আজ যদি আবদুল হাই আর বিহ্‌জাদ বেঁচে থাকতেন তবে তাঁরাও তাঁর চিত্ররুচির জন্য হাসানকে যথার্থ সম্মান দিতেন।

"ওঁর বাবা, আকা রীজা, আমার যুবরাজ দশায় আমার সঙ্গে সর্বদা থাকতেন, আর উনি (হাসান) আমার গৃহে জন্মান। তবে ছেলে বাপের চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। আমি তাঁর সুশিক্ষার ব্যবস্থা করি, ফলে এখনকার কালে তাঁর মত গুণবান বিশিষ্ট লোক বিরল। তাঁর আঁকা পোর্ট্রেট অতি সুন্দর।

"মনসূরও নক্‌শা বিদ্যায় ওস্তাদ। তাঁর উপাধি দিয়েছি, নাদিরুল-আস্‌লি। আমার সময়ে ত বটেই, আমার বাবার কালেও এই দু'জন শিল্পীর সমকক্ষ কেউ ছিল না।"

আবুল ফজলের তালিকায় কিন্তু আবুল হাসান বা মনসুর দু'জনের একজনেরও নাম নেই। বোধহয় আকবরের রাজত্বের-শেষের দিকে তাঁরা প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কলকাতায় মনসুরের হাতের দুটি খুব ভাল চিত্র আছে।

জাহাঙ্গীর নিজেকে খুব চিত্ররসিক মনে করতেন, ন্যায্য কারণও ছিল। একই ছবির ভিন্ন ভিন্ন অংশ আঁকার জন্য ভিন্ন ভিন্ন শিল্পী ফরমায়েস পেতেন ; তার বেশ মজার উল্লেখ তাঁর আত্মজীবনীতে পাই :

"আমি খুব ছবির ভক্ত, এবং সমস্ত শিল্পীর কাজ এত ভাল চিনি যে জীবিত বা মৃত যে কোন শিল্পীর কাজ দেখেই বলে দিতে পারি। যদি একই ছবিতে ভিন্ন ভিন্ন লোকের পোর্ট্রেট ভিন্ন ভিন্ন শিল্পীর হাতে আঁকা হয়ে থাকে, তবে তাদের প্রত্যেকের নাম বলে দিতে পারি। এমন কি যদি একটি পোর্ট্রেটের ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন লোকে এঁকে থাকে, তাও প্রত্যেকের নাম বলে দিতে পারি। বস্তুত, আমি বলে দিতে পারি কে কপাল এঁকেছেন, কে চোখের পক্ষ্ম এঁকেছেন, কিংবা ছবিটি তৈরি হবার পর কে সেটিকে ঠিকঠাক (ইংরেজিতে টাচ আপ) করে দিয়েছেন।"

যদি কারও একে বৃথা দম্ভোক্তি বলে মনে হয় তিনি শুধু মনে রাখবেন যে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সীলমোহর যে সব ছবিতে আছে সে সব ছবি আজও মুঘল ছবির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হয়।

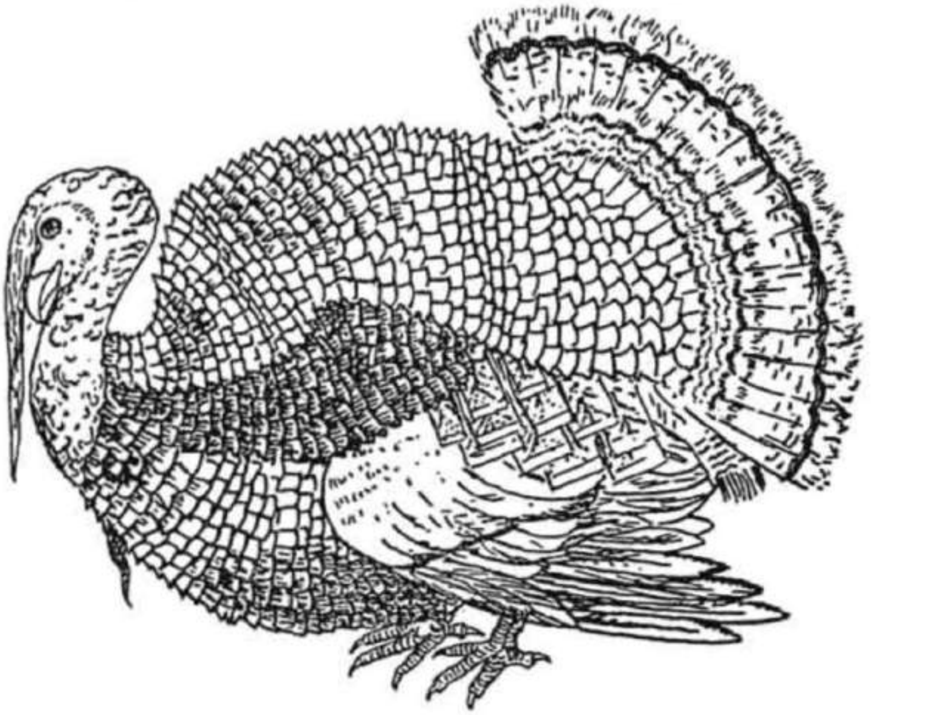
প্রথম যুগের মুঘল ছবিতে প্রকৃতির বিশদ অনুশীলন তেমন ছিল না। একবার গোয়া থেকে জাহাঙ্গীর কতকগুলি দুর্লভ জীবজন্তু উপঢৌকন পেলেন। তিনি সেগুলির ছবির হুকুম দিলেন। আত্মজীবনীতে লিখলেন : "সম্রাট বাবর তাঁর আত্মজীবনীতে কিছু জীবজন্তুর বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন, যা পড়লে তাদের রূপ চোখের সমুখে ফুটে ওঠে। কিন্তু খুব সম্ভবত তিনি কোন চিত্রশিল্পীকে দিয়ে তাদের জীবন্ত অবস্থার ছবি আঁকাননি।"

প্রকৃতির সৃষ্টি দেখে তাকে যথাযথভাবে আঁকার উপর জাহাঙ্গীর বিশেষভাবে জোর দেন। তাঁর সময়ের নক্‌শা বা ছবির নতুন পথ হল এই দিকে। তবুও এটা মনে রাখতে হবে যে 'যথাযথ' আঁকা ইওরোপীয় রীতির চোখে দেখা বা যা দেখছি তাই ফুটিয়ে তুলছি, অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলে 'ভেরিসিমিলিটিউড', তা কখনও হল না। ইংরেজিতে যাকে বলে রিপ্রেজেন্টেশন অর্থাৎ পুনঃপ্রকাশ তাই হল। কিন্তু ইওরোপীয় ছবির মূল হল মড়লিং, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, গভীরত্ব ; মুঘল ছবিতে, তথা ভারতীয় ছবিতে, গভীরত্বের উপর দৃষ্টি রইল না, রইল দৈর্ঘ্য প্রস্থের উপর, অর্থাৎ প্রোফিলের উপর, যার ফলে ছবি হত ফ্ল্যাট, চ্যাপটা। কেন যে গভীরত্বর উপর ঝোঁক ছিল না তার একটা কারণ একটু আগেই বলেছি, সে হচ্ছে আমাদের দেশের সূর্যের আলো, যা নিজের তীব্র প্রখরতায় সব গভীরত্ব গলিয়ে এক সমান স্তরে সব কিছু আনতে চায়। সেইজন্যে এক হিসাবে ভারতীয় ছবি ইমপ্রেশনিস্ট ছবি বলা যায়, অর্থাৎ শিল্পী কদাচিৎ বিষয়কে সমুখে মড়ল হিসাবে ঘন্টার পর ঘন্টা বসিয়ে রেখে আঁকতেন। রীতি ছিল খুব ভাল করে বিষয়কে নিরীক্ষণ করার পর চলে গিয়ে, চিত্রে চোখের ছাপটি ফুটিয়ে তোলা, অর্থাৎ চোখে যে ছবি রয়ে গেল, সেটি চিত্রে এঁকে দেয়া।

বাবরের আত্মজীবনী পড়লেই বোঝা যায় তিনি ছিলেন প্রকৃতি বিজ্ঞানী, ইংরেজিতে যাকে বলে ন্যাচরলিস্ট, অর্থাৎ প্রকৃতির যাবতীয় সৃষ্টি, ফুল, ফল, গাছ, লতা, পাতা, কীট, পাখি, প্রাণী সম্বন্ধে তাঁর ছিল উৎসাহ, তাদের সম্বন্ধে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সন্ধান নিয়ে লিখে রাখতেন। জাহাঙ্গীরের সময়ে উদ্ভিদ্ ও প্রাণী জগতের উপর অনেক ছবি আঁকা হল। উপরন্তু পোর্ট্রেট ত ছিলই। উদ্ভিদ্ ও প্রাণী জগৎ সম্বন্ধে জাহাঙ্গীরের উৎসাহ ও চর্চার দৃষ্টান্ত মেলে সম্রাট যে সব শিকারের চিত্র আঁকার হুকুম দিতেন তার মধ্যে। যে সব ফুল খুব কম দেখতে পাওয়া যায়, বা যে সব প্রাণী বহু কষ্ট করে দূর দেশ থেকে ধরে আনতে হয়, জাহাঙ্গীর বিশেষ ফরমায়েস দিয়ে ভাল ভাল শিল্পী দিয়ে তাদের ছবি করিয়ে রাখতেন, সে সব ছবির অনেকগুলি আছে। একটি আস্ত ছবির বই-ই গড়ে উঠল শুধু এই

ধরনের অসাধারণ পশু পক্ষীর ছবিতে। দেখলেই বোঝা যায় জাহাঙ্গীরের প্রকৃতি বিজ্ঞানী মনকে খুশি করার জন্য শিল্পীরা কত চেষ্টা করতেন। এদের মধ্যে বোধহয় সর্বশ্রেষ্ঠ ছবি হচ্ছে একটি টার্কি মোরগের। এর রঙ আর সতেজ নক্‌শা, নিখুঁত যথাযথ্য দেখলে শিল্পীর বাহাদুরি ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার না করে উপায় থাকে না। এটি বোধহয় শিল্পী মনসুরের হাতের কাজ : ছবিতে জাহাঙ্গীরের সীলমোহর আছে। জাহাঙ্গীর নিজে তাঁর রোজনামচায় ছবিটির বিষয়ে লিখেছেন। তুকিয়ৎ-ই-জাহাঙ্গীরী থেকে খানিকটা অনুবাদ করার লোভ সংবরণ করা শক্ত। জাহাঙ্গীর তখন সাত বছর হল সিংহাসনে এসেছেন। গোয়াতে মকবর খাঁকে দূত করে পাঠিয়েছিলেন, তিনি সেখান থেকে সম্রাটের জন্য কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য প্রাণী নিয়ে এলেন। জাহাঙ্গীর মহা খুশি, লিখছেন :

"ওদের মধ্যে কয়েকটি প্রাণী আমি আগে কখনও দেখিনি, খুব কৌতূহল হল। সম্রাট বাবর তাঁর আত্মজীবনীতে কিছু জীবজন্তুর বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন, যা পড়লে তাদের রূপ চোখের সমুখে ফুটে ওঠে। কিন্তু খুব সম্ভবত তিনি কোন চিত্রশিল্পীকে দিয়ে তাদের জীবন্ত অবস্থার ছবি আঁকাননি। কিন্তু আমার সমুখে যে সমস্ত প্রাণী উপনীত হল তারা এত সুন্দর আর এত দুষ্প্রাপ্য, যে আমি তাদের বর্ণনা লিখে ফেললুম আর জাহাঙ্গীরনামার জন্যে



তাদের ছবি আঁকার হুকুম দিলুম, যাতে বর্ণনা পড়ে পাঠকের যত না বিস্ময় হবে, ছবি দেখে তার চেয়ে বেশি হবে।

"ওদের মধ্যে একটি দেখতে কতকটা ময়ূরীর মত, তবে ময়ূরীর চেয়ে একটু বড়, আবার ময়ূরের চেয়ে ছোট। যখন তার সঙ্গিনীর সঙ্গে মিলতে ইচ্ছা হয়, লেজ, পালক মেলে ধরে, ময়ূরের মত নেচে নেচে বেড়ায়। ঠোঁট আর ঠ্যাং সাধারণ পোষা মুরগীর মত। কিন্তু মাথা, ঘাড়, গলার রঙ মিনিটে মিনিটে বদলায় ; কিন্তু সঙ্গিনীর সঙ্গে যখন মিলনের ইচ্ছা হয় তখন সবটা চমৎকার লাল হয়ে যায়, মনে হয় যেন সমস্তটাই একটুকরো সুন্দর প্রবাল। আবার কিছুক্ষণ পরে তুলোর মত সাদা হয়ে যায়, আবার কখনও টারকোয়ার মত নীল। এককথায় বলতে গেলে বহুরূপীর মত রঙ বদলায়। মাথায় একটুকরো মাংস ঠিক মোরগের ঝুঁটির মত দেখায়। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে মিলনের সময়ে মাংসর টুকরোটি হাতির শুঁড়ের মত এক বিঘত ঝুলঝুল করে, আবার কিছু পরে ছোট হয়ে মাথার উপর দু' আঙ্গুল সোজা খাড়া হয়ে থাকে। চোখের চতুর্দিকের রঙ সর্বদা নীল, কখনও সে রঙ বদলায়

না। কিন্তু গায়ের পালকের বেলায় উল্টো, সব সময়েই রঙ বদলাচ্ছে; এ বিষয়ে ময়ূরের থেকে তফাৎ।"

এটি টার্কি মোরগের বর্ণনা, কিন্তু, মজার কথা হচ্ছে, তুর্কী ভাষায় একে বলে 'হিন্দ তৌগী'।

আরেকটি ছবি কলকাতার মিউজিয়মে আছে। এটিও বোধহয় মনসুরের; ভারী সযত্নে, পেলব তুলিতে আঁকা। প্রাণীটি হচ্ছে বাংলা ফ্লোরিক্যান, মালদহ জেলায় এখনও মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। ১৯৪৮ সালে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় আমি একটি দেখি। ছবিটি এত মিহি কাজ যে ছাপা শক্ত। ছবিটির উপরে জাহাঙ্গীরের নিজের হাতে পারসীতে একটু লেখা আছে: "এটি জুরজ্-ই-বুর বলে একটি পাখির ছবি, তাঁর সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী ওস্তাদ মনসুরের আঁকা। লিখিত জাহাঙ্গীর আকবর শাহ, ১৯ সন (অর্থাৎ ১৬২৪ খ্রীস্টাব্দ)।"

তৃতীয় ছবি হচ্ছে একটি সারসের। পাখির ছবি হিসাবে এর স্থান শ্রেষ্ঠ জাপানী ছবির পাশে। সাদা পালকে সুচারু সূক্ষ্ম পেলব তুলির কাজ, পাখিটির শরীর সম্বন্ধে নিখুঁত জ্ঞান; অসীম ধৈর্য ও বিজ্ঞানী মন নিয়ে আঁকা; অথচ ছবিটি চিত্র হিসাবে অসামান্য রুচি ও বিচারের পরিচয় দেয়; অত খুঁটিনাটি সত্ত্বেও চোখ ক্লান্ত হয় না, সমস্তটি একটি চিত্রের ঐক্যে বাঁধা পড়ে আছে। আরেকটি ছবি আছে একটি ভেড়ার। ফুল, লতা পাতার অ্যালবামটিও সমান সুন্দর, বিচিত্র, বিস্ময়কর।

মূল ছবির চেয়েও বিস্ময়কর হচ্ছে ছবির ফ্রেম আর ছবির পাড়, যার অসামান্য সৌন্দর্য, রুচি আর বৈদগ্ধ্য দেখে স্তম্ভিত হতে হয়। ফুললতাপাতামণ্ডিত চওড়া পাড় মুঘল ক্ষুদ্রকায় ছবির রেওয়াজ বললেও হয়, কিন্তু জাহাঙ্গীরের দরবারেই এর চূড়ান্ত সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। বড় আকারে পাড়ের কাজের নমুনা তাজমহলে এবং অন্যত্র দেখা যায়, সাদা মার্বলের মধ্যে রঙীন পাথর বসানো নক্শায়। বস্তুত ছবির পাড়ের কাজ আর তাজে বা ইতিমাদদৌলায় দরজা বা খিলানের চারদিকে রঙীন পাথরের নক্শার কাজের জাত একই। কিন্তু ছবিতে কাজ স্বভাবতই আরও মোলায়েম, আরও নিখুঁত, আশ্চর্য। ফুলের গুচ্ছসুদ্ধ লতা ঘুরে ঘুরে গেছে বরফির আকারে, তাতে ছিট ছিট রঙের এক অদ্ভুত নরম সুন্দর নক্শার সৃষ্টি হয়; উপরন্তু রঙগুলি এমন যত্নে বাছা যাতে মূল ছবির রঙের সঙ্গে নিখুঁত সামঞ্জস্য থাকে। মাঝে মাঝে এসেছে প্রজাপতি, পাখি। ফল হয়েছে আশ্চর্য; একেবারে বিশুদ্ধ চিত্রকলার উৎকর্ষ, যেমন তার জমক তেমনি জৌলুস।



জাহাঙ্গীরের দরবারে আঁকা ফুলের পাড়ওলা মিনিয়েচর ছবি বোধ হয় নিছক চিত্রত্বে আশ্চর্য। এইসব পাড়ে যে সব লতা বা ফুল ফল আঁকা হত তা সবই সাধারণ, যা সচরাচর পাহাড়ে বা সমতলে দেখতে পাওয়া যায়, যেমন পপি, বুনো স্ট্রবেরি, জংকুইল, লিলি, আইরিস, মার্গরীট, কিন্তু সে সব প্রায়ই এমনভাবে চিত্রের মামুলি ছকে ফেলে আঁকা (ইংরেজিতে যাকে বলে কন্‌ভেন্‌শনালাইজ করা) যে চেনা শক্ত।

শিকারের চিত্রও অনেক। বিষয়টি মুঘল শিল্পীর বিশেষ প্রিয়। স্পষ্টই বোঝা যায় সম্রাটের আদেশে আঁকা, যাতে শিকার খেলায় সম্রাটের শক্তিমত্তার নিদর্শন থাকে। শিকারে যে সব মুহূর্ত সবচেয়ে রোমহর্ষক, জাহাঙ্গীর কখনও সে সব মুহূর্তের চিত্র রাখার লোভ সামলাতে পারতেন না। সেকালে কেশরহীন সিংহের শিকার প্রায়ই হত। সিংহ শিকারের উপর একাধিক ছবি আছে। তার মধ্যে একটি অপূর্ব। সম্রাট খুব অল্পের জন্যে বেঁচে গেছেন। কেমন করে যে রক্ষা পেলেন বলা শক্ত, কারণ ছবিতে দেখা যায়, হাতি ভয়ে পাগল হয়ে গেছে, আর তার পিঠে সিংহ চড়ে উঠে ঝুলছে, সম্রাট খালি বন্দুকটি প্রাণপণে বাড়িয়ে দিয়ে তাকে কোনও রকমে হাওদা থেকে ঠেকিয়ে রেখেছেন। অবশ্য সম্রাট প্রাণে বেঁচে যাবেন বোঝা যায়, কারণ ওদিক থেকে ততক্ষণে এক অশ্বারোহী রক্ষী বল্লম নিয়ে এগিয়ে এসেছে, কিন্তু এদিকে সম্রাটের আপন দেহরক্ষী 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম' স্মরণ রেখে

সম্রাটকে সিংহের মুখে ফেলে হীন কাপুরুষের মত হাওদা থেকে লাফ দিয়ে পালাচ্ছে। বিপদের মধ্যেও ছবিতে এমন বিদ্রূপ ফুটে উঠেছে যে স্পষ্টই মনে হয় ঘটনাটি ঘটেছিল। এই সমস্ত শিকারের চিত্রে সর্বত্রই ল্যাণ্ডস্কেপ খুব আবেগ দিয়ে আঁকা। দূরের পাহাড়, আর কাছের যে ঝোপে শিকার লুকিয়ে আছে, সবই একান্ত অনুশীলন ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টির পরিচয় দেয়। তুলনা পাওয়া ভার। আকাশের গায়ে সাঁটা তালগাছই বলুন, আর বেগ্‌নে-লাল রঙের মোচা ঝোলা, বড় বড় শাঁসে জলে পাতাওলা কলাগাছই বলুন, সোনালি চিনার, অশ্বত্থই বলুন, আর আমের কচি কচি লাল লাল পাতা সুদ্ধ ডালই বলুন ; এইসব অসংখ্য লতা, পাতা, ফুল, ফল, গাছ পাতাড়ির প্রত্যেকটিই আলাদা আলাদা করে মুঘল ছবিতে চেনা যায়।

একটি ছবির কথা না বলে পারছি না। তিনটি হাতির ছবি, তার মধ্যে একটি ক্ষেপে গিয়েছে। ছবিটিতে লেখা : "ইক্‌বাল নামে হাতির পিঠে শাজাহানের ছেলে রাজপুত্র মহম্মদ মুরাদ, ১০৩০ হিজরীতে গোলাম কর্তৃক আঁকা (খ্রীস্টীয় ১৬২১)।" ছবিটির মুখ্য চরিত্র হচ্ছে বড় হাতিটি হঠাৎ ক্ষেপে গেছে, মাহুতকে ফেলে তার অঙ্কুশটি শুঁড়ে জড়িয়ে, জোরে ডাক ছাড়ছে। রাজপুত্র পিছন থেকে তার পিঠে চড়ে উঠেছেন মাহুতের বদলে, নীচে হয় মাহুতই, না হয় ঐ রকম কেউ হাতির পা শিকল দিয়ে বাঁধছে। বড় হাতিটির উত্তেজনা অস্থিরতা যেন আশ্চর্য ফুটে উঠেছে, তেমনি ভাল হয়েছে নক্‌শার তেজ আর রীতি, আর তেমনি নিখুঁত হয়েছে পিছনের বটগাছটি আর তিনটি হাতির নক্‌শা। চিত্রকলায় জাহাঙ্গীরের আসক্তি সম্বন্ধে বাদশার দরবারে ইংলণ্ডের দূত স্যর টমাস রো'র আত্মজীবনীতে কিছু মজার ঘটনার উল্লেখ আছে। ছবি সম্বন্ধে জাহাঙ্গীরের আগ্রহের কথা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টররা জানতেন। ইতিপূর্বে তাঁরা জেম্‌স্ ও তাঁর রানী, কোম্পানির গভর্নর স্যর টমাস স্মিথের ছবি জাহাঙ্গীরকে পাঠিয়েছিলেন, জাহাঙ্গীর সেগুলি আগ্রহ করে রেখেছিলেন। সম্রাটের এইদিকে উৎসাহের খোঁজ পেয়ে স্যর টমাস রো, বিখ্যাত ইংরেজ শিল্পী আইজাক অলিভারের আঁকা তাঁর বন্ধুর একটি ক্ষুদ্রকায় ছবি বাদশাকে উপহার দেন। জাহাঙ্গীর ভারী খুশি হলেন, তবে রো'র সঙ্গে বাজি রাখলেন যে তাঁর শিল্পীরা এমন নকল করে দেবেন যে রো আসল নকল বুঝতে পারবেন না। দরবারের শিল্পীদের সম্বন্ধে রো'র অবজ্ঞা ছিল, সুতরাং তিনি উজির আসফ খাঁর সঙ্গে একটি ভাল ঘোড়া বাজি রাখলেন। রো তাঁর ডাইরিতে লিখলেন, যে আসফ খাঁ চুপি চুপি বাজি ফিরিয়ে নেন।

ইতিমধ্যে কয়েক সপ্তাহ কেটে গেছে। হঠাৎ দরবারে রো'র ডাক পড়ল। ভিতরে ভিতরে সম্রাট তাঁর শিল্পীদের শক্তি যাচিয়ে নিয়েছেন। রো'কে জিগ্‌গেস করলেন, যদি রো বাজি হারেন, তবে শিল্পীকে কি দেবেন। অবজ্ঞার সুরে রো বললেন, "কারিকরের বকশিস—পঞ্চাশ টাকা।" জাহাঙ্গীর বললেন, "বড্ড কম', তাঁর শিল্পী যে সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক।

যখন পাঁচটি নকল আসলটির সঙ্গে এনে, পাশাপাশি একই টেবিলে পাতা হল, তখন রো ফাঁপরে পড়লেন। ডাইরিতে লিখলেন, "বাতি নিয়ে খুব নিবিষ্ট মনে দেখলুম, আসলটা বার করতে পারি কিনা। আরেকটু হলে নির্ঘাত হারতুম, কিন্তু বরাতক্রমে আসলটি চিনতে পারলুম। তবে খুব সন্ধানী চোখ ভিন্ন চেনা শক্ত, সাধারণ লোকে পারত না। এটা ঠিক যে প্রথমে দেখে আমি ধরতে পারিনি, তাতে সম্রাট আনন্দে আটখানা ; সে কি হাসি আর ঠাট্টা, ঠিক যেন আমাদের দেশের কোন লোক।"

জাহাঙ্গীর মহানন্দে রো'র কাছে আবদার ধরলেন, শিল্পীকে কি দেবে এখন বল ! টাকা পয়সা চলল না, শেষে ঠিক হল যে রো একটি নকল রাখবেন, পরিবর্তে শিল্পী রো'র একটি বিলেতী "পুতুল" পাবেন। (রো নিজের দেশের পুতুল সঙ্গে এনেছিলেন)। শিল্পী মনোহরের আঁকা বাদশার একটি পোর্ট্রেট জাহাঙ্গীর রো'কে উপহার দেন। ছবিটি 'পারচাস পিল্‌গ্রিমেজ' বইটির ১৬২৫ সালের সংস্করণে একটি কাঠখোদাই করে ছাপা হয়। আসল ছবিটি লুপ্ত হয়েছে। মনোহরের কথা পরে একটু বল্‌ব।

শাজাহানের সময়ে (১৬২৭-৫৮) মুঘল চিত্রকলা যে পরিণতির চরমে ওঠে একথা সকলেই স্বীকার করেন। তাঁর সময়ে দেশময় শান্তি ছিল, দরবারেও জাঁকজমক ছিল সবচেয়ে বেশি। ফলে আগেকার শিল্পীরা যেখানে যুদ্ধ বিগ্রহের ছবি আঁকতে ভালবাসতেন সেখানে শাজাহানের দরবারের শিল্পীরা আঁকলেন দরবারের গৌরব আর জাঁকজমকের দৃশ্য। প্রথম দিকের রঙের উদ্ধত তীব্রতা ও উচ্ছ্বাস কমে গিয়ে এল সুকুমার মনোরম রীতি, চিত্র নির্মাণের কাজেও এল সমধিক কৃতিত্ব। পোর্ট্রেটে আর জন্তু-জানোয়ারের ছবিতে খুব কৌশলে তুলির সামান্য

কয়েকটি সূক্ষ্ম পেলব টানে রঙের সামান্য গাঢ়-ফিকেতে চিত্রশিল্পী অভূতপূর্ব সাফল্যলাভ করলেন। হল কি একদিকে যেমন প্রাচ্যরীতিসুলভ রেখার বলিষ্ঠতা ও প্রাণবন্তুতা বজায় রইল, অন্যদিকে রঙের টানের বাহাদুরিতে এল ওজন, ঘনত্ব, মড়লিং-এর গুণ, নিটোল পরিপূর্ণতার আভাস। অথচ রঙের ব্যবহার এমন সংযত হল যে কোথাও রেখাকে ব্যাহত করল না। শাজাহানের রাজত্বকালে চিত্রের বিষয়ে যেমন বৈচিত্র্য এল, তেমনি শিল্পীর সংখ্যাও বেড়ে গেল। তার মধ্যে কয়েকজনের কাজ খুবই প্রশংসার যোগ্য : চিতরমন ওরফে কল্যাণদাস ; অনুপছতর ; রায় অনুপ (বোধ হয় একই ব্যক্তি), যুবরাজ দারা শিকোর দরবারের শিল্পী ; মনোহর ; মহম্মদ নাদির সমরকন্দী ; মীর হাশিম ; মহম্মদ ফকিরুল্লা খাঁ।

ব্রিটিশ মিউজিয়মে যতগুলি অমূল্য অ্যালবাম আছে তার মধ্যে একটি পুঁথির নম্বর হচ্ছে এ-ডি-ডি ১৮৮০১। বইটিতে একটি উৎসর্গ আছে, তার তারিখ হিজরী ১০৭২ (১৬৬১-২ খ্রীস্টাব্দ), সুতরাং তৈরি হয় শাজাহানের সময়ে। ১৭৭৭ সালে ইংলণ্ডের বিখ্যাত শিল্পী স্যর জশুয়া রেনল্ড্স্ পুঁথিটি দেখে এই ছয়খানি ছবির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন :

১। ২০নং ছবি। শাজাহানের একজন কর্মচারীর পেন্সিল স্কেচ। শিল্পীর নাম চিতরমন, অন্য নাম কল্যাণ দাস।

২। ২১নং ছবি। আজম খাঁ কোকার পেন্সিল স্কেচ। শিল্পীর নাম মহম্মদ নাদির সমরকন্দী।

৩। ২৭ নং ছবি। আসফ খাঁয়ের পেন্সিল স্কেচ। শিল্পী অজ্ঞাত।

৪। ২৮ নং ছবি। শাজাহান দরবার করছেন, চারিদিকে পাত্র মিত্র, অমাত্য, প্রত্যেকের নাম লেখা আছে। বড় সাইজের স্কেচ। শিল্পী অজ্ঞাত। দাম লেখা আছে ২০০ ; সেকালের ২৫ পাউণ্ডের চেয়েও বেশি।

৫। ৩০ নং ছবি। হাকিম মসিউজ্জমানের মাথার স্কেচ। হাকিম আকবরের সময়ে বেঁচে ছিলেন। শিল্পীর নাম মীর হাশিম। ছবিটি অতি সুন্দর কাজ।

৬। তিনটি পোর্ট্রেট। প্রধান ছবিটি হচ্ছে শের মহম্মদ নওয়ালের স্কেচ। শিল্পীর নাম মহম্মদ নাদির সমরকন্দী। দুটি ছোট রঙীন মিনিয়েচর, একটি জাহাঙ্গীরের, অন্যটি শাজাহানের, একই শিল্পীর আঁকা।

আরেকটি ছবি আছে। মীর্জা নৌজরের ছোট্ট মাথা ; ভারী সূক্ষ্ম কাজ। মীর্জা শাজাহানের দরবারে সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। শিল্পীর নাম মীর হাশিম। এটিও স্যর জশুয়া রেনল্ড্সের বাছাই করা ছবির সঙ্গে রাখা চলে।

কতকগুলি জন্তু-জানোয়ারের ছবিও খুব সুন্দর। জন্সন্ কলেক্শন বলে একটি বিখ্যাত সংগ্রহ আছে। তাতে শিল্পী মনোহরের আঁকা দারা শিকোর শখের শিকারী ঘোড়া দিল্‌পসন্দের একটি পোর্ট্রেট আছে। দেখে জীবন্ত বলে ভ্রম হয়। আরেকটি বেশ বড় আকারের ছবিও আছে, দারা শিকো অন্য একটি ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে বসে আছেন। এটি বেশ বড় ছবি, ১১ ইঞ্চি লম্বা ৯ ইঞ্চি চওড়া। এই সংগ্রহেই একটি ছোট্ট বেড়াল আছে ; অপূর্ব। এটিই যে একমাত্র বেড়াল তা নয়, আরও আছে। ব্রিটিশ মিউজিয়মে রাজ লাইব্রেরিতে একটি ছবিতে সম্রাট ফররুখশিয়ারের পায়ের তলায় একটি বেড়াল আছে।

শাজাহানের সময়ে চিত্রশিল্পে অসামান্য সৌন্দর্য ও অভূতপূর্ব দক্ষতা এলেও চিত্রাঙ্কনের বলিষ্ঠতা কমে গেল। সূর্য মাথার ঠিক উপরে পৌঁছল বটে কিন্তু পশ্চিম দিকে ঢলতে শুরু করল। শাজাহানের রাজত্বে স্থাপত্যে অসাধ্য সাধন হল, কিন্তু চিত্রকলার ক্ষয় শুরু হল। এ যেন ছবির যুগ সারা হয়ে স্থাপত্যের যুগ শুরু হল। অনেক ছবি আঁকা হল বটে কিন্তু ক্রমশ চিত্রজগতে অবনতি এল।

শাজাহানের বড় ছেলে দারা শিকো ছিলেন চিত্ররসিক, বড় সমঝদার। ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে দারা সিন্ধুর মরুভূমিতে পালান, সেখানে বিশ্বাসঘাতকের হাতে প্রাণ হারান। ট্যাভার্নিয়ের লিখছেন : "(সেখানে) এক চরের মুখে তাঁর সবচেয়ে প্রিয়তমা স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদ পেলেন। এই স্ত্রী সব ভাগ্যবিপর্যয়ের ক্লেশ সহ্য করে বরাবর তাঁর সঙ্গে ছিলেন। কেমন করে অসম্ভব তাপ ও তৃষ্ণা সহ্য করতে না পেরে, একবিন্দু জলও মুখে না দিয়ে তিনি মারা যান, দারা যখন সে কাহিনী শুনলেন তখন তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।"

এই দুঃখের কাহিনীর স্মৃতি বয়ে বেড়াচ্ছে একটি সুন্দর ছোট্ট অ্যালবাম। এটি এখন লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিসের লাইব্রেরিতে। সমুখের সূক্ষ্ম কাজ করা মুখপত্রের একধারে সোনালি জমির উপরে যুবরাজ দারার স্বহস্তে লেখা উৎসর্গ আছে :

"সম্রাট শাজাহানের পুত্র যুবরাজ মহম্মদ দারা কর্তৃক তাঁর একান্ত আত্মীয়া ও প্রিয়তমা বন্ধু যুবরানী নাদিরা বেগমকে এই অ্যালবামটি ১৫০১ হিজরীতে (১৬৪১-২ খ্রীস্টাব্দে) উপহার প্রদত্ত হইয়াছিল।"

শাজাহানের মৃত্যুর পর ঔরঙ্গজেবের সময়ে মুঘল চিত্রশিল্পের দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। ঔরঙ্গজেবের গোঁড়া স্বভাবের কাছে চিত্রকলা নিশ্চয়ই বেশি প্রশ্রয় পেত না। অবশ্য পাত্র মিত্র অমাত্যদের মধ্যে চিত্রকলার যথেষ্ট আদর ছিল, কিন্তু রাজানুগ্রহের অভাবে সবই ম্লান হয়ে গেল। বার্ণিয়ার কোলবার্টকে ১৬৬৯ সালে যখন চিঠি লেখেন, তখন সম্রাট ঔরঙ্গজেব মাত্র বছর এগারো সিংহাসনে এসেছেন, কিন্তু ইতিমধ্যেই চিত্রশিল্পীরা সম্রাট আকবর, জাহাঙ্গীর বা শাজাহানের সময়ে যে কদর পেতেন তার অনেক কম মর্যাদা পেতে লাগলেন। তীক্ষ্ণধী বার্ণিয়ারের কথা অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। তিনি চিত্রশিল্পী ও তাঁদের পৃষ্ঠপোষক অথবা হুকুমের মনিবদের মধ্যে কি সম্বন্ধ ছিল তার এইভাবে বর্ণনা করেন :

"ফলে সত্যিই কি বিস্ময়ের কিছু আছে যে এই ধরনের (দীনহীন) অবস্থায় এখানে চারুশিল্পের কেন উন্নতি নেই, যা হতে পারত যদি শাসনযন্ত্র আরও ভাল হত, যেমন হয় ফ্রান্সে ? যেখানে লোকজন এত অসম্ভব গরীব, অথবা ধনী হলেও এত গরীবিয়ানা চালে থাকে ; যারা সৌন্দর্য বা গুণাগুণের বিচার না করে শুধু সস্তা খোঁজে ; যে দেশের অতিবিত্তশালী সম্ভ্রান্ত লোকরা সদাই ন্যায্যমূল্যের বহু কম দিতে ব্যস্ত ; কিংবা নিজের খেয়ালখুশি মত দাম দিয়েই রেহাই পায় ; যারা গরীব প্রার্থী শিল্পীকে কোড়া দিয়ে মারতে দ্বিধা করে না ; (যে লম্বা ও ভীষণদর্শন কোড়া সাধারণ ওমরাদের সদর দরজায় ঝোলান থাকে) সেখানে কোনও শিল্পী কি করে মন দিয়ে কাজ করবে ? কোনও দিনও ভাগ্যে উপযুক্ত সম্মান জুটবে না, এটুকু যদি কোনও শিল্পী বুঝতে পারে তবে তার কি নিজের কাজে আগ্রহ ঘুচে যাবে না ? গৃহে বা প্রাসাদে যদি শিল্পীদের মাহিনা করার রীতি প্রাচ্যে না থাকত, যারা বাড়িতে কাজ করবে, ছেলে পড়াবে, এবং ছিটেফোঁটা অনুগ্রহের আশায় অথবা কোড়ার ভয়ে কাজ করবে, তাহলে এ দেশের শিল্প থেকে সৌন্দর্য আর সূক্ষ্ম কাজ বহুদিন আগে লুপ্ত হত। অনেক বড় বড় লোকরা ধনী বণিকদের রক্ষা করেন, যারা ওরই মধ্যে শিল্পীদের একটু বেশি মাহিনা দেয়। 'ওরই মধ্যে একটু বেশি' বললুম, তার কারণ ভাল চমৎকার কাজ দেখে একথা মনে করার কোন দরকার নেই যে শিল্পী সম্মান পান, অথবা তিনি স্বাধীন ভাবে কাজ করতে পারেন। এটা নির্ঘাত কথা যে শিল্পী শুধু মুগুরের গুঁতোর ভয়েই কাজ করেন।"

আরেক জায়গায় বার্ণিয়ার বড় বড় লোকের বাড়িতে শিল্পীরা কি রকম ভাবে কাজ করেন, তার বর্ণনা করছেন :

"একটি ঘরে হয়ত ছুঁচের কাজ চলছে, একজন তদারক করে যাচ্ছেন, আরেক ঘরে হয়ত সোনারূপোর কাজ, তৃতীয় ঘরে চিত্রশিল্পীরা ইত্যাদি।"

বার্ণিয়ার হয়ত কারুশিল্পীদের হীন অবস্থা সম্বন্ধেই বিশেষ করে লিখেছেন, কিন্তু চিত্র ও অন্যান্য চারুশিল্পীদের সম্বন্ধেও তাঁর উক্তি নিশ্চয় খানিকটা খাটে। সব ওমরাই যে বিলক্ষণ শিক্ষিত ছিলেন তা নয়, আর কোনও মদমত্ত ওমরা একদিকে পুঁথির মিনিয়েচর শিল্পী, অন্যদিকে সুনিপুণ দপ্তরির মধ্যে যে খুব ভেদজ্ঞান করতেন তাও মনে হয় না।

ঔরঙ্গজেবের পর তাঁর বংশধরদের রাজত্বে মুঘল চিত্ররীতির পরিণতি সম্বন্ধে পরে আলোচনা করব। এখন শুধু এইটুকু উল্লেখ করা দরকার যে ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্য জয় করার ফলে মুঘল চিত্রনীতি দাক্ষিণাত্যে গেল। দক্ষিণে গিয়ে মুঘল ছবি কতকগুলি বৈশিষ্ট্য অর্জন করে, ফলে সেই পরিবর্তিত চিত্রঐতিহ্যের নাম হয় দক্ষিণী বা দাক্ষিণাত্য কলম। তখনকার দিনে ভারতের যেটুকুকে হিন্দুস্থান বলত, অর্থাৎ উত্তর ভারত, তার বাইরে একমাত্র দাক্ষিণাত্য কলমেই মুঘল রীতির ধারা প্রসারিত হয়। এই কলম ছাড়া দক্ষিণ ভারতের মুঘল চিত্রনীতির প্রভাব আর কোথাও বিশেষ দেখা যায় না।

মুঘল চিত্রের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনার আগে তাহলে আরেকবার বিখ্যাত বিখ্যাত চিত্রশিল্পীর নাম ঝালিয়ে নেওয়া যাক। তৈমুরিদ রীতির শিল্পী সুলতান মহম্মদের নাম আগেই করেছি। তিনি বিহ্জাদের সাকরেদি করেন। তাঁর হাতের একটি ছবি কলকাতায় আছে। ভারতে মুঘল প্রতিকৃতি চিত্রের প্রাচীন বিবরণ যা পাওয়া যায় তাতে দেখি অধিকাংশ বড় বড় শিল্পীই ছিলেন হিন্দু, যেমন ভগবতী ও হুনার। ষোল শতকে যে সব শিল্পী প্রথম নাম করেন ভগবতী তাঁদের মধ্যে একজন। হুনার কিছু পরে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। চিত্রশিল্পীর বংশে তাঁদের জন্ম, অথবা মুঘল সম্রাটের অনুগ্রহে তাঁরা চিত্রবিদ্যা অধিগত করে খ্যাতিলাভ করেন, ঠিক জানা নেই। ভগবতী প্রায় পুরো পারসীক রীতিতে আঁকতেন, এমন কি লোকে বলে হিন্দু হয়েও তিনি যেন বিদেশী রীতির পায়ে দাসখৎ

লিখে দিয়েছিলেন। অন্যপক্ষে হুনার ছিলেন রাজপুত রীতির শিল্পী। বস্তুত, হুনারের ছবি রীতিতে, আবেগে এতই ভারতীয় যে মনে হয় তাঁর শিরায় নিশ্চয় শিল্পীর বংশের রক্ত ছিল, শুধু কার্যবিপাকে তিনি মুঘল রীতিতে আঁকতে শুরু করেন। জাহাঙ্গীরের সময়ে বিখ্যাত হিন্দু শিল্পী ছিলেন বসাওঅনের ছেলে মনোহর।

এইসব নজিরের জোরে, আগে যা বলেছি, তার প্রমাণ আরও দৃঢ় হয় যে মুঘল প্রতিকৃতির রীতি হিন্দু ও পারসীক নীতির মিশ্রণের ফল, আর তার চলন হয় ষোল শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে। তারপর থেকে মুঘল দরবারের কৃপায় এত দ্রুত বিকাশ হয়। আকবর বাদশা পোর্ট্রেটের কি রকম ভক্ত ছিলেন বলেছি, জাহাঙ্গীর ও স্যর টমাস রো'র কথাও বলেছি। বিদেশীদের মধ্যে শুধু বার্ণিয়ারই এদেশের শিল্পীদের পোর্ট্রেট আঁকার ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। আইন-ই-আকবরীতে আবুল ফজলের করা বিখ্যাত চিত্রশিল্পীদের তালিকা আগেই দিয়েছি। আকবরের রাজত্বের শেষ দিকে, অনুমান ১৬০০ খ্রীস্টাব্দে, বাবরের জীবনী, বা ভকিয়ত-ই-বাবরী বলে পুঁথিটি তৈরি হয়। একা এই পুঁথিতেই বাইশজন বিখ্যাত শিল্পীর ছবি আছে, আরও দু'-একজনের ছবি থাকতেও পারে। যতগুলি তালিকা পাওয়া যায় তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে যে তাদের অধিকাংশই হিন্দু নাম। যথা, ভকিয়ত-ই-বাবরীর বাইশটি নামের মধ্যে উনিশটি হিন্দু, মাত্র তিনটি মুসলমান। তেমনি আবুল ফজলের তালিকায় সতেরোটি নামের মধ্যে তেরোটি হিন্দু। চারজন মুসলমান শিল্পীর নাম হচ্ছে (১) মীর সয়ীদ আলি, হাম্‌জানামার জন্যে যিনি ছবি আঁকেন, (২) খাজা আবদুস সামাদ, (৩) ফররুখ কলমাক, আর (৪) মিশকিন। ফররুখ উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। আকবরনামার অনেক ছবি তিনি আঁকেন, তাছাড়া তিনটি দৃশ্য সম্বলিত তাঁর একটি বিখ্যাত ছবি আছে। মিশকিন আর ওস্তাদ মিশকিন বোধহয় একই ব্যক্তি, এঁর আঁকা দুটি স্কেচ আছে, উত্তম মেষপালক বলে একটি ছবিও তিনি আঁকেন, তাছাড়া এক ভদ্রমহিলার ছবিও আঁকেন। সব কটিই মুঘল রীতির প্রথম যুগের ছবি।

আবুল ফজলের তালিকার তেরোটি হিন্দু নাম হচ্ছে (৫) দশ্যন্ত্‌; (৬) বসাওঅন; (৭) কেশু (কেশব); (৮) লাল; (৯) মুকুন্দ; (১০) মাধো; (১১) জগন (জগন্নাথ); (১২) মহেশ; (১৩) খেমকরণ; (১৪) তারা; (১৫) সন্‌ওলান; (১৬) হরিবাস; (১৭) রাম। হরিবাসের আঁকা ছবি এখনও পাওয়া যায়নি। দু'জন মাধো ছিলেন, একজন বড় (কলন), একজন ছোট (খুর্দ)। কেশু এবং আরও দু'-একজন বোধহয় একাধিক ছিলেন। আবুল ফজল বোধহয় ওদের মধ্যে বড়দেরই নাম করেছেন। রজ্‌ম্‌নামায় আটাশজন শিল্পীর নাম পাওয়া যায়, তার মধ্যে কুড়ি কি একুশটি নাম হিন্দুর।

দশ্যন্তের কাহিনী আবুল ফজল থেকে আগেই তুলে দিয়েছি। জয়পুরের রজ্‌ম্‌নামায় তাঁর ছবি আছে। রেখা বা নক্‌শা তাঁর হাতের; রঙ করেন বড় মাধো আর কাহ্না (কাহ্নাই)। বিষয়গুলি মহাভারতের, পারসীক রীতিতে চিত্রিত, কিন্তু তফাৎ আছে। প্রধান চরিত্রগুলির মুখাবয়ব, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, শরীরের গড়ন ভারতীয়; এমন কি গৌণ চরিত্রের প্রতিকৃতিও তাই, যদিও সেগুলিতে পারসীক চিত্রসুলভ ট্যাবটেবে গাল এসেছে, কিন্তু পারসীক ছবিতে দেহগুলি যেমন লম্বা করে দেওয়া হয়, এতে অত লম্বা করা নয়। রঙও অনেক নরম, পারসীক ছবির অত তীব্রতা নেই। দেবতাদের দেহের রঙ কিন্তু জ্বলজ্বলে নীল। বসাওঅনের একটি ছবি রজ্‌ম্‌নামায় আছে। উপাখ্যানটি হচ্ছে এক রাজা ব্যাঙরাজার মেয়েকে বিয়ে করেন। বিয়ের পর কনে ভাল ভাল বসন ভূষণ ছেড়ে, ব্যাঙ হয়ে গেলেন। বর রেগে অস্থির হয়ে ঠিক করলেন, সব ব্যাঙ মেরে শেষ করবেন, ফলে বধূ ফিরে আসতে বাধ্য হলেন। ছবিটির মুখ্য রঙ হচ্ছে নানা পর্দার সবুজ। পাখি, ব্যাঙ, গাছ, ফুল সবই খুব সূক্ষ্ম, সুকুমার রেখায় আঁকা, রঙও খুব নরম ও পেলব। কিন্তু লেখার বড় বড় অংশ ছবির মধ্যে ঢুকে গিয়ে ছবির চেহারাটা কিছুটা নষ্ট করে দিয়েছে। পারস্পেক্‌টিভের রীতি প্রাচীন ভাস্কর্যের বেস-রিলিফের রীতিতে। যদি মনে করা যায় ছবিতে যা কিছু আছে, অর্থাৎ মানুষ, জীবজন্তু, গাছপালা, সবই তলায় কব্জা দিয়ে আঁটা, আর তাদের প্রত্যেককে ধরে ধরে কব্জার উপর ঘুরিয়ে পায়ের উপর দাঁড় করানো যাবে, তাহলে প্রত্যেক জিনিসই তখন যথাস্থানে দাঁড়িয়ে যাবে। চিত্রকর সব জিনিসই মনে মনে দাঁড়ানো অবস্থায় কল্পনা করে নিয়েছিলেন, কিন্তু আঁকার বেলায় এমনভাবে আঁকলেন যেন সবাই কাত হয়ে পড়ে আছে। সমস্ত ছবিটি যেন উপরে, শূন্যে কোন জায়গা থেকে দেখে আঁকা, সব জিনিসের উপরই যেন সমানভাবে প্রখর আলো পড়েছে, সে আলো আবার কোনও বিশেষ দিক থেকে আসছে না। ফলে ছবিতে কোন ছায়া নেই, কোন ছায়াতপ বা রঙের গাঢ়-ফিকে করাও নেই। বড় গাছের পিছনে এক সোনালি পোঁচড় টেনে কড়া সূর্যের আলো বোঝানো হয়েছে। নক্‌শা বসাওঅনের, রঙ ভবানীর। এ ছবিটিতে অন্তত

দশ্যন্তের চেয়ে বসাওঅনের হাত ভাল বলে মনে হয়।

দুইজন কেশুই (কেশব), দশ্যন্তের মত, জাতে কাহার বা পাল্‌কি-বেহারা ছিলেন। বড় কেশু অর্থাৎ কেশব দাস কয়েকটি ছবির একটি অ্যালবাম আকবরকে ১৫৮৮ খ্রীস্টাব্দে উৎসর্গ করেন। এর মধ্যে খ্রীস্টিয়ান বিষয়ক ছবির কিছু কপি ও অনুকরণ আছে।

জাহাঙ্গীরের শিল্পী মনসুরের কথা আগেই বলেছি। জাহাঙ্গীরের দরবারে আরেকজন শিল্পী ছিলেন, তাঁর নাম নাহ্না। তাঁর আঁকা একটি বিখ্যাত পোর্ট্রেট আছে। ছবিটিতে জাহাঙ্গীরের সীলমোহর আর সম্ভবত তাঁরই হাতে লেখা আছে: "অমরসিংহের পুত্র সূরজমলের ছবি, শিল্পী নাহ্না।" ছবিটি একটি রত্ন। যেমন বিশিষ্ট সুশিক্ষিত নক্‌শা, দৃঢ় হাতে চরিত্র ফুটিয়ে তোলা, তেমনি রঙের অপূর্ব আভাস, আবেগ, যার ফলে পুরুষ দেহে অপরূপ অসামান্যতা ফুটে উঠেছে। হোলবাইনের মত যেমন নক্‌শার হাত, তেমনি হোলবাইনের মত শিল্পী ছায়া বাদ দিয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও অসামান্য নৈপুণ্যে সূক্ষ্ম মড়লিং এনেছেন, নক্‌শায় এনেছেন জোর, যার ফলে ছবিতে এসেছে ওজন, ঘনত্ব, গভীরত্ব, পরিপূর্ণতা। প্রত্যেকটি অবয়ব ফুটে উঠেছে। তেমনি সুন্দর ছবির পাড়। প্রথমে দুটি সরু পাড়, তাদের মধ্যে একটি পারসী কবিতা ছোট ছোট খোপে আঁকা, চারদিকে ফুলের নক্‌শা। তাদের চারদিকে মোটা চওড়া পাড়ে অপূর্ব ডায়মণ্ড কাটা ফুলের নক্‌শা; ঠিক তাজমহলে শ্বেত পাথরের উপর রঙীন পাথরের নক্‌শার মত। যিনি ছবি আঁকতেন আর যিনি পাড় আঁকতেন তাঁরা সাধারণত দু'জন আলাদা শিল্পী হতেন। কিন্তু তবুও ছবির সঙ্গে পাড়ের সর্বদাই অপূর্ব সামঞ্জস্য থাকত। এই ছবিটির শিল্পীর নাম নাহ্না ৮ এঁর নাম জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনীতে নেই, তবুও ইনি নিশ্চয় প্রথম দরের শিল্পী ছিলেন।

দারা শিকো আর শাজাহানের সময়ের শিল্পীদের নাম অল্প আগেই করেছি।

মুঘল চিত্রের বিষয়বৈচিত্র্য কত ছিল তার কিছুটা আন্দাজ দিয়েছি। তবে এ সম্বন্ধে আরেকটু আলোচনা বোধ হয় ক্লান্তিকর হবে না। এটা ঠিক, মুঘল চিত্রকলা এত তাড়াতাড়ি যে শ্রেষ্ঠত্বের চূড়ায় ওঠে তার একটা কারণ রাজানুগ্রহ। আকবরের কঠোর সমালোচক ছিলেন বদাওঅনি, তাঁর মতে বাদশার পাত্র মিত্র অমাত্যরা যে সকলে খুব চিত্রকলার ভক্ত ছিলেন তা নয়, তবে "যখন যেমন তখন তেমন" নীতির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে, যেহেতু বাদশা ছবি ভালবাসেন অতএব যে যেমন পারলেন চিত্রকলায় নিজ নিজ রুচি ও ঐশ্বর্য দেখাবার প্রয়াসে উঠে পড়ে লেগে গেলেন। ফলে চিত্রিত পুঁথি বাড়িতে রাখা একটা রেওয়াজ হয়ে গেল, চিত্রশিল্পীরাও কাজ পেয়ে উৎসাহিত হলেন। কাজের সঙ্গে সঙ্গে চিত্রের উন্নতি হল, অতএব রুচিরও হল। দামও উঠতে লাগল খুব। একটু আগে একটি ছবির হিসাব দিয়েছি; স্যর জশুয়া রেনল্‌ড্‌স্ ছবিটির খুব তারিফ করেন; বিষয়, সম্রাট শাজাহান দরবার করছেন। এর মূল্য ধরা ছিল তখনকার দিনে ২০০্ টাকা, অর্থাৎ তখনকার হিসাবে অন্তত ২৫ পাউণ্ড। লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিসের গ্রন্থাগারে জন্‌সন্ সংগ্রহে (রিচার্ড জন্‌সন্ ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংসের মহাজন) ঔরঙ্গজেবের সময়ের ওমরা সায়েস্তা খাঁয়ের একটি ছবি আছে, তার দাম ১৭০্ টাকা। আরেকটি খণ্ডে কয়েকটি মোটামুটি মামুলি ছোট প্রতিকৃতি আছে, তাদেরও এক একটির দাম ২৫্ টাকা।

পুঁথির চিত্র ভারত-পারসীক চিত্রকলার একটি অঙ্গ মাত্র। তাও যে প্রধান বা সবচেয়ে ভাল অঙ্গ ছিল বলা যায় না। ভারতীয় নক্‌শাবিদ বা রঙের চিত্রকররা সবচেয়ে সাফল্য লাভ করেন নানা আকারের আলাদা আলাদা ছবিতে। এগুলি প্রায় একসঙ্গে একটি অ্যালবামে বাঁধানো থাকত। একটি অ্যালবাম যেমন দারা শিকো তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রীকে দেন। ব্রিটিশ মিউজিয়মে এইরকম অনেক অ্যালবাম আছে। তার মধ্যে কয়েকটি শুধু ইতিহাসের বিখ্যাত বিখ্যাত লোকের প্রতিকৃতির অ্যালবাম; এগুলির ঐতিহাসিক মূল্য খুব বেশি, এই রকম একটি অ্যালবাম হাফিজ রহমতের নামে প্রসিদ্ধ। আর দিল্লীর দরবারে যা রেওয়াজ একবার হল, সে ফ্যাশন ছোট বড় সব দরবারেই ছড়িয়ে পড়ল। এমন কি আঠারো শতকে ইংরেজ 'নবাব'রাও এই রোগের হাত থেকে নিস্তার পেলেন না। তাঁরা লক্ষ্ণৌএ, পাটনায়, আরও অন্যান্য জায়গায় একদিকে যেমন চিত্রশিল্পীদের দিয়ে নিজেদের ছবি আঁকাতে শুরু করলেন, অন্যদিকে তেমনি পুরনো চিত্র সংগ্রহে মেতে গেলেন, এবং যোগাড়যন্ত্র, লুটপাট করে দেশে পাঠালেন। তবে এইসব অ্যালবামে একটা বড় জিনিস প্রমাণ হয়। মুঘল চিত্র আখ্যানধর্মী না হয়ে ক্রমেই বিশুদ্ধ চিত্রধর্মী হয়ে পড়ল। এক একটি ছবি নিজের চৌহদ্দির মধ্যে থেকে, স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে, চিত্র বিচারে সাজন ও চিত্রত্বের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার দিকে মন দিল। আখ্যান বা গল্পের লাঠি ভর করে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটা ছেড়ে দিল। চিত্রবহির্ভূত সাহিত্যিক প্রসাদরূপ ঠেকনো বা খুঁটির উপর নির্ভর করল না। এমন কি রাজপুত রাগমালা

ইত্যাদির মত চিত্রমালাও হল না। ফলে এইদিক থেকে ভারত-পারসীক বা মুঘল চিত্রের মূল্য আধুনিক ভারতীয় শিল্পীর কাছে রাজস্থানী বা পাহাড়ী চিত্রের মূল্যের চেয়ে বেশি হতে বাধ্য।

মুঘল ছবিতে যখন সাজন এবং অলঙ্কারই হল মূল অম্বিষ্ট, তখন আবশ্যিকভাবেই বিষয়াবলম্বনের বৈচিত্র্য এল খুব, যাকে অবলম্বন করে চিত্রের বিভিন্ন গুণ, নৈপুণ্য ও প্রসাদপরীক্ষার তাগিদ এল। নানাধরনের জন্তু জানোয়ারের প্রতিকৃতির কথা আগেই বলেছি। চতুষ্পদ আর পাখির ছবি বিস্তর। আকবরনামার দুটি বিখ্যাত শিকারের চিত্র মনসুরের কাজ। মনসুর সবচেয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেন চতুষ্পদ আর পাখি এঁকে। ভিক্টোরিয়া অ্যাণ্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়মে সংগ্রহে তিনটি ছবি আছে, একটি বড় ফেজেন্ট, একটি টার্কি মোরগ, আর একটি নীলকণ্ঠ বারবেট। কলকাতায় মনসুরের আঁকা একটি অপূর্ব সারস আছে, আগেই বলেছি। শাজাহানের রাজত্বে আঁকা পশু পক্ষী চিত্রের কথা উল্লেখ করেছি। নিখুঁতভাবে আঁকা হাতির ছবিও বহু আছে। একটি ছবির উল্লেখ ইতিমধ্যেই করেছি। হাতি ভারতের বৈশিষ্ট্য, সেই হিসাবে ভারতীয় ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী এই বিরাট জন্তুটি সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন ; এর স্বভাব, রীতি, রূপ তাঁরা খুব ভাল জানতেন, এঁকেছেনও অসংখ্য বিচিত্র ভঙ্গিতে। জন্সন্ সংগ্রহের ৬৭তম খণ্ড প্রায় গোটাটাই হাতির ছবিতে ভর্তি, তার মধ্যে কয়েকটি অতুলনীয়। জাহাঙ্গীরের শিল্পী আবুল হাসান ওরফে নাদিরুজ্জমানের আঁকা একটি আশ্চর্য হাতি আছে। ৬৭তম খণ্ডে ১৫নং ছবিটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রাসাদের আঙ্গিনার দৃশ্যে প্রধান চরিত্র হচ্ছে একটি বিরাট জমকালো হাতি, সঙ্গে আরও হাতি, একটি ষাঁড়, অন্যান্য জন্তু। নক্শাটি ছাই রঙে আঁকা, শুধু অল্প ব্রাউন ঘেঁষা সেপিয়ার আমেজ, আর কোন রঙ নেই, শুধু হাতির সোনার জলের সাজে আছে হলুদে।

চতুষ্পদের ছবির মতই সুন্দর পাখির ছবি, সেগুলির কাজ আরও সূক্ষ্ম, আরও পেলব, রঙের বাহারও অপূর্ব। দারা শিকোর অ্যালবামে তিনটি অপূর্ব রঙীন পাখি আছে সম্ভবত মনসুরের তুলির। একটি ছবি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সারস জাতের লম্বা ঠ্যাঙওলা ব্রাউন পাখি, জলের পাশে দাঁড়িয়ে, জমিতে ঘাস, ফুল, বাঁশ ; পারস্পেক্টিভ এসেছে। কেবল নীল আকাশটা একটু কাঁচা হাতে আঁকা। এটি দারা শিকোর অ্যালবামের ৮নং ছবি। ১০ নং ছবিটিও চমৎকার, পাহাড়ের পাদদেশে জলের ধারে একটি বুনো হাঁস সচকিত চোখে মাথা খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে। এটি অতি আশ্চর্য সুন্দর ছবি। পাহাড়ের বুকে সূর্যের আলো দেখানো হয়েছে সাপ্টা সোনালি রঙ লেপে দিয়ে, ফল হয়েছে অতি সুন্দর। জাহাঙ্গীরের আদেশে যে টার্কি মোরগ আঁকা হয় তার উল্লেখ আগেই করেছি, এই ছবিটির মত কাজ চীনে ছবিতেও বোধ হয় নেই।

পাঁচমিশেলি বিষয়ের ছবিও অনেক, তার মধ্যে আখ্যানমূলক ছবিও অনেক। রূপকথাও নানা রকম আছে। একটি বিশেষ প্রিয় বিষয় ছিল মালোয়ার রাজা বাজবাহাদুর আর তাঁর প্রণয়িনী রূপমতীর উপাখ্যান। এঁদের দু'জনকে নিয়ে কয়েকটি ছবি আছে, অন্ধকারে একত্রে মশালের আলোয় পথ দেখে দেখে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছেন। লয়লা-মজনু, খসরু-শীরীন, কামরূপ-কান্তা, নল-দময়ন্তীর উপাখ্যানের চিত্রও অনেক। অনাবৃত, অর্ধবৃত শরীর আঁকা ব্যাপারেও মুঘল চিত্রশিল্পীরা ছিলেন বিশেষ দক্ষ। ই বি হ্যাভেল একটি ছবি ছাপিয়েছেন। সেটি বিষয়ের দিক থেকে অত্যন্ত মূল্যবান। প্রাসাদে দেয়াল গাঁথা হচ্ছে, অনেকগুলি রাজমিস্ত্রী কাজ করছে, কেউ ইঁট গাঁথছে, কেউ পুলুম (প্লাম লাইন) ফেলে দেখছে, কেউ কর্নিক দিচ্ছে, কয়েকজন ঝুড়ি করে চুন সুরকি বইছে, মাঝখানে চুন সুরকি মাখা হচ্ছে, ভিস্তি জল নিয়ে আসছে। ছবির মধ্যে মজুর, রাজমিস্ত্রী, মুটের মধ্যে অনেকেরই খালি গা, খুব নৈপুণ্যের সঙ্গে আঁকা, যাকে যেমন রোগা, মোটা বলিষ্ঠ দেখানো দরকার ঠিক সেইভাবেই দেখানো হয়েছে, সুতরাং যথাযথ্যের মধ্যে প্রচ্ছন্ন কৌতুকও যথেষ্ট। জন্সন্ সংগ্রহের ৯, ১০ আর ১১ খণ্ডে অধিকাংশ ছবিই মহিলাদের, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ হয় স্নান, নয় প্রসাধনরত, ফলে অর্ধবৃত। ১১ খণ্ডের ছবিগুলি বিশেষ ভাল ; একটি ছবি আছে, এক মহিলা উঁচু তে-কোণা পাগড়ির মত পরেছেন। ছবিটির রঙ চমৎকারভাবে গাঢ়-ফিকে করা। ছবিটির একটি নিকৃষ্ট নকল আছে, তার থেকে মহিলাটির নাম জানা যায় : মাল্কা জমানিয়া।

হিন্দু মুসলমান সাধু সন্তদের চিত্রও আছে অনেক। এর মধ্যে অনেকগুলি একক পোর্ট্রেট, আবার অনেকগুলি গ্রুপ। এই বিষয়ের দুটি ছবি আছে, অপূর্ব, দুটিই শাজাহানের সময়ে আঁকা, দারা শিকোর অ্যালবামে স্থান পেয়েছে। একই বৃদ্ধ ফকিরের দুই অবস্থার দুটি ছবি, একটিতে হাতে বই নিয়ে, অন্যটিতে জপমালা নিয়ে। দুটিতেই ফকিরের দেহের সীমারেখা নরম করে আঁকা, সাধারণত যে রকম সরু আর তীক্ষ্ণ হয় সে রকম নয় ; সীমারেখার পাশাপাশি সরু রেখা এমনভাবে গোছা করে দেওয়া যাতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গে নিটোল ভাব আসে। পাতলা

দাড়ির প্রত্যেকটি চুল এমন সুন্দর, নিখুঁতভাবে আঁকা যাতে বোঝা যায় শিল্পী, যাকে বলে একচুলের তুলি (এক বাল কলম) তা ধরার ব্যাপারে কত নিপুণ ছিলেন। রঙ নরম, মোটেই উগ্র নয়, পারস্পেক্‌টিভও মোটামুটি ঠিক। দারা শিকোর অ্যালবামে একই রীতিতে আরেকটি ছবি আছে, বোধ হয় একই শিল্পীর হাতের। বিষয়টি হচ্ছে একজন মোল্লা সমুখে বইদানের উপর কোরাণ শরীফ খুলে পাঠ করছেন। পাশে দু'জন সঙ্গী নিবিষ্ট মনে শুনছেন, সমুখে আরেকজন লোক, মোল্লার বাঁ পায়ের চেটোটি হাতে তুলে ধরে আঙুলের উপর জল ঢালছেন। এই লোকটির ঘোরানো-পেঁচানো শরীরের অবস্থা এঁকে দেখানো বেশ শক্ত, কিন্তু শিল্পীর নৈপুণ্যে বেশ অক্লেশে সম্ভব হয়েছে।

অধিকাংশ অ্যালবামেই জাঁকজমকপূর্ণ দরবারের ছবি আছে। অসীম ধৈর্যে যেমন বিশদভাবে আঁকা, তেমনি অসম্ভব খুঁটিনাটিতে ভর্তি, সমস্তটা খুব সুসমঞ্জভাবে রঙ দেওয়া, প্রায়ই সোনার জলের কাজ করা। রঙ আর সোনার বাহার দেখলে অবাক হতে হয়। তার উপরে অত ছোট ছবিতে দরবারের প্রত্যেক আমীর ওমরার ছবির মুখ আলাদা। তাতেই বোঝা যায় সত্যিকারের দরবার চোখে দেখে, কে কোথায় বসে, সম্রাটের থেকে কতদূরে কার স্থান, শিল্পীর ভাল করে জানা ছিল, এবং সব জিনিস খুঁটিয়ে হিসাব করে প্রত্যেক পাত্রমিত্রের পোর্ট্রেট আঁকা হত। তা না হলে বোধ হয় শিল্পীরও রক্ষে থাকত না। এসব দরবারের ছবির আসল রঙ বজায় রেখে বইয়ে ছাপা অসম্ভব ; উপরন্তু সাদা-কালো ছাপালে ছবির কিছু ধরা যায় না, কারণ কে কোথায় বসে আছেন তার যথাযথ্য রক্ষা করতে গিয়ে কম্পোজিশন প্রায়ই আবশ্যিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ত। তাই রঙ না থাকলে এসব ছবি খোঁড়া হয়ে পড়ে। কর্ণেল হান্নার সংগ্রহে দুটি জগদ্বিখ্যাত ছবি আছে, দুটিই "পারসিয়ান ড্রয়িংস" খণ্ডে। ১ আর ২নং ছবি। ২নং ছবিটি বোধ হয় ভারত-পারসীক রীতিতে আঁকা সবচেয়ে বড় ছবি, ২৩ ইঞ্চি লম্বা ১৭½ ইঞ্চি চওড়া। এক হাম্‌জানামার প্রথম দিকের ছবি কিছু কিছু এর চেয়ে আকারে বড়। ২নং ছবির বিষয় হচ্ছে, হাতির পিঠে চড়ে শাজাহান যমুনার ধারে সজ্জিত অশ্বারোহী সেনা অবলোকন করছেন। প্রধান প্রধান সেনাপতি কর্মচারীদের নাম ছবিতেই লেখা আছে।

১৮১৫ সালে যিনি দিল্লীর সম্রাট ছিলেন তাঁর উপহারদত্ত একটি পুঁথি এখন ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। তার নম্বর বি-এম এ-ডি-ডি ২০৭৩৪। তাতে অতি উৎকৃষ্ট রীতিতে আঁকা নয়টি ছবি আছে। তার মধ্যে এখানে দুটির উল্লেখ করা যায়। একটিতে মায়ের কোলে শিশু শাজাহান (তখন রাজপুত্র খুর্‌রম), চারদিকে অনুচরবর্গ ঘিরে প্রশংসাবাদ করছে (ঠিক কতটা যীশুর জন্মবিষয়ক ছবির মত, ইংরেজিতে যাকে বলে নেটিভিটির চিত্র)। রঙ-এর জমকে, আলোর দীপ্তিতে, পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় এত ব্যঞ্জনাঢ্য হয়েছে, যে ছবিটি নকল করা অসম্ভব। আরেকটি ছবিতে শাজাহান পূর্ণগৌরবে ময়ূর সিংহাসনে সমাসীন, আসফ খাঁ তাকে বহুমূল্য একছড়া মুক্তার মালা উপহার হিসাবে নিবেদন করছেন। মুঘল দরবার যখন গৌরবের সপ্তশীর্ষে তখন তার কি প্রতাপ, জাঁকজমক ছিল এই ছবিটিতে সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হয়।

ভারত-পারসীক চিত্ররীতিতে ইওরোপীয় রীতি অবলম্বনের প্রয়াস হয়। কিন্তু খুব কম ক্ষেত্রেই তা সফল হয়েছে। মুঘল সম্রাটরা এ বিষয়ে যত না চেষ্টিত ছিলেন, পারস্যের রাজাদের আগ্রহ ছিল অনেক বেশি। পারস্যের দরবারে (১৬০৬ খ্রীস্টাব্দে) স্যর রবার্ট শার্লি যখন রাজদূত, তখন রাজা প্রথম শাহ-আব্বাস (১৫৮৭-১৬২৯) চিত্রকলা শেখার উদ্দেশ্যে রোমে একদল শিল্পী ছাত্র পাঠান। এঁদের মধ্যে একজন খ্রীস্টিয়ান হয়ে যান এবং ডন জন অভ পারসিয়া নাম নিয়ে একটি বই লিখে প্রকাশ করেন। দ্বিতীয় শাহ-আব্বাস (১৬৪২-৬·) আরেকটি দল পাঠান। এঁদের মধ্যেও একজন খ্রীস্টিয়ান হয়ে যান ; পারস্য থেকে যখন যান তখন নাম ছিল মহম্মদ জামান ; যখন ফিরে এলেন তখন নাম হল পাওলো জামান। কিন্তু তাঁকে দেশত্যাগ করতে হল, ফলে শাজাহানের দরবারে আশ্রয় নেন। সেই সময়ে আরও কয়েকজন পারস্য থেকে বিতাড়িত হন, তাঁদেরও শাজাহান আশ্রয় দিয়ে মন্‌সবদার পদে বাহাল করে কাশ্মীরে পাঠান। ঔরঙ্গজেব সিংহাসনে এসেই এইসব বিদেশী মন্‌সবদারদের খোঁজ নেন, ফলে কাগজপত্র দেখানোর জন্য তাঁদের দিল্লীতে ডাক পড়ে। তখন মানুচ্চির সঙ্গে মহম্মদ ওরফে পাওলো জামানের পরিচয় হয়। জামান নিজেকে খ্রীস্টিয়ান বলে পরিচয় দিতেন অথচ সাধারণ মুসলমান রীতিতে সংসার করতেন। ব্রিটিশ মিউজিয়মের একটি পুঁথিতে (এ আর ২২৬৫) ইওরোপীয় রীতিতে জামানের তিনটি ছবি আছে। পারস্যে চিত্রশিল্পীদের মধ্যে ইওরোপীয় রীতিতে আঁকার বাসনা বরাবর আছে। এখনও প্রাচীন রাজধানী ইস্পাহানে, নতুন রাজধানী তেহেরানে, অনেক শিল্পী আছেন যাঁদের জীবনের লক্ষ্য হল, "র‍্যাফেইলের মত" আঁকবেন ; এখনও তাঁরা এই বলে গর্ব করেন যে তাঁদের পূর্বপুরুষরা রোমে চিত্রশিল্প শিক্ষা

করতে গেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইওরোপীয় ও প্রাচ্যরীতির জোটকে যে সব ছবি হয়েছে তার কোনটিই কোন কালে খুব রসোত্তীর্ণ বা রুচিসিদ্ধ হয়নি। বড়জোর কয়েকটি ফিকে চটকদার 'সুন্দর' ছবি হয়েছে, আর কিছু হয়নি। অনেকে প্রশ্ন করেন মুঘল চিত্রের প্রাকৃতিক দৃশ্যে যে ছায়াতপ বা 'কিয়ারসক্যুরো' এসেছিল তা ইওরোপীয় শিক্ষার ফলে না চীনে রীতির প্রভাবে। এ সম্বন্ধেও সন্দেহের বিশেষ কারণ নেই। কারণ চীনে ছবিতে ছায়াতপ বা কিয়ারসক্যুরো বহু শতাব্দী ধরে বিদ্যমান, যার ফলে চীনে ছবিতে যে ব্যাপ্তি, অসীম বিশ্বের চিত্রপ্রতিমার আমেজ আসে তা অন্যত্র বিরল। পারসীক রীতির মাধ্যমে চীনে শিল্পশাস্ত্র ও রীতির প্রভাব মুঘল, তথা রাজপুত চিত্রে, বিলক্ষণ ছিল ; কিন্তু একথাটি আমরা প্রায়ই মনে রাখি না। ফলে ভারতীয় চিত্রে প্রকৃতির প্রতিপ্রকাশ বা বাস্তবরীতির সামান্য নিদর্শন দেখলেই আমরা তাকে ইওরোপীয় প্রভাবের ফল বলে কল্পনা করি। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায় জাহাঙ্গীরের দরবারশিল্পী গোবর্ধন দাসের চিত্রিত জনৈক বাইজীর অনাবৃত প্রতিকৃতির। এটি এখন বানারসের শ্রীসীতারাম সাহুর সংগ্রহে আছে নানালাল চমনলাল মেহ্‌তা তাঁর "স্টাডিজ ইন ইণ্ডিয়ান পেন্টিং"-এ পুরো মাপে ছাপিয়েছেন। (লম্বায় ৬ ইঞ্চি চওড়ায় ৪৫/৮ ইঞ্চি)। চিত্রটি প্রায় পুরো মড়ল করা, পরিপূর্ণ নিটোল, মনে হল মহিলা যেন শরীরের সমস্ত ওজন নিয়ে, রক্তমাংস পেশীমজ্জা নিয়ে বসেছেন, ছবিতে এতই গভীরত্ব, ঘনত্ব এসেছে। মাথা, ঘাড়, গলা, বাহু, শরীর, বুক সবই নিটোল। মুখটি যদিও মুঘল রীতি মতে একপাশ করে, অর্থাৎ প্রোফিল করে আঁকা, তবুও মোটেই চ্যাপটা নয়, নীরক্ত তনুতাদুষ্ট নয়। অনেকে বলবেন এটি ইওরোপীয় রীতির ছবি। অথচ শরীর যেভাবে কাল্‌চে ব্রাউন গাঢ়-ফিকের উপর আশ্রয় করে আঁকা, তাতে মানতে দ্বিধা হয় না যে এই ধরনের চিত্রবিন্যাস, দেশজ মেজাজ ও ঐতিহ্য অজন্তার উত্তরাধিকারসূত্রে রক্তের মধ্যে দিয়ে গোবর্ধন দাস পেয়েছেন।

সতেরো শতকে মুঘলচিত্রে ইওরোপীয় বিষয়বস্তুও আসে। দারা শিকোর অ্যালবামে দুটি কাঠ খোদাই আছে, একটি সিয়েনার সেন্ট ক্যাথরিনের (১৫৮৫) আর একটি সেন্ট মার্গারিটার (একই সময়ে আঁকা)। তৃতীয় ছবিতে ইওরোপীয় পোশাক পরিহিত এক দম্পতির প্রতিকৃতি। শিল্পীরা বাইবলের গল্প অবলম্বন করেও ছবি আঁকতেন ; ফতেপুর সিক্রি বা লাহোরের প্রাসাদে সেগুলি স্থান পেত তার প্রমাণ আছে। অবশ্য আঁকার রীতি হত অদ্ভুত। যেমন, 'শ্রেষ্ঠ মেষপালকে'র একটি ছবি আছে, তাতে মেষপালক হচ্ছেন মোটাসোটা মধ্যবয়সী থপ থপে একটি লোক, মুখে প্রকাণ্ড কালো দাড়ি, গায়ে মুসলমানী আলখাল্লা, মাথায় সোনার জরির কাজ করা পাকানো কাপড়ের পাগড়ি। জন্‌সন্ সংগ্রহের 'শ্রেষ্ঠ মেষপালক'টিতে ওস্তাদ মিশকিনের সই আছে। বোধ হয় ইনিই আকবরের দরবারের মহম্মদ মিশকিন, যাঁর নাম আবুল ফজলে আছে। আরও অনেক বাইবলের ছবি আছে, তবে কোনটাই দেখে বিশেষ তৃপ্তি হয় না। পূর্ব-পশ্চিম রীতি ঠিক মেলেনি, মেশেনি।

১৫৮০-র পর আকবরের দরবারে জেসুইটরা তিনবার আসেন। প্রথম ১৫৮০-৮৩-তে, দ্বিতীয়বার ১৫৯১-তে, তৃতীয়বার ১৫৯৫-১৬০৫ সালে। প্রথমবারে জেসুইটরা ক্রিস্টোফার প্ল্যান্টিনের আটটি বড় বড় খণ্ডে সম্পূর্ণ একাধিক ভাষায় রচিত বাইবল আকবরকে উপহার দেন। তার সঙ্গে দেন দুটি বড় চিত্র। আরও অন্যান্য চিত্র ও এনগ্রেভিং নিশ্চয় দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়বার যখন জেসুইটরা আসেন তখন নিশ্চয় কিছু চিত্রিত ধর্মপুস্তক আর পুঁথি রেখে যান, কারণ ১৫৯৫ সালে তৃতীয়বার যখন জেসুইটরা আসেন তখন আকবরের গ্রন্থালয়ে তাঁরা অন্তত কুড়িটি ইওরোপীয় বই দেখতে পান।

প্ল্যান্টিনের বাইবলে মার্টিন ভান হীম্‌স্-কার্কের আঁকা সেন্ট ম্যাথ্যুর একটি এনগ্রেভিং দেখে কেশু ১৫৮৭ সালে একটি নক্‌শা আঁকেন। তারপর চল্লিশ বছর ধরে খ্রীস্টিয়ান বিষয়ে অনেক ছবি আঁকা হয়, কেশুর ছবিটি তাদের অগ্রজ ; তাছাড়া মুঘল ছবিতে ইওরোপীয় ধর্মবিষয়ক ছবির প্রভাব অন্যভাবেও এল। চীনে কিয়ারস্‌কুরো নীতির সঙ্গে ইওরোপীয় কিয়ারস্‌ক্যুরো ও পারস্পেক্‌টিভ নীতিও নিশ্চয় ভারতীয় ছবিতে অনেক প্রভাব রাখে। ফলে দেশী শিল্পীরা অনেকেই ইওরোপীয় রীতিতে ল্যাণ্ডস্কেপ আঁকার চেষ্টা করলেন। তার ফলে পারসীক মিনিয়েচরসুলভ উঁচু দিকচক্রবাল রেখার সঙ্গে ভারতীয় ছবির পিছনের মামুলি সমান জমি চলে গিয়ে এল দূর থেকে আরও দূরের আভাস। সুতরাং বসাওঅন, মধু, মিশকিন, নরসিং, মনোহর শুধু যে ইওরোপীয় এনগ্রেভিং দেখেছিলেন তা নয়, ফ্লেমিশ রীতিতে আঁকা বিখ্যাত 'বুক অভ আওয়ার্স' বইয়ের চিত্ররাজিও নিশ্চয় এঁকে আয়ত্ত করেছিলেন। এঁদের কাজের ফলে জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রথম যুগে মুঘল চিত্রে পশ্চাদ্‌পটে দূরের পারস্পেক্‌টিভ প্রচলিত রীতি হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য এ কাজে বোধ হয় চীনে রীতির দান, ইওরোপীয় রীতির দানের চেয়ে বেশি

মূল্যবান।

আরেকটি বিষয়ে অনেক ছবি আছে, সেটি অনেকে ভুল করে বলেন 'স্বর্গদূতগণ খ্রীস্টের শুশ্রূষা করছেন'। কিন্তু আসলে এটি সম্পূর্ণ মুসলমানী বিষয়, এবং ইসলামীয় রীতিতে আঁকা। লোকচক্ষুর অন্তরালে এক সংসারত্যাগী সাধু ধ্যান করে দিন কাটান, তাঁকে দেবদূতরা রোজ খাইয়ে যান, এই হচ্ছে ছবির বিষয়। দেবদূতদের পিঠের পাখা প্রায় গ্রীক রীতিতে আঁকা বলে অনেকে এটিকে খ্রীস্টিয়ান বিষয় বলে মনে করেন। প্রায় সব ছবিতেই একজন দরবেশকে ছবির এককোণে হয় কোন গুহা, না হয় ঘরের সমুখে, ব্যাজার মুখ করে বসে থাকতে দেখা যায়। ডব্লিউ জি আর্চার তাঁর 'ইণ্ডিয়ান পেন্টিং ইন দা পাঞ্জাব হিল্‌স' বইটির 'পুঞ্চ' অধ্যায়ে এই বিষয়ের একটি ছবি তুলে দিয়েছেন, সেটি পুঞ্চে পাওয়া গেছে। আসল আখ্যানটি হচ্ছে বল্‌খের বাদশা, আদমের ছেলে, ইব্রাহিম রাজত্ব ত্যাগ করে বাণপ্রস্থ নিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে যান। যে বনে গেলেন সেখানে আগে থাকতেই এক দরবেশ থাকতেন, দেবদূতরা নিয়মিতভাবে তাঁকে খাওয়াতেন। কিন্তু বাদশা আসার পর থেকে বাদশাকেই দশজন দেবদূত দশ ব্যঞ্জন দিয়ে রোজ খাওয়াতে শুরু করে দিল, আর দরবেশকে নিতান্ত প্রাণ ধারণের পক্ষে যথেষ্ট একথালা করে খাবার একজন মাত্র দেবদূত দিয়ে আসত। ফলে দরবেশ যেতেন বেজায় চটে। এই বিষয়ক ছবিতে এইটুকু কৌতুক প্রায় বাদ দেওয়া হত না।

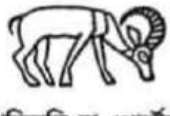
ই বি হ্যাভেল কতিপয় ছবির উল্লেখ করেছেন যেগুলি লোকের গ্রুপের ছবি, ছবির একপাশে বা মধ্যস্থলে ভিড় করে আছে। প্রত্যেকেরই মুখ, শরীর, চরিত্র, ভঙ্গি আলাদা। যেমন একটি ছবি ছাপিয়েছেন, তাতে চারজন মুসলমান মোল্লা, অর্ধচন্দ্রাকারে ছাতের উপর বসে আছেন, পিছনে প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে দূরে প্রাসাদ। কম্পোজিশনটি খুবই ভাল, যদিও পারস্পেক্‌টিভ তেমন ভাল নয়, কতকটা পনেরো শতকের ইটালিয়ান ছবির মত। কিন্তু চরিত্রচিত্রণে, নাটকীয় বর্ণনায়, বর্ণাঢ্যতায়, রেখার বলিষ্ঠ নিশ্চিন্ততায়, বিন্যাসরীতিতে ছবিটি অপূর্ব। প্রাসাদে রাজমিস্ত্রীর কর্মরত ছবির উল্লেখ আগেই করেছি। সেটিও অতুলনীয়।

কী অপূর্ব নৈপুণ্য ও দক্ষতায় ভারতীয় চিত্রকর একদিকে আলকাতরার মত কালো রাত্রি, অন্যদিকে বিদ্যুৎ অথবা মশালের উদ্ভাসের বৈষম্য ফুটিয়ে তুলতে পারতেন তার উল্লেখ ই বি হ্যাভেল করেছেন। রাজপুত রীতিতে অভিসারিকা চিত্রগুলি সবই এই নীতিতে সফল। রাত্রে মশাল জ্বেলে, আলো ফেলে শিকার ; মশালের আলোয় নায়ক নায়িকার পলায়ন, আগুনের কুণ্ড করে তার চারিদিকে পথিকদের আগুন পোহানো ; এই সমস্ত ছবিতে আলো অন্ধকারের বিরোধ খুব আশ্চর্যভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। জন্‌সন্ সংগ্রহে কয়েকটি এই ধরনের ছবি আছে, কর্ণেল হান্নার সংগ্রহেও আছে। শিল্পীশ্রেষ্ঠ রেমব্রাণ্ট জাহাঙ্গীর ও শাজাহান বাদশা'র সমসাময়িক ছিলেন। রেমব্রাণ্ট ছবিতে এমন এক আলোর সৃষ্টি করেন যা আগে কখনও কেউ জলে স্থলে দেখেনি। ব্রিটিশ মিউজিয়ম, লুভর ও অন্যত্র রেমব্রাণ্টের কালি কলমে আঁকা অনেক নক্‌শা আছে। এগুলির অনেকগুলি সম্প্রতি ছাপা হয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটি যে ভারত-পারসীক মুঘল ক্ষুদ্রকায় ছবির নকল তা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ হয়েছে। রেমব্রাণ্টের ছবি আর মুঘল ক্ষুদ্রকায় ছবি বা নক্‌শা পাশাপাশি সাজিয়ে জার্মান অধ্যাপক সার প্রমাণ করে দিয়েছেন যে রেমব্রাণ্টের ছবির উৎস কী। রেমব্রাণ্টের একটি ছবি আছে, সেটি "সিংহাসনে আসীন আকবর" নামে একটি ক্ষুদ্রকায় মুঘল ছবির হুবহু নকল। রেমব্রাণ্টের আরেকটি ছবি আছে, সেটিও 'অশ্বপৃষ্ঠে জনৈক ভারতীয় রাজপুত্র' বলে ছবির নকল। আসলটি আছে বার্লিনে, রেমব্রাণ্টের নকলটি ব্রিটিশ মিউজিয়মে। 'সিংহাসনে আসীন তৈমুর' বলে রেমব্রাণ্টের নকল করা আরেকটি ছবি লুভরে আছে, আসল মুঘল ক্ষুদ্রকায়টি আছে বার্লিনে।

১৬৩১ খ্রীস্টাব্দে রেমব্রাণ্ট ছিলেন আমস্টারডামে। তখন আমস্টারডাম ডাচ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কেন্দ্র। সুতরাং সেখানে প্রাচ্য থেকে অনেক বহুমূল্য শিল্পবস্তু আসত। ১৬৪২ সালে রেমব্রাণ্ট ডাচ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টর এব্রাহাম ভিল্‌মার ডঙ্কসের একটি পোর্ট্রেট আঁকেন। ভিল্‌মার ডঙ্কস্ এশিয়া থেকে বহু মহার্ঘ শিল্পসামগ্রী সংগ্রহ করেন। রেমব্রাণ্টের নিজেরও বহুমূল্য জিনিস সংগ্রহের বাতিক ছিল (যার ফলে শেষ বয়সে তাঁকে কপর্দকহীন অবস্থায় মরতে হয়)। ১৬৫৬ সালে যখন রেমব্রাণ্ট দেউলে বলে ঘোষিত হন, তখন তাঁর সম্পত্তির মধ্যে একটি বই পাওয়া যায় ; সরকারী নথিতে সেটিকে উল্লেখ করা হয় 'অদ্ভুত ধরনের ক্ষুদ্রকায় নক্‌শার সংগ্রহ' বলে। এগুলিই হয়ত মুঘল ক্ষুদ্রকায় ছবির সংগ্রহ হবে, যার থেকে রেমব্রাণ্ট তাঁর কালি কলমের নক্‌শা নকল করতেন।

রেমব্রাণ্ট এতবড় জগজ্জয়ী প্রতিভা ছিলেন, তাঁর কাজ স্বকীয় প্রতিভায় এত সমুজ্জ্বল, ছবিতে তিনি এমন

অভূতপূর্ব আলোর সৃষ্টি করেন, যে তাঁকে নকলনবীশ মনে করা ভুল হবে। তবুও একথা নিতান্ত ঠিক যে জগজ্জয়ী প্রতিভাও স্বয়ম্ভূ নয়। রেমব্রান্টের ছবি আর মুঘল ছবি দুটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন জগতের, তবুও এটা মানতেই হয় যে রেমব্রান্টের ছবির সঙ্গে রীতি ও বিষয় নির্বাচনে মুঘল ছবির আশ্চর্য মিল আছে। দুই ধরনের ছবিতেই সূচীভেদ্য অন্ধকারের হঠাৎ একজায়গায় তীক্ষ্ণ, প্রখর আলোয় গম্ভীর, কুহেলিকাময় বিস্ময়কর খেলার প্রমাণ পাওয়া যায়, যার রীতি প্রায় একরকম। রাত্রির অন্ধকারে মশাল বা কুণ্ডের আলো যে বর্ণবিন্যাসের, যে কবিত্বময় ব্যাপ্তি ও উদাত্ত দীপ্তির সৃষ্টি করে তা মুঘল শিল্পী ও রেমব্রান্ট উভয়েই খুব ভালভাবে দেখিয়েছেন।



কিন্তু মুঘল ক্ষুদ্রকায় চিত্রের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব প্রতিকৃতি বা পোর্ট্রেটে। এবং পুরো মড়লিং-এর অভাবে পোর্ট্রেটের মুখ প্রায় সব সময়ে একপাশ বা প্রোফিল করে দেখানোর দরুন প্রায় সব সময়েই ছবিগুলিতে ঘনত্ব, দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-গভীরত্ব-জনিত ভল্যুমের অভাব সত্ত্বেও, ছবিগুলি সাধারণত চ্যাপটা বা ফ্ল্যাট হওয়া সত্ত্বেও, এটা স্বীকার করতেই হয় যে আলেখ্যগুলিতে প্রতিপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিরূপও হয়েছে সফল, চরিত্রও ফুটে উঠেছে আশ্চর্য স্পষ্টভাবে। আকবরের রাজত্বকালে (১৫৫৬-১৬০৫) এবং কিছুটা জাহাঙ্গীরের সময়েও (১৬০৫-২৭) পোর্ট্রেট হত প্রায় সব সময়েই দাঁড়ানো অবস্থায়, মুখটি প্রথামত একপাশ বা প্রোফাইল করা, ডান হাত বুক পর্যন্ত তোলা, তাতে হয় একটি ফুল না হয় কোন দুর্মূল্য মণি, এক পা পদক্ষেপের ভঙ্গিতে সমুখে বাড়ানো। আস্তে আস্তে এই রীতিদুরস্ত কাঠের পুতুলের মত ভঙ্গি ত্যাগ করে স্ত্রীপুরুষের স্বাভাবিক ভঙ্গির রেওয়াজ হল। যে ছবিগুলি সবচেয়ে প্রাচীন, সে সব ভারত-পারসীক ছবিতে, তাদের মূল পারসীক দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা হত। সে রীতিতে পরিপূর্ণতা বা নিটোলভাব একেবারে থাকত না, প্রত্যেক বিষয়ই একেবারে চ্যাপটা, ফ্ল্যাট বা চিত্রের জমির সঙ্গে সমান লেপা অবস্থায় দেখানো হত, বিষয়ের চারিদিকের শূন্যের পরিপ্রেক্ষিত হত বর্জন, টোন বা রঙের আভার বিন্যাসে কোন গভীরতা থাকত না, এমন কি বর্ণচ্ছটার স্বর বিন্যাসও থাকত খুব কম। কিন্তু জাহাঙ্গীরের রাজত্বের শেষদিকে এবং তারপর থেকে, ভারতীয় শিল্পীরা এই সমান, চ্যাপটা, ফ্ল্যাট রীতি বদলালেন। তার পরিবর্তে খুব সংযতভাবে সরু সরু রেখার গোছা দিয়ে সীমারেখার তীক্ষ্ণতা নরম করে দিয়ে আনলেন রঙের গাঢ়-ফিকের আভাস। ফল হল অভাবনীয়। আশ্চর্য কম রেখায় তাঁরা ফিগরকে দিলেন যথেষ্ট পরিমাণে নিটোল পরিপূর্ণতা ; যে জিনিসটি আগে ছিল নিতান্ত দৈর্ঘ্য আর প্রস্থে চ্যাপটা, সেটি হল গভীর, আর তার চারপাশ দিয়ে হাওয়া খেলে গেল। গোবর্ধন দাস-কৃত বাইজীর ছবির উল্লেখ করেছি। এই পরিবর্তনে ছবিতে এল ঘনত্ব, গভীরত্ব, ভল্যুম। ফলে আধুনিক চোখে সতেরো শতকের পোর্ট্রেট হল বিশেষ আদরের বস্তু। অনেকে বলেন এ রীতি এল বিদেশ থেকে, এবং ছায়াতপ বা কিয়ারস্ক্যুরো এল রঙ আর রেখার ক্ষতি করে। আমার বক্তব্য হচ্ছে, ছায়াতপ হয়ত চীন থেকে এসেছিল, কিন্তু প্রকৃত ছায়াতপ বরাবরই ভারতীয় শিল্পীর রঙে ছিল ও আছে ; তার প্রমাণ সাঁচি, ভারুত, অমরাবতীর ভাস্কর্য ও অজন্তার ছবি থেকে আরম্ভ করে, ফতেপুর সিক্রি ও বাংলার মন্দির পর্যন্ত। অনেকের মতে কিয়ারসক্যুরো আসায় সুকুমার সূক্ষ্ম কাজ এল কিন্তু তার পরিবর্তে বেগবান রেখা গেল স্তিমিত হয়ে, বলিষ্ঠতা গেল দুর্বল হয়ে। পোর্ট্রেট শিল্পে একদিকে যেমন এল অসাধারণ নৈপুণ্য, অন্যদিকে নক্শা আর আল্পনার প্রতিভা গেল ম্লান হয়ে।

পারস্যেও পনেরো শতকের শেষের দিকে তৈমুরিদ চিত্রকলার পরুষ রেখা আর জোরালো রঙ নরম হয়ে ষোল শতকের সাফাবিদ যুগে হল তনু, সুকুমার, মিষ্টি। সতেরো শতকে এই সাফাবিদ রীতিই ভারতবর্ষে আদর পেল, রঙ হল আরও নরম, হিন্দু শিল্পীর হাতে হল আরও পেলব, মার্জিত। ব্লশে নামে একজন ফরাসী সমালোচকের মতে হিন্দুদের রঙ সম্বন্ধে আরও নিখুঁত জ্ঞান ছিল, তাদের তুলিতে সূক্ষ্ম টোন বা রঙের আভার বিন্যাস আসত, রঙ সম্বন্ধে ছিল আরও শুদ্ধ চেতনা। তাঁর মতে হিন্দু শিল্পীরা আবার অনেক সময়ে রঙ বড় বেশি নরম করে দিতেন। তবে তাঁরা এক ধরনের ছাই রঙের আমেজের জমিতে একরঙা ছবি আঁকায় ছিলেন সিদ্ধহস্ত ; অনেক সময়ে সে রঙ হত খুব ফিকে সেপিয়া, তাতে গোলাপীর সূক্ষ্ম আমেজ। ফল হত যেমন নয়নাভিরাম তেমনি স্বকীয়তার গৌরবে উজ্জ্বল। সেই সঙ্গে চরিত্রচিত্রণে তাঁরা পেলেন প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতা।

অনেকের মতে এই ক্ষমতা এল পারসীকদের কাছ থেকে, কারণ এই রীতিতে শ্রেষ্ঠ ছবি হতে আরম্ভ হয় সতেরো শতকের প্রথমার্ধে, তার আগে নয়। পারসীক রীতির কাছে এ বিষয়ে ভারতীয় শিল্পী নিশ্চয় খুব ঋণী, কারণ আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ই হচ্ছে যে যেমন নানা রক্ত না মিশলে কোন জাতি বরাবর বলিষ্ঠ, তেজোময়, তীক্ষ্ণধী থাকতে পারে না, তেমনি নানা রীতির নিয়ত আদান-প্রদান না ঘটলে কোন বিশিষ্ট চিত্ররীতিরও অবনতি ঘটে, ক্ষয় হয়। তবুও এই সূত্রে মনে রাখতে হবে যে ছাইরঙের আমেজের জমিতে একরঙা ছবি আঁকায় ভারতীয় চিত্রশিল্পী অজন্তার যুগ থেকে আরম্ভ করে যামিনী রায় পর্যন্ত বরাবর আশ্চর্য সাফল্যলাভ করেছেন, এবং এই রীতিই আবহমানকাল ধরে ভারতের বৈশিষ্ট্য বলা যায়। আর প্রতিকৃতি আঁকায় প্রতিটি চরিত্রের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলার ব্যাপারেও ভারতীয় শিল্পী চিরকালই নিপুণ বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

এই নৈপুণ্য সবচেয়ে বেশি প্রকাশ পায়, মুঘল ক্ষুদ্রকায় পোর্ট্রেটে। ভারতীয় চিত্ররীতিতে চ্যাপটা ফ্ল্যাট নক্শা প্রতিটি চরিত্রের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং অবয়ব নিঃসংশয়ভাবে ফুটিয়ে তোলা কম কৃতিত্বের কাজ নয়। রাজ পরিবারের প্রতিকৃতি দিয়েই মুঘল পোর্ট্রেট শুরু হয়। প্রতিটি পোর্ট্রেটের মাথার পিছনে থাকত জ্যোতি আর অন্যান্য রাজচিহ্ন। কখনও কখনও দু'তিন পুরুষ বাদশার ছবিও একত্রে আঁকা হত, একই চৌহদ্দির আলাদা আলাদা খোপে। কিন্তু প্রায়ই একক ছবি হত, রাজা ফুলফোটা সবুজ ঘাসের উপর দাঁড়িয়ে, পিছনে আকাশ বাতাসের রঙে পশ্চাদ্‌পট। পরনের কিংখাবে, রত্নখচিত পোশাকে, বহুবর্ণ জামাকাপড়ে শিল্পী পেতেন রঙ ফলানর অকুণ্ঠ স্বাধীনতা, ফলে রঙে যেমন আসত বৈচিত্র্য তেমনি আসত জৌলুস। তাদের প্রসাদগুণ আরও উচ্চকিত করার জন্য মাঝে মাঝে শিল্পী দিতেন মাজা সোনার তবক। গরমের দেশের উপযোগী স্বচ্ছ অভ্রের মত মসলিনের পোশাক আঁকতে তাঁরা ছিলেন অদ্বিতীয় (এক ধরনের মসলিন ছিল তার নামই ছিল চাঁদিনী ফট্‌কা, অর্থাৎ চন্দ্রালোকের তীব্রতা যে কাপড় সহ্য করতে না পেরে ফেটে যায়); সে কাপড়ের স্বচ্ছতার মধ্যে দিয়ে ফুটে বেরোত শরীরের অবয়ব আর গায়ের রঙ। সাঁচি, ভারুত, কুশান, অজন্তা আমল থেকেই এই ধরনের কাপড় খোদাইয়ে বা আঁকায় ভারতীয় শিল্পী ছিলেন সিদ্ধহস্ত। ইওরোপীয় চিত্রে প্রথম স্বচ্ছ কাপড় দেখা যায় বতিচেল্লির ছবিতে, যদিও তার বহু আগে থেকেই ঢাকা ইত্যাদি বন্দর থেকে ইওরোপে মসলিন রপ্তানি হত। প্রায়ই পশ্চাদ্‌পট হত পাতলা বর্ণহীন আকাশ বাতাসের রঙ, তার সমুখে প্রতিকৃতিটি গাঢ় রঙ আমেজে দাঁড় করানো হত। কয়েকটি পোর্ট্রেটে আবার বিশেষ কৃতিত্ব দেখা যায়; পশ্চাদ্‌পটটি গাঢ় কালোয় সমান করে লেপা। কোন আলো ছায়া নেই, কোন ছায়া নেই। চীনে শিল্পীর মতই ভারতীয় শিল্পী ছায়াকে কোনদিনই আয়ত্ত করতে পারেননি; যেখানেই ছায়া আঁকতে গেছেন সেখানেই বড় অবাস্তব হয়েছে; বস্তুর আকারের সঙ্গে সম্বন্ধ আসেনি, মনে হয় আচমকা কয়েক জায়গায় ধপ ধপ করে গাঢ় রঙ যেমন তেমন ভাবে পড়ে গেছে। রঙের আভার সূক্ষ্ম বিন্যাসে আর সামান্য মড্‌লিং-এর ফলে পোর্ট্রেটটি পিছন থেকে জেগে ওঠে। আসলে ছবিটি দাঁড়ায় তার বর্ণাঢ্যতায়, সংবেদক সীমারেখার নৈপুণ্যে আর আল্‌পনার দক্ষতায়।

এ সব হল সাধারণ গুণ বর্ণনা, কিন্তু মুঘল চিত্রের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে চিত্রের যথাযথ্যে, জীবন্ত মানুষটির সমস্ত অবয়বের দক্ষ প্রতিপ্রকাশে। এখানেই শিল্পীর কৌশল দেখা যায় সবচেয়ে বেশি। মুখ আর মাথার প্রতিকৃতির সুকুমার সম্পূর্ণতায় মুঘল রীতির জুড়ি মেলা ভার, কিন্তু সেই সঙ্গে এতখানি চরিত্র, ভিতরের মানুষটির মনের ছাপ ঐটুকু ছবির মধ্যে অত ভালভাবে ফুটিয়ে তুলতে অনেক ইওরোপীয় শিল্পীও পারেননি। চ্যাপটা, ফ্ল্যাট, ভল্যুমবিহীন ছবি বলে ইওরোপীয় রীতিতে অভ্যস্ত চোখ সাধারণত প্রথম থেকেই একটু বিমুখ হয়, এসব ছবি মিষ্টি মিষ্টি, নির্জীব, নিছক সুন্দরপানা বলে মনে হয়। কিন্তু একটু নিরীক্ষণ করলেই বোঝা যায় মুঘল শিল্পী মনুষ্য চরিত্র কত ভাল বুঝতেন। যেহেতু বাদশার ছবি, সেহেতু শিল্পী হয়ত তাঁর প্রতিকৃতিতে মহান দেবভাব, সর্ববিধ সুলক্ষণে ভূষিত করার চেষ্টা করতেন। কিন্তু তবুও মনের অগোচরে তাঁর তুলিতে বেরোত আসল চরিত্রের রূপ। কোথাও কোন সূত্রে বেরিয়ে আসত কৃতকর্মের স্বরূপ, কোথাও বা মহান, কোথাও নিতান্ত হেয়, উদার বা নিষ্ঠুর, মুক্তহস্ত বা কৃপণ, সত্যনিষ্ঠ বা মিথ্যাচারী, দৃঢ়স্বভাব অথবা দীর্ঘসূত্রী। অন্বেষী রেখাপাতে পাতে আস্তে আস্তে অমোঘভাবে বেরিয়ে আসত আসল মানুষটি, ধামা চাপা দেবার চেষ্টা সত্ত্বেও।

অধিকাংশ মুঘল পোর্ট্রেটেই মুখ একপাশ করে আঁকা, যাকে বলে প্রোফিল করা। এই ধরনের রীতি-দুরস্ত বিন্যাসে স্বকীয়তা বা বৈচিত্র্য আনা শক্ত, এবং মাঝে-মাঝে মুখের $\frac{3}{4}$ ভাগ বা $\frac{7}{8}$ ভাগ যে না এসেছে তা নয়। শরীরটি প্রায় সমুখ থেকে দেখে আঁকা, কিন্তু মুখ ও মাথা প্রোফাইল করা, অর্থাৎ শরীরটি একভাবে দেখে আঁকা,

মুখ আর মাথা আরেকভাবে দেখে আঁকা ; দুই ধরনের দুইভাবে দেখা, ছবিতে এসে কাঁধের উপরে ঘাড় মিলিয়ে মিশে গেছে। এই ধরনের রীতি বহু প্রাচীন। ঈজিপশনরা বা অসিরিয়রা যখন রাজা-রাজড়ার ছবি আঁকতেন তখন এইভাবে আঁকতেন। আবার যখন সাধারণ লোকের ছবি আঁকতেন তখন মুখের ¾ ভাগ বা ⅞ ভাগ আনতেন। প্রোফাইল আঁকার রীতি বিশেষ করে মুদ্রায় বা পদকে বেশি চলন। অর্থাৎ যেখানেই বিষয়মর্যাদায়, যথা রাজ-রাজড়ার ছবিতে মানুষী মুখে মনুমেন্টালিটি বা দেবসুলভ অতিকায়ত্ব আনা দরকার, সেখানেই প্রাচ্যশিল্পী ও প্রতীচ্য পদককার প্রোফাইল আঁকতেন, যে রীতির ফলে অবয়বে আসত কাঠিন্য, দুর্নমনীয়তা, দেবসুলভ অতিকায়ত্বের ব্যঞ্জনা, সম্ভাবনা। তা ছাড়া আর একটি কারণে প্রোফাইল বেশি গ্রাহ্য ছিল। প্রাচ্য ছবির রীতি হচ্ছে মুখ্যত চ্যাপটা, সমান, দৈর্ঘ্য প্রস্থে সম্পূর্ণ, 'অগভীর', 'ঘনত্বহীন'। তার মধ্যে মড়ল করা, চারপাশ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে বা আন্দাজ করা যাচ্ছে এ রকম মুখ বসালে অনেক ক্ষেত্রে ছবির ছন্দ কেটে যাওয়া অনিবার্য, অবশ্যম্ভাবী। দৈর্ঘ্য প্রস্থে স্বয়ংসম্পূর্ণ সমান জমিতে যেমন ভল্যুম বা দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-গভীরতা অসঙ্গত, তেমনি ভারতীয় ছবির স্তরবিহীন চ্যাপটা ছকে সমুখ থেকে দেখা মুখ অসঙ্গত ঠেকে। তাছাড়া আগেই বলেছি মুঘল ছবিতে আছে ক্যালিগ্রাফি বা লিপি কৌশলের গুণ। ক্যালিগ্রাফির রেখার সঙ্গে খাপ খায় কাটা কাটা, পাশ থেকে দেখা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, মুখের অবয়ব, সেগুলির সীমা হয়ে দাঁড়ায় রেখা। সেখানে ছবির জ্যামিতিসুলভ রেখানির্ভর মেজাজে প্রাকৃত রূপ ঠিক খোলে না, অপ্রাকৃত বিন্যাসই ভাল লাগে বেশি। তা না হলে, তার কেটে যাবার মত হয়। কিন্তু মুঘল পোর্ট্রেটে শিল্পীর বাহাদুরি এই যে যা হতে পারত নেহাতই একটা আবেগহীন নীরক্ত ঢঙ বা অধ্যাত্মবিলাস, তা হল রক্ত মাংসে পুষ্ট একান্ত স্বাধীন চরিত্র।

প্রতিকৃতি হিসাবে চিত্রগুলি উৎকৃষ্ট হত ত বটেই ; কিন্তু সেই সঙ্গে এইসব চিত্রের বর্ণিকাভঙ্গ বা আঁকার রীতি পদ্ধতির তারিফ না করে পারা যায় না। যাকে বলে ছবির জমি, বা পারসীতে 'তার', সেই প্রস্তুতির ব্যাপারে ; রঙের শেডিং বা গাঢ়-ফিকে করার ব্যাপারে ; এবং রঙ দেওয়া অর্থাৎ পারসীতে যাকে বলে রঙ আমেজি করার ব্যাপারে এই ছবির শ্রেষ্ঠত্ব অবিসম্বাদিত। মুঘল ছবিতে সীমারেখা অঙ্কন সবচেয়ে কঠিন সিদ্ধির ফল। পারসীতে সীমারেখা আঁকার একটি প্রতিশব্দ আছে তাকে বলে তার-কশ করা, অর্থাৎ নক্শা আঁকা। মুঘল ছবি 'তার-কশ' ব্যাপারে অদ্বিতীয় বলা যায়, এবং এতে কতখানি নৈপুণ্য ছিল তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় কতকগুলি 'কোরা' ছবি দেখলে। শিল্পী শুধু মাথাটা কালি কলমে খুব মনোযোগ দিয়ে নিখুঁত করে এঁকে, ছবির বাকিটা সামান্য রেখা মাত্র করেই ছেড়ে দিয়েছেন, এ রকম ছবি মুঘল চিত্রের দলিলে অনেক আছে। এদের মধ্যে অনেকগুলি নিতান্ত প্রারম্ভিক স্কেচ ; আবার অনেকগুলি অসমাপ্ত নক্শা, শেষ পর্যন্ত 'রঙ-আমেজ' করা হয়নি। কিন্তু দুই অবস্থার ছবিতেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে প্রথম দিকের নক্শার কাজে শিল্পী কতটা যত্ন নিতেন ও পরিশ্রম করতেন। এইসব অতি উৎকৃষ্ট 'কোরা' নক্শায়, যাকে চলতি কথায় বলা যায় আঙুলের নখ দিয়ে আঁকা স্কেচে, স্পষ্ট বোঝা যায় রেখা কত অভ্রান্ত হতে পারে, মড়লিং হতে পারে কত উদাত্ত, ব্যাপ্তিময়, অথচ সূক্ষ্ম, সমগ্র কাজই কত উৎকৃষ্ট। এদের যে কোনটিকে কয়েক গুণ বড় করলেও এদের বৈশিষ্ট্য বা শ্রেষ্ঠত্ব একটুও খর্ব হয় না।

পরিপাটি করে সম্পূর্ণকরা ছবিগুলিতে, উপরদিকে পালক আর রত্নখচিত উষ্ণীষ আর তলার দিকে মণিমুক্তার হার শোভিত গলার উপরে সূক্ষ্ম কাজ করা মুখ আশ্চর্যভাবে খোলতাই হত। সম্রাট বা রাজপুত্রদের ছবির বেলায় মাথার পিছনে আঁকা হত সোনালি জ্যোতি, তাতে সমস্ত ছবিতে আসত গাম্ভীর্য আর সম্ভ্রম। শরীরের পশ্চাদপট সাধারণত হত সাপটা সোনালি-সবুজ রঙের লেপ, উপরের দিকে সেটি আস্তে আস্তে আকাশের নীল বা তামাটে রঙের সঙ্গে মিশে যেত। ছবির নীচের দিকে প্রতিকৃতিটি ছোট বাগানের মধ্যে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড় করানো হত। পায়ের চারপাশে কয়েকটি ফুল ছড়িয়ে দিয়ে কম্পোজিশনের কঠোরতা একটু ভেঙ্গে দেওয়া হত। কিন্তু স্পষ্টই বোঝা যায় যে শিল্পীর আসল উদ্দেশ্য থাকত খুব সাধারণ মামুলি সাপটা পটভূমির উপরে সাজ সজ্জার বর্ণাঢ্যতা ও দেহের বিভূতি ফুটিয়ে তোলা। ঋজু, কঠোর, সরল ভঙ্গিমা ও রীতির মধ্যেও চিত্রশিল্পী ছবির মধ্যে হাতের স্বাভাবিকত্ব, কোমলতা, ফুটিয়ে তুলতেন আশ্চর্যভাবে। ছবিতে হাত এঁকে তাকে যেন কথা কওয়াতে পারতেন। হাত আঁকার কথা অজন্তার বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছি। তাতেই মনে হয় একেক দেশে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে দক্ষতা বা শক্তি, শিল্পীরা যেন রক্ত ও জল হাওয়ার মধ্যে দিয়ে পুরুষ পরম্পরায় পান।

অধিকাংশ মুঘল প্রতিকৃতিই মনে হয় চোখে দেখে আঁকা। এ সমস্ত ছবির সংগ্রহে সম্রাট, বিদূষক, রানী, বাইজী, রাজপুত্র, সাধু সন্ত ফকির, পীর, সৈনিক, পাত্র অমাত্য, ভিস্তি, সহিস, সব যেন ভিড় করে চিত্রশালায় স্তম্ভিত হয়ে আছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে একদিকে যেমন চরিত্রচিত্র নেই বললেই হয়, অন্যদিকে মুঘল চিত্রশিল্পীর হাতে তার অভাব ঘুচে গেছে। চিত্রশিল্পে এসেছে চরিত্রচিত্রের অসীম বৈচিত্র্য। শুধু তাই নয় শিল্পীর প্রতিভা অন্য বিষয়েও সাফল্য সিদ্ধি লাভ করে। পূর্বযুগে কোন বিখ্যাত বীর কি রকম দেখতে ছিলেন, মুঘল শিল্পী হয়ত তাঁর বর্ণনা শুনে অথবা পুরনো ছবি নকল করে সেই বীরকে জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠা করতেন, লোকের বাড়িতে বাড়িতে



যার সস্তা নকল চল হয়ে যেত। আধুনিক কালের হেদুয়ার রেলিং-এ ঝোলানো ওলিওগ্রাফের চেয়ে সেগুলি নিশ্চয় চিত্র হিসাবে হত অনেক উৎকৃষ্ট। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায় পারস্যের স্বর্ণযুগের রূপকথার যুবরাজ ঈরেজের ছবির অথবা চেঙ্গিজ খাঁর ; অথবা হজরৎ মহম্মদের জামাই ইমাম আলির। শিল্পীর হাতে আঁকা এঁদের ছবি অল্প কিছুদিন আগে পর্যন্ত পাওয়া যেত। এমন কি অল্প কিছু বছর আগে পর্যন্তও পাঞ্জাবে মাথায় গ্রীক শিরস্ত্রাণ পরা আলেকজাণ্ডারের ছবি হরদম পাওয়া যেত।

মুঘল সম্রাট, আমীর ওমরাদের ছবি বহু আছে। দারা শিকোর অ্যালবামে জাহাঙ্গীরের কয়েকটি উৎকৃষ্ট প্রতিকৃতি আছে। একটি ছবিতে শিল্পী মহম্মদ খাঁয়ের সহি আছে। জাহাঙ্গীর বাদশার দরবারে কিরকম মদ্য পান ও আমোদ আহ্লাদ চলত তা এই ছবিটি থেকে বোঝা যায়। ছবিটির বিষয় হচ্ছে একটি যুবক, পরনে উজ্জ্বল হলদে পোষাক, মাথায় বড় সবুজ পাগড়ি, একটি ফুলের পাত্র আর তার পাশে সোনার থালার উপর চারটি পাত্রের সমুখে হাঁটু গেড়ে বসে ডান হাতের রত্নখচিত মদের পাত্র থেকে বাঁ হাতের বাটিতে মদ ঢালছে। ছবিটিতে রঙের কোন রকম গাঢ়-ফিকে করা নেই। আকবরের ছবি এত আছে যে গুণে শেষ করা শক্ত। ব্রিটিশ মিউজিয়মের একটি ছবিতে সম্রাট আকবর পাশে শিশুপুত্র সলীম (জাহাঙ্গীর)-কে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন দেখা যায়। আরেকটি ছবিতে দরবারে সমাসীন আকবর একটি নারীর আবেদন শুনছেন। এই ছবিটিতে আকবরের সব বিখ্যাত অমাত্যদের প্রতিকৃতি আছে, উপরে খুব ছোট অক্ষরে প্রত্যেকের নাম লেখা। ১৮১৬ সালে ডাক্তার বুকানন হ্যামিলটন জন্‌সন্‌ সংগ্রহের একটি খণ্ড (৫৭নং) উপহার দেন। তাতে রাজপুরুষ, আমির ওমরাদের তিপ্পান্নটি ছবি আছে। তার মধ্যে আকবরের দরবারের আবুল ফজল, বীরবল, মানসিংহের ছবিও আছে ; চিত্রগুলি মনে হয় একটু তাড়াতাড়ি করে আঁকা। ঐ সংগ্রহেই ৫৮ খণ্ডের ছবিগুলি আরও সম্পূর্ণ করে আঁকা ; এর মধ্যে ১৮নং ছবিটি মিশকিনের তুলির। ই বি হ্যাভেল তাঁর 'ইণ্ডিয়ান স্কাল্পচার অ্যাণ্ড পেন্টিং' বইয়ে কয়েকটি ছবি দিয়েছেন, একটি একজন ওমরার, নাম ইতিকাদ খাঁ ; দ্বিতীয়টি একটি বৃদ্ধের ; তৃতীয়টি শিরাজের কবি সাদীর (কিংবদন্তী অথবা খুব পুরনো কোন ছবির উপর নির্ভর করে আঁকা) ; চতুর্থটি শিল্পী নাহ্নার আঁকা, অমর সিংহের ছেলে সূরজমলের প্রতিকৃতি। শেষোক্ত ছবিটির সামান্য উল্লেখ আগেই করেছি।

মুঘল রাজত্বের প্রথম দিকে পোর্ট্রেট শিল্প ছিল অভিজাতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, কারণ তাঁরাই খরচ জোগাতে পারতেন। কিন্তু শীঘ্রই জনসাধারণের মধ্যে এর বহুল প্রচার হল। অল্প দামের প্রতিকৃতির চাহিদা খুব বাড়ল। ফলে পোর্ট্রেট শিল্প ব্যবসায়ে দাঁড়াল। কারিকররা কোন বিখ্যাত ছবির সীমারেখাটি কাগজে নকল করে নিতেন এবং সেই নকলটি নতুন ছবি তৈরি করার জন্য ব্যবহার করতেন। নতুন নকল করতে হলে তাঁর আঁকা কাগজটি নতুন কাগজের উপর ফেলতেন, তারপর তার সীমারেখার উপর সরু কাঠি দিয়ে হাতের জোরে তলাকার কাগজে রেখায় রেখায় বুলিয়ে দাগ ফুটিয়ে দিতেন। তারপর সেটি ভাল করে এঁকে রঙ করে দিতেন। এইভাবে 'শিল্পীর' কাজ হয়ে গেল, হাজারে হাজারে ছবি তৈরি হতে লাগল। দাগ বুলিয়ে বুলিয়ে নকল করতে করতে আসল ছবির রেখায় রেখায় ফুটো ফুটো হয়ে যেত। কিন্তু যেগুলি জীর্ণ হয়ে ফুটো ফুটো হয়ে যায়নি তাদের সুকুমার, সূক্ষ্ম কাজ আর রেখার স্বাচ্ছন্দ্য দেখলে অবাক হতে হয়।

সাধারণত মুঘল পোর্ট্রেটে চিত্রিত লোকের নাম লেখা থাকত। অনেক লোকের ছবিতে, যেমন দরবারের চিত্রে, প্রত্যেক লোকের মাথার উপরে তার নাম লেখা হত। অনেক সময়ে ছবির উল্টো পিঠেও লেখা থাকত। কিন্তু সব সময়ে যে ঠিক ঠিক লেখা হত তা নয়। যেমন ঔরঙ্গজেবের কিছু ছবি আছে যাতে লেখা আছে জাহাঙ্গীর, যদিও দু'জনের অবয়ব সম্পূর্ণ আলাদা। কোন কোন ক্ষেত্রে ছবির দর বাড়াবার জন্য ইচ্ছা করেই ভুল নাম লেখা হত।

এখন ছবি কিভাবে কিসের উপর আঁকা হত তা সংক্ষেপে আলোচনা করার আগে মুঘল প্রাসাদে বা সরকারী বেসরকারী সৌধগুলির কাঠে বা পাথরে কী সুন্দর তেল রঙ অথবা নানারঙের দামী পাথর খচিত করে নক্‌শা বা ছবি করা হত, তার সামান্য উল্লেখ দরকার। এইসব নক্‌শা বা ছবির সবচেয়ে উৎকৃষ্ট নিদর্শন মেলে ফতেপুর সিক্রিতে, আগ্রা দুর্গে, আর তাজমহলে। ফতেপুর সিক্রির কাঠের কাজে বা কাঠের গায়ের চিত্রে, আগ্রার দরবার-ই-আমে এবং অন্যান্য বাড়িতে, ইতিমাদদৌলা বা তাজমহলে, কাঠে বা পাথরে যে সব রঙীন নক্‌শা বা ছবির কাজ আছে তার আল্‌পনার বাহাদুরি, চিত্রের ভাস্বর ব্যঞ্জনা, রঙের বিচিত্র জৌলুস অবিশ্বাস্য রকমের নিপুণ ও সুন্দর। স্পষ্টই বোঝা যায়, নিশ্চয় কোন চিত্রশিল্পী সমস্তটা আগে রঙে এঁকে দেখে নিয়েছিলেন চিত্র হিসাবে সেগুলি কি রকম দেখাবে, তারপর সেগুলি তুলে দিয়েছিলেন কাঠের মিস্ত্রী বা পাথরের মিস্ত্রীর হাতে, সেগুলি করে দেখানোর জন্য। প্রথম যুগে তুলোর কাপড়ের উপরে আঁকা, দেয়ালে আঁকা ফ্রেস্কো, বা খুব পাতলা চামড়ার (ইংরেজিতে যাকে বলে পার্চমেন্ট বা ভেলাম) উপরে আঁকা ছবি বা আধুনিক যুগে হাতির দাঁতের উপর আঁকা ছবি ছাড়া, বাকি মুঘল ছবির প্রায় সবই কাগজের উপর আঁকা। সিল্কের উপরে চীনে রীতিতে আঁকা ভারতীয় ছবি প্রায় নেই বললে ভুল হয় না। সীমারেখার গণ্ডীর মধ্যে সব বস্তুবিষয়ের রূপই আবদ্ধ, সব প্রাচ্য চিত্রশিল্পীর মত ভারতীয় শিল্পীও এ ধারণাটি স্বতঃসিদ্ধ বলে মানতেন, ফলে তাঁদের প্রথম কাজই হত আগে বিষয়ের সীমারেখাটি ভাল করে এঁকে নেওয়া। সাধারণ পুঁথির জন্য ছবি আঁকতে হলে আগে ছবির জমি তৈরি অর্থাৎ ফারসীতে যাকে বলে 'তার' করে নেওয়া হত। তারপর ব্রুশে'র মতে সীমারেখাটি সরাসরি লাল বা কালো খড়ি দিয়ে আঁকা হত। একে ফারসীতে বলত 'তার-কশ' করা, অর্থাৎ রেখাচিত্র করা। তারপরেই অংশগুলিতে রঙ দেওয়া হত, তাকে বলত রঙ আমেজ করা। এইভাবে চিত্রনির্মাণের সম্পূর্ণ কাজটিকে ফারসীতে বলত 'আমল' করা। বহুমূল্য পুঁথির ছবি আরও বিশদভাবে আঁকা হত। আগে ছবিগুলি আলাদা কাগজে সম্পূর্ণভাবে আমল করে পরে আঠা দিয়ে পুঁথির খালি জায়গায় লাগিয়ে দেওয়া হত। যে কাগজে ছবি হবে সেটিতে বাব্‌লার আঠা জাতীয় গঁদ মিশিয়ে খুব মিহি করে একটি আস্তর বা প্লাস্টার লাগানো হত। এইভাবে হত কাগজ তার করা। এই রকম করে তৈরি মসৃণ জমির উপর ছবির সীমারেখা আঁকা হত, বা তার-কশ করা হত। তারপর ছবির সীমারেখার অংশে অংশে, জলে অস্বচ্ছ রঙ মিশিয়ে, লেপের উপর লেপ লাগিয়ে ছবিতে রঙ করা হত, ঠিক তেলরঙের কাজের মত ; তবে তফাৎ এই যে তেলরঙে ভুল হলে চেঁচে ফেলে দিয়ে ফিরে ফিরতি রঙ লাগানো যায়, কিন্তু মুঘল রীতিতে একবার রঙ লাগানোয় ভুল হলে আর উপায় থাকত না। ছবিতে যেখানে মণিমুক্তা বা অন্য অলঙ্কার দেখাতে হবে সেখানে অল্প গর্ত গর্ত করে ছুঁচের মুখে করে সোনার তবক অথবা মুক্তা বা হীরাচূর্ণ লাগিয়ে দেওয়া হত। সমস্ত কাজটি অতি নরম সূক্ষ্ম, কাঠবেড়ালীর লোম দিয়ে তৈরি তুলিতে করা হত। তার মধ্যে আবার যে সব কাজ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হত সেগুলি এক লোমের তুলি দিয়ে করা হত : একে বলত এক-বাল্ কলম। এই এক-বাল্ কলম দিয়ে রঙ দেওয়া কত কঠিন ধৈর্যের কাজ তা আজকের দিনে শুধু অনুমানই করা যায়। পুরাকালের গ্রীক শিল্পী অপেলিজের সূক্ষ্মরেখাসৃষ্টির অপূর্ব দক্ষতার গল্প 'পশ্চিম ইওরোপের চিত্রকলা'য় করেছি, জার্মান শিল্পী ডিউরর সাধারণ তুলিতে কত সূক্ষ্ম চুল বা দাড়ি একটি একটি করে আঁকতে পারতেন তাও সে বইয়ে উল্লেখ করেছি। কিন্তু মুঘল ক্ষুদ্রকায় ছবিতে এক-বাল্ কলমের রেখার কাছে ডিউররের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রেখাও দড়ি বা কাছির মত মোটা দেখায়। সুতরাং আন্দাজ করা শক্ত এই তুলি চালাতে গেলে হাত কত স্থির, চোখ কত তীক্ষ্ণ হওয়া প্রয়োজন। লণ্ডনে যে সব সংগ্রহ আছে তাতে অনেক ছবি অসম্পূর্ণ বা কোরা অবস্থায় পরিত্যক্ত দেখা যায়, সেইসব পুরো 'আমল'-না করা ছবি খুব শিক্ষার বিষয়, সেগুলি খুঁটিয়ে দেখলে ধারণা হয় ছবি কিভাবে প্রথম থেকে ধাপে ধাপে নির্মাণ করা হত।

একটু আগেই বলেছি অনেক পোর্ট্রেটের এক বা ততোধিক নকল প্রায়ই পাওয়া যায়। হত কি, শিল্পী একটি কাগজে বা চামড়ার উপর প্রতিকৃতিটি এঁকে রাখতেন, এবং তার প্রতিটি অংশে কোথায় কি রঙ পড়বে তা হয় সেই সেই রঙ দিয়ে চিহ্ন করে রাখতেন না হয় খুব ছোট ছোট অক্ষরে লিখে রাখতেন। তাতেই বোঝা যায় নকলগুলি

কত সযত্নে, নিখুঁতভাবে তৈরি হত। অনেক শিল্পীর বাড়িতে এই রকম গোছা গোছা ট্রেসিং (ঠিক যেমন আজকাল ছুঁচের কাজের বই পাওয়া যায়, প্রত্যেক ছবির কোথায় কোন রঙের সূতা ব্যবহার হবে তারও নির্দেশ থাকে) কাগজ বা চামড়া বংশ পরম্পরায় উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যায়। এই রকম নক্শা করা চামড়াকে বলত চর্বা ; চামড়া থেকে অন্য কাগজে নক্শাটি তোলা হত সীমারেখা পাতে পাতে ছুঁচ দিয়ে ফুটো ফুটো করে ; ঠিক যেমন জন্তুজানোয়ারের খাবার নখে ফুটো হয়, একে ইংরেজিতে পাউন্স করা বলে। ইংরেজিতে চর্বাকে বলে কার্টুন। তারপর সেই ফুটোর উপর মিহি করে গুঁড়োন কাঠকয়লা ঘষে তলার কাগজে দাগ ফুটিয়ে তোলা হত।

এইভাবে সীমারেখাটি ভাল করে আগে এঁকে নিয়ে, পরে তার অংশে অংশে সুপরিকল্পনা মত রঙ দেবার রীতির ফলে শিল্পীরা শীঘ্রই নিজেদের কাজ ভাগ করে ফেললেন। একদলের কাজ হল বুলিয়ে বুলিয়ে কাগজে সীমারেখা তোলা, আরেক দলের কাজ হল সেগুলিকে রঙ করা। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় ভিক্টোরিয়া অ্যাণ্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়মের আকবরনামায় অধম খাঁর মুণ্ডচ্ছেদ চিত্রে, রেখা আঁকেন মিশকিন, রঙ দেন শঙ্কর। অনেক সময়ে একই ছবি তিনজন শিল্পী হাত মিলিয়ে 'আমল' করতেন। আবার অনেক ছবিতে চারজনও থাকতেন। যেমন আকবরনামায় একটি দরবার চিত্রে 'তার-কশ' করেন মিশকিন, রঙ আমেজ করেন সারওয়ান ; মুখাবয়ব আঁকেন (চিরা-নামি করা বলত) তৃতীয় এক শিল্পী তাঁর নাম ঠিক পড়া যায় না ; প্রতিকৃতিগুলির মুখ ছাড়া শরীরের বাকি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ (ফারসীতে বলত সুরত) আঁকেন মাধো। ঠিক কিভাবে বা ধরনে কাজ ভাগ হত, আন্দাজ করা শক্ত। তবে মনে রাখলেই হয় যে র‍্যাফেইল বা রুবেন্সও অনেক সময়ে ছবির মুখগুলি আঁকতেন নিজে, বাকি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আঁকত তাঁদের ছাত্ররা। কিন্তু এটা ঠিক যে একই ছবিতে একাধিক শিল্পী কাজ করলে সে ধরনের চিত্ররীতি দ্রুত কারিগরির পর্যায়ে নেমে আসে, নিছক স্বয়ম্বশ সৃষ্টির তাগিদ বা প্রাণ তাতে থাকে না। আস্তে আস্তে প্রাণহীন নিপুণ কারিগরি হয়ে দাঁড়ায়। আর হয়েছিলও তাই ; অধিকাংশ মুঘল ছবি নিছক নৈপুণ্যের প্রমাণ বয়ে বেড়ায় ; তাতে প্রাণ নেই, দর্শকের মনে নাড়া দেয় না ; আবেগহীন, সুষ্ঠু, ঠুনকো, সুন্দরপানা অলঙ্কার বা গৃহসজ্জাতেই তার মূল্য শেষ হয়।

লিপিশৈলী বা ক্যালিগ্রাফির সঙ্গে ক্ষুদ্রকায় ছবির যে কত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তা এককথায় বলে শেষ করা যায় না। অতি বিচিত্র, সুন্দর, চিত্রপ্রায় অক্ষর লিখে লিখেই যে চীনে শিল্পীরা রেখায় রূপ, চিত্রের অবশ্যম্ভাবিতা, সম্ভাবনা ইত্যাদি সম্বন্ধে ধারণা করেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রত্যেকটি অক্ষরের চিত্ররূপ, সংহত বেগবান গতি কি করে অক্ষরের রেখার মধ্যে স্তব্ধ রাখতে হয়, কি করে লেখার স্রোত চিত্রের আবর্ত সৃষ্টি করে, সে সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞান হস্তলিপির চর্চা থেকেই আসে ; চীনে যেমন এসেছে, তেমনি এসেছে মধ্যপ্রাচ্যে, তিব্বতে, আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি উড়িষ্যায় এবং কিছুটা বঙ্গে। ইওরোপের চিত্র ও লিপিশৈলীর অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ স্বতঃসিদ্ধ। এমন কি আধুনিক যুগে নন্দলাল বসুর সুনিপুণ সৌকুমার্য ক্যালিগ্রাফির গুণাগুণের উপর একান্ত নির্ভর একথাও বলা যায়। একথা বোধ হয় অনস্বীকার্য যে, যে জাতির বর্ণলিপি যত চিত্রপ্রায় ও চিত্রধর্মী সে জাতির পক্ষে সার্থক চিত্র নির্মাণ তত সহজ হয়েছে, যেমন সম্ভব হয়েছে চীনেদের, এবং আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি ওড়িয়াদের। ওড়িয়া বর্ণলিপি এত চিত্রানুগ বলেই বোধ হয় ওড়িয়ার পক্ষে জাতি হিসাবে ভারতবর্ষে সবচেয়ে বড় শিল্পীর জাতি হওয়া সম্ভব হয়। ঠিক যেমন হয়েছে তিব্বতীরা, তাদের বর্ণলিপির সাহায্যে।

আবুল ফজল ক্যালিগ্রাফি আর চিত্রাঙ্কণের মধ্যে গূঢ় সম্বন্ধ ভাল মত বুঝতেন, তাই তিনি তাঁর ৩৪ নং আইনে দুই বিষয়েরই আলোচনা একত্রে করেন। এমন কি তিনি ক্যালিগ্রাফির আলোচনাকেই বেশি প্রাধান্য দেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় ক্যালিগ্রাফি সম্বন্ধে যেখানে তিনি আলোচনা করলেন সাত পৃষ্ঠা ধরে, চিত্রাঙ্কণ সম্বন্ধে সেখানে তিনি লিখলেন মাত্র দুই পৃষ্ঠা। লিপিশিল্প সম্বন্ধে তাঁর ভূমিকাটি খুব হৃদয়গ্রাহী :

"আমরা যাকে রূপ বলি তাকে ধরে আমরা দেহে পৌঁছই ; দেহ আবার আমাদের শেখায় কাকে বলে ধ্যান, কাকে বলে ধারণা। যথা, আমরা অক্ষরের রূপ দেখে অক্ষরটিকে, কথাকে চিনি, তার থেকে ধারণায় পৌঁছই। লোকে যাকে ছবি বলে তার বেলায়ও একথা খাটে। কিন্তু যদিও এটা ঠিক যে চিত্রশিল্পীরা, বিশেষ করে ইওরোপীয় শিল্পীরা, এমন ছবি আঁকতে পারেন যার থেকে মানুষ কি ভাবছে, চিন্তা করছে, অনুভব করছে তার মনের অবস্থা কী রকম, স্পষ্ট বোঝা যায়, যার ফলে ছবিকেই বাস্তব বলে মনে হয়, তবুও এটা স্বীকার করতেই হয় যে চিত্র অক্ষরের চেয়ে নিকৃষ্ট, কারণ অক্ষরের মাধ্যমে আমরা যুগ যুগান্তরের সঞ্চিত জ্ঞানের হদিশ পাই। অক্ষর জ্ঞানের আকর।

"আমি প্রথমে লিপিশিল্পের কথা বলব, কারণ লিপি আর চিত্রের মধ্যে লিপিই বেশি মূল্যবান। সম্রাট দুটি শিল্পের উপরই খুব নজর রাখেন, কারণ তিনি নিজে রূপ ও ধ্যান ধারণা দুইয়েরই উৎকৃষ্ট বোদ্ধা।

"সত্য কথা বলতে, শুদ্ধ সুন্দরের যাঁরা উপাসক, তাঁরা অক্ষরের আলোর জ্যোতি দেখতে পান, আর যাঁরা দার্শনিক তাঁরা—জমশেরের বাটিতে যেমন সৃষ্টির ভূত-ভবিষ্যত-বর্তমান ধরা পড়ত—অক্ষরের মধ্যে সব দেখতে পান। অক্ষরের মধ্যে থাকে জাদু, যেন আবিষ্কারের কলম থেকে অধ্যাত্মরূপী জ্যামিতির মত বেরোয়, অদৃষ্টের হাত থেকে স্বর্গের বাণীর মত, এর মধ্যে লুকিয়ে থাকে বীজমন্ত্র ; অক্ষর হাতের জিভ। যারা কাছে থেকে শোনে তাদের হৃদয়ে মুখের কথা ঢুকতে পারে ;কিন্তু যে যেখানেই থাকুক সকলের কাছেই লেখার অক্ষর জ্ঞানের কথা পৌঁছে দেয়। অক্ষর জ্ঞানের প্রতিকৃতি এঁকে যায় ; ধ্যান আর ভাবজগতের যেন স্কেচ করে দেয় ; কালো রাত্রির মধ্যে দিয়ে আনে দিন ; এ যেন জ্ঞানগর্ভ কালো মেঘ ; অন্তর্জগতের ধনদৌলতের চাবিকাঠি ; বোবা অথচ মুখর, নিশ্চল অথচ ভ্রাম্যমাণ ; কাগজের উপর ছড়ানো, অথচ উর্ধ্ব গগনে উড্ডীয়মান।"

চীনে ও জাপানী ক্যালিগ্রাফির গুণেই যে চীনে বা জাপানী চিত্রে এসেছে স্বতঃস্ফূর্ত রেখার স্রোত ও স্বচ্ছন্দ গতি, রেখাচিত্রে এসেছে অসীম বৈচিত্র্য, সে সম্বন্ধে দ্বিমত নেই। চীনে কত রকমের রেখাচিত্রের ধারা আছে চট করে বলা শক্ত, কিন্তু জাপানে সচরাচর দশটি বিভিন্ন ধারা অনায়াসে নজরে পড়ে, আর প্রত্যেকটি ধারাই এক একটি বিশেষ রূপসৃষ্টির বাহক। ঠিক এইভাবে পারসীক আর মুঘল লিপিশিল্পের সঙ্গে মুঘল ক্ষুদ্রকায় ছবিতেও এসেছে এক বিশেষ চরিত্র। সে চরিত্রে হয়ত চীনে ছবির স্বচ্ছন্দ স্রোত ও সাবলীল গতি নেই, কিন্তু আছে সুকুমার পেলব স্পর্শ, নিশ্চিন্ত, নিখুঁত রেখা।

ছবি আঁকার বিষয়ে মুঘল চিত্রশিল্পী উপকরণ ব্যাপারে খুব খুঁতখুঁতে হতেন। মধ্য যুগে ভারতবর্ষে ছবি আঁকার উপযোগী কয়েক রকম দামী কাগজ তৈরি হত। এক রকম কাগজের নাম ছিল হারিরি (ওরফে রেশমী)। এটি সিল্কের মত কাগজ হত, কিন্তু কিছুদিন পরে ফেটে যেত। হায়দ্রাবাদের দৌলতাবাদে দৌলতাবাদী বলে এক রকম বিখ্যাত কাগজ হত। হিন্দী বলে সাধারণ কাগজেরও বেশ চলন ছিল। পরবর্তী যুগে পাঞ্জাবের শিয়ালকোটে তৈরি শিয়ালকোটী কাগজও খুব চলত। দক্ষিণ ভারতে মুঘলী বলে এক ধরনের কাগজ খুব চলত, নাম শুনে বোঝা যায় উত্তর রীতির কি রকম চলন ছিল। আরেকটি ভাল কাগজ হত মহীশূরে, তাকে বলত কারদে। বাঁশ থেকে যে সব কাগজ হত তাকে বলত বাভসাহা বা ভাঁশি কাগজ। পাট বা টাট থেকে যে কাগজ হত তাকে বলত টাটাহা। তুলা থেকে যে কাগজ হত তাকে বলত তুলোট কাগজ। আরেকটি কাগজ শণ থেকে হত, তাকে বলত শুন্নি কাগজ। ঈরাণী আর ঈস্পাহাণী বলে দুটি বিদেশী কাগজের খুব নামডাক ছিল। এর মধ্যে অবশ্য কোন কাগজই ধবধবে সাদা হত না, একটু হলদেটে হত। কাগজ পছন্দ হবার পর শিল্পী দুই বা ততোধিক কাগজ একের উপর আরেক আঠা দিয়ে জুড়ে পুরু করে নিতেন। অবশ্য পুঁথিচিত্র এক তা কাগজেই আঁকা হত। কাগজের জমিটি গোল নুড়ি দিয়ে মসৃণ করে নেওয়া হত, ফলে মিনের মত পালিশ উঠত। এইভাবে জমি 'তার' করে নিয়ে রেখার সাহায্যে নক্‌শা করা হত, অর্থাৎ 'তার-কশ' করা হত। রাজপুত ছবিতে যে ভাবে নক্‌শা করা হত বলেছি সেই ভাবেই হত। গেরু দিয়ে প্রথম রেখাচিত্রটি হত ; ইচ্ছে করলেই এটি মুছে ফেলা যেত। তারপর ভুসোকালি দিয়ে রেখাটি ভাল করে আঁকা হত। ভুসোকালি তৈরি হত সর্ষেতেলের প্রদীপের উপর কর্পূরের কাজল করে। চিত্রশিল্পীরা নিজেদের রঙ নিজের হাতে তৈরি করে নিতেন, আজও অনেক শিল্পী যেমন করেন। নানারকম গাছগাছড়া বা মাটি থেকে রঙ তৈরি হত। গালা থেকে হত আলতা রঙ ; হেনার পাতা থেকে হত কালচে ব্রাউন রঙ ; মুলতানী মাটি থেকে হত হলুদ রঙ ; সাদা হত কাশগর থেকে আনা একরকম মাটি থেকে ; লাল হত হরমচি বা গেরু থেকে ; সিঁদুরে রঙ হত সিঁদুর মাটি থেকে ; আশমানি রঙ হত বাদাক্‌শান থেকে আনা ল্যাপিজ ল্যাজুলাই বা লজওয়ার্দ থেকে, বা নীল থেকে ; হলুদ হত হরতেল, মুলতানী মাটি, পিউরি বা ঢাক ফুলের রস থেকে (ঢাক ফুলের রসকে বলত নক্‌লী পিউরি)। সবুজ জাঙ্গাল বা জাঙ্গার গুঁড়ো থেকে, অথবা নীল আর হরতেল মিশিয়ে, জলপাই সবুজ, অথবা মুগ সবুজ, অথবা তরমুজি সবুজ হত ভুসো, হরতেল আর নীল মিশিয়ে। বেগুনে বা পার্পল হত সিঁদুর আর নীল মিশিয়ে। গাঢ় পার্পল হত ভুসো আর হরমুজি মাটি মিশিয়ে (হরমুজি মাটি পারস্যোপসাগরের হরমুজ দ্বীপ থেকে আসত)। সোনার তবক খুব ব্যবহার হত। পারসীকরা তিসির তেলের সঙ্গে সন্দরক মিশিয়ে একরকম স্বচ্ছ বার্নিশ করতেন।

মুঘল বা রাজপুত চিত্রের নির্মাণ রীতি একরকম। প্রথমে হত মধ্যস্থলের প্যানেলটি, যেখানে ওস্তাদ শিল্পী মূল

ছবিটি আঁকতেন। ছবির পাড় আঁকতেন আরেকজন শিল্পী, সে সম্বন্ধে আগেই বলেছি। মধ্যস্থলের প্যানেলটি, অর্থাৎ যাকে বলে আসল 'তসবীর'টি, একটু একপাশ করে দেওয়া হত, যাতে ছবিটিতে বিশেষ মাধুর্য ও স্বাভাবিক ভঙ্গি আসে। তসবীরের চারপাশের পাড়কে বলত হাশিয়া। যেখানে হাশিয়া এসে তসবীরের সঙ্গে মিলেছে, সেখানে সরু নক্‌শা করা একটি পটি হত, তার সঙ্গে হত দুটি রঙীন রেখা। পটিকে বলে ফুলকারি বা বালে ; রঙীন রেখা দুটিকে বলত যাদবাল বা খাট। ফুলকারি বললে বুঝতে হবে এখানে ওখানে ফুল দিয়ে অলঙ্কৃত করা, কিন্তু বালে বললে বুঝতে হবে একটি নক্‌শা একটানা ঘুরে ঘুরে গেছে। হাশিয়ার সমস্ত প্রস্থটি সাধারণত ফুটকি ফুটকি সোনা দিয়ে ভর্তি হত। এই সোনার ছিট যখন ঠিক নিয়ম করে একের পর এক পড়ত তখন তাকে বলত টিক্কি (কপালের টীকা থেকে কথাটা এসেছে), আরও ছোট ছোট সোনার ফুটকিকে বলত শাফাক, আর খুব মিহি ছিট ছিট সোনাকে বলত গুবারা। এই ধরনের সোনার চুমকির কাজ হত দুই উপায়ে ; হয় কড়া তুলি দিয়ে ভিজে সোনা রঙ ছিটিয়ে ছিটিয়ে দিয়ে, না হয় একটি ছোট্ট ন্যাকড়ার থলিতে মিহি করে গুঁড়োনো সোনা ভরে তাই ছবির উপর থুপে থুপে। তবে থোপাবার আগে ভাতের পাতলা মাড় জল দিয়ে জমিটি তৈরি করে নিতে হত। হাশিয়া যখন গুচ্ছ গুচ্ছ ফুলে ভরে দেওয়া হত (এ হত সবচেয়ে দামী ছবিতে) তখন এর নাম হত ঝাড়।

ছাগল, উট, কাঠবেড়ালী, নেউলের লোম থেকে তুলি হত (সিংহলে টেলিটানা বলে একরকম ঘাস তুলি তৈরি হত।) ছবিতে মণি মুক্তা চূর্ণও দেওয়া হত। একে বলত 'জারা' করা। মণি মুক্তা সাধারণত লাগানো হত উষ্ণীষে, সাজসজ্জায় বা অলঙ্কারে। শুধু জলের ব্যাপারও ছিল নানা রকম। এক ধরনে জল দেওয়া হত, তাকে বলত আবিনা ; শুধু জল বুলিয়ে শুকিয়ে নেওয়া হত, কাগজে জলের দাগ থেকে যেত। সেই দাগ ধরে নক্‌শা আঁকা হত। কাশ্মীরী চিত্রশিল্পীরা একটি পাত্রে জল রেখে, সেটি শুকিয়ে গেলে তলায় যে সাদা লবণ পড়ে থাকত, তাই দিয়ে চিরা-নামি করার সময়ে ছবির মুখে রঙের এক অদ্ভুত আমেজ আনতেন। প্রায় সব রঙই জল রঙ হত তবে জলের সঙ্গে গঁদ, কষ, আটা, গুড় বা তিসির জলও মেশানো হত। সাধারণত কাগজে ছবি আঁকার রীতি থাকলেও ক্যানভাস বা চটেও ছবি আঁকা হত। ক্যানভাসে আঁকার রীতি বেশ প্রাচীন ছিল ; চটে আঁকা হাম্‌জানামার ছবি এখনও ইওরোপের নানা জায়গায় রক্ষিত আছে। কিন্তু চটে আঁকার রেওয়াজ খুব বেশি ছিল না, উপরন্তু তেল রঙের ব্যবহার ছিল না বললেই হয়।





ষষ্ঠ অধ্যায়

মুঘল চিত্রের দ্বিতীয় যুগ

ভূমিকা

১ । উত্তর ভারত

মুঘল চিত্রকলা সম্বন্ধে আলোচনা একটু বড় হয়ে গেল। অনেক বলেন মুঘল চিত্ররীতি ভারতীয় ঐতিহ্যে একটি উপাখ্যান ; দেশজ শিল্পের পাকা সড়ক নয়। এটা বোধহয় বলা নিতান্ত ভুল। কারণ আমরা দেখেছি কি করে মুঘল চিত্রনীতির মাধ্যমে ভারতীয় শিল্পী এক বিদেশী নীতি সম্পূর্ণ আয়ত্ত ও পরিপাক করে, আত্মসাৎ করে নিলেন। মুঘল রীতিকে উপাখ্যান বলা আর মুসলমান যুগকে বিদেশী যুগ বলা একই রকমের ভুল হবে। মুঘল চিত্র নিতান্ত ভারতীয় চিত্র। অন্নজল যখন শরীরে রক্ত হয়ে যায় তখন ত আর তা অন্নজল থাকে না।

এখন আমরা সংক্ষেপে মুঘল চিত্রকলা পরবর্তী যুগে ভারতের চতুর্দিকে কি রকম অপভ্রংশে পরিণত হল তার সামান্য বিবরণ দেব। প্রত্যেকটির বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে পাণ্ডিত্য দেখাবার জায়গা এটা নয়। কারণ পরবর্তী যুগে, আগে যা ছিল শিল্পপ্রতিভা তা অনেকাংশে হয়ে গেল নিছক ঠাট, বা রীতিপদ্ধতি বা কারিগরি নৈপুণ্য। চিত্রগুণ গেল কমে, স্থানীয় গৌণ বৈশিষ্ট্য কিছু কিছু এল স্থান-মাহাত্ম্যের মুদ্রাদোষে, কিন্তু প্রৌঢ়ত্বে ও বার্দ্ধক্যের জরায় প্রতিভা গেল স্তিমিত হয়ে। তা সত্ত্বেও আঠারো শতকে মুঘল চিত্রে বন্ধ্যাত্ব এল বলা যায় না, কারণ এই শতকের চিত্রে এক ধরনের কাব্যরস দেখা যায় যাকে রোমান্টিসিজম্ বলা যায়। এই গুণ বোধহয় আসে রাজপুতানা থেকে। সম্রাট বাহাদুর শাহের শিকার চিত্র কতকগুলি আছে, সেগুলি স্পষ্টই রোমান্টিক, তার মধ্যে একটি যে তার বছর পনেরো আগের আঁকা বিকানীরের একটি ছবি থেকে নেওয়া তা বেশ বোঝা যায়। নূরজাহানের কয়েকটি মাথা ও আবক্ষ পোর্ট্রেট এবং অন্যান্য মুঘল রাজপুরুষের ছবিও কিছু কিছু এ সময়ে হয় ; এগুলিরও কিষণগড়ের চিত্রধারার সঙ্গে কিছু মিল আছে, বিশেষ করে এদের বিষয়ের গীতিকাব্যধর্মী রসে। কিন্তু তবুও স্পষ্ট বোঝা যায় যে মুঘল চিত্ররীতির নাড়ি দুর্বল হয়ে পড়ল, কারণ এই শতকের প্রধান কাজই হল পুরনো ছবি নকল করা। নকলের কাজ দিল্লীতে যথেষ্ট হয়, আবার লক্ষ্ণৌ এবং আউধেও হয়। এই সময়ে মুঘল চিত্ররীতির একটি অপভ্রংশ দাক্ষিণাত্যের একটি জায়গায় যথেষ্ট কাজ করে। স্থানটি হচ্ছে আর্কট ; সেখানে আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে গোলকুণ্ডা চিত্ররীতির প্রসার হয়। চাঁদিনী রাতের আধোছায়াময় প্রেমের চিত্রগুলিতে সত্যিই একটি মধুর রোমান্টিক কাব্যগুণ ফুটে ওঠে, এবং এইসব দক্ষিণী ছবিতে নকশার কাজ যে বেশ ভাল তা সুরাপুর বা কার্ণুলের ছবি থেকে বোঝা যায়। হায়দ্রাবাদের আশ্রফ সংগ্রহে কতকগুলি খুব ভাল ছবি আছে। এমন কি হায়দ্রাবাদের নিজামী রীতিও, খানিকটা নিষ্প্রাণ, ঊষর হলেও, একেবারে খেলো নয়।

(ক) মুঘল মহারথীদের পরের যুগ (১৭০৭-১৮৮৫)

মুঘল যুগের অন্তরাগ (১) (১৭০৭-১৭৪৮)

সাতাশি বছর বয়সে ১৭০৭ সালে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়। দ্বিতীয় পুত্র বাহাদুর শা' নাম নিয়ে সম্রাট হন। ১৭১২ সালে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে জাহান্দরকে সিংহাসনচ্যুত করে তাঁর ভাইপো, ফররুখশিয়ার হলেন সম্রাট (১৭১৩-১৭১৯)। এই কয় বছরে মুঘল চিত্ররীতির বিশেষ কিছু পরিবর্তন বা উন্নতি হয়নি, তবে যেহেতু ফররুখশিয়ারের বেশ কিছু প্রতিকৃতি পাওয়া যায় তাতে মনে হয় চিত্রকলা সম্বন্ধে সম্রাটের উৎসাহ ফিরে আসছিল। সম্রাট তাঁর সাম্রাজ্য সম্বন্ধে কতখানি উদ্বিগ্ন ছিলেন বলা অবশ্য যায় না, কিন্তু একটি ছবি আছে যাতে ফররুখ রাজচিহ্ন হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে, মুখে কেমন যেন আত্মবিশ্বাসের অভাব, বেশভূষা বড় বেশি ঝকমকে, পিছনে আকাশের মেঘগুলিও স্তরে স্তরে পোশাকের মত সাজিয়ে আঁকা। ১৭১৯ সালে ফররুখ সিংহাসনচ্যুত হলে অল্পদিনের অনিশ্চয়তার পর বাদশা হলেন মহম্মদ শা' (১৭১৯-১৭৪৮)। এঁর রাজত্বে মুঘল চিত্ররীতি কিছুটা পুনরুজ্জীবিত হয়। কারখানা যদিও বেশ ছোট হয়ে গেছে তবুও সে সময়ের ছবিগুলিতে মেজাজে বেশ আত্মস্থ, নিশ্চিন্তভাব ফিরে আসে। চিতরমনের আঁকা মুঘল দরবারের একটি ছবিতেই এই মেজাজটি বেশ স্পষ্ট। ১৭৩৫ সাল নাদিরশাহের দিল্লীজয় ও ধ্বংস, উপরন্তু ময়ূর সিংহাসন ও বহু মূল্যবান চিত্রিত পুঁথি ও মুরাক্কা লুঠ হয়ে ঈরাণে চলে যাবার ফলে মুঘল দরবারের চিত্রকর্মের জাঁকজমকে ভাঁটা পড়ে। তা সত্ত্বেও যে সব অমূল্য ছবি দিল্লীতে থেকে যায় তার মধ্যে গোবর্ধনের আঁকা একটি ছবি ও সঙ্গে কারনামা-ই-ইশ্‌ক্ বলে তাঁরই আঁকা ৩৭টি মিনিয়েচর সম্বলিত একটি পুঁথি পরে জন্‌সন্‌সংগ্রহভুক্ত হয়। এসময়ে গোবর্ধনই সম্ভবত হলেন কারখানার নেতা, তাঁর অধীনে বেশ কিছু চিত্রকর কাজ করে। মহম্মদ আফজল বলে এক চিত্রকরের আঁকা একটি মেয়ের ছবি দেখে মনে হয় ছবিটিতে গোবর্ধনের হাত ছিল। ১৭২৪ সালে মহম্মদ শাহ সাদাৎ খানকে আযোধ্যা বা আউধের গর্ভনর নিযুক্ত করেন। এরপর থেকে দিল্লীর বাদশাদের প্রাধান্য কিছুটা খর্ব হয়ে আউধের নবাবদের প্রাধান্য বাড়ে।

তা সত্ত্বেও বাদশা ও ওমরাহদের ও দরবারের ঘনিষ্ঠ রাজপুরুষ ও মহিলাদের অনেক প্রতিকৃতির সৃষ্টি হয়। নামজাদা শিল্পীও অনেকে তখন মুঘল দরবারের কারখানায় বহাল হয়ে ছবি আঁকতেন : যেমন রায় অনুপ চত্তর ; ঠাকুর রাও গজসিং ; খানজাদা চিতরমন ; গোবর্ধন ; (গোবর্ধনের আঁকা ছবি বেশ কিছু পাওয়া গেছে) ; দলচাঁদ ; হুনহার ; মহম্মদ ফকিরুল্লা খান ; ইত্যাদি।

মুঘল যুগের অন্তরাগ (২) (১৭৪৮-১৮০৬)

১৭৪৮ সালে মহম্মদ শা'র মৃত্যুর পরে মুঘল দরবারের চিত্র-'কারখানা'য় শিল্পীনিয়োগ যদিও প্রায় বন্ধ হয়ে গেল, তবুও দিল্লী শহরে ও আশেপাশের রাজ্যে প্রসিদ্ধ শিল্পীরা ছড়িয়ে পড়ে কিছু কিছু কাজ পেতে লাগলেন। ইতিমধ্যে অনেক বিখ্যাত শিল্পী ফৈজাবাদ (অযোধ্যা) ও লক্ষ্ণৌতে কাজ পেয়ে চলে গেলেন। দিল্লীর কলমে চরিত্রচিত্রণে, পুরাণে, ইতিহাসে, জীবনীগ্রন্থে, প্রকৃতির যাবতীয় ঐশ্বর্য, পশুপক্ষী আঁকা, অনেক কমে গেল। এ যুগে প্রাকৃতিক তথা নগরের দৃশ্যহিসাবে নিধামলের চিত্রিত দিল্লী ফোর্টের ছবিটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিছুটা ইটালির স্বর্ণযুগের শেষাশেষি কানালেত্তোর ভেনিস চিত্রাবলির স্মৃতি জাগিয়ে দেয়। নিধামল ছিলেন মহম্মদ শা'র দরবারের শিল্পী, দিল্লীফোর্ট ছবিটির তারিখ আনু. ১৭৫০। দিল্লীর তদানীন্তন অবস্থা ১৭৭২ সালে লেখা দিল্লী দরবারের মারাঠা দূতের একটি চিঠি থেকে বোঝা যায়। হিন্দু দেবদেবীর উত্তম ছবি আঁকার মত কিছু শিল্পী দিল্লীতে পাওয়া যাবে কিনা মহারাষ্ট্র দরবার থেকে এই প্রশ্নের উত্তরে দূত লেখেন দিল্লীতে ভাল হিন্দু চিত্রকর পাওয়া যায় না, কারণ দিল্লীতে কাজের অভাবে তাঁদের অধিকাংশই লক্ষ্ণৌ ও অন্যান্য নগরে চলে গেছেন। সুতরাং এই যুগে অর্থাৎ ১৭৪৮-১৮০৬ সালের যুগে যা কিছু ছবি দিল্লী কলম নামে চলে সে সব মুঘল ধারায় বলে অভিহিত হলেও অধিকাংশই অন্যত্র আঁকা। এই কারণে যদিও কিছু কিছু ছবিতে প্রতিকৃতি হিসাবে যথেষ্ট উৎকর্ষ তখনও দেখা যায়—যেমন আহমদ শা'র (১৭৪৮-৫৪) প্রতিকৃতি, নজম্‌-অল্‌-দিন আলিখানের এবং একটি মহিলার প্রতিকৃতি। (দুটিরই চিত্রকর চিতরমন ওরফে কল্যাণ দাস), শিল্পী ফৎচাঁদের কুকুভ রাগিণী (আনু. ১৭৫৭), তবুও ছবির বিষয় হল কিছুটা এলোমেলো। চিরাচরিত বিষয় নিয়ে নয় বলেই হয়ত কিছু কিছু ছবি যেমন

উৎকৃষ্ট, তেমনি বিষয় হিসাবে চমকদার, যেমন, বনের কুটিরে রাত্রির দৃশ্য (শিল্পী আকিল খান), একটি মেয়ে ও জন্তুর সমষ্টি দিয়ে আঁকা সম্পূর্ণ একটি মন্ত্রপূত ঘোড়া, আরোহিণী একটি পরী, হাতে একটি কমলারঙের ধ্বজা, ঘোড়ার পিছনে ছুটছে একটি কুকুর। আকাশে স্বর্ণ রঙ, একেবারে উপরে রঙীন মেঘ। দিনে ও চাঁদের আলোয় আঁকা মহিলা ও অল্পবয়স্কা মেয়েদের ছবিও কিছু কিছু আছে, আছে বাদ্যকর, গাইয়েদের ছবি, নিদ্রারত সন্ন্যাসীদের ছবি (চিত্রকর মাসুদ), দরবেশদের ছবি। তার সঙ্গে আছে স্মৃতিউদ্রেককর কিছু কিছু আগেকার বাদশাহের ছবি। বিষয়বৈচিত্র্যে এই যুগটি উল্লেখযোগ্য। স্পষ্টই বোঝা যায় শিল্পী বাঁধাধরা পৃষ্ঠপোষকের কারখানায় আর তেমন বেশি কাজ পাচ্ছেন না, নানান পৃষ্ঠপোষকের যখন যেমন চাহিদা সেইমত সেটি যোগাচ্ছেন।

মুঘল অন্ত যুগ (৩) (১৮০৬-৫৮ ও পরের)

দ্বিতীয় আকবর শা' (১৮০৬-১৮৩৭) এবং দ্বিতীয় বাহাদুর শা'য়ের (১৮৩৭-১৮৫৮) কিছু কিছু শিল্পী দিল্লী দরবার আঁকড়িয়ে পড়ে রইলেন। দুটি উৎকৃষ্ট প্রতিকৃতি আছে, দুটিই শিল্পী গোলাম মুর্তজা খানের : একটি বাদশা দ্বিতীয় আকবর শা'র (স্বাক্ষরে লেখা : এই যুগের বিস্ময়, বিহ্‌জাদের সমকক্ষ, মহান দরবারের শিল্পী গোলাম মুর্তাজা খান) অন্যটি যুবরাজ আবু জাফর-সিরাজ-অল দিন মহম্মদ (পরে দ্বিতীয় বাহাদুর শা')। বেশির ভাগই পাঁচমিশেলী বিষয়ের ছবি এবং সংখ্যায় কম। স্পষ্টই বোঝা যায় পৃষ্ঠপোষকের সংখ্যা বহুগুণ কমে গেছে।

(খ) প্রাদেশিক মুঘল রীতি (১৭৬০-১৮৬৫)

(১) ফৈজাবাদ বা লক্ষ্ণৌ কলম

আঠারো শতকে উত্তর ভারতের মুঘল রীতির মুখ্য কেন্দ্র বলা যায় অযোধ্যা প্রদেশের রাজধানী লক্ষ্ণৌকে। কেবল ১৭৬৫ থেকে ১৭৭৫ পর্যন্ত এই প্রদেশের রাজধানী সাময়িকভাবে ফৈজাবাদে স্থানান্তরিত হয়। এখন ফৈজাবাদকে অযোধ্যার সঙ্গে সামিল করা হয়। ১৭২৪ সালে মুঘল সম্রাট মহম্মদ শাহ, সাদাৎ খাঁ বুরহান অলমুল্ককে অযোধ্যার রাজ্যপাল নিযুক্ত করেন। দিল্লী দরবারে এই নিয়োগ-উৎসবের একটি চিত্রিত ছবি আছে। তিন বছরের মধ্যে যখন সম্রাট সাদাৎ খাঁকে মালোয়ার রাজ্যপাল করে পুনর্নিয়োগ করলেন তখন তিনি সে-আদেশ অগ্রাহ্য করে নিজেকে লক্ষ্ণৌতে অযোধ্যার স্বাধীন শাসক হিসাবে ঘোষণা করেন। এর পর লক্ষ্ণৌ ক্রমে ক্রমে প্রাধান্য ও শক্তিলাভ করে। ১৭৭৫ থেকে ১৭৯৭ পর্যন্ত চিত্রকলার জগতে লক্ষ্ণৌ বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করে। উপজীব্য বিষয় হল মুখ্যত মুঘল দরবারের মহিমা ও ঐশ্বর্যের স্মৃতি এবং তার সঙ্গে সেই যুগের হিন্দু ও ইসলামীয় বিশেষ বিশেষ কিছু উপপাদ্য লক্ষণ ও বিষয়। লক্ষ্ণৌ দরবারের শিল্পীরা ছাড়াও, লক্ষ্ণৌ ও অযোধ্যার প্রধান প্রধান শহরে বেসরকারী পৃষ্ঠাপোষকদের আওতায় অনেক চিত্র-কারখানা ও 'দোকান' গড়ে ওঠে। এর মধ্যে অনেকগুলিই গড়ে ওঠে এক বা একাধিক বিশিষ্ট ও স্বনামধন্য শিল্পীর চারদিকে। বিখ্যাত শিল্পীদের মধ্যে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন মীর কালান খান, মিহিরচাঁদ ; প্রথম জন খ্যাতিলাভ করেন ফৈজাবাদে কাজ করে। ১৭৭৫-এর পর তাঁরা লক্ষ্ণৌ গিয়ে কাজ শুরু করেন। তাঁদের সঙ্গে নাম করা যায় বাহাদুর সিং, পাটিক চাঁদ, রামসহায়, মুলচাঁদ, মীর মহম্মদ, হুনহার, মিশকিন, মুহম্মদ, উত্তমচাঁদ, মহম্মদ আফজল, জগন্নাথ, গোবিন্দ সিং, মোহন সিং, গোলাম রিজা, শীতল দাস, মহম্মদ জান প্রভৃতির। নাম দেখেই বোঝা যায় শিল্পীরা নিজেদের নাম রাখেন তাঁদের সুবিখ্যাত পূর্বসূরীদের অনুসরণে। এই যুগেও চিত্রের বিষয় মূলত প্রতিকৃতি ও রাগরাগিণী। কিন্তু আগের যুগের মত সাধারণ দৃশ্যও অনেক আছে। সম্ভবত বিদেশী ক্রেতাদের চাহিদাই এই নতুন হাওয়ার কারণ। গত চল্লিশ বছরে দিল্লী বা উত্তরাঞ্চলে মুঘল মিনিয়েচর বলে যে সব ছবি বিক্রির জন্য পাওয়া যায় তার অধিকাংশই হয় নকল, না হয় যদি সত্যিই আসল হয় তবে লক্ষ্ণৌ কলমের। পুরনো সম্ভ্রান্ত বাড়ির সম্পত্তি। কোন বাদশা বা নবাবের ব্যক্তিগত রুচির দ্বারা নির্দিষ্ট না হবার ফলে বিষয়বৈচিত্র্য হয় প্রায় অসীম, এবং বিষয়বৈচিত্র্যেই বেশ বোঝা যায় ক্রেতাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন বিদেশী, যাঁরা বিদেশী চিত্রকরদের রীতি অনুযায়ী দেশী চিত্রকরদের কাছে অপেক্ষাকৃত নামমাত্র মূল্যে, বাড়িতে টাঙ্গিয়ে রাখা বা নিজের সংগ্রহে রাখার জন্য স্মৃতিজড়ানো নানা দৃশ্যের মিনিয়েচরের ফরমায়েস দিতেন।

(২) ফররুখাবাদ (ফরক্কাবাদ) (১৭১৩-আনু. ১৭৮০)

ফররুখশিয়রের রাজত্বকালে (১৭১৩-১৭১৯) বাঙ্গাশ উপজাতির এক রোহিলাপতি, নাম মুহম্মদ খান বাঙ্গাশ—সম্রাটের সম্মানে তাঁর নামে একটি নগরস্থাপন করেন, নাম রাখেন ফররুখাবাদ। শহরটি ফৈজাবাদ থেকে ১৬০ মাইল এবং লক্ষ্ণৌ শহরের ৮০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে। তার মানে লক্ষ্ণৌ থেকে দুটি শহর দুটি দিকে প্রায় সমদূরত্বে। এই শহর স্থাপনার পর মুহম্মদ খান বাঙ্গাশকে নিজ প্রদেশ রক্ষা করতে অনেক বেগ পেতে হয়। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর তার দ্বিতীয় ছেলে আহমদ খাঁ বাঙ্গাশ ১৭৫০ থেকে ১৭৭১ পর্যন্ত প্রায় কুড়ি বছর ধরে নির্বিঘ্নে শাসন চালান। এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় বেশ কিছু শিল্পী বিশিষ্ট ভাল কাজ করে তাঁর চিত্রকারখানার গৌরববৃদ্ধি করে। প্রথমেই তৈরি হয় আহমদ খান বাঙ্গাশের কতকগুলি প্রতিকৃতি। তাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভিন্ন ভিন্নভাবে তাঁর দাড়ি ছাঁটা। দাড়ি গোঁফ খুব পুষ্ট কেবল চিবুকটি চাঁচা কামানো। আহমদ খাঁর মৃত্যুর পর মজাফর জঙ্গ নবাব হন। তাঁর প্রতিকৃতির বিশেষত্ব হচ্ছে তাঁর ঝুলে পড়া গোঁফজোড়া।

ইন্ডিয়া অফিস সংগ্রহের একটি মুরাক্কা বা অ্যালবাম আছে (৬৬ নং) তাতে ছয়টি আবেগময় রম্যচিত্র (রোমান্টিক) মিনিয়েচর আছে। প্রত্যেকটি মিনিয়েচরের উল্টোপিঠে আছে এক একটি করে ছয়টি রাগমালা ছবি। ছয়টি ছবির বিষয় হচ্ছে (১) রমণী সহচরীর সঙ্গে রাজপুত্র; (২) এক মহিলা ও সন্ন্যাসিনীর আলাপ; (৩) সহচরীর সঙ্গে রাজকুমারী; (৪) ফরহাদের দেহ শিরীন আবিষ্কার করছেন; (৫) প্রস্রবণের ধারে আটটি কুমারী সহ এক মহিলা; (৬) রাজপুত্র মহিলাপরিবৃত হয়ে ধূম্রপান করছেন। পিছনের রাগমালা চিত্রগুলি হচ্ছে: দীপক রাগ; কানদা রাগিণী; ধনশ্রী রাগিণী; বরারি রাগিণী, বসন্ত রাগিণী, দেশ্বারতী রাগিণী। দীপক রাগিণীতে রাজপুত্র ও বধূ আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে শয্যায় শায়িত, মাথার শিয়রে উষ্ণীষ, তার মধ্যে একটি প্রদীপ জ্বলছে; কানদা রাগিণীতে দেখি একটি হাতি নিহত হয়ে পড়ে আছে, যোদ্ধাকে দুটি লোক কুর্নিশ করছে; ধনশ্রীতে দেখি একজন পত্র লিখছেন, দু'পাশে দুই নারী; বরারি রাগিণীতে মহিলা শয্যায় শুয়ে ফুলের মুকুট সাজাচ্ছেন; বসন্ত রাগিণীতে রাজপুত্র ছয়টি বাদকের সঙ্গীত শুনছেন; দেশ্বারতীতে এক রাজপুত্রী দুইবাহু মাথার উপর তুলে আয়নায় নিজেকে দেখছেন। এগুলি ছাড়া আরো কয়টি প্রতিকৃতি ও আটটি রাগমালা চিত্রও রিচার্ড জন্‌সন্ সংগ্রহে ফররুখাবাদের কাজ বলে বর্ণিত আছে।

(৩) মুর্শিদাবাদ (১৭০৩-আনু. ১৭৭০)

বাংলার নবাব মুর্শিদ কুলী খান ১৭০৪ সালে ঢাকা থেকে তাঁর রাজধানী সরিয়ে আধুনিক মুর্শিদাবাদের লালবাগে প্রতিষ্ঠা করেন। মুর্শিদাবাদ বাংলা, বিহার উড়িষ্যার কেন্দ্রস্থলে হবে এই ছিল উদ্দেশ্য। যখন রাজধানী স্থাপিত হয় তখন চিত্রকর্মের কোন কারখানা মুর্শিদাবাদে স্থাপিত হয়নি। ১৭২০ সালে নবাবের প্রতিনিধি হিসাবে আলিবর্দী খান নিযুক্ত হন। ১৭২৭ সালে মুর্শিদ কুলী খান মারা যাবার পর কিছুদিন অন্তর্যুদ্ধ চলে। ১৭৪০ সালে আলিবর্দী খান নবাব হন এবং ১৭৫৬ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। আলিবর্দীর সময়ে কিছু কিছু মিনিয়েচর আঁকা হয় যা বিশিষ্ট মুর্শিদাবাদ শৈলীর বা কলমের মনে হয়। মিলড্রেড আর্চারের মতে এগুলিতে আছে কেমন একটি শীতল রঙের সমাবেশ; মনে হয় যেন সর্বব্যাপী চন্দ্রালোকের মধ্যে সব কিছু ভাসছে। তার মধ্যে আছে আবার ইওরোপীয় অঙ্কনের প্রভাব; স্পষ্টই বোঝা যায় ইওরোপীয় প্রভাব দ্রুত আসছে। ১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধ জয়ের পরেও ব্রিটিশরা নবাবের শাসনে হস্তক্ষেপ করেনি, শুধু রাজস্ব নিয়ে খালাস, এবং সেই হেতু সম্ভবত চিত্রকররা মুসলমান, হিন্দু ও ব্রিটিশ পৃষ্ঠাপোষকদের অনেক প্রতিকৃতি আঁকতেন। আমি নিজে এর কিছু কিছু জিয়াগঞ্জ আজিমগঞ্জের ধনী রাজস্থানী পরিবারবর্গের সংগ্রহে দেখেছি, আরো দেখেছি জিয়াগঞ্জের শ্রীসুরেন্দ্র সিং নেহালিয়ার পারিবারিক সংগ্রহে ও কিছু ছবি হাজারদুয়ারিতে। শ্রীমতী আর্চারের সঙ্গে আমি একমত যে মুর্শিদাবাদ কলমে, বেশ সূক্ষ্মতুলির কাজে এসেছিল কিছুটা অনাবশ্যক জমকালো রঙের বাহার, পৃষ্ঠপোষক বা দর্শককে কিছুটা চমৎকৃত করে দেবার অভিপ্রায়ে। আমি নিজে দেখিনি, শ্রীমতী আর্চার যাকে বলেন, ইন্ডিয়া অফিস সংগ্রহের স্যর এলাইজা ইম্পে সংগ্রহ (১৭৭৪-১৭৮৩) তাতে আছে আটটি রাগমালা চিত্র। তাঁর মতে ললিতা, বিভাস, রামকেলী, মেঘ, খাম্বাবতী, হিন্দোলা ও ধনশ্রী রাগিণী। এই ছবিগুলি মুর্শিদাবাদী রাগমালা শৈলীর উত্তম দৃষ্টান্ত। কম্পোজিশনগুলি যেমন আঁটসাঁট ও স্পষ্ট, তেমনি আছে সোনার উৎকৃষ্ট প্রয়োগ, যেমন জৌলুস, তেমনি ঐশ্বর্যময়,

নারীদের মুখ যেমন সুন্দর ও পেলব, চোখগুলি তেমনি কোমল আয়তভাবে আঁকা। ইন্ডিয়া অফিসের জন্‌সন্ এ্যালবামে আরেকটি অতি উৎকৃষ্ট রাগমালা চিত্রসম্ভার আছে। এটিতে আছে ৩৬টি রাগমালা চিত্র। ছবিগুলির পিছনে লেখা আছে, ভাবচ্ছবিগুলি সংস্কৃত সঙ্গীত-দর্পণের হিন্দী অনুবাদ হরিবল্লভের কাব্য থেকে। তার সঙ্গে আছে পারসীকে প্রতিটি রাগরাগিণীর সঠিক উল্লেখ, তার সঙ্গে কোনটি কি ঋতুতে কি সময়ে গাইতে হয় তার নির্দেশ। চিত্রগুলি আকারেও বেশ ভাল : লম্বায় ৩২ সেমি, চওড়ায় ২১½ সেমি। হনুমান রীতি অবলম্বনে ছত্রিশটি রাগিণী (এই বইয়ের শেষে পরিশিষ্ট দেখুন)। বিভিন্ন রাগমালা চিত্ররাজি দেখে ধারণা হয় যে পৃষ্ঠপোষকদের বেশ সমঝদারের চোখ ও বোধ ছিল বেশ শিক্ষিত ও সংস্কৃত : চারপাশের পাড়ে পরিষ্কার ঋজুরেখা, কম্পোজিশনে আছে ফুললতা ও জ্যামিতিক আকারের সুন্দর সমাবেশ। ছয় রাগের প্রতিটির বিশিষ্ট সম্বন্ধবদ্ধ জীবজন্তু, পাখি, ফুল ও নৌকো ইত্যাদির চিত্র ও বর্ণনা ছবির পিছনে স্পষ্ট করে লেখা আছে। যদিও এইসব প্রতীকের সঙ্গে সঙ্গীত-দর্পণের লেখার বিশেষ সম্বন্ধ নেই তবুও ছবিগুলি দেখেই প্রত্যয় হয় যে পৃষ্ঠপোষক ও কারখানার ওঁস্তাদ শিল্পীরা উভয়েই বিশেষ অভিনিবেশ ও নিষ্ঠা সহকারে ছবিগুলি যাথাযথ্য এঁকেছিলেন ও আঁকিয়েছিলেন। এই ধরনের সংগ্রহে রিচার্ড জন্‌সনের অবদানও কম নয়।

সারা আঠারো শতক ধরেই মুর্শিদাবাদ ছিল মুসলমান ও হিন্দু উৎসবের কেন্দ্রস্থল। মহরম ও খাজা খিজিরের উৎসব খুব জাঁকজমকের সঙ্গে পালিত হত ত বটেই। এ বিষয়ে নবাব অর্থব্যয়ে কোন কার্পণ্য করতেন না। সেইসঙ্গে জিয়াগঞ্জ, আজিমগঞ্জের রাজস্থানী শেঠদের এবং বিভিন্ন হিন্দুরাজবংশের আনুকূল্যে হিন্দু উৎসবগুলিও অতি জাঁকজমকে উদ্‌যাপিত হত। সবথেকে মনোরম হত ভাগীরথীতে প্রদীপ ভাসানো বেড়া উৎসব, যার অবশিষ্ট আমিও ১৯৪৯ সালে মুর্শিদাবাদে হাজারদুয়ারির সম্মুখে দেখেছি। নবাব মীরকাশিমের অন্তর্ধানের পর মীরজাফরের আমলে মুর্শিদাবাদ কলমের অবক্ষয় শুরু হয় এবং স্থানীয় শিল্পীরা মুসলমানী চিত্রবিষয় ছেড়ে হিন্দু দেবদেবীর ছবি আঁকায় মন দেন, বিশেষত তন্ত্রঘেঁষা দেবদেবীর। শ্রীমতী আর্চারের মতে ১৭৭০ সাল নাগাদ মুর্শিদাবাদ কলমে কিছু কিছু মুঘলোত্তর শৈলীগুণ আসে। লক্ষ্ণৌ থেকে মুঘল শিল্পী হুনহার সম্ভবত বিহারে ও বাংলায় ঐ সময়ে এসেছিলেন, এবং লক্ষ্ণৌ থেকে আরো কিছু শিল্পী মুর্শিদাবাদে আসেন। ইন্ডিয়া অফিসে মীরকাশিমের একটি প্রতিকৃতি আছে। নবাব বাগানে বসে, পারিষদ ও অমাত্য পরিবৃত হয়ে। চরিত্রগুলির মুখে ও হাবভাবে কেমন যেন লম্পট ভাব। জলাশয়ে পদ্মগুলির হলুদ বর্ণ ও চারপাশের ফুলগাছের কেয়ারিগুলিতে লক্ষ্ণৌ কলমের প্রভাব সুস্পষ্ট।

মুর্শিদাবাদ থেকে দেওয়ান ও পরে নিজামত দপ্তর ও মহাফেজখানা ব্রিটিশদের আদেশে কলকাতায় স্থানান্তরিত হলেও, আঠারো শতকের শেষ চার দশকে এবং পরেও মুর্শিদাবাদ ও বহরমপুর ছিল চিত্রাঙ্কনের একটি বড় কেন্দ্র। চিত্রকরও বেশ কিছু ছিলেন, তার মধ্যে অনেক চিত্রকর, স্বর্ণকার, হাতির দাঁতের শিল্পী, পরে পাটনায় এবং অন্যত্র বাস গুটিয়ে চলে যান। ইংরেজ অফিসাররা নিজেদের প্রতিকৃতি করিয়ে নেবার বিষয়ে বেশ আগ্রহী ছিলেন। ভিক্টোরিয়া ও অ্যালবার্ট মিউজিয়মে যেমন একটি প্রতিকৃতি আছে, উইলিয়াম ফুলারটন : চিত্রকর দীপচাঁদ।

মুর্শিদাবাদ কলম সম্বন্ধে আমার উৎসাহ জাগে ১৯৪৯ সালে ঐ জেলায় থাকার সময়। নওলাখা, নেহালিয়া, আজিমগঞ্জ, দুগার পরিবারে কিছু কিছু সংগ্রহ ছিল। কাশিমবাজার বা লালগোলা রাজবাটিতে ছবি দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। হয়ত নিজে বাঙালী বলে এবং মুর্শিদাবাদ কলম সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হয় না বলেই আমি একটু সবিস্ত র লিখলুম। পাঠক বিস্তারিত জানতে ও দেখতে পারবেন ফ'ক ও আর্চারের বইতে।

(৪) বাংলা কলম

ফ'ক ও শ্রীমতী আর্চার মুর্শিদাবাদের একটি অপভ্রংশকে বলেছেন বাংলা কলম। ইণ্ডিয়া অফিস সংগ্রহের ক্যাটালগ তিনি এই কলমের সংগ্রহ নয়টি সংখ্যায় ভাগ করেন : ৩৯০-৩৯৮। তার মধ্যে, ৩৯৩ নম্বরে আছে আটটি তান্ত্রিক দেবীদের ছবি : লক্ষ্মী, ভূতেশ্বরী, তারা, দেবী, ধর্মাবতী, দুর্গা, ভৈরবী, পীতাম্বরী, মাতঙ্গী। ৩৯৬ নম্বরের অন্তর্গত আছে সাতটি বিষ্ণু অবতার : মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, পরশুরাম, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ। ৩৯৭ নম্বরে আছে দশাবতার : মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, কল্কি। নগরগুলির বাইরে গ্রামাঞ্চলেও যে মিনিয়েচর শিল্পী ছিলেন, তার প্রমাণ হিসেবে রিচার্ড জন্‌সন্ জোড়াবাগের পূর্বে সুতাকুটি গ্রামনিবাসী আত্মারাম দাসঘোষকে কলকাতায় আনিয়ে ছন্দোবদ্ধ একটি মহাভারত গ্রন্থ চিত্রিত করান।

(৫) পাটনা (আজিমাবাদ) (১৭০৪-১৭৬৪)

ফ'ক ও আর্চার মুঘলরীতির অপভ্রংশ হিসাবে পাটনাই (আজিমাবাদ) কলমের আলাদা শ্রেণীবিন্যাস করেছেন। ১৭০৪ সালে আজিম-অল-শান তাঁর ঠাকুর্দার অনুমতিক্রমে পাটনায় তাঁর রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন, তার নাম দেন আজিমাবাদ। গণ্ডক ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে নগরস্থাপনার ফলে শহরটি বঙ্গপ্রদেশ শাসনের পক্ষে অনুকূল হয়। আজিম অল-শানের পৃষ্ঠপোষকতায় পাটনাই কলম বলে এক রীতি চালু হয়। নিঃসন্দেহে মুঘলরীতির অপভ্রংশ। বাংলার অনেক শিল্পীর প্রভাব সুস্পষ্ট। ১৭৬৩ সালে পাটনায় ইংরেজ পরিবারগুলিকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। চিকিৎসক উইলিয়াম ফুলারটন একমাত্র প্রাণে বাঁচা ইংরেজ ছিলেন। দীপচাঁদের আঁকা তাঁর প্রতিকৃতির কথা উপরে লিখেছি। তাঁর সংগৃহীত চারটি প্রতিকৃতিই ইন্ডিয়া অফিস সংগ্রহে আছে, ১৭৬৪ সালে আঁকা। চারটিই দীপচাঁদের কলমের। প্রতিটিতে বহু খুঁটিনাটি বিশদ ও সূক্ষ্মভাবে আঁকা আছে। এর মধ্যে দুটি ছবি, আশ্রফ আলি খানের ও একটি মহিলার প্রতিকৃতি, বোধ হয় কোন নর্তকী বিনোদিনীর।

আঠারো শতকের শেষে মুর্শিদাবাদ থেকে যখন অনেক শিল্পী পাটনায় এলেন, তখন ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায় শুরু হল যাকে বলে কোম্পানি স্টাইল বা কলম.। এর সঙ্গে মুঘলরীতির সম্পর্ক কম, যদিও মুঘলরীতি যাকে কোম্পনীরীতিতে রূপান্তরের কিছু কিছু চিহ্ন আছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি ছবির নাম শ্রীমতী আর্চার করেছেন, কোম্পানি কলমের শিল্পী শিবলালের পুত্রবধূ সোনাকুমারীর, শিবলালেরই আঁকা। আরো কিছু ছবি আছে, স্থানীয় লোকচিত্ররীতিতে আঁকা উৎসবের চিত্র।

মুঘল চিত্রকলার অপভ্রংশ ঃ দক্ষিণী রীতি

উপক্রমণিকা

ষোল শতকে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আগে অনেকগুলি মুসলিম রাজ্য বা সুলতানী রাজ্য ছিল। তার মধ্যে সবথেকে শক্তিশালী অবশ্য ছিল দিল্লীর সুলতানবংশ। অন্যান্য স্বাধীন সুলতানী রাজ্যও ছিল। তার মধ্যে দাক্ষিণাত্যে ছিলেন বাহমনী সুলতানরা। পাঁচটি বাহমনী প্রদেশ বা রাজ্য ছিল : বেরার, বিদর, আহমদনগর, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা। এর মধ্যে বেরার ও বিদরই ছিল সবথেকে স্বল্পজীবী এবং এই দুই রাজ্যের কোন বিশিষ্ট চিত্ররীতির কথা এখনও জানা যায়নি। কিন্তু অন্য তিনটি রাজ্যে প্রত্যেকের নিজস্ব চিত্রকর ও চিত্ররীতি ছিল।

(ক) আহমদনগর

এই তিন রাজ্যের মধ্যে আবার আহমদনগরের নিজস্ব বিশিষ্ট চিত্ররীতি ছিল। নিজামশাহী নবাবরা বিশেষ উৎসাহী হওয়া সত্ত্বেও এই কলমের কাজ এখন প্রায় দেখা যায় না। ষোল শতকের শেষে আঁকা এক আধটি দৃষ্টান্ত মাত্র আছে। দক্ষিণী রাজত্বগুলির সঙ্গে পশ্চিম এশিয়া এবং আফ্রিকার দেশগুলির সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ছিল। আহমদনগর দরবারে তুর্কি, ঈরাণী ও এবিসিনিয়ায় অনেক লোক ছিলেন, তাঁদের মধ্যে চিত্রশিল্পী ও হস্তলিপির পারদর্শীও ছিলেন। ফলে কোন ছবিটি পারস্যে ঈরাণীদের আঁকা কোনটিই বা দাক্ষিণাত্যে ঈরাণী শিল্পীর আঁকা বলা শক্ত। যেমন জনসন্ অ্যালবামে একটি চিত্র আছে বোখারা রীতিতে আঁকা ; আবার এই ধরনের রীতির আঁকা ছবি ঈরাণী শিল্পীরা দক্ষিণী দরবারে এসেও এঁকেছেন। শ্রীমতী আর্চার লিখেছেন ৫৩ নং জনসন্ অ্যালবামে একটি ছবি আছে—ভারতীয় অ্যালবামের জন্য প্রস্তুত কাগজে মার্বল কাজ করা একটি ছবি মাউন্ট করা। মার্বল কাজের ছবি হচ্ছে চিত্রের কাজের মধ্যে মার্বলে যেমন ছিটছিট লম্বা লম্বা সোজা বা বঙ্কিম রেখা বা দাগ থাকে সেই রকম রেখা ; ছবিটির উল্টোপিঠে আছে একটি দক্ষিণী ফুলের রঙীন ছবি। রঙীন চিত্রে, ড্রয়িং বা হস্তলিপিতে মার্বল-অলঙ্কারের রীতি তুর্কী থেকে দাক্ষিণাত্যে আসে। ১৬১০ সালে মুঘল আক্রমণে আহমদনগর রাজ্যের পতন হয়।

(খ) বিজাপুর

ষোল শতকের শেষে বিজাপুর রাজ্যে আদিল শাহী নবাবরা বেশ কায়েম হয়ে রাজত্ব চালান। দ্বিতীয় ইব্রাহিম আদিল শাহ্ (১৫৭৯-১৬২৭) চিত্রকর্ম সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। তাঁর কতগুলি প্রতিকৃতি আছে, সেগুলি নিঃসন্দেহে তাঁরই জীবিতকালের ও সমসাময়িক। বিজাপুর ছবির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাদের পেলব, কোমল রঙ ; তার উপরে ফুল ও পাখির যথাসম্ভব নিখুঁতভাবে প্রতিটি খুঁটিনাটি বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলা (সম্ভবত তাদের প্রতীক তাৎপর্যের জন্যে)। একটি ছবি আছে একটি বৃদ্ধ মোল্লার, বোধহয় দরবারে অমাত্য ছিলেন। স্পষ্টই মনে হয় চিত্রশালার পরিচালক ও পৃষ্ঠপোষকের রুচি ও চোখ, তার সঙ্গে ঠিকমত কাজ আদায় করার আগ্রহ ও শক্তি ছিল অকুত। জমির উপর মোল্লার পায়ের দু'দিকে দুটি তিতির পাখি, সেগুলিও খুব সযত্নে আঁকা। এই শিল্পীরই আঁকা অন্যান্য ছবিও সমান যত্নে, নিখুঁতভাবে আঁকা। মোল্লার পাশে বাঁদিকে ঘোর নীল আইরিস ফুলের পাতা, ভ্যান গখকে স্মরণ করিয়ে দেয়, এমনই তাদের ধ্বনিত রঙের বাহাদুরি। এই ধরনের বেশ কিছু প্রতিকৃতি আছে যার কাজ অনায়াসে অত্যুৎকৃষ্ট বলা যায়। অনুমান ১৬৪০ সালে আঁকা এবিসিনিয়ান ইক্‌লাস খানের একটি প্রতিকৃতি আছে ; শিল্পী চাঁদ মহম্মদের কাজ। ইক্‌লাস খানের ডান হাত এক বিশাল ভারী মাটিতে দাঁড় করানো তরোয়ালের উপর রাখা, বাঁ হাতে আরেক জোড়া হাল্‌কা তরোয়াল, তাদের মুখগুলি বিরাট গোল ঢালের নিচে দেখা যাচ্ছে। সমস্ত প্রতিকৃতিটি আত্মবিশ্বাস ও বেপরোয়া সাহসের মূর্ত প্রতিচ্ছবি। ১৬৫০ সালে আঁকা একই ইক্‌লাসের আরেকটি প্রতিকৃতিতে বয়সের কল্যাণে শরীর ও মুখ আরো পুরন্ত, সমস্ত দেহে, মাথায়, মুখে, চোখে আত্মস্থ গর্ব ফুটে উঠেছে। এই যুগের অধিকাংশ প্রতিকৃতিই সুলতানের নিজের। অধিকাংশই মামুলি অথচ সাদৃশ্য হিসাবে ভাল। তারই মধ্যে কয়েকটি যথেষ্ট নিপুণভাবে আঁকা ও রঙ দেয়া। পরিবেশ ও পর্যবেক্ষণের তীক্ষ্ণতা যথেষ্ট লক্ষণীয়।

(গ) গোলকুণ্ডা

ষোল দশকের শুরুতে গোলকুণ্ডা ছিল কুতব শাহ্ নবাবদের রাজধানী। সবথেকে প্রাচীন দক্ষিণী রীতির হিসাবে সনাক্ত করা কিছু ছবির উৎস হচ্ছে গোলকুণ্ডা। ইণ্ডিয়া অফিস সংগ্রহে যেটি সবথেকে প্রাচীন সেটি অবশ্য ১৬০০ সালের পরে আঁকা। ফলে, ছবিটিতে প্রাচীন গোলকুণ্ডা রীতির উপর চলতি মুঘল রীতির ছাপ সুস্পষ্ট ভাবে পড়ে। কিছু কিছু নিসর্গচিত্রে পাওয়া যায় পারসীক রীতির স্পষ্ট ছাপ, বিশেষত পটভূমির পাথরের পাহাড়ে (গোলকুণ্ডাতেও বিরাট বিরাট গণ্ডোয়ানা যুগের গ্র্যানিট নগ্ন কালো পাথরের স্তূপ বেশি রকম দেখা যায়)। ছবিতে সর্পিলগতি সরু নদীর স্রোত আর আকাশ রেখায় এলোমেলো গাছের সারে দক্ষিণী রীতি বেশ প্রকট। পরের যুগের কুতব শাহী ছবির প্রায় সবই প্রতিকৃতি। তার মধ্যে অনেকগুলি আঁকা হয়েছিল ওলন্দাজ বণিকদের জন্য। কুতব শাহী অনেকগুলি ছবি হল্যান্ডের চিত্রশালায় দেখা যায়। গোলকুন্ডা রাজ্যের বাণিজ্যের বন্দর ছিল মসুলিপট্টম। এখান থেকে ডাচ বাণিজ্য হত।

সতেরো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মুঘলসেনা দাক্ষিণাত্য জয়ে উঠে পড়ে লাগে। শাজাহান ঔরঙ্গজেবকে সেনাপতি হিসাবে নিযুক্ত করেন। বিজাপুরের পতন হয় ১৬৮৬তে, গোলকুণ্ডার ১৬৮৭তে। তার আগের দশকে মুঘল শিল্পীরা অধিকৃত ঔরঙ্গাবাদে অনেক কাজ করেন। ১৬৪০-১৬৮০-র মধ্যে ঔরঙ্গাবাদে মিশ্র মুঘল ও দাক্ষিণাত্য রীতিতে অনেক কাজ হয়। কোন রীতির উপর কোন রীতির প্রভাব বেশি পড়ে বলা শক্ত। ১৬৮৭ সালে মুঘলরা আসার পর বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা থেকে চিত্রকর ও শিল্পী জীবিকার খোঁজে ছোট ছোট রাজ্যে প্রস্থান করেন। আঠারো শতকের মাঝামাঝি বা তারও আগে থেকে ছত্রভঙ্গ শিল্পীরা আবার হায়দ্রাবাদে এসে পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতে শুরু করেন।

বিজাপুর, গোলকুণ্ডা জয়ে মুঘলদের বিশেষ লাভ হয়নি। এইসব প্রদেশে মুঘল রাজ্যপাল হিসাবে আসফ ঝালি হায়দ্রাবাদে ১৭১৩ সালে নিযুক্ত হন। ইতিমধ্যে মুঘল শক্তি স্তিমিত হবার ফলে আসফ ঝা ১৭২৭ সালে হায়দ্রাবাদে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। ১৭২৭ থেকে ১৭৪৮-এর মধ্যে হায়দ্রাবাদ বেশ সম্পদশালী রাজত্ব হয়। গোলকুণ্ডা দুর্গের পাঁচ মাইল দূরে হায়দ্রাবাদ শহরের পত্তন হয় এবং হায়দ্রাবাদের প্রথম রীতি গোলকুণ্ডার চিত্ররীতির সামিল হয়। কিন্তু শীঘ্রই হায়দ্রাবাদ কলম গোলকুণ্ডা কলম থেকে অনেক বেশি কমনীয়, গীতিধর্মী ও

আড়ষ্টতাবিহীন হয়। শ্রীমতী আর্চারের মতে ৩৭ নম্বর জন্‌সন্ অ্যালবামের হায়দ্রাবাদী রাগমালা চিত্ররাজি আঠারো শতকের হায়দ্রাবাদ কলমের মধ্যমণি হিসাবে ধরা যায়। এদের মধ্যে অনেকগুলি চিত্রেই গোলকুণ্ডা কলমের পরিবেশ ও আমেজ থাকলেও সেগুলি হায়দ্রাবাদ বা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সৃষ্টি।

শ্রীমতী আর্চার তাঁর বইয়ে রিচার্ড জন্‌সনের অ্যালবাম থেকে ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীর ছবি খুব ছোট ডাকটিকিটের আকারে ছাপিয়েছেন। অত ছোট আকারেও ছবিগুলি অনবদ্য দেখায়। ইংরেজ আধিপত্যের পর হায়দ্রাবাদ থেকে অনেক ছবি ইংল্যান্ড রপ্তানি শুরু করে।

(ঘ) পাঁচমিশেলী রীতি (১৬৪০-১৭৭০)

যে সব ছবি স্পষ্টত কোন কলমের বা আঞ্চলিক রীতি বলে সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি, ফ'ক ও আর্চার সেগুলিকে পাঁচমিশেলী বা অশিক্ষিত ডেকানী রীতি বলে শ্রেণীভুক্ত করেন। এই শ্রেণীতে নানা যুগের নকল ও অনুকরণ করা ছবি পাওয়া যায়। ফ'ক ও আর্চার মুখ্যত জন্‌সন্ অ্যালবামের উপর নির্ভর করে ৬২টি ছবির বর্ণনা দিয়েছেন, তাদের বিষয়বস্তু নানারকম। রিচার্ড জন্‌সন্ কার্যোপলক্ষ্যে ১৭৮৪ সালে হায়দ্রাবাদ নগরে বদলি হন।

দক্ষিণী রীতির আলোচনা

প্রথমে দক্ষিণী বা ডেকানী চিত্রকলা সম্বন্ধে খুব সংক্ষেপে একটু আলোচনা দরকার। ষোল শতকে দাক্ষিণাত্যে চারটি মুসলমান রাজত্ব ছিল : আহ্‌মদনগর, বিজাপুর, বিদর, আর গোলকুণ্ডা। তাদের দক্ষিণে হিন্দুরাজ্য বিজয়নগরে রাজাদের অনুগ্রহে হিন্দু চিত্ররীতি ও স্থাপত্যের ঐতিহ্য চলিত ছিল। কিন্তু ১৫৬৫ সালে চারটি মুসলমান রাজ্যের মিলিত আক্রমণে বিজয়নগর ধ্বংস হয়। এর পরে বিজয়নগর নগর থেকে রাজধানী সরে যায় এবং দাক্ষিণাত্য খসে যায়। আহ্‌মদনগরের বাদশা হুসেন শাহ আর বিজাপুরের বাদশা ইব্রাহিম আদিল শাহ দু'জনেই বিভিন্ন কলারীতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং হিন্দু সংস্কৃতি সম্বন্ধে যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ফলে বিজয়নগর ধ্বংসের পর সেখানকার পরিত্যক্ত শিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ, সুরজ্ঞদের তাঁরা নিজের নিজের দরবারে সসম্মানে আশ্রয় দেন।

বিজাপুরে সুন্দর, সুচারু স্থাপত্যের অভাব নেই, কিন্তু বিজাপুরী চিত্ররীতির উৎকর্ষ স্বীকার মাত্র হালে হয়েছে। বিজাপুরী রীতি যেটুকু বা স্বীকৃতি পেয়েছে, আহ্‌মদনগরী রীতি সম্বন্ধে আমরা জানি আরও কম। বলতে গেলে একমাত্র পুনার ভারত ইতিহাস সংশোধক মণ্ডলের গ্রন্থাগারে রক্ষিত একটি পুঁথির ছবিতেই যা কিছু আহ্‌মদনগরী চিত্ররীতির চিহ্ন আছে। এটি পদ্যে লেখা হুসেন শাহের একটি জীবনী, লেখার সময় ১৫৬৫ থেকে ১৫৬৮। ডঃ স্টেলা ক্রামরিশ এর থেকে দুটি ক্ষুদ্রকায় ছবি ছাপিয়েছেন। বিকানীর প্রাসাদের সংগ্রহে রাগিণীমালার বারোটি উল্লেখযোগ্য ছবি আছে। ডঃ গোয়েট্‌সের মতে এগুলি আহ্‌মদনগরে আঁকা হয়েছিল। এগুলির রঙ যেমন উজ্জ্বল, নকশাও তেমনি প্রাণবন্ত, উচ্ছল ; তাদের ভাবের সুরও তেমনি গীতিকাব্যে ভরা। হিন্দু প্রভাব খুবই প্রকট, যদিও পুরুষের পোষাকে আর ঘরবাড়ির স্থাপত্যে মুসলমানী রুচি স্পষ্ট। এগুলি যে বিজয়নগর রাজ্যের সৃষ্টি সে বিষয়ে সন্দেহের কারণ বিশেষ নেই। উপরন্তু, বোধ হয় আহ্‌মদনগরের। কারণ বিজাপুরী কাজে পারসীক প্রভাব সাধারণত আরও বেশি। এইসব ছবি বোধ হয় ১৫৭০ সাল নাগাদ আঁকা। বানারসের ভারত কলা ভবনে দীপক রাগের একটি ছবি আছে, তাতে পারসীক প্রভাব যথেষ্ট। মুঘল প্রভাবও আছে, মনে হয় ছবিটিতে মুঘল আর ডেকানী রীতি যেন বেশ মিলে গেছে। দক্ষিণী চিত্ররীতিতে পরনের কাপড়ের ভাঁজের পারিপাট্য, সৌন্দর্য, ও দক্ষতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু শুধু এইটুকু বললেই ডেকানী রীতির মোটেই সব কিছু বলা হয় না। দক্ষিণী চিত্ররীতির বৈচিত্র্য ও বিস্তার দেখা যায় বিজাপুরী পোর্ট্রেটে আর পুঁথিচিত্রে। ১৯৪৭-৮ সালে লণ্ডনের রয়াল অ্যাকাডেমিতে একটি প্রদর্শনী হয়, তাতে বিজাপুরী চিত্রশিল্পের বহুধা প্রতিভার কিছুটা প্রমাণ পাওয়া যায়। নুজুম-অল-উলুম নামে একটি পুঁথিতে নানা রীতিতে আঁকা অনেক ক্ষুদ্রকায় ছবি আছে। সেগুলি দেখলে বোঝা যায় দক্ষিণী চিত্রকররা কত বিচিত্র ছবি আঁকতে পারতেন। প্রায় একটি গোটা বিশ্বকোষের মত তার বিষয় ও রীতি বৈচিত্র্য, অথচ সমস্ত ছবিতেই একটি বিশিষ্ট ঐক্যের ছাপ সুস্পষ্ট, দেখে বুঝতে দেরি হয় না যে ছবিগুলি একটি বিশেষ দেশে, বিশেষ কালে, একটি বিশেষ প্রভাবের ছায়ায় আঁকা। রঙের স্বর বিন্যাসও প্রায় এক ধরনের, প্রায়

পারসীক ; কারণ সব ছবিতেই নীল, সোনালি আর সাদার প্রাদুর্ভাব। এই পুঁথির কয়েকটি মিনিয়েচরে আবার বিকানীর সংগ্রহের রাগিণীমালার মহীয়সী মহিলাদের পুনরায় দেখা যায় : অঙ্গে রাশি রাশি জড়োয়া অলঙ্কার, দেহে হাওয়ায় ওড়া হাল্কা ওড়না। কতকগুলিতে পারসীক পটভূমির মধ্যে হিন্দু দেবদেবীর ছবি। আবার অন্য কতকগুলিতে পুরোপুরি মুসলমানী পুঁথির উদ্ভাসচিত্রসুলভ বিশদ ফুলকারি কাজ, অথবা দু'দিকে সমানভাবে মিলিয়ে অলঙ্কারবহুল আল্পনার কাজ।



অন্যান্য ডেকানী মিনিয়েচরে অবশ্য বিজয়নগরের প্রভাব কম, স্পষ্ট বোঝা যায় দক্ষিণপ্রান্তদেশের প্রভাব ক্ষণস্থায়ী ছিল। কিন্তু তবুও দক্ষিণী হিন্দু চিত্ররীতির ডেকানী ছবিতে বরাবরের জন্য কতকগুলি চিহ্ন রেখে যায় : সেগুলি হচ্ছে ছবিতে চমৎকার গতির ব্যাপ্তি, সবই যেন দরাজভাবে যথেষ্ট জায়গা নিয়ে নড়ছে, চলছে ; হাওয়ায় ভাসা হালকা ওড়না ও অন্য দেহসজ্জা ; ছবিতে সাদা আর সোনালির প্রাদুর্ভাব। স্বচ্ছ, হাওয়ায় ভাসা, ওজনহীন বসন আঁকা ব্যাপারে ডেকানী ছবির জুড়ি মেলা ভার। ষোল শতকে আঁকা দ্বিতীয় ইব্রাহিম আদিল শাহের একটি ক্ষুদ্রকায় পোর্ট্রেট ব্রিটিশ মিউজিয়মে আছে। ছবিটি আদিল শাহের যুবা বয়সের, দরবারে সিংহাসনে বসা অবস্থায় আঁকা। ছবিতে পারসীক ছাপ সুস্পষ্ট, কারণ পারসীক রীতি অনুসারে ছবিটির দু'দিক একেবারে মিলিয়ে, যাকে ইংরেজিতে বলে সিমেট্রিক্যাল করে, আঁকা। ছবিটিতে একটি জিনিস বিশেষ উল্লেখযোগ্য : সিংহাসনের তলায় একপাশ দেখে আঁকা এক সার সোনার পাত্র। এই ধরনে আঁকা সারবন্দী সোনার পাত্র প্রথম যুগের এমন কি শেষের দিকের রাজপুত ছবিতে ভূরি ভূরি পাওয়া যায়।

রন্ধন প্রণালী সম্বন্ধে হায়দ্রাবাদ মিউজিয়মের একটি পুঁথিতে কতকগুলি ক্ষুদ্রকায় ছবি আছে। বইটির নাম নিমত-নামা। তাতেও দ্বিতীয় আদিল শাহের দুটি পোর্ট্রেট আছে। এ দুটি খুব ছোট্ট। একটিতে রঙের জৌলুস বিশেষ উল্লেখযোগ্য ; অন্যটি অসমাপ্ত কিন্তু তাতে বিজাপুরী রীতির নক্শার আশ্চর্য উৎকর্ষ বেশ বোঝা যায়। এই বাদশারই মধ্য বয়সের যে সব পোর্ট্রেট আছে তাতেও এই ধরনের আশ্চর্য দৃঢ় নক্শাই ছবির কাঠামোর সৃষ্টি করেছে। ইব্রাহিম আদিল শাহের সভাসদদেরও কয়েকটি ছবি আছে, তাতেও নক্শার প্রসাদগুণ অনস্বীকার্য।

১৬১০ সাল নাগাদ তৈরি ফলাও করে আঁকা দুটি নক্‌শার ছবি বার্লিনে ও প্যারিসে আছে। এ দুটিতে ডেকানী চিত্রের বৈশিষ্ট্য খুব ভাল ফুটেছে ; স্পষ্ট বোঝা যায় ভারতীর চিত্রধারায় দক্ষিণী ধারার দান কতখানি। মুঘল রীতি যে শুধু দক্ষিণে এসে দক্ষিণী ধারাকে সমৃদ্ধ করেছে তা নয় ; তার চেয়ে বড় কথা এই যে, দক্ষিণী ধারাও উত্তরে গিয়ে এক নতুন রীতি, নতুন চালের সৃষ্টি করে, যেটি মূল উত্তর ধারার থেকে তফাৎ হলেও তাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে, এবং নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুণে মুঘল দরবারে সম্রাটদের কাছে বিশেষ সম্মান লাভ করে।

চিত্রকলার ইতিহাসে কোন্ ধারা যে গুরু কোন্ ধারাই বা শিষ্য, জোর করে বলা যায় না, অল্পদিনের মধ্যে বিভিন্ন রীতি এত ওতপ্রোতভাবে মিশে যায়।

রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতির ধারাও যে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এটা স্বতঃসিদ্ধ কথা। মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে মুঘল চিত্ররীতিরও বহুধা প্রচার হল। শাজাহানের সময়ে মুঘল চিত্ররীতি যখন চরম বৈশিষ্ট্যলাভ করল তখন রাজধানীর নামে নামকরণ হল, দিল্লী কলম, অর্থাৎ দিল্লীর রীতি। এখনও দিল্লী কলমের কাজ কিছু কিছু হয়। কিন্তু শাজাহানের পর ঔরঙ্গজেবের সময়ে চিত্রকলার দ্রুত অবনতি শুরু হল, কারণ রাজানুগ্রহ গেল কমে। তবুও ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্য জয় করায় মুঘল বা দিল্লী কলম দক্ষিণে হায়দ্রাবাদে গেল এবং সেখানে তার নাম হল দক্ষিণী বা ডেকানী কলম। হায়দ্রাবাদ থেকে ভারত-পারসীক ক্ষুদ্রকায় ছবির কলাকৌশল গেল বিজাপুরে, আর্কটে, আহমদনগরে, গোলকুণ্ডায়, মহীশূরে, সুরাপুরে বা কার্ণুলে, তাঞ্জোরে, ত্রিচিনপল্লীতে। প্রত্যেক দরবারেই কয়েকজন করে ভাল শিল্পী হলেন, এবং ওরই মধ্যে স্বকীয় ও স্থান মাহাত্ম্য ফুটিয়ে তোলার জন্য চেষ্টিত হলেন। কিন্তু একথা আমাদের সব সময়েই মনে রাখা দরকার যে চিত্রশিল্প কখনও সরাসরি রপ্তানি হয় না, এবং এমন কোন দেশ নেই যেখানে দেশজ চিত্ররীতি নেই বা ছিল না। যেমন একটু আগেই বলেছি, দিল্লী কলম দক্ষিণে প্রভাব বিস্তার করার আগে বিজাপুর রাজ্যে খুব ভাল ভাল চিত্রকর এবং চিত্রশিল্প ছিল। ষোল শতকের কিছু বিজাপুরী ছবি এখনও আছে যাতে স্পষ্টই পূর্বতন যুগের গুজরাটী পুঁথিচিত্রের সঙ্গে মিল সুস্পষ্ট। পশ্চিম ভারতীয় পুঁথিচিত্রের বিচিত্র প্রভাবের কথা পরে আরও বলব। গুজরাট অঞ্চল পুঁথিচিত্রের উৎপত্তিস্থল এবং পশ্চিমভারতের মধ্যে দিয়ে চোদ্দ, পনেরো, ষোল শতকে দক্ষিণী ও রাজস্থানী প্রভাব যে বেশ যাতায়াত করত তা একদিকে ষোল শতকের বিজাপুরী, আহমদনগরী ছবি, অন্যদিকে মুঘল ছবি দেখলে বুঝতে দেরি হয় না। দাক্ষিণাত্যের ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও দেশজ রীতি সম্বন্ধে অনেক রকম গবেষণা হয়েছে এবং অনেক বিদগ্ধ পণ্ডিতই প্রত্যেক দেশের বিশিষ্ট রীতির নিজস্ব লক্ষণ বার করে যে-কোন ছবির উৎপত্তিস্থল সম্বন্ধে প্রামাণ্য অভিমত দিতে পারেন। কিন্তু সে সব বৈশিষ্ট্যের বিশদ আলোচনা এই ছোট বইয়ে অবান্তর হবে, কারণ সেগুলির মূল্য পণ্ডিতদের কাছেই বেশি। ভারতের চিত্রকলার মূল রীতি, নীতি, অন্বিষ্টের ছোট ঐতিহাসিক আলোচনায় তাদের ছোট ছোট বৈশিষ্ট্য বা পার্থক্য খুবই গৌণ এবং অকিঞ্চিত। বিষয়, রীতি, নক্‌শা, কম্পোজিশন, রঙ, সবেরই মূল এক : অর্থাৎ প্রাচীন দাক্ষিণাত্য রীতির উপরে দিল্লী কলমের প্রভাব ; যে দিল্লী কলমের আবার মূল হচ্ছে ভারত-পারসীক রীতি, এবং তারও আগের ঈরাণী কলম। অবশ্য ঔরঙ্গজেবের আগেই ষোল শতকে এবং তারও আগে বাহমনী বাদশাদের আমলে পারসীক চিত্ররীতি দাক্ষিণাত্যে দেখা যায়। প্রথম যুগে তৈমুরিদ প্রভাব বেশ আসে, পরে আসে দিল্লীর প্রভাব। কিন্তু দিল্লী কলমও দক্ষিণে এসে বদলে গেল। ঔরঙ্গাবাদ বা দৌলতাবাদের চিত্রশিল্পীদের ছবি দিল্লী কলমের ছবির চেয়ে সচরাচর আকারে ছোট হত, এবং সে সব ছবিতে ব্যাপ্তি বা প্রসারের অভাব চোখে বড় পীড়া দেয়। চিত্রের বিষয়ও সাধারণত ঐতিহাসিক হত, যথা রাজাবাদশার ছবি। এইসব পুরনো শিল্পীদের বংশধরদের কেউ কেউ এখনও হায়দ্রাবাদ বা নেকোণ্ডায় জীবিত আছেন। তবে দক্ষিণী কলমে দিল্লী কলমের দুটি বৈশিষ্ট্যের যথেষ্ট চর্চা হয়। একটি হচ্ছে খুব সুকুমার, পেলব, মিহি গাঢ়-ফিকের মধ্যে দিয়ে প্রতিকৃতির মড়লিং বা দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-ঘনত্ব আনা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, দেশজ রীতিতে এক মৌলিক ধরনে পরিপ্রেক্ষিত বা পারস্পেক্টিভের সৃষ্টি করা। প্রথম দিকে ছবির জমিতে রঙের স্তরের সাহায্যে মড়লিং প্রায়ই হত না। কিন্তু আস্তে আস্তে যখন মুঘল রীতি সুপ্রতিষ্ঠিত হল তখন ঈরাণী কলমের চ্যাপটা, ফ্ল্যাট সতরঞ্চ নক্‌শার আভাস দূরে সরে গিয়ে ছবি হল আরও প্রাকৃত ও গভীর। ছবির পিছন বা পশ্চাদ্‌পট আঁকার মধ্যেও পরিবর্তন

এল। ঈরাণী কলমের নিছক চ্যাপটা; ছকে-ফেলা আল্‌পনা চলে গিয়ে এল গাছপালা, প্রকৃতি, দূরত্ব এবং দূরে-কাছের স্পষ্ট, প্রাকৃত বোধ ; এমনভাবে ছবি আঁকা শুরু হল যাতে বুঝতে পারা যায় যে প্রতিটি বস্তুর চারিদিকে হাওয়া খেলে বেড়াচ্ছে। শূন্যের মধ্যে বিষয়বস্তুদের পারস্পরিক সম্বন্ধ ও পরিপ্রেক্ষিতের বোধ এল, আর তার সঙ্গে প্রাকৃতিক দৃশ্যের বিভিন্ন স্তরের কম্পোজিশনও ভালমত এল। কয়েকটি মুঘল ও ডেকানী ছবিতে সমুখ দিকটা খাটো করে দেওয়া বা ফোরশর্টনিং সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান ও ভাবের পরিচয় পাওয়া যায় ; এটা বেশ বোঝা যায় যে ইওরোপীয় চিত্রের মত ফোরশর্টনিং ভারতীয় শিল্পীর অভ্যস্ত নীতি না হলেও দরবারী শিল্পী ফোরটশর্নিং বিলক্ষণ বুঝতেন, এবং ভারতের আলোয় এবং টেম্পেরা বা মিশ্র রঙে কি করে ফোরটশর্নিং করতে হয় তাও জানতেন। কলকাতার যাদুঘরে এই রীতিতে আঁকা একটি আশ্চর্য ছবি আছে। বিষয়টি হচ্ছে, একজন অশ্বারোহী সৈন্য ছবির সমুখের জমির উপর দিয়ে আড়াআড়িভাবে যাচ্ছে। ছবিটিতে লোকের ভিড়ের কম্পোজিশন এবং ফোরশটশনিং-এর এমন নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে যে অবাক হতে হয়। এসব ছাড়াও দক্ষিণী কলমের আরও বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাদের ছোট্ট সাইজ এবং সেই অনুপাতে তুলির ব্যাপ্তির অভাব। দক্ষিণী কলমে সোনা প্রচুরভাবে ব্যবহার হত, ফলে ছবি এমন জমকালো হত যে আসল দিল্লী কলমের ছবি এর কাছে জমকালোত্বয় হার মেনে যায়।

দিল্লী কলমের প্রভাব সর্বত্রই দেখা যায়, এবং চিত্ররসিকরা বলেন যে এর মধ্যে চিত্রশিল্পের ক্ল্যাসিকাল বা ধ্রুপদী রীতি সবচেয়ে বেশি। এই কলমের কাজে একটা ঝরঝরে, তরতরে, পরিচ্ছন্ন দরবারী ভাব সবসময়েই পাওয়া যায়। এর অপভ্রংশ হয় জয়পুরী কলম। জয়পুরী কলমের কাজ বেশির ভাগই একটু গোলগাল, নরম জাতের। জয়পুরী কলমে রঙের গাঢ়-ফিকের সাহায্যে মড়লিং-এর যথেষ্ট চেষ্টা আছে ; কিন্তু মনে রাখতে হবে যে জয়পুর কলমের কথা যখন বলছি তখন জয়পুরের মুঘল রীতিতে আঁকা চিত্রের কথাই বলছি, রাজপুত বা পশ্চিম ভারতীয় রীতিতে আঁকা জয়পুরী চিত্রের কথা নয়।

দিল্লীর কাছের দেশ, যাকে ইংরেজরা বলত আউধ সেই আউধ রাজ্যের নবাবদের মধ্যে দিল্লী কলমের খুব প্রচলন হয়। সেই সঙ্গে আরেকটি বিদেশী চিত্ররীতি জনপ্রিয় হয়, তাকে বলে রুমী বা ইওরোপীয় কলম। ইওরোপীয় পোর্ট্রেট রীতি অনুসরণ করে আউধে যে সব মিনিয়েচর সৃষ্টি হত তাকে বলত রুমী কলম। রুমী কলম বলতে ইওরোপীয় চিত্রবিষয় বোঝায় না। খ্রীস্টিয়ান বা ইওরোপীয় চিত্রবিষয় কিভাবে মুঘল চিত্রে স্থানাধিকার করে তার বিষয় অল্প আলোচনা আগেই করেছি। রুমী কলম বলতে কিন্তু ইওরোপীয় বিষয় বোঝায় না, মিনিয়েচরে ইওরোপীয় চিত্রশিল্পের টেকনিক বোঝায়, যেমন মড়লিং, ফোরশর্টনিং ও পারস্পেক্‌টিভ। এই ধরনের ইওরোপীয় পদ্ধতিতে আঁকা ছবি দিল্লী বা জয়পুর কলমে অনেক দেখা যায় এবং সেই হিসাবে মুঘল চিত্রশিল্পে রুমী কলমের একটি বিশেষ স্থান আছে। রুমী কলমে ছবি সাধারণত বাদশার হুকুমে দরবারের জন্য আঁকা হত। ঐগুলি প্রায়ই ইওরোপীয় ছবির নকল হত, কিংবা বিদেশী মিশনারীদের ফরমায়েস মত হত।

লক্ষ্ণৌর নবাবরা যখন আঠারো শতকে প্রতাপশালী হলেন তখন দিল্লী কলমের এক অংশ লক্ষ্ণৌ দরবারে গিয়ে লক্ষ্ণৌ কলম হল। বলা বাহুল্য দিল্লীর বাদশার তুলনায় লক্ষ্ণৌর বাদশারা যেমন হীনতেজ হলেন, লক্ষ্ণৌ কলমের ছবিও তেমনি দিল্লী কলমের তুলনায় অনেক নিকৃষ্ট হল। চিত্ররীতি-পদ্ধতিও অনেক তফাৎ হল। যথা লক্ষ্ণৌ কলমের ছবির রঙ হল প্রায় স্বচ্ছ, এমন কি অনেক সময়ে জলরঙে আঁকা হত, যদিও অনেক ক্ষেত্রে পশ্চাদ্‌পটে ছবির খোল বা জমি হত সাদা। ক্রমশ লক্ষ্ণৌ কলম আঠারো শতকে তরল হতে হতে যখন নিছক খারাপ হয়ে গেল তখন ইওরোপীয় ছবির প্রভাবে তার মোড় ঘুরে গেল। আঠারো শতকের শেষে ওয়ারেন হেস্টিংস্‌ আউধ জয় করার পর, এবং উনিশ শতকে, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি জায়গায় ইংরেজদের মারফৎ বহু ইওরোপীয় মিনিয়েচর ছবি আমদানি হল। লক্ষ্ণৌর অনেক ঘরোয়ানা চিত্রশিল্পী ইওরোপীয় রীতি চটপট নকল করে জন্‌ কোম্পানির সাহেবদের ছবি যোগাতে লাগলেন ; তাদের পোর্ট্রেট করতে লেগে গেলেন। সাহেবরাও সে সব ছবি আগ্রহ করে নিলেন ; হাতির দাঁতের পাতে বা পাটায় আঁকা নিজেদের এবং পরিবার পরিজনবর্গের ছবি, দেশে পাঠাতে লাগলেন। এইসব মিনিয়েচরে ইওরোপীয় রীতি সুস্পষ্টভাবে এল ; এবং মুখ সাধারণত একপাশ করে আঁকার দরুন তাদের সঙ্গে ইওরোপীয় রীতিতে তৈরি মেডালিয়ন বা মুদ্রার ছবির খুব মিল দেখা গেল।

দিল্লী, লক্ষ্ণৌ থেকে আবার কয়েকটি শিল্পী পরিবার ইংরেজদের কাছে কাজ পাবার আশায় পাটনায় এসে বসবাস আরম্ভ করে। এইভাবে উনিশ শতকে পাটনায় একটি শিল্পরীতি গড়ে ওঠে, তার নাম হয় পাটনাই কলম।

পাটনাই কলমের ছবি যে বিশেষ উৎকৃষ্ট কিছু তা নয়, এগুলি প্রায় আড়ষ্ট, ভাবাবেগহীন নীরস ছবি হত, যদিও নকুশায় ও রঙে যথেষ্ট বাহাদুরি থাকত। পাটনাই কলমের চিত্রে বোধ হয় সর্বপ্রথম বাস্তব ছায়া দেখা দেয়। কোম্পানির আমলে পাটনাই কলমের একটি মজার জারজ বৈশিষ্ট্য হয়, যা দেশীয় নয়, আবার ইওরোপীয় নয়, দুইয়ের মিশ্রণ। যাকে বলে ইঙ্গ-বঙ্গ। পাটনাই কলম সম্বন্ধে পরে আলোচনা করব।

কাশ্মীরে মুঘল রীতির এক ধরনের বৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠে, তাকে বলা যায় কাশ্মীরী কলম। এগুলি প্রথম দিকে কাশ্মীরেই হত। শেষে কাশ্মীরী শিল্পীরা পাঞ্জাবের লাহোর, অমৃতসর, প্রভৃতি জায়গায় এই রীতির প্রচলন করেন।

কিন্তু এইসব বিভিন্ন কলমের কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ আছে। সেগুলি হচ্ছে কল্পনার সংকোচ এবং বলিষ্ঠতার অভাব, অলঙ্কারবাহুল্য, যৌবনসুলভ দীপ্তি ও দুঃসাহসের বদলে বাহ্যাড়ম্বর এবং গতানুগতিকতা। অত বড় এক সাম্রাজ্য ভেঙ্গে গিয়ে যখন টুকরো টুকরো রাজত্ব হয়, তখন সেগুলি যেমন হীনবল অথচ মিথ্যা আড়ম্বর জাঁকজমকে ব্যাপৃত থাকতে বাধ্য হয়, তেমনি মুঘল রীতির গাম্ভীর্য তোলা আর সম্ভব হল না। নানা জায়গায় সেগুলি ছোট ছোট স্বকীয়তার অহঙ্কারেই ডুবে রইল, নেহাৎ ঠুনকো, সুন্দরপানা ছবি হল; দরবারের সামান্য অনুগ্রহ ভিক্ষার আশায় মহান লৌকিক চিত্রধারার কাছে শিখবার সাহস হারিয়ে ফেলল; ভারতীয় মূল চিত্রধারার স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

পাদটীকা

*বন্ধুবর শ্রীশোভন বসুর কাছে বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' উপন্যাসের এই অংশটি উদ্ধৃতির প্রেরণা পেয়েছি। মনে থাকতে পারে 'রাজসিংহ' উপন্যাস শুরু হয় 'চিত্রে চরণ। প্রথম পরিচ্ছেদ : তসবিরওয়ালী' দিয়ে। এই পরিচ্ছেদে আছে : 'যুবতীগণের হাসিবার কারণ, এক প্রাচীনা, কতকগুলি চিত্র বেচিতে আসিয়া তাঁহাদিগের হাতে পড়িয়াছিল। হস্তিদন্তনির্মিত ফলকে লিখিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপূর্ব চিত্রগুলি; প্রাচীনা বিক্রয়াভিলাষে এক একখানি চিত্র বস্ত্রাবরণমধ্য হইতে বাহির করিতেছিল; যুবতীগণ চিত্রিত ব্যক্তির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছিল।'

নিচের উদ্ধৃতিটি 'দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : চিত্রদলন'। এর থেকেই উপন্যাসটির উৎপত্তি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : চিত্রদলন

এই ভুবনমোহিনী সুন্দরী, যারে দেখিয়া চিত্রবিক্রেতী প্রণত হইল, রূপনগরের রাজার কন্যা চঞ্চলকুমারী। যাহারা এতক্ষণ বৃদ্ধাকে লইয়া রঙ্গ করিতেছিল, তাহারা তাঁহার সখীজন এবং দাসী। চঞ্চলকুমারী সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া, সেই রঙ্গ দেখিয়া নীরবে হাস্য করিতেছিলেন। এক্ষণে প্রাচীনাকে মধুরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে গা?"

সখীগণ পরিচয় দিতে ব্যস্ত হইল। "উনি তসবির বেচিতে আসিয়াছেন।"

চঞ্চলকুমারী বলিলেন, "তা তোমরা হাসিতেছিলে কেন?"

কেহ কেহ কিছু কিছু অপ্রতিভ হইল। যিনি সহচরীকে ঝাড়ুদারি রসিকতাটা করিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "আমাদের দোষ কি? আয়ি বুড়ী যত সেকেলে বাদশাহের তসবির আনিয়া দেখাইতেছিল—তাই আমরা হাসিতেছিলাম—আমাদের রাজ-রাজড়ার ঘরে শাহজাঁহা বাদশাহ, কি জাঁহাগীর বাদশাহের তসবির কি নাই?"

বৃদ্ধা কহিল, "থাক্‌বে না কেন মা? একখানা থাকিলে কি আর একখানা নিতে নাই? আপনারা নিবেন না, তবে আমরা কাঙ্গাল গরীব প্রতিপালন হইব কি প্রকারে?"

রাজকুমারী তখন প্রাচীনার তসবির সকল দেখিতে চাহিলেন। প্রাচীনা একে একে তসবিরগুলি রাজকুমারীকে দেখাইতে লাগিল। আক্‌বর বাদশাহ, জাহাঁগীর, শাহজাহাঁ, নূরজাহাঁ, নূরমহালের চিত্র দেখাইল। রাজকুমারী হাসিয়া হাসিয়া সকলগুলি ফিরাইয়া দিলেন—বলিলেন, "ইহারা আমাদের কুটুম্ব, ঘরে ঢের তসবির আছে। হিন্দুরাজার তসবির আছে?"

"অভাব কি?" বলিয়া প্রাচীনা, রাজা মানসিংহ, রাজা বীরবল, রাজা জয়সিংহ প্রভৃতির চিত্র দেখাইল। রাজপুত্রী তাহাও ফিরাইয়া দিলেন, বলিলেন, "এও লইব না। এ সকল হিন্দু নয়, ইহারা মুসলমানের চাকর।"

প্রাচীনা তখন হাসিয়া বলিল, "মা, কে কার চাকর, তা আমি ত জানি না। আমার যা আছে, দেখাই, পসন্দ করিয়া লও।"

প্রাচীনা চিত্র দেখাইতে লাগিল। রাজকুমারী পসন্দ করিয়া রাণা প্রতাপ, রাণা অমরসিংহ, রাণা কর্ণ, যশোবন্ত সিংহ প্রভৃতি কয়খানি চিত্র ক্রয় করিলেন। একখানি বৃদ্ধা ঢাকিয়া রাখিল, দেখাইল না।

রাজকুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওখানি ঢাকিয়া রাখিলে যে?" বৃদ্ধা কথা কহে না। রাজকুমারী পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন।

বৃদ্ধা ভীতা হইয়া করযোড়ে কহিল, "আমার অপরাধ লইবেন না—অসাবধানে ঘটিয়াছে—অন্য তসবিরের সঙ্গে আসিয়াছে।"

রাজকুমারী বলিলেন, "অত ভয় পাইতেছ কেন? এমন কাহার তসবির যে, দেখাইতে ভয় পাইতেছ?"

বুড়ী। দেখিয়া কাজ নাই। আপনার ঘরের দুশমনের ছবি।

রাজকুমারী। কার তসবির ?

বুড়ী। (সভয়ে) রাণা রাজসিংহের।

রাজকুমারী হাসিয়া বলিলেন, "বীরপুরুষ স্ত্রীজাতির কখনও শত্রু নহে। আমি ও তসবির লইব।"

তখন বৃদ্ধা রাজসিংহের চিত্র তাঁহার হস্তে দিল। চিত্র হাতে লইয়া রাজকুমারী অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ; দেখিতে দেখিতে তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইল ; লোচন বিস্ফারিত হইল। একজন সখী, তাঁহার ভাব দেখিয়া চিত্র দেখিতে চাহিল—রাজকুমারী তাহার হস্তে চিত্র দিয়া বলিলেন, "দেখ। দেখিবার যোগ্য বটে।"

সখীগণের হাতে হাতে সে চিত্র ফিরিতে লাগিল। রাজসিংহ যুবা পুরুষ নহে—তথাপি তাঁহার চিত্র দেখিয়া সকলে প্রশংসা করিতে লাগিল।

বৃদ্ধা সুযোগ পাইয়া এই চিত্রখানিতে দ্বিগুণ মুনাফা করিল। তার পর লোভ পাইয়া বলিল, "ঠাকুরাণি ! যদি বীরের তসবির লইতে হয়, তবে আর একখানি দিতেছি। ইহার মত পৃথিবীতে বীর কে ?"

এই বলিয়া বৃদ্ধা আর একখানি চিত্র বাহির করিয়া রাজপুত্রীর হাতে দিল।

রাজকুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কাহার চেহারা ?"

বৃদ্ধা। বাদশাহ্ আলম্গীরের।

রাজকুমারী। কিনিব।

এই বলিয়া একজন পরিচারিকাকে রাজপুত্রী ক্রীত চিত্রগুলির মূল্য আনিয়া বৃদ্ধাকে বিদায় করিয়া দিতে বলিলেন। পরিচারিকা মূল্য আনিতে গেল, ইত্যবসরে রাজপুত্রী সখীগণকে বলিলেন, "এসো, একটু আমোদ করা যাক্।"

রঙ্গপ্রিয়া বয়স্যাগণ বলিল, "কি আমোদ বল ! বল !"

রাজপুত্রী বলিলেন, "আমি এই আলম্গীর বাদশাহের চিত্রখানি মাটিতে রাখিতেছি। সবাই উহার মুখে এক একটি বাঁ পায়ের নাতি মার। কার নাতিতে উহার নাক ভাঙ্গে দেখি।"

ভয়ে সখীগণের মুখ শুকাইয়া গেল। একজন বলিল, "অমন কথা মুখে আনিও না, কুমারীজী ! কাক পক্ষীতে শুনিলেও, রূপনগরের গড়ের একখানি পাতর থাকিবে না।"

হাসিয়া রাজপুত্রী চিত্রখানি মাটিতে রাখিলেন, "কে নাতি মারিবি মার্।"

কেহ অগ্রসর হইল না। নির্ম্মল নাম্নী একজন বয়স্যা আসিয়া রাজকুমারীর মুখ টিপিয়া ধরিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, "অমন কথা আর বলিও না।"

চঞ্চলকুমারী ধীরে ধীরে অলঙ্কারশোভিত বাম চরণখানি ঔরঙ্গজেবের চিত্রের উপরে সংস্থাপিত করিলেন— চিত্রের শোভা বুঝি বাড়িয়া গেল। চঞ্চলকুমারী একটু হেলিলেন—মড় মড় শব্দ হইল—ঔরঙ্গজেব বাদশাহের প্রতিমূর্ত্তি রাজপুতকুমারীর চরণতলে ভাঙ্গিয়া গেল।

"কি সর্ব্বনাশ ! কি করিলে !" বলিয়া সখীগণ শিহরিল।

রাজপুতকুমারী হাসিয়া বলিলেন—"যেমন ছেলেরা পুতুল খেলিয়া সংসারের সাধ মিটায়, আমি তেমনই মোগল বাদশাহের মুখে নাতি মারার সাধ মিটাইলাম।" তার পর নির্ম্মলের মুখ চাহিয়া বলিলেন, "সখি নির্ম্মল ! ছেলেদের সাধ মিটে ; সময়ে তাহাদের সত্যের ঘর-সংসার হয়। আমার কি সাধ মিটিবে না ? আমি কি কখন জীবন্ত ঔরঙ্গজেবের মুখে এইরূপ—"

নির্ম্মল, রাজকুমারীর মুখ চাপিয়া ধরিলেন, কথাটা সমাপ্ত হইল না—কিন্তু সকলেই তাহার অর্থ বুঝিল। প্রাচীনার হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল—এমন প্রাণসংহারক কথাবার্ত্তা যেখানে হয়, সেখান হইতে কতক্ষণে নিষ্কৃতি পাইবে ! এই সময়ে তাহার বিক্রীত তসবিরের মূল্য আসিয়া পৌঁছিল। প্রাপ্তিমাত্র প্রাচীনা ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

সে ঘরের বাহিরে আসিলে, নির্ম্মল তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া আসিল। আসিয়া তাহার হাতে একটি আশরফি দিয়া বলিল, "আয়ি বুড়ী, দেখিও, যাহা শুনিলে, কাহারও সাক্ষাতে মুখে আনিও না। রাজকুমারীর মুখের আটক নাই—এখনও উহার ছেলে বয়স।"

বুড়ী আশরফিটি লইয়া বলিল, "তা এ কি আর বল্‌তে হয় মা ! আমি তোমাদের দাসী—আমি কি আর এ সকল কথা মুখে আনি ?"

নির্ম্মল সন্তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া গেলেন।



সপ্তম অধ্যায়

মালোয়া ও রাজপুত চিত্র

ভূমিকা

মালোয়ায়, বিশেষত মাণ্ডুতে, মুঘলরা আসার আগে, পাঠানযুগে পারসীক প্রভাব কিভাবে আসে তার আলোচনা জৈন পুঁথিচিত্র ও মধ্যযুগীয় চিত্ররীতির বিবরণ উপলক্ষ্যে করেছি। দেখেছি কি করে দুটি ধারা মাণ্ডুর পাঠান রাজত্বকালে এক সঙ্গে মেশে : একদিকে জৈন পুঁথিচিত্রের শৈলী ও নন্দনতত্ত্ব, অন্যদিকে পারস্য থেকে আমদানি সংস্কৃতি ও শিল্পীদের কল্যাণে অনেকগুলি পারসীক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। মাণ্ডু ও মালোয়ার অন্যান্য অঞ্চলে, গুজরাটের ও বর্তমান রাজস্থানের সীমান্ত রাজ্যগুলিতে এই দুই ধারার সমন্বয় কী রূপান্তর নেয় তারও ইঙ্গিত আছে। জৈন শৈলী ও চিত্রণের ঠাট কি করে বৈষ্ণব দর্শনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে সতেরো শতক থেকে একদিকে মুঘল দরবারী অন্যদিকে রাজস্থানের রাজ্যগুলিতে তাদের শৈলীর ও দৃষ্টিভঙ্গির অন্তঃস্থলে পৌঁছয় তার নিদর্শন প্রথম পাই বাজবাহদুর রূপমতী আখ্যানের কাব্যময় চিত্রণে, যার প্রতিফলন দেখি আমরা সতেরো শতকের বুঁদি ও কোটার চিত্রাবলীতে।

১৯৫৬ সালে যখন এ বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় তখন রাজস্থানের বিভিন্ন আঞ্চলিক রীতি ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে গবেষণা ঠিকমত শুরু হয়নি। ১৯৫৮ সালে আমি দিল্লীতে কার্যসূত্রে যাই। ১৯৫৮ থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত রাজস্থানের নানা প্রদেশে বা রাজ্যে (এখন যেগুলি জেলা বলে পরিচিত) ঘোরার সুযোগ ও কিছু কিছু স্থানীয় পুঁথিচিত্র বিশেষত প্রাচীর চিত্র দেখার সুযোগ হয়েছে। অন্যত্র বলেছি কি করে রাজস্থানের ও হিমাচলপ্রদেশের প্রাসাদগুলির প্রাচীর চিত্র যথেষ্ট পরিমাণে ভারতের প্রাচীন গুহাচিত্রের রীতি নীতি শৈলী ও কম্পোজিশনের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে এখন লোকচিত্রে বহতা থেকেছে। এই কারণে আনন্দ কুমারস্বামীর গভীর অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ মন্তব্যটি স্মরণযোগ্য। তিনি লিখেছেন মুঘলচিত্র হচ্ছে শিক্ষা ও চিন্তাপ্রসূত, বিদ্বৎসমাজের জন্য তৈরি। তার মধ্যে আছে নাটক ও নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি, যা ব্যক্তিগত রুচিনির্ভর। রাজপুত চিত্রকলা মূলত রাজকীয় লোকচিত্র, সবশ্রেণীর দর্শককে আনন্দ ও চিত্তের প্রসাদ দেবে, সাধারণ জীবন থেকে অবিচ্ছেদ্য, উপরন্তু এ চিত্রকলা সম্পূর্ণ মানবিকভাব, অনুভূতি ও চিন্তানির্ভর। সেইজন্যই বোধহয় রাজস্থানের যেখানেই গেছি সেখানেই দেখেছি স্থানীয় মিনিয়েচরের নন্দনতত্ত্ব ও বৈশিষ্ট্য শৈলী মূলত সাধারণ নাগরিকের গৃহের দেয়াল থেকে প্রাসাদ প্রাচীরের চিত্রের রীতির সঙ্গে নানা সূক্ষ্ম, কিছুটা অনুচ্চারিত বা অর্ধউচ্চারিত ভাবে লুকিয়ে আছে, অথচ দুই রীতির আত্মীয়তা অনস্বীকার্য।

রাজস্থানের বিভিন্ন আঞ্চলিক শৈলীগুলি বিশ্লেষণ করে যে ঘরানাগুলির আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য নির্ণীত হয়েছে সেগুলি হচ্ছে আজমীর, অম্বর (আঠারো শতক থেকে জয়পুর [স্থাপিত ১৭২৭] বলে প্রসিদ্ধ), বিকানীর, বুঁদি, কিষেণগড়, কোটা, মাড়োয়ার (রাজধানী যোধপুর), মেবার (রাজধানী উদয়পুর)। এদের মধ্যে যেগুলি বড় রাজ্য

ছিল তাদের আবার ছোট ছোট অঞ্চল ছিল, তাদের বলত ঠিকানা। সেই ঠিকানাগুলির কয়েকটির আবার নিজস্ব শৈলীর জন্যে খ্যাতি ছিল, যেমন দেওগড়, আজমীরের ঠিকানা ছিল সওয়ার। ভৌগোলিক মার্কা বা লেবেল ছাড়াও, স্থানীয় অধিবাসীদের নামেও অঞ্চল হত, যেমন শেখাওতী রীতি।

১৯৮০ দশকের শেষ পর্যন্ত যে সব আঞ্চলিক ঘরানা সম্বন্ধে সার্থক গবেষণা হয়েছে তাদের তালিকা এই রকম : আজমীর (সংলগ্ন ঠিকানা সওয়ার), বিকানীর, বুঁদি, দেওগড়, ডুঙ্গরপুর, জয়পুর, যোধপুর, কিষেণগড়, কোটা, মাড়োয়ার, মেবার। মধ্যভারতে রঘোগড়, উনিয়ারা, ডাটিয়া (তার মধ্যে অর্চাকে ফেলা যায়)।

এক হিসাবে রাজপুত মিনিয়েচরের চিত্ররীতির মূল বা ভিত্তি মুঘলরীতি থেকে অনেক বেশি প্রাচীন ও পোক্ত ও সেই হিসাবে শক্ত, দীর্ঘজীবী। অন্যপক্ষে মুঘল চিত্ররীতি মূলত ষোল শতকে বিদেশ অর্থাৎ ঈরাণ থেকে আমদানি, যাকে প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা বলবেন, আমদানি করা বিদেশী জাতের কলম (বা graft) ; ভারতের মাটিতে স্থানীয় রীতির সঙ্গে জুড়ে, লালন করে বড় করা, এবং সেই হিসাবে তার যাবতীয় ফলফুল একলাফে অনেক উন্নতজাতের হয়ে গেল, যেমন কলমের আম হয়।

অন্যপক্ষে রাজপুত শৈলী শুরু হয় আঁটির গাছের ফল হিসাবে। কিন্তু ষোল শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে দেশী আঁটির ফলের সঙ্গে কলমের ফলের গাছের সংমিশ্রণে আবার নতুন জাতের শৈলী তৈরি হয়, বিশেষত রাজপুত চিত্রেতিহাসে। মালোয়া, রাজস্থানের বহু অঞ্চল থেকে মুঘলরা সিদ্ধহস্ত চিত্রকরদের আমদানি করেন তাঁদের কারখানায় ঈরাণী ওস্তাদদের সাহায্যার্থে, সাকরেদ হিসাবে। দেশী চিত্ররীতি ও ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের সঙ্গে যুক্ত হল বিদেশী জ্ঞান ও প্রযুক্তি, রীতি নীতি দর্শন। ফলে এল মুঘল চিত্রের চরিত্রচিত্রণ, রঙের শুদ্ধতা, কম্পোজিশন ও নন্দনতত্ত্বের নতুন সংস্করণ, লেখন, রেখাঙ্কন, বর্তনাব্যঞ্জনা, বর্ণক্রম, দ্বিককর্ম বা দীপকর্মের নতুন রূপান্তর। দেশী চিত্রকররা ইতিমধ্যে কিছু কিছু মুঘল দরবারের কারখানা ও রাজস্থানের মুঘল সাম্রাজ্যের অনুগত রাজাদের রাজসভায় আনাগোনা করে রাজস্থানী চিত্ররীতিকে রূপান্তরিত, নতুন নান্দনিক তত্ত্বে দীক্ষিত করার কাজ শুরু করলেন। যে-মাটিতে এই কাজ শুরু হল তা হলে দেশজ পুঁথিচিত্র ও সার্বভৌম রাজস্থানী প্রাচীর চিত্র রীতি। মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয় অবস্থার উল্টোস্রোতে রাজস্থানী চিত্রকলার অভূতপূর্ব, এমন কি অপার্থিব, ঐশ্বর্যবৃদ্ধি হল। আঠারো শতকে মুঘল দরবারের স্তিমিত কারখানাগুলি থেকে দলে দলে শিল্পীরা পশ্চিম ভারতের রাজস্থানের বিভিন্ন রাজ্যে, হিমাচলপ্রদেশে, পাঞ্জাবে এবং মুঘল প্রাদেশিক রাজ্যগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে মুঘল চিত্ররীতির জ্ঞান, শিক্ষা ও উন্নতরুচিপ্রসূত অভিজাত বোধ, চিন্তা, অনুভূতি, ভাব, দর্শন ও কাব্যময় পরিশীলিত, অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ শৈলীর জন্ম দিল। মুঘল চিত্রশালায় দেশী বিদেশী জাতের শিল্পের সংমিশ্রণে যে মিশ্র কলম হয়েছিল, তার ফল পুনরায় রাজস্থানী দরবারগুলিতে ফিরে গিয়ে দেশজ গাছের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে নতুন যে ফলের সৃষ্টি করল তার কমনীয়তা, সূক্ষ্মতা, অন্তর্দৃষ্টি, কোমলতা, অতীন্দ্রিয়, অভিজাত, পেলবভাবের তুলনা মেলা শক্ত হল, আমরা দেখি অম্বর, মেবার, যোধপুর, গুলের, গাড়োয়াল কাংড়া ইত্যাদি চিত্ররীতিতে আঠারো ও উনিশ শতকের প্রথমের চিত্রসৃষ্টিতে। এই চিত্রগুলির মানবিক, আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও অনুভূতির আভিজাত্যে, মুঘল নৈপুণ্য, শৈলীর উৎকর্ষ মননকে এক সুউচ্চ অনুভূতি ও উপলব্ধির জগতে নিয়ে যায়। আমরা আত্মবিস্মৃত জাতি। সময়ে সময়ে আমার বিশেষ দুঃখ হয় যে আমাদের দেশের শিল্পীরা এই ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে ভালভাবে দীক্ষিত হবার সুযোগ আজকাল স্কুল কলেজে পান না। একমাত্র সুযোগ হয়েছিল নন্দলাল বসু অবনীন্দ্রনাথের সময়ে, তবে তাঁদের সম্বন্ধে আমার অনুযোগ, তাঁদের মধ্যে বিশেষত নন্দলাল, অতীতের মহিমাই বেশি দেখলেন, এবং অতীতে থাকলেন। আসলে আমি ব্রেশটের কথায় বিশ্বাস করি, 'everything is good about everything new' নতুন প্রতিটি জিনিস পুরাতন জিনিসের থেকে ভাল। আমার আক্ষেপ যে বেঙ্গল স্কুলের উত্তরাধিকারীরা যদি ইওরোপীয় রীতি গভীর অভিনিবেশে অধ্যয়ন ও নিরীক্ষণ করে নতুন এক কলম তৈরি করতেন, তাহলে কত ঐশ্বর্যেরই না সৃষ্টি হত। ঠিক যেমন হয়েছে জাপানী উডকাট ও পৃথিবীর নানা স্থানের শৈলী ও দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ে জ্ঞান ও শিক্ষা আহরণ করে, ইওরোপীয় শিল্পকে এক নতুন অতীন্দ্রিয় জগতে নিয়ে যান উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের প্রথমে ফরাসী শিল্পীরা। আসলে কলমের গাছের ফল প্রতিবারই এক নতুন ঐশ্বর্যের আস্বাদ ও সন্ধান দেয়।

উপরোক্ত প্রতিটি ঘরানার নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞরা প্রামাণ্য বই লিখেছেন। প্রাকৃতিক দৃশ্য, গাছপালা, পাতা, ফুল, বাড়িঘর, মেঘ, আকাশ, মানবপ্রকৃতি, অভিব্যক্তি, ভাবের প্রকাশ, বিষয় প্রাধান্য, এসব বিষয়ে প্রতি রাজপুত ঘরানা সম্বন্ধে বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করে, এক ঘরানা অন্য ঘরানা থেকে কিভাবে কি হিসাবে তফাৎ

তার লক্ষণগুলি বিশ্লেষণ করেছেন। তাদের অভিনিবেশ ও বিচক্ষণতার সঙ্গে আমার পাল্লা দেয়া সম্ভব নয়। তবে একথা মনে রাখা দরকার পণ্ডিতরা শ্রেণী ও জাত বিভাগ করার সময়ে এমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিভিন্ন চারিত্রিক প্রকোষ্ঠের উদ্ভাবনা করে লক্ষণগুলি খোপে খোপে চালান বা বরাদ্দ করে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন, যা অনেক সময়ে তাঁদের এবং আমাদের শ্রেণীবিন্যাসের অযথা জটিল বিভ্রান্তিতে ঘুরিয়ে মারে। বংশলতিকায় লক্ষণের মূল্য খুবই আছে কিন্তু এই বংশের এক শাখার কিছু লক্ষণ সেই বংশের অন্য শাখায় যে দেখা দিতে পারে সে সম্ভাবনা বাদ দেওয়া উচিত নয়। আমার মতে রাজপুত চিত্রের আদিপুরুষ হচ্ছে প্রাচীর চিত্ররীতি এবং তার সঙ্গিনী জৈন ও বৈষ্ণব পুঁথি চিত্ররীতি, যে সঙ্গিনী ঈরাণী ও পাঠান চিত্রনীতির সাহচর্যে সমৃদ্ধ হয়ে, প্রাচীন প্রাচীররীতির সঙ্গে মিলিত হয়ে, পুনরায় মুঘলরীতির সঙ্গে এক সঙ্গে সহবাস করে দিকে দিকে রাজস্থান ও হিমাচলে সন্তানসন্ততি বৃদ্ধি করেছে।

এই ধরনের শিল্পসঙ্গম ও সমন্বয়ের সাক্ষ্য পাই, প্রতাপাদিত্য পাল-এর কোর্ট-পেন্টিংস অভ ইন্ডিয়া বইয়ে রাজপুত চিত্রের অনুচ্ছেদে প্রথম ত্রিশটি ছবিতে। এগুলি ১৫৫০-১৬০৫—১৬২৫-৫০-এ তৈরি। এগুলিতে জৈন পুঁথিচিত্রের লক্ষণাদি পুরোমাত্রায় দেখা যায়। কিন্তু তার পরে কালক্রমিকতায় মুদ্রিত যে সব ছবি দেখি তাতে মুঘল সংসর্গের অভিজ্ঞান পূর্ণভাবে প্রকট। দুঃখের বিষয়, প্রতাপাদিত্য পাল তাঁর ছবির ক্রমিকতায় কালানুক্রমিকতা রক্ষা করেননি, অর্থাৎ যেখানে যে ছবির উদ্ভব হোক না কেন কালানুক্রমে সেগুলি সাজালে এই ছবিগুলিরই সূক্ষ্ম, নান্দনিক, অভিব্যক্তি, অনুভূতি, ভাবগত, আসঙ্গগত রূপগুলির কালক্রমিক উন্মেষ বুঝতে সুবিধা হত, এবং রাজপুত চিত্র কি করে আঠারো শতকে এমন কি উনিশ শতকের প্রথমে হিমাচলপ্রদেশের গুলেরে, কাংড়ায়, গাড়োয়ালে তার চূড়ান্ত পরিণতি পায় সে উপলব্ধির পথও প্রশস্ত হত। তা সত্ত্বেও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করার চোখ তৈরি করা ও অনুশীলনের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। কি করে আকাশের রঙ ও মেঘের বিন্যাস অঙ্কনরীতি ও রঙ দেখে বলা যায় ছবিটি বিকানীরের না মেবারের, কি করে বাড়ি ঘর দোর, কম্পোজিশনের সংস্থান দেখে বলা যায় ছবিটি জয়পুরের, অথবা যোধপুরের, অথবা কোটা'র, কি করে বিশেষ বিশেষ রঙের ব্যবহার দেখে বলা যায় ছবিটি কিষানগড় বা আজমীরের, সে সব লক্ষণবর্ণিত প্রকাশিত বইগুলি, বিশেষত ত্রিশ বছরে ললিতকলা অ্যাকাডেমি যে বইগুলি বার করেছে, তাদের তালিকা আমি এ বইয়ের শেষে দিয়েছি। সেগুলি পাঠকের অবধানার্থে বিশেষ সাহায্যে আসবে। তবে যেহেতু আমার মতে মুঘল-রাজপুত-পাহাড়ী-শিখ চিত্রাবলী এক বিরাট যৌথ পরিবারের শাখা-প্রশাখা, সেহেতু কালানুক্রমে এবং সেই সঙ্গে পুরুষানুক্রমে সেই বংশের লক্ষণগুলি, যাকে ইংরেজিতে বলে শ্রেণীগত বিভাগ ও বিভাজন (ট্যাক্সোনমিক বিশ্লেষণ) করলে স্থূল চিত্রগত লক্ষণের রূপান্তরের সঙ্গে মানবিক, আধ্যাত্মিক, আনুভূতিক, ভাবগত অভিব্যক্তি ও বিবর্তনেরও স্পষ্ট ক্রমান্বয় ধারা প্রতিভাত হবে। এইটুকু বলে আমি রাজপুত চিত্রের মত এক বিশাল, জটিল বিশ্ব পাঠকের রুচি ধৈর্য আগ্রহ ও অধ্যবসায়ের উপর ছেড়ে দেয়াই সমীচীন বোধ করি। নিচের আলোচনা সূচনা হিসাবে ধরতে হবে।

পশ্চিম ভারতীয় ও রাজপুত চিত্র

আঞ্চলিক চিত্রকলা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা হল। এখন সাধারণত যাকে রাজপুত চিত্র বলা হয় তার সম্বন্ধে কিছু বিচার দরকার। রাজপুত চিত্র কথাটা আমরা সচরাচর খুব ঢিলেঢালা ভাবে ব্যবহার করি ; ফলে রাজপুত চিত্ররীতি আর ভারতবর্ষের হিন্দু চিত্ররীতি কতকটা একই জিনিস বোঝায়, সে রীতি দাক্ষিণাত্যেরই হোক আর গুজরাটেরই হোক, বা আসল রাজস্থানের অথবা পাঞ্জাবের পার্বত্যদেশ, বা পূর্বদেশের বুন্দেলখণ্ডি ছবিই হোক। প্রথমেই কিন্তু একটা কথা মনে রাখা দরকার। স্থান-মাহাত্ম্য অনুসারে চিত্ররীতির বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য যথেষ্ট থাকলেও ভারতবর্ষের সর্বত্র সর্বদা চিত্ররীতি-নীতির আদান-প্রদান অত্যন্ত বেশি রকম হয়েছে। ফলে একথা কোন রীতিবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলা যায় না যে সেটি নিতান্তই দেশজ, তাতে অন্য কোন রীতির ছাপ নেই। তাছাড়া যুগধর্ম অনুসারেও রীতিনীতি ঘনঘন বদলাচ্ছে। সুতরাং রাজপুত চিত্রের ক্ষেত্রেও কোন রীতি কোনও বিশেষ স্থানে বা রাজ্যে স্থাণু বা অজড় অনড় হয়ে ছিল না, স্থান কাল পাত্র ভেদে চিত্ররীতি অনেকক্ষেত্রে বেমালুম বদলেছে। কিছু আগেই বলেছি যে নিছক মুঘল বা ভারত-পারসীক চিত্ররীতি বলে কিছু নেই, পারসীক রীতি, ভারতীয় রীতির সংমিশ্রণে ভারতীয় শিল্পীর হাতে, পুনর্জন্ম নিয়ে যেমন এক বিশিষ্ট ভারতীয় ধারায় রূপান্তরিত হয়েছে, তেমনি যুগে

যুগে, রাজ্যে রাজ্যে, ভারতীয় লোকচিত্র ও প্রাচীর বা গুহাচিত্ররীতি স্থান কাল পাত্র ভেদে, নানা শিল্পীর হাতে, নানা প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে নানা রকম বিচিত্র রূপ নিয়েছে। বিশুদ্ধ রাজপুত রীতি বলে কিছু বোধহয় নেই, এবং সেই হিসাবে আনন্দ কুমারস্বামী তাঁর রাজপুত চিত্রকলা বইয়ে মুঘল ও রাজপুত চিত্রনীতি রীতির মধ্যে যে আকাশ-পাতাল, অর্থাৎ দুটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন জগতের বৈষম্য, পার্থক্য এমন কি নীতিগত বিরোধের কথা বলেছেন তা বোধহয় কতকটা মনগড়া বা কাল্পনিক, নিদেনপক্ষে কষ্টকল্পিত। কারণ, কি ঐতিহাসিক, কি অর্থনৈতিক, কি সামাজিক, সব ক্ষেত্রেই যখন মুঘল সাম্রাজ্যের সঙ্গে দেশীয় হিন্দুরাজ্যগুলির ঘনিষ্ঠ, ওতপ্রোত সম্বন্ধ ছিল, যখন চিত্রশিল্পীদের মধ্যেও ঘনিষ্ঠ আদান-প্রদান ছিল, এমন কি হিন্দু শিল্পী মুসলমান দরবারে, এবং মুসলমান শিল্পী হিন্দু দরবারে বিশেষ সম্মান পেতেন তখন এটা সহজেই অনুমান করা যায় যে হিন্দু ও মুঘল চিত্ররীতির মধ্যে দুর্ভেদ্য পাঁচিল থাকা কখনও সম্ভব নয়। অতএব হিন্দুচিত্রে মুসলমান রীতি যেমন দেখা যায়, মুসলমান চিত্রেও হিন্দুরীতি তেমনি দেখা যায়।

রাজপুত রীতি আলোচনার আগে খ্রীস্টীয় সাত থেকে পনেরো শতক পর্যন্ত কোথায় কি চিত্ররীতির নিদর্শন এখনও বর্তমান আছে তা আরেকবার চট করে ঝালিয়ে নেওয়া যাক। খ্রীস্টীয় প্রথম শতক থেকেই ত্রিবাঙ্কুর কোচিনে সিরীয় চার্চের একটি বড় কেন্দ্র আমাদের দেশে আছে। খ্রীস্টের খোদ শিষ্য সেন্ট টমাস ভারতে আসেন। সিরিয়ান চার্চের যখন যথেষ্ট প্রতিপত্তি এ অঞ্চলে ছিল তখন এটুকু অনুমান করা যায় যে গ্রীক এবং পরে খ্রীস্টীয় বা বাইজানটাইন চিত্ররীতিও এখানে নিশ্চয় কিছু কিছু বহুদিন থেকে বর্তমান। কিন্তু এই ঐতিহ্যের বিশেষ কিছু নিদর্শন নেই। ত্রিবাঙ্কুরের পদ্মনাভ মন্দিরে সতেরো শতকের আঁকা কিছু প্রাচীরচিত্র এখনও আছে; ত্রিবাঙ্কুর চিত্রালয়ের অধ্যক্ষকে লিখলে এইসব ছবির ফোটোগ্রাফ পাওয়া যায়; তাতে নক্শা ও রেখার কাজের অপূর্ব নৈপুণ্য থাকলেও বিদেশী ছাপ বিশেষ নেই। অজন্তা, ইলোরা, বাঘের পর যে গুহাচিত্র সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তার নাম সিত্তন্নভাসল। এটি একটি জৈন মন্দির; কৃষ্ণানদীর দক্ষিণতীরে পুদুকোট্টাই থেকে নয় মাইল উত্তর-পশ্চিমে সিত্তন্নভাসল বলে গ্রামে। পল্লব রাজবংশের একেবারে কেন্দ্রস্থলে বললেই হয়। পাহাড় থেকে কেটে বার করা মন্দিরটি এককালে সবটাই চিত্রিত ছিল। এখন শুধু ভিতরের ছাত, থামের উপরদিক ও মাথাগুলিতে ছবির অবশিষ্ট আছে। মন্দিরের বারান্দার ছাতে একটি বিরাট ফ্রেস্কো আছে: বিষয় হচ্ছে একটি বিরাট পদ্ম সরোবর, পদ্মে ভর্তি, তার মধ্যে মাছ, হাঁস, মোষ, হাতি আর তিনটি পুরুষ, তাদের হাতে পদ্ম। দু'জন লোকের গায়ের রঙ গাঢ় লাল, তৃতীয়টির রঙ উজ্জ্বল হলদে। তাদের যেমন মধুর ভঙ্গি, তেমনি রঙ, তেমনি সুন্দর মুখের ভাব। নক্শার কাজের বৈচিত্র্য যেমন, তেমনি সুন্দর বর্ণবিন্যাস, আর ছায়াতপ। থামের কাজেও নৈপুণ্য অপূর্ব, যে কয়টি ছবি আছে অধিকাংশই নর্তকীদের হাতে পদ্ম। এখন থেকে বোধহয় দেবদাসীদের চলন হয়। গুহার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছবি অবশ্য অর্ধনারীশ্বরের। কিন্তু দুটি অপ্সরাদেরও তুলনা মেলা ভার।

সিত্তন্নভাসলের ছবি বোধহয় পল্লব রাজ প্রথম মহেন্দ্র বর্মণ এবং তাঁর পরবর্তী রাজা নরসিংহ বর্মণের সময়ে আঁকা। অর্থাৎ খ্রীস্টীয় ৬২৫ থেকে ৬৫০ সনের মধ্যে। এই সময়ে অজন্তায় ও বাঘেও সেরা সেরা প্রাচীরচিত্র আঁকা হচ্ছিল। আর ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়, ঠিক এই যুগে সুদূর উত্তর পশ্চিমে চীনের টুনহুয়াঙ গুহাগুলিতেও শিবিরাজের উপাখ্যান, হাওয়ায় ভেসে যাওয়া অপ্সরাদের অপূর্ব গুহাচিত্র আঁকা হয়।

পশ্চিম বাঙলার ভূতপূর্ব রাজ্যপাল ডঃ কৈলাসনাথ কাটজু পঞ্চাশের দশকের প্রথম কেঁওঝড় রাজ্যের কাছে কতগুলি গুহাচিত্র আবিষ্কার করেন। এগুলি ইতিহাসের আগের যুগের ছবি কিনা জোর করে বলা যায় না।

খ্রীস্টীয় দশ শতকে তাঞ্জোরের মন্দির স্থাপিত হয় এবং ১০০৯ সাল নাগাদ এই মন্দিরের গায়ে যে সমস্ত ফ্রেস্কো আঁকা হয় তাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে অজন্তার চিত্ররীতির প্রভাব দক্ষিণ ভারতে তখনও বেশ প্রবল। নায়ক রাজবংশের সময়ে এইসব ফ্রেস্কোর উপর আবার নতুন করে টেম্পেরায় ছবি আঁকা হয়। কিন্তু সম্প্রতি উপরকার টেম্পেরাগুলি চেঁচে ভিতরের ফ্রেস্কো বেরিয়েছে। কিন্তু বাঘের চিত্ররীতির থেকে এইসব ফ্রেস্কোর বিশেষ প্রভেদ নেই।

দক্ষিণ ভারতে দশ শতক থেকে আশ্চর্য ভাস্কর্যের যুগ শুরু হয়, শেষ হয় পনেরো ষোল শতকে। অধিকাংশ ভাস্কর্যে কিন্তু চিত্রগুণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মাদুরার মন্দিরের কিছু কিছু প্রাচীরচিত্র এখনও আছে, সেগুলি কত প্রাচীন বলা শক্ত। আনেগুণ্ডির প্রাচীরচিত্রগুলিও যথেষ্ট প্রাচীন। কিন্তু তিরুপতি তিরুমাল কুন্দরমের ছাতে যে সব চিত্র আছে তার থেকে বুঝতে দেরি হয় না যে বাংলার জড়ানো পটের আদি নজির হিসাবে এইসব ছবিকে

অনায়াসে ধরা চলে।

উত্তর ভারতে মধ্যযুগের ছবির নিদর্শন প্রায় নেই বললেই হয়, কিন্তু দক্ষিণ ভারতে এই সময়ে চিত্রশিল্পের নিশ্চয় বিশেষ চর্চা ছিল। তারনাথের লেখায় দক্ষিণ দেশের চিত্রশিল্প সম্বন্ধে অল্প উল্লেখ পাওয়া যায়। তারনাথ দাক্ষিণাত্যের তিনজন বিখ্যাত শিল্পীর নাম করেন : জয়, পরাজয় ও বিজয়। প্রত্যেকের আবার অনেক শিষ্য ছিলেন। এঁদের তারিখ জানার উপায় নেই, এঁদের হাতের কাজও কিছু পাওয়া যায়নি। এই বিশিষ্ট দক্ষিণী রীতি পরের যুগে ভিন্ন রীতিতে ভাগ হয়ে যায়, একটি তাঞ্জোরী, অন্যটি মহীশূরী। কিন্তু এসব হয় সতেরো শতকের শেষে, আঠারো শতকে।

ইতিহাসের প্রথম যুগে যে আন্দোলন চিত্রশিল্পে সবচেয় বেশি প্রাণের সঞ্চার করেছে, সেই বৌদ্ধধর্ম মধ্যযুগে উত্তর ভারতে চিত্রকলার কি কি নিদর্শন রেখে গেছে তার সামান্য উল্লেখ দরকার। পালবংশের অনুগ্রহে খ্রীস্টীয় নয় থেকে বারো শতকের মধ্যে উত্তর ভারতে বৌদ্ধ চারুশিল্পের সবচেয়ে বেশি উন্নতি ঘটে। তখন উত্তর ভারতের কলাকেন্দ্র ছিল নালন্দা। সাহিত্যের নানা লেখা থেকে জানা যায় যে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়ি ঘর দোর সব চিত্রিত ছিল। সে সবের অবশ্য এখন কিছু নেই। নালন্দার চিত্রকলার অবশিষ্ট যা কিছু আছে, তার কথা শুনলে কষ্ট হবে। জীর্ণ দুয়েকটি তালপাতার পুঁথির পাতার কয়েক ইঞ্চি জুড়ে কয়েকটি মাত্র ছবি আছে, আর আছে সেইসব পুঁথির চিত্র করা কয়েকটি কাঠের পাটা। আর সবই ১১৯৯-১২০০ সনে দু'বছরেরও কম সময়ে মুসলমানদের ধ্বংসকাজে নষ্ট হয়ে গেছে। যেটুকু আছে তার হিসাব দু'লাইনেই দেওয়া যায়। কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে একজোড়া চিত্রিত কাঠের পাটা আর অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা পুঁথির দুটি চিত্র করা তালপাতা আছে। এদের বয়স বোধহয় খ্রীস্টীয় ১০১৫ সনে। অক্সফোর্ডের বডলিয়ান গ্রন্থাগারে রামপালের ১৫ বছর রাজত্ব কালে (অর্থাৎ এগারো শতকে) লেখা অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞপারমিতা পুঁথির একটি চিত্রিত কাঠের পাটা আর দুটি চিত্রকরা তালপাতা আছে। কাঠের পাটাটিতে আছে প্রজ্ঞাপারমিতা আর তারার চিত্র। একটি তালপাতায় আছে বুদ্ধের ছবি, ইন্দ্র তাঁর আরাধনা করছেন, দু'পাশে সূর্য চন্দ্র। আরেকটি তালপাতায় আছে বুদ্ধের জীবনী থেকে কিছু কিছু দৃশ্য। এই তিনটি ছবিই সবচেয়ে ভাল অবস্থায় এখনও আছে। পঞ্চবিংশতিসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা বলে হরিবামন রাজার আট বছর রাজত্বকালে একটি পুঁথি লেখা হয়, তার সমস্তটা পাওয়া যায়নি। এরই তিনটি পাতা এখন বরোদা রাজ্যের মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। এগুলি এগারো শতকের শেষের দিকের। তিনটি ছবি আছে, একটি মঞ্জুশ্রীর, দ্বিতীয়টিতে আছে রক্তলোকেশ্বর আর হয়গ্রীব ; তৃতীয়টিতে অবলোকিতেশ্বর। বানারসের ভারত কলা ভবনে রামপালদেবের নয় বছর রাজত্বকালে লেখা প্রজ্ঞাপারমিতা পুঁথির একটি তালপাতা আছে, তাতে তারার ছবি আছে। পাটনার দেওয়ান বাহাদুর রাধাকিষণ জালানের কাছে একটি প্রজ্ঞাপারমিতা পুঁথির দুটি চিত্রিত কাঠের পাটা আছে। গোবিন্দপালের আঠারো বছর রাজত্বকালে (বারো শতকের শেষ দিকে) লেখা অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা পুঁথির একটি তালপাতা কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে আছে, এতে তারা আর কালীর রঙীন ছবি আছে। এশিয়াটিক সোসাইটিতেই বারো শতকে লেখা একটি অসম্পূর্ণ প্রজ্ঞাপারমিতা পুঁথি আছে তাতে তিনটি অসম্পূর্ণ ক্ষুদ্রকায় ছবির সীমারেখার নক্‌শা আছে। পালযুগের ছবি যা কিছু আছে তার প্রায় পুরো তালিকা বলতে এইটুকুই, এর মধ্যে কাঠের পাটার চিত্রগুলি তালপাতার ছবির চেয়ে অনেক বেশি ফলাও করে আঁকা এবং ছবি হিসাবেও উল্লেখযোগ্য। তাতে তান্ত্রিক সূত্র অনুযায়ী ভাস্কর্য বা ধাতু ঢালাই মূর্তির মত করে আঁকার দরুন ছবিগুলিতে চিত্রকরের স্বাধীনতা যে কম ছিল তা বোঝা যায়। আগেই বলেছি ভারতে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস লিখতে গিয়ে তারনাথ চিত্রকলা ভাস্কর্য আর ধাতু ঢালাই মূর্তির কাজ সম্বন্ধে একসঙ্গে একই জায়গায় আলোচনা করেছেন। সুতরাং তিনটি শিল্পের মধ্যে সে যুগে শুধু যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল তা নয়, তাদের শিল্পগত অস্বিষ্টও বোধ হয় এক ছিল। ডঃ কঞ্জে বলেন সে যুগের বৌদ্ধ প্রভাবের যথাযথ পরিচয় এই ছবিকয়টিতে পাওয়া যায়। ছবিগুলির পশ্চাদ্‌পট মামুলিভাবে আঁকা, প্রাকৃতিক দৃশ্য বা গাছপালার শুধু নামমাত্র ইঙ্গিত আছে বলা যায়, দেবীরা যে সব সিংহাসনে বসে আছেন সেগুলি নিতান্ত ধাতু ঢালাই করা সিংহাসনের মত দেখায়। ছবিগুলি প্রথম দেখলে মনে হয় যেন ভাস্করের আঁকা নক্‌শা, যা দেখে দেখে মূর্তি গড়া হবে, সুতরাং ছবিতে মড়লিং এবং প্লাস্টিক রূপের দিকে বেশি ঝোঁক। ঠিক এই ধরনের গুণ সমসাময়িক পশ্চিম ভারত অথবা দক্ষিণ ভারতের ছবিতে নেই। সে সব অঞ্চলের ছবিতে আছে রেখার প্রাধান্য ; ছবিগুলি মুখ্যত আখ্যানমূলক, চিত্রধর্মী। পালযুগের পুঁথিচিত্রের রীতি ভারতের অন্য কোথাও ঠিক দেখা যায় না ; এ রীতি নিশ্চয় নেপাল থেকে এসেছিল। রঙের জমক যদিও

খুব আছে, তবু পরের যুগের ভারতীয় চিত্রের প্রাণবন্ততা এতে নেই, অথবা আগের যুগের গুহাচিত্রের মানবিক আবেগ নেই।

গত সত্তর বছরে গুজরাটী চিত্রনীতি সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয়েছে। প্রথম প্রথম গুজরাটী ছবি হলেই জৈন বলা হত, কিন্তু একই রীতিতে আঁকা বৈষ্ণববিষয়ক ও সামাজিক ছবি পাওয়াতে এখন আর গুজরাটী চিত্রনীতিকে নিছক জৈন বলা হয় না। এখন অনেকে গুজরাটী ছবিকে পশ্চিম ভারতীয় ছবি বলেন, কিন্তু এরও বিপদ আছে, কারণ 'পশ্চিম ভারতীয়'র মধ্যে রাজপুতানাও পড়ে যায়। গুজরাট আর রাজপুতানা পাশাপাশি হলেও এবং দুটি দেশের মধ্যে ভাষা ও সংস্কৃতিগত সম্বন্ধ থাকলেও আরাবল্লীর উত্তরে রাজপুতানা আর দক্ষিণ-পশ্চিমে গুজরাটের মধ্যে অর্থনৈতিক কাঠামোর এত তফাৎ, রাজপুতানা এত সামন্ততান্ত্রিক, আর গুজরাট চিরকাল এত বাণিজ্য-নির্ভর, যে দুই দেশের চিত্রনীতিকে একই নামে ডাকলে অন্যায় হবে।

গুজরাটী রীতি

ভারতের চিত্রকলার ইতিহাসে গুজরাটী রীতির একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। সেটি হচ্ছে, অজন্তা বাঘের যুগ আর পনেরো শতকের পরের রাজপুত, মুঘল, ডেকানী যুগের ছবির মধ্যে যে মধ্যযুগ, গুজরাটী চিত্রের সাহায্যেই শুধু এই মধ্যযুগের চিত্ররীতির হদিশ মেলে, এবং গুজরাটী চিত্রই এই দুটি যুগের, দুটি বিশিষ্ট ধারার, যোগসূত্র মিলিয়ে দেয়। তাঞ্জোর, আনেগুণ্ডি বা তিরুপতি তিরুমালা'র ফ্রেস্কো ছাড়া মধ্যযুগের ছবির নিদর্শন বিশেষ পাওয়া যায় না। এক যেটুকু আছে পালবংশের ছবিতে ; যার উল্লেখ এখনই করেছি। কিন্তু পাল চিত্ররীতি রপ্তানি হয় নেপালে, ভারতে তার প্রভাব খুবই কম দেখা যায়।

অনেকে তর্কের খাতিরে অনুমান করেন যে মধ্যযুগে সারা ভারতময় হয়ত কোন বিশিষ্ট চিত্রধারা ছিল, যার একটি অঙ্গ দেখি গুজরাটে, অন্যটি নালন্দায়। হয়ত ছবির পশ্চাদ্‌পটে বা অন্য ভঙ্গিতে সামান্য কিছু মিল থাকতেও পারে কিন্তু আসলে দুটি রীতি সম্পূর্ণ তফাৎ। কোন সম্বন্ধই বিশেষ নেই। এর কারণ সোজা। একদিকে বাঙলার ছবিতে নিতান্ত আশ্রমসুলভ কঠোর তনুতা ; অন্যদিকে গুজরাটী চিত্রকলায় ব্যবসাবাণিজ্যস্ফীত মধ্যশ্রেণীর প্রগল্‌ভ বিস্তার।

গুজরাটে চিত্রকলার যে প্রসার সম্ভব হল, তার জন্যে দায়ী গুজরাটের ব্যবসাবাণিজ্য। বরোচের বন্দর আর ক্যাম্বে উপসাগরে বাণিজ্যের কল্যাণে গুজরাটে পুরাকাল থেকেই প্রভূত বিত্তশালী বণিক-সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। এই বাণিজ্যের প্রভাব গুজরাটের সমাজে সংস্কৃতিতে গভীরভাবে দেখা যায়। উত্তর ভারতে যখন মুসলমান আক্রমণে রাজদরবারগুলির অবস্থা একে একে খারাপ হয়ে যায় তখন বাণিজ্যের উপর নির্ভর করেই গুজরাটের ধনীসমাজ বরাবর চিত্রশিল্পীদের পোষণ করে যান। এইসব ভোগলিপ্সু ধনী মধ্যশ্রেণীরা যে বৌদ্ধধর্মের আশ্রমানুবর্তিতার পরোয়া করবেন না, বা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের কঠোর নিয়মানুগত্যের তোয়াক্কা রাখবেন না, এটুকু সহজেই আন্দাজ করা যায়। লৌকিক ধর্মের জোয়ার আসার আগে, চৈতন্যদেবের অনেক আগেই, গুজরাটে বাউলজাতীয় গান গেয়ে বেড়ানো কবিরা এক দেশজ সংস্কৃতির ধারার প্রবর্তন করেন। এই যুগের চিত্রশিল্পের নিদর্শন কিছু নেই। কিন্তু এই যুগের পরে আসে জৈন প্রভাব যার ফলে আসে জৈন পুঁথি আর ঋজু, আড়ষ্ট পিতলের মূর্তি। এদের জের সতেরো শতক পর্যন্ত চলে।

ওরই মধ্যে মূর্তির চেয়ে পুঁথিচিত্রের প্রাণবন্ততা বেশি। এই জাতীয় ছবিতে পারসীক ক্ষুদ্রকায় চিত্ররীতির প্রভাব গোড়া থেকেই দেখা যায়। পারস্য থেকে ল্যাপিস্ ল্যাজুলাই পাথরের আমদানি হত এবং ল্যাপিস্ ল্যাজুলাই গুঁড়ো করা রঙ-এর দরুন গুজরাটী ক্ষুদ্রকায় ছবির জৌলুস খুলত খুব। ল্যাপিস্ ল্যাজুলাই চূর্ণের রঙ স্পষ্টতই পারসীক প্রভাবের ফল, এ ছাড়াও সামান্য কিছু পারসীক প্রভাব দেখা যায় ছোটখাটো খুঁটিনাটিতে, মুখের আদলে, পোশাকে। শরীরের ভঙ্গিমা এসেছে হয়শলদের ভাস্কর্য থেকে (১০০৭-১৩৩৬)। নাচের ভঙ্গি শরীরের দোমড়ান মোচড়ান নানা অবস্থা সবেতেই হয়শল ভাস্কর্যের ছাপ নিতান্ত অবিসংবাদিত। এমন কি ছবির পাড়ে যে সব জন্তুজানোয়ার, হাঁস, হাতি ইত্যাদির পাঁতি দেখি সে সবই বেলুড় হালেবিদ ইত্যাদি হয়শলদের মন্দিরের পটি থেকে ধার করা।

গুজরাটী চিত্ররীতিকে আজকাল পশ্চিম ভারতীয় রীতি বলা রেওয়াজ হয়েছে। এই রীতির সবচেয়ে প্রাচীন

দৃষ্টান্ত আমরা পাই এগারো শতকের পরের কিছু পুঁথিতে। এত পুরনো পুঁথিতে আমরা ক্ষুদ্রকায় ছবি খুব কমই পাই, যা আছে তা অতি সরলভাবে আঁকা, সবই একটি করে আকৃতি, একই স্থাপত্যের আভাসের মধ্যে ভাস্কর্যের মত নক্শা। তেরো শতকে এই ধরনের নক্শার সামান্য উন্নতি হয়। পশ্চাদ্‌পটে বা পিছনের জমিতে গাছ আসে। চোদ্দ শতকের শেষ দিকে যখন তালপাতার পুঁথির যুগ গিয়ে কাগজের চলন হয়, সেই সময়ে তালপাতায় ফলাও করে নক্শার কাজ শুরু হল। আর চোদ্দ শতকেই পুঁথির দু'পিঠে কাঠের পাটাতেও একাধিক চিত্র দেখা দিল। অতএব দেশজ রীতির উন্নতি হয়ে যখন জটিল ছবির সূচনা হল ঠিক সেই সময়ে অর্থাৎ প্রায় ১৪০০ সন নাগাদ পারস্য থেকে কাগজ আমদানি হল। কাগজের কল্যাণে অনেকখানি জায়গা নিয়ে ছবি আঁকা সম্ভব হল। রঙও আমদানি হল, বিশেষ করে পারস্য থেকে ল্যাপিস্ ল্যাজুলাই-এর, ফলে রঙের বৈচিত্র্য ও জৌলুস বাড়ল। সেই সঙ্গে চিত্রবিষয়ে ও রীতিতেও পারসীক প্রভাব এল। দাড়িওলা লোক, পরনে চাদরজড়ানোর মত করে পরা লম্বা আলখাল্লা, পায়ে লম্বা বুট, এ সমস্তই যে ঈরাণ থেকে এল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। পোশাকে ও কাপড়ের ভাঁজে, পাটে এল নানাধরনের চৌখুপি বরফির মত, কিংবা মাকড়সার জালের মত জ্যামিতিক নক্শা, ইংরেজিতে যাকে বলে অ্যারাবেস্ক। নক্শা হল সমান, চ্যাপটা, ফ্ল্যাট ছবির সব কিছুই একস্তরে সাজিয়ে আঁকা। পুরনো রীতি বলতে রইল শুধু তারের মত সর্পিল অথচ স্পষ্ট, কড়া, সীমারেখা, আর লাল জমি। ১৪১৬ সনের যে ছবি পাই তাতে এই ধরনের রীতি বেশ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

পনেরো শতকে লেখা ও আঁকা কতকগুলি জৈন পুঁথি এখনও আছে। ১৪২৮ সনে রচিত একটি পুঁথি ইণ্ডিয়া অফিস গ্রন্থাগারে আছে। এই শতকের সবচেয়ে বিখ্যাত পুঁথি হচ্ছে ১৪৫১ সনে লেখা বসন্তবিলাস। এটি ওয়াশিংটনে ফ্রিয়ার গ্যালারিতে আছে। গুজরাটে আহমদ শা কুতুবুদ্দিনের রাজত্বকালে ১৪৫১ সনে পুঁথিটি প্রস্তুত হয়। এর চেয়ে প্রাচীন দুটি পুঁথির উল্লেখ আগেই করেছি, একটি পাটান গ্রন্থাগারের কল্পসূত্র, অন্যটি ইণ্ডিয়া অফিস গ্রন্থাগারের কল্পসূত্র ; প্রথমটির তারিখ ১২৩৭, দ্বিতীয়টির ১৪২৭। বসন্তবিলাস লম্বা একফালি তুলোর জমিতে লেখা ও আঁকা। লম্বায় ৩৫ ফিট ৬ ইঞ্চি, চওড়ায় ৯ ইঞ্চি। রঙগুলি সমান, চ্যাপটা করে লাগানো। লাল হল্‌দে খুব বেশি, জমি হল্‌দে। মুখ সাধারণত সমুখ থেকে অর্ধেক করে আঁকা। ফলে দূরের চোখটি মুখের কাঠামো থেকে বেরিয়ে অনেক সময়ে ছবির জমিতে চলে যায়। গাছ সাধারণত বরফির আকারে আঁকা, তাতে শাখাপ্রশাখা আর পাতাও আছে। ভারতীয় চিত্রে এ ধরনের গাছপাতা দেখা যায়, তবে অজন্তা ইলোরার ছবিতে নয়। সেখানে ফুল-ফল-পাতা বিশদভাবে গভীর উল্লাসে বিস্তৃত করে আঁকা। কিন্তু গুজরাটী চিত্রে, এক কলা আর আম গাছ ছাড়া, আর যে কোন গাছই নিতান্ত আড়ষ্ট, কিছুটা অগোছালভাবে আঁকা। মনে হয় সবটাই নিতান্ত বাঁধা ছকে ফেলা। কচিৎ কখনও এর ব্যতিক্রম হয়ে এক স্বচ্ছন্দ ভাব এসেছে। প্রতিকৃতির রেখা দুর্বল। সেই অনুপাতে পোশাক, অলঙ্কার, হাওয়ায় ভাসা, হাল্কা ওড়না, কোমরবন্ধ সবই অত্যন্ত নিখুঁতভাবে যথাযথ করে আঁকা। মোটামুটি বলতে গেলে, এই যুগের গুজরাটী পুঁথিচিত্রে একটি সরল অকপট ভাব আছে, যা সত্যই হৃদয়গ্রাহী। ছবিগুলি অবশ্য অজন্তা ইলোরার মত একান্তই আখ্যানমূলক। পোশাক সম্বন্ধে দু' এক কথা বলা উচিত। পুরুষদের পরনে লম্বা অথবা খাটো ধুতি, কাঁধে উড়ুনি। মাথায় নানা ধরনের মণিমুক্তাখচিত উষ্ণীষ দেখা যায়, কিন্তু সাধারণত চুলে বা খোঁপায় ফুলই বেশি। মেয়েদের পাজামা ওড়না, অর্থাৎ মুঘল পোশাক, তখনও আসেনি ; বরং তাদের পোশাক তখনও অজন্তার মতই। সমসাময়িক অধিকাংশ বৈষ্ণব ছবিতে একই রীতি দেখা যায়। এর কিছু পরে যে সব পুঁথি হয় তাতে ছবির বাহুল্য, বর্ণাঢ্যতা, নিপুণ নক্শা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিষয় বৈচিত্র্য কম বলে অনেক ছবিই আছে যা দায়সারা করে আঁকা তবুও ইওরোপীয় দরবারী তাসের ছবির মত, জৈন পুঁথিতেও কতকগুলি কম্পোজিশনের বাঁধা ছক আসে যার রঙের বাহাদুরির তারিফ করতেই হয়। পনেরো শতকের শেষভাগে অবশ্য নৈপুণ্য কমে গিয়ে অবান্তর অলঙ্কার বাহুল্য আসে, রেখা হয় অপরিচ্ছন্ন, অনিশ্চিত। এই ধরনের লক্ষণ ষোল শতকে আরও বেড়ে যায়। ষোল শতকের মাঝামাঝি লেখা কল্পসূত্র বলে একটি উল্লেখযোগ্য গুজরাটী পুঁথির ছবিগুলির কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। প্রত্যেকটি পাতাতেই একাধিক ছবি এবং তাদের চারধারে পাড় আঁকা ছবি। এইসব পাড়ে হয় মানুষ, পাখি, ফুল, ফল আঁকা, নয় অ্যারাবেসক্ আঁকা। এদের মধ্যে নাচের ভঙ্গিতে নর্তকীদের ছবিগুলি নিতান্তই ভারতীয়, আবার ফুলের নক্শাগুলিতে মুসলমানী আবেগ বেশ স্পষ্ট। বন্দুক হাতে কতকগুলি পদাতিক সৈন্য আর অশ্বারোহী বা হাতির পিঠে চড়া সৈন্যের ছবির সারিও আছে। এগুলি দেখলেই ১৫৭০ সনে তৈরি নুজম-অল-উলুম পুঁথির অথবা সুলতান হুসেন নামা পুঁথির ছবির কথা মনে

পড়ে যায়। সুতরাং গুজরাটী পুঁথির ছবিতে মুসলামানী প্রভাব বোধহয় পারস্য থেকে সরাসরি না এসে দাক্ষিণাত্য থেকে গিয়েছিল। চকমকি ঠোকা বন্দুক ১৫১৪ সনের চালদিরণের যুদ্ধে প্রথম দেখা যায়। অতএব পুঁথিটি নিশ্চয় ষোল শতকের প্রথমার্ধের আগে লেখা হয়নি। সুতরাং গুজরাটী চিত্রকলার চরমোৎকর্ষ যদি পনেরো শতকের প্রথমার্ধে হয়েছে বলে আমরা মানি, তাহলে পুঁথিটি সে যুগের পরের লেখা। কোন পুরনো প্রথাকে মানুষ কি করে নানাভাবে আঁকড়ে থাকতে চায় তার নানান মজার উদাহরণ দেখা যায়। যেমন রথে বা ঘোড়ার গাড়িতে ঘোড়া সমুখে থাকত বলে মানুষ যখন মোটর আবিষ্কার করল, তখন এঞ্জিনটা রাখল গাড়ির সমুখ দিকে, যাতে সেটা ঘোড়ার স্থান নেয়। তেমনি কাগজ চালু হবার পর পুঁথি যখন অচল হয়ে এল, তার বহুদিন পর-পর্যন্ত, অর্থাৎ দু'শ বছর ধরে পুঁথি লেখকরা কাগজে পুঁথি লিখলেও তালপাতার পুঁথিতে যে জায়গা দুটিতে সুতো গলানোর জন্যে ফুটো করা হত, সেই জায়গা দুটি আন্দাজ করে তাতে দুটি রঙের ফুটকি বসাতেন, আর ফুটকি দুটির চারপাশে আল্পনা করে দিতেন। যে কোন কাগজের পুঁথি তালপাতার পুঁথির যুগের কতদিন পরে লেখা হয়েছে তা বার করবার এক সোজা উপায় আছে। সেটা হচ্ছে কাগজের পুঁথি যতই হালের হবে ততই তার দৈর্ঘ্যের অনুপাতে প্রস্থ হবে বেশি, কারণ তালপাতার পুঁথি লম্বার তুলনায় চওড়া হত খুব কম। পনেরো শতকে গুজরাটী চিত্রকলা চরম উৎকর্ষে পৌঁছনোর পর আস্তে আস্তে অবনতি ঘটতে শুরু হল, প্রাণশক্তি গেল কমে। ষোল শতকের শেষের দিকে কেমন শুকনো আড়ষ্ট হয়ে গেল। এই ধরনের অবনতির দরুন অনেকে মানতে রাজি হন না যে রাজপুত চিত্রকলার মূল উৎস হচ্ছে গুজরাটী চিত্রশিল্প। কিন্তু মানা সম্ভব হয় যদি আমরা মনে রাখি যে রাজপুত চিত্রকলা প্রথমে ওঠে ষোল শতকে। ডঃ নর্মান ব্রাউন বলে এক আমেরিকান পণ্ডিত এককথায় এর তত্ত্বটি বলার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন ষোল শতকের শেষভাগে গুজরাটে পশ্চিম ভারতের প্রাচীন রীতি রাজপুত রীতিকে স্থান করে দিল, আর যে রাজপুত রীতি এইভাবে জন্মাল তা হল পশ্চিম ভারতের প্রাচীন রীতি আর পারসীক রীতির মিশ্রণের ফল। নর্মান ব্রাউনের এ উক্তিটি আসলে যা ঘটেছিল তাকে বড্ড সোজা করে বলতে গিয়ে বোধ হয় অত্যুক্তির পর্যায়ে পড়ল। কারণ মধ্যযুগের বিশুদ্ধ গুজরাটী রীতি তখনই প্রকৃতপক্ষে ভেঙ্গে যায় যখন সে দেশে মুঘল রীতির প্রভাব রীতিমত আমদানি হয়। গুজরাটী চিত্ররীতিতে মুঘলপ্রভাব সবচেয়ে নজরে পড়ে কতগুলি নিয়ন্ত্রণ পত্রে বা বিজ্ঞপ্তি পত্রে। এইসব বিজ্ঞপ্তি পত্রের উল্লেখ ব্রাউন নিজেই করেছেন, হীরানন্দ শাস্ত্রী প্রভৃতিরাও করেছেন। ১৫৯০-১ সনে লেখা একটি গুজরাটী পুঁথি পাওয়া গেছে, তার নাম উত্তরাধ্যয়ন সূত্র। নর্মান ব্রাউন এ পুঁথিটির উল্লেখ করেছেন। পুঁথিটির বিশেষ মূল্য আছে, কারণ এটি একটি বড় সমস্যার সৃষ্টি করেছে। পুঁথিটিতে যে সব চিত্র আছে তাতে একদিকে যেমন পারসীক প্রভাব খুব কম, এমন কি তার একশ' বছর আগে যে সব পুঁথির ছবি আছে তার চেয়েও কম, অন্যদিকে প্রথম যুগের রাজপুত রীতির প্রভাব বা আবেগ এতে নেই বললেই হয়। এই পুঁথিটি থেকেই স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে দেশজ লৌকিক রীতির অস্তিত্ব ও প্রভাব অস্বীকার বা উপেক্ষা করে ক্রমাগত এদেশ সেদেশের প্রভাব নিয়ে বাড়াবাড়ি করা কত ভুল। কারণ পুঁথিটির চিত্রগুলিই প্রমাণ করে দেয় যে গুজরাটেও ছিল, রাজপুতানাতেও ছিল, এমন একটি সর্বব্যাপী সাধারণ পশ্চিম ভারতীয় চিত্ররীতি যা ষোল শতকের শেষভাগে তৈরি হয়নি। কতকগুলি সুস্পষ্ট দেশজ সংস্কৃতির লৌকিক রীতি নিশ্চয় ছিল। নানালাল চমনলাল মেহতা গীতগোবিন্দ পুঁথির উল্লেখ করেছেন, এটি বোধহয় ষোল শতকের প্রথম দিকে লেখা। উত্তরাধ্যয়ন সূত্র পুঁথির ছবির সঙ্গে গীতগোবিন্দ পুঁথির ছবির খুব মিল আছে। ছবিগুলি সব একপাশ করে আঁকা, যাতে ছবির জমিতে অবয়বের রেখাগুলি পড়ে (ইংরেজিতে যাকে বলে সিলুয়েট রীতি); গুজরাটী চিত্ররীতির কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যথা গাছ আর জল আঁকার ধরন। হাওয়ায় ওড়া জামা ও স্বচ্ছ পোশাকে যদিও রাজপুত রীতির আমেজ আছে, তবুও আবেগের টান কষাকষি বা প্রাণবন্ততা এতে নেই। আছে শুধু খুব সরল, গ্রাম্য গীতিধর্মী এক রীতি। বোধহয় গুজরাট আর রাজপুতানার মাঝামাঝি কোন রাজ্যে আঁকা।

প্রাচীন রীতিতে পোশাকে পরিচ্ছদে নক্শার বাহার বৈচিত্র্য খুব ছিল। কিন্তু ষোল শতকের শেষভাগে সেগুলি কমে হল কতকগুলি ফুটকি। অন্যদিকে সীমারেখা হল আরও কড়া, বলিষ্ঠ। যখন আস্তে আস্তে পুঁথির প্রস্থ বাড়তে লাগল তখন এক এক পাতায় দুটি তিনটি ভাগে ছবি আঁকার রেওয়াজ হল, বাড়িঘরদোর, গাছপালা আঁকার রীতিও সরল হয়ে গেল, ছবিতে সেগুলি অনেক কম জায়গা জুড়তে লাগল। যেমন প্রাচীন গুজরাটী নীতির সজল নানা রকমারি গাছপালা ১৫৯১ সনে লেখা উত্তরাধ্যয়ন পুঁথিতে হয়ে দাঁড়াল একটি ছোট পাতা আঁকা গাছের ডাল। মুখ এবং অন্যান্য অবয়বের সাবলীল জোরালো রেখা চলে গিয়ে এল নিতান্ত সাধারণ বর্ণনা রীতি।

গুজরাটী রীতির স্বকীয়তা বলিষ্ঠতা চলে গিয়ে আস্তে আস্তে সতেরো শতকে মুঘল প্রভাবের পথ পরিষ্কার হয়ে গেল।

বৈষ্ণব প্রভাব

গীতগোবিন্দ পুঁথির ক্ষুদ্রকায় ছবিগুলির রীতিও উত্তরাধ্যয়ন পুঁথির ছবির রীতির মতই অদ্ভুত। গাছপালা, জল আঁকার রীতি যদিও একরকম, তবুও ছবিগুলির মধ্যে নতুন প্রাণের সন্ধান পাওয়া যায়। যেহেতু গীতগোবিন্দের বিষয় কৃষ্ণলীলা, বোধহয় সেই কারণেই প্রত্যেকটি ছবি যেন নাচের ছন্দে সংযত, তরঙ্গায়িত, প্রতিটি প্রাণী যেন নৃত্যের ছন্দে জীবন্ত। স্পষ্ট বোঝা যায় যে, পনেরো শতকের শেষভাগে আর ষোল শতকের প্রথমভাগে সারা পশ্চিম ভারতে, বৈষ্ণব ধর্মের যে ঢেউ খেলে যায়, গীতগোবিন্দের ছবি তারই সাক্ষ্য বয়ে বেড়াচ্ছে। বিখ্যাত ভারতীয় ভাষাতত্ত্ববিদ স্যার জর্জ গ্রীয়র্সনের আজীবন সাধনার ফলে আমরা আজ জানি যে ১৪৫০ থেকে ১৬৫০ পর্যন্ত, দু'শ বছর ধরে ভারতের সর্বত্র লোক-সাহিত্যে অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি ঘটে, এবং সর্বত্র হিন্দু সংস্কৃতি যেন নব নব উন্মেষে বিকশিত হয়ে ওঠে। এবং এই নব জাগরণ, সংস্কৃতি ও চারুশিল্পে আবার-জন্মানো যুগ যে মুঘল রাজপ্রাসাদে সম্ভব হয়েছিল তা মোটেই নয়। এর জন্য দায়ী নানা শাখা-প্রশাখা নিয়ে বৈষ্ণব ধর্মের আন্দোলন, যার ফলে সারা দেশের জীবনে যেন এক পুনর্জন্মের যুগ আসে। মুঘল ও রাজপুত দরবারী চিত্রকলায় যেমন মুঘল চিত্ররীতির দান ও প্রভাব খুব, তেমনি ভারতীয় রাজদরবারের বাইরে চিত্রকলায় লোক-সংস্কৃতির পুনর্জন্মপ্রসূত প্রভাবও খুব বেশি। মুঘল ও দেশজ হিন্দু এই দুই প্রভাবের মধ্যে পরস্পর কি সম্বন্ধ ছিল, ভারতীয় চিত্ররীতিতে কার কতখানি, কি ধরনের দান, সেটুকু নিরূপণের চেষ্টা একটু করা দরকার।

চৈতন্যদেব জন্মান ১৪৮৫ সনে, মারা যান ১৫৩৩ সনে। ষোল শতকে উত্তর ভারতে যে আবার-জন্মানো যুগ এল তার মূলে যে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। চৈতন্যদেবের জন্যই জয়দেব, বিদ্যাপতির আদর হয়, এবং ভিন্ন ভিন্ন ভারতীয় ভাষায় সাহিত্য সমৃদ্ধিলাভ করে। চৈতন্যদেবই কীর্তনের প্রবর্তন করেন। কীর্তন একাধারে নাচ ও গানের অদ্ভুত সমন্বয়। অবশ্য আগেও নামকীর্তন ছিল, কিন্তু সে সুর করে রাম ও কৃষ্ণের রকমারি নামোচ্চারণ। কিন্তু চৈতন্যদেব যে লীলাকীর্তনের প্রচার করেন সে হল অনেক বিস্তারিত রীতি : একাধারে এক কণ্ঠের গীত, তার সঙ্গে বহু কণ্ঠের ঐক্যতান, সঙ্গে আবার খোল বা মৃদঙ্গ।

বৈষ্ণব আন্দোলনের প্রথম যুগে বৈষ্ণব ধর্মপ্রচার ও চিত্রকলার যে বিশেষ সম্বন্ধ ছিল একথা মোটেই বলা যায় না। কারণ বৈষ্ণব ধর্মের জন্মভূমি বাঙলাদেশে ঠিক এই যুগে বৈষ্ণব চিত্রের কিছু প্রমাণ নেই। আর উড়িষ্যায় যা কিছু পাওয়া যায় তার সঙ্গে মধ্য ভারত আর দাক্ষিণাত্যের সম্বন্ধই বেশি। কীর্তনের সঙ্গে আপাতদৃষ্টিতে যে চিত্রবিষয়ের সবচেয়ে বেশি সম্বন্ধ সে হচ্ছে রাগমালা অর্থাৎ ঋতু দিনক্ষণের সঙ্গে সম্বন্ধ মিলিয়ে রাগরাগিণী বিষয়ক চিত্র। কিন্তু ভারতে কোথাও পনেরো শতকের রাগরাগিণীর চিত্র পাওয়া যায় না, সামান্য একটু অঙ্কুর গুজরাটে দেখা যায়, আর বসন্তবিলাসের মেজাজে কিছুটা আছে। তবে বালগোপালস্তুতি আর জয়দেবের গীতগোবিন্দ পুঁথির সঙ্গে বৈষ্ণব আন্দোলনের যথেষ্ট সম্বন্ধ ছিল বলা যায়। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে দুটিরই যতগুলি প্রাচীন পুঁথি পাওয়া যায় সবই গুজরাটী রীতিতে লেখা। তার কারণও এমন কিছু আকস্মিক নয়, কারণ একদিকে দক্ষিণে রামানুজ, মাধবাচার্য সম্প্রদায়, অন্যদিকে গুজরাটে কৃষ্ণভক্তি এই দুইয়ের মিলনে গুজরাটে তেরো শতকেই বৈষ্ণব আন্দোলনের ক্ষেত্র বেশ তৈরি হয়ে ওঠে।

হাতে পাঁজি মঙ্গলবার রীতিতে প্রমাণ করার উপায়ের চেয়ে ভাল রীতি খুব কমই আছে। যদি একবার কোন বিশেষ রীতির সন তারিখ ঠিকমত পাওয়া যায় তবে কিসের থেকে কিসের প্রভাবে কিসের উৎপত্তি হল তা বলা শক্ত হয় না, এবং মানতেও বাধে না, কারণ এটা ঠিক যে শিল্পীদের কাছে খবর বড় তাড়াতাড়ি পৌঁছে যায় ; দেশের এককোণে এক শিল্পী কি করছেন, তার সংবাদ দেশের আরেক কোণে অন্য শিল্পীর কাছে হাওয়ায় পৌঁছতে দেরি হয় না। আমরা যা ভাবি তার চেয়ে অনেক কম সময় লাগে। এবং এইভাবে চিত্রনীতিতে আজ যেটা আনকোরা নতুন রীতি সেটা দু'দিনের মধ্যে চিরপ্রচলিত পুরনো বাসি রেওয়াজ হয়ে যায়। সুতরাং কোন্ রীতি আগে, কোন্ রীতি পরে এসেছে এর হিসাব সংখ্যা দেখে হয় না, হয় নিতান্তই তারিখ দেখে। তাই আজও অনেকে হয়ত এইকথা শুনে চমকে উঠবেন যে রাজপুত চিত্রের উৎস গুজরাটী পুঁথির ক্ষুদ্রকায় ছবি নয়। যাকে পণ্ডিতরা

সাধারণত বুন্দেলা রীতি বলেন সেই বুন্দেলা রীতির মতন করে আঁকা কতকগুলি ছবির একান্ত প্রাণবান বলিষ্ঠ রেখা আর দুঃসাহসী নাটকীয় রঙের বিন্যাসের মধ্যে তথাকথিত রাজপুত আদি ছবির উৎস খোঁজা উচিত হবে। প্রথম যুগের অর্ধোচ্চারিত রাজপুত ছবিকে পণ্ডিতরা সাধারণত 'আদিম' রাজপুত ছবি (ইংরেজিতে রাজপুত প্রিমিটিভ) বলেন.। ১৫৭০ সন নাগাদ লেখা কবি বিল-হ্ণ প্রণীত চৌরপঞ্চাশিকার একটি পুঁথি পাওয়া গেছে তার মধ্যে কতকগুলি চিত্রের বিষয় আর রীতি দুইই উল্লেখযোগ্য। একটি প্রেমের দৃশ্য ; কবি বিল-হ্ণ তাঁর প্রেয়সীর পদচর্চা করছেন, বাঁ দিকে পালঙ্কের পাশে জ্বলন্ত প্রদীপ, ডানদিকে একটি ফুলফোটা গাছ। দ্বিতীয়টি অভিসার : কবি তাঁর প্রেয়সীর কাছে রাত্রে এসেছেন, চারটি প্রদীপ জ্বলছে, বাঁয়ে পালঙ্ক, ছবির সমুখদিকে পদ্মফুলের সারি। আরেকটি ছবিতে কবি আর তাঁর প্রেয়সী চম্পাবতী বাড়ির খোলা বারান্দায় বসে, দুটি পরিচারিকা বীণা আর খঞ্জনী বাজাচ্ছে, সমুখদিকে পদ্মের সারি। অন্য একটি ছবিতে খোলা চবুতারায় চম্পাবতী আর তাঁর পরিচারিকা পদ্মপুকুরের উপরে দাঁড়িয়ে, মাথার উপরে চাঁদোয়া, বাঁদিকে হাওয়া আটকানোর উদ্দেশ্যে জোড়া পর্দা লাগানো। প্রায় একই সময়ে আঁকা কতকগুলি রাগিণী চিত্র পাওয়া যায়, তার মধ্যে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এটি রাগিণী ভৈরব ; মন্দিরে লিঙ্গের পাশে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে পূজা দিচ্ছে, সমুখদিকে পদ্মপাঁতি ; জমির রঙ হলদে, পিছনে গাঢ় সবুজ পাহাড়, দিক্‌রেখা খুব উঁচু করে টানা। নীল আকাশ শুধুমাত্র কোণেই দেখা যাচ্ছে। হলদে, নীল, আর কড়া লালে ছবিটি আঁকা। এ ছাড়া লাহোর মিউজিয়মে কতকগুলি বারমাস্যা ছবি পাওয়া গেছে সেগুলি ষোল শতকের শেষভাগে আঁকা। এগুলির উদ্দেশ্য সাধারণত কোন প্রেমের কাহিনী অবলম্বন করে ঋতু বর্ণনা। এ ছবিগুলিতে পারসীক প্রভাব নিতান্ত স্পষ্ট, এমন কি ছবির মধ্যেই পারসী অক্ষর ছবির সঙ্গে গাঁথা। আনন্দ কুমারস্বামী ১৯২৩ সনে পোর্টফোলিও অভ ইন্ডিয়ান আর্ট বলে একটি অ্যালবাম প্রকাশ করেন, তাতে ৬৬ ও ৬৭ নং ছবিতে বুন্দেলা রীতিতে আঁকা দুটি রাগিণী আছে। এই দুটির কম্পোজিশন ও হাতের দৃঢ় ব্যঞ্জনার মধ্যেও রাজপুত চিত্রের আদি উৎসের সন্ধান পাওয়া যায়। এইসব ছবির লাল, হলদে আর নীলের কড়া বর্ণবিন্যাসের ধ্বনিপ্রতিধ্বনির রেশ পাওয়া যায় বিকানীরের রসিকপ্রিয়া ও অন্যান্য রাগিণীচিত্রে। পরে ক্রমে রঙ আর ভঙ্গি কিভাবে তনু ও কোমল হয়ে যায় তার উৎকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় বোস্টন মিউজিয়মের কৃষ্ণলীলা চিত্রে ও অন্যান্য মুঘল রীতিতে আঁকা ক্ষুদ্রকায় ছবিতে।

এই চিত্ররীতির উৎস কী জোর করে বলা শক্ত। ভিক্টোরিয়া অ্যাণ্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়মে হাম্‌জানামার যে সব চিত্র আছে তার কোন কোন গৌণ অংশের পোশাক, অলঙ্কার, দাঁড়ান-বসার ভঙ্গির সঙ্গে এইসব ছবিগুলির মধ্যে আবার যেগুলি সবচেয়ে প্রাচীন তাদের রীতির বেশ মিল আছে। এইসব ছবির তারিখ মোটামুটি ঠিক হয়ে গেছে (১৫৫৫ থেকে ১৫৭৯) এবং যেহেতু এইসব শিল্পীদের অনেকেই মুঘল দরবারে কাজে ভর্তি হন, সেহেতু এদের তারিখ আরও একটু আগে হতে পারে। সুতরাং এদের তারিখ মোটামুটি ১৫৭০ সন ধরা যায়। কিন্তু ঠিক কোন্ দেশে যে আঁকা হয়েছিল বলা শক্ত। চৌরপঞ্চাশিকা পুঁথি সংস্কৃতে লেখা। কাব্যটি গুজরাটে খুব লোকপ্রিয় ছিল বলে জানা যায়, কিন্তু গুজরাটী ভাষায়, সংস্কৃতে নয়। কৃষ্ণলীলা পুঁথির ভাষা খানিকটা মাড়োয়ারি, খানিকটা গুজরাটী। বারমাস্যা পুঁথি যদিও ফারসী হরফে লেখা, কিন্তু ঠিক কী খণ্ডভাষায় লেখা বোঝা যায় না। এই রীতিটি ঠিক আসল গুজরাটী চিত্রের বিভিন্ন রীতির মধ্যে পড়ে না। অন্যান্য নানা লক্ষণের সাহায্যে, যেমন বাড়িঘরদোরের স্থাপত্যবৈশিষ্ট্যে, ভারতের ঠিক কোনস্থানে এ রীতির জন্ম তার নির্ণয়ের চেষ্টা করা যেতে পারে কিন্তু তাতে বিপদ আছে। যেমন ধরা যাক ছাদের খুব চওড়া কার্নিশ, আর তা ধরে রাখার জন্য পাতলা সরু ব্র্যাকেট : আকবরের ফতেপুর সিক্রিতে এটি খুব নজরে পড়ে, কিন্তু এটি নিতান্তই প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্য রীতি। পুরনো রাজপুত স্থাপত্যে ত বটেই ; মানসিংহের তৈরি (১৪৮৬-১৫১৬) গোয়ালিয়রের মানমন্দিরে গুর্জরী মহলেও এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। অম্বরের অতি প্রাচীন ঠাকুরজী (কৃষ্ণ) মন্দিরের দেখা যায়। তা ছাড়া সবচেয়ে বেশি দেখা যায় দাক্ষিণাত্যে কাকটীয়দের তৈরি মন্দিরগুলিতে , যেমন ওয়ারাঙ্গলে, হাম্পিতে, রামাপ্পায়। সেগুলির তারিখ খ্রীস্টীয় তেরো চোদ্দ শতক। মাণ্ডুতেও পনেরো শতকে তৈরি বাড়িতে দেখা যায়। ষোল শতকে রাজপুতানায়, মধ্যভারতে এই স্থাপত্যরীতি বিশেষভাবে ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং ছবিতে স্থাপত্যরীতির উপর নির্ভর করে জোর করে কিছু মত দেওয়া যায় না। তবে এই ছবিগুলির উল্লেখ করে মধ্যযুগের প্রাচীরচিত্র আর পুঁথিচিত্রের মধ্যে সম্বন্ধ ও যোগাযোগ টানা যায়। সেই সঙ্গে এই কথাও বলা যায় আকবর বাদশার কিতাবখানার শিল্পীদের মুঘল কলমে ভারতীয় প্রভাব কিভাবে এসেছিল। এই সময়ে ষোল শতকের শেষভাগে দাক্ষিণাত্যে যে চিত্ররীতি বিশেষ

সমৃদ্ধিলাভ করে তার কথা আগেই বলেছি। সে রীতিও নিশ্চয় মুঘলরীতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। একটি ভুল ধারণা সাধারণভাবে প্রচলিত আছে যে, ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্য জয় করার পরই সে দেশে যা কিছু চিত্রকলার উন্মেষ হয় ; যার ফলে একটি বিশিষ্ট ডেকানী কলম হয়। আসলে ব্যাপারটি আরও অনেক জটিল। বিজয়নগর রাজ্য ধ্বংসের পর দক্ষিণী শিল্পীরা নানাদিকে ছড়িয়ে গিয়ে ষোল শতকে উত্তর ভারতে দক্ষিণী রীতি রপ্তানি করে, আবার সতেরো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে উত্তর ভারতের রীতি দক্ষিণ ভারতে এসে দক্ষিণী রীতিকে পুনরুজ্জীবিত করে।

মুঘল ও রাজপুত রীতির সম্বন্ধ

আকবর-বাদশার রাজত্বকালের সবচেয়ে পুরনো চিত্রিত পুঁথি যা পাওয়া যায় সেটি ১৫৭০ সনে রচিত একটি জন্তু জানোয়ারের কাহিনীর বই বা কথামালা। নাম আনোয়ার-ই-সুহায়লি। পুঁথিটি এখন লণ্ডনের স্কুল অভ ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ-এ আছে।

পুঁথিটিতে মানুষের ছবি খুব কম ; গাছপালা, জলের ছবিতে পারসীক রীতি সুস্পষ্ট, হাম্‌জানামার সঙ্গে খুব মিল। কিন্তু জন্তু জানোয়ারের ছবিগুলি একান্ত ভারতীয় : যেমন সমবেদনা দিয়ে আঁকা, তেমনি জন্তু চরিত্র সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান ও ধারণা। কিন্তু তবুও নক্‌শার রীতি, মুখের ভাবভঙ্গিতে পারসীক প্রভাব স্পষ্ট। আকবরের রাজত্বের প্রথম অংশে, অর্থাৎ ১৫৮৫ সনের আগে আঁকা, আরও দুটি পুঁথির উল্লেখ করা উচিত। দুটিই ১৫৮০ সন নাগাদ রচিত, একটির নাম তুতিনামা, অন্যটির দরাবনামা। দুটিই চিত্রবহুল, মানুষের ছবিও অনেক। ছবির বর্ণবিন্যাসে পারসীক প্রভাবের চেয়ে ভারতীয় আমেজ বেশি : লাল আর গাঢ় সবুজের ছড়াছড়ি, মাঝে মহিলাদের স্বচ্ছ ওড়নায় সাদা। মহিলাদের মুখ ও পোশাক স্পষ্টই ভারতীয়। কিন্তু বাড়িঘরদোর আবার হাম্‌জানামার রীতিতে আঁকা, অর্থাৎ কিছুটা মুসলমানী। বাড়িঘরের অ্যারাবেস্‌ক করা টালির কাজেও এই মুসলমানী প্রভাব লক্ষ্য করার মত। ঠিক এই সময়ে পারস্যে মহম্মদী রীতির খুব চলন ছিল তাতে সোজা সোজা রেখার খুব রেওয়াজ হয়। দরাবনামায় এই রীতির প্রমাণও কিছু পাওয়া যায়। এই রীতি অবশ্য মুঘল দরবারে বেশি স্পষ্ট হয় ষোল শতকের একেবারে শেষভাগে। কিন্তু ১৫৭০ সনে আঁকা আনোয়ার-ই-সুহায়লিতে অথবা ১৫৮০ সন নাগাদ আঁকা তুতিনামাতে মামুলি মুঘল চিহ্ন সুস্পষ্ট : তার প্রমাণ, জমাট, গাঢ় কালো জমিতে আঁকা গাছে, হাল্‌কা রঙে আঁকা গাছের পাতায়। কিন্তু প্রেমের চিত্রগুলিতে যে আবেগ এসেছে তা নিতান্তই ভারতীয়, তাতে না আছে মুঘল দরবারের স্বভাবসিদ্ধ প্রেমিকবীরের ভাব, না আছে পারসীক রোমান্টিক ভাব। এই ছবিগুলিতে ভারতীয় রীতিনীতি নিতান্ত কায়েম হয়ে, পরে বাবরনামা, আকবরনামার সমৃদ্ধি সাধন করে। ১৫৮১ সনে আঁকা গুলিস্তান বলে একটি পুঁথির অলঙ্কার নক্‌শার কাজে একদিকে যেমন গুজরাটী পুঁথির হাত খুব স্পষ্ট, অন্যদিকে সেটি জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রথমদিকের কাজ হাফিজনামার কথা খুব স্মরণ করিয়ে দেয়। গুলিস্তানের শেষ ছবিটি একটি অল্পবয়স্ক যুবার, বোধ হয় শিল্পী মনোহরের আঁকা নিজের ছবি। যা কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় তাতে মনে হয় মনোহর ১৫৬৫ সন নাগাদ জন্মেছিলেন। মনোহর বসাওঅনের ছেলে ছিলেন।

আকবরের রাজত্বের মধ্যযুগে জয়পুরের রজম্‌নামা তৈরি হয়। ১৫৮২ সনে বাদশা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীদের মহাভারতের পারসী অনুবাদের পুঁথিতে ছবি আঁকার হুকুম দেন। বইটিতে ১৬৯ পৃষ্ঠার পুরো মিনিয়েচর ছবি আছে। সেগুলির প্রগল্‌ভ ঐশ্বর্য, ভিড় করা কম্পোজিশনের বাহাদুরিতে ভারতীয় চিত্রের লক্ষণ অদ্ভুতভাবে ফুটে ওঠে। বইটিতে রাজপুতানা ও গুজরাটের রীতি ত দেখা যায়ই, উপরন্তু দাক্ষিণাত্যের রীতির ছাপও সুস্পষ্ট। কয়েকটি ছবির একটি বিশেষ লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। বইটিতে চোদ্দটি ছবি আছে যা বইয়ের বাঁধানো শিরদাঁড়ার সঙ্গে সমান্তরাল করে এবং ফারসী লেখার সঙ্গে সমকোণ করে আঁকা। পুরনো তালাপাতার পুঁথিতে ঠিক এইভাবে ছবি আঁকা হত। ফলে পুরনো ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে ছবিগুলির বেশ খাপ খায়। আরও উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে রজম্‌নামার অন্য ছবির থেকে এই ছবিগুলির রীতিগত পার্থক্য নেই। ফলে স্বীকার করতেই হয় যে রজম্‌নামার ছবি ভারতীয় চিত্রকলার ঐতিহ্যধারার মধ্যে পড়ে।

আকবর ও জাহাঙ্গীরের সময়ে কি করে এক বিশিষ্ট মুঘল রীতি সুপ্রতিষ্ঠিত হল তার কথা আগেই সংক্ষেপে বলেছি। ১৫৭৯ সনের আগে রচিত চোদ্দশ' চিত্রসম্বলিত হাম্‌জানামা ১৫৮২ থেকে ১৫৮৪-র মধ্যে রচিত।

জয়পুরী রজমনামা ১৫৮৯ সনে রচিত, তারিখ-ই-আলফি ১৬০২ সনে রচিত, আকবরনামা, বহর-অল-হয়াত, যোগবাশিষ্ঠ, হরিবংশ, কথাসরিৎসাগর, ইত্যাদি বিরাট বিরাট চিত্র সম্বলিত পুঁথির মধ্যে দিয়ে পারসীক, ভারতীয়, ইওরোপীয়, দক্ষিণী, বিভিন্ন রীতি মিলে কি করে আশ্চর্য ধনাঢ্য মুঘল রীতির প্রসার হল তার সামান্য উল্লেখ করেছি। এইভাবে মুঘল বাদশা আকবরের একান্ত চেষ্টায় বহু নিপুণ, যশলোভী চিত্রশিল্পীর একত্র সমাবেশ সম্ভব হয়, যার ফলে হয় বিশাল ও বহুমুখী সৃষ্টি। দেশজ ও পারসীক, হিন্দু ও মুসলমান, সংস্কৃতির যা কিছু শ্রেষ্ঠ তার সমন্বয়ের যে চেষ্টা আকবর বাদশা করেন, নতুন এক সংস্কৃতি সৃষ্টির যে একান্ত আগ্রহ তাঁর মধ্যে আসে, তার শ্রেষ্ঠ ফল হয় এক নতুন ভারতীয় চিত্ররীতি, যার উপযুক্ত নাম হচ্ছে মুঘল। আকবর বাদশার রাজত্বকালেই এই নতুন রীতি এত সুপ্রতিষ্ঠিত হয় যে এই রীতি ফিরেফিরতি ভারতের অন্যান্য দেশীয় রীতি, বিশেষ করে রাজপুতানার রাজ্যগুলির দেশজ রীতির উপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। প্রথম যে দুটি রাজ্যে দেশজ চিত্ররীতিতে মুঘল প্রভাব বিশেষভাবে কাজ করে তাদের নাম বিকানীর ও অম্বর। বিকানীরের রাজা ছিলেন রায় সিংহ (১৫৭১-১৬১১) আর অম্বরের রাজা মানসিংহ (১৫৯২-১৬১৪)। দু'জনেই আকবরের সেনাপতি ছিলেন। এটা মনে রাখা দরকার যে এ সময়ে আকবরের দরবারও ক্রমাগত এ জায়গা ও জায়গা ঘুরে ঘুরে বেড়াত ; কিছু কিছু শিল্পীও নিশ্চয় সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতেন ; যেমন সঙ্গে থাকতেন আকবরের সভাকবি রাজা বীরবল, যিনি যুদ্ধে মারা যান। মুঘল দরবারে আরেক হিন্দু কবি ছিলেন, তিনি বুন্দেলখণ্ডের রাজ্য অর্চার লোক, রসিকপ্রিয়ার স্রষ্টা, কেশব দাস। বিকানীর, অম্বর, বুন্দেলা রীতিতে মুঘল প্রভাব কিভাবে আসে সে সম্বন্ধে ডঃ হার্মান গোয়েটজ খুব মূল্যবান কাজ করেছেন।

রাজপুত চিত্রের অবতারণা করতে গিয়ে ভূমিকা বড় হয়ে গেল। তার একটু কারণ আছে। ১৯১৬ সনে আনন্দ কুমারস্বামী তাঁর বিখ্যাত বই 'রাজপুত পেন্টিং' দুই খণ্ডে প্রকাশ করেন। রাজপুত চিত্রকলা বিষয়ে তিনি প্রথম পথপ্রদর্শক, তার উপরে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ পাণ্ডিত্য ও বৈদগ্ধ্যে বইয়ের প্রতিটি ছত্র উজ্জ্বল। এই বইয়ে তিনি মুঘল চিত্রনীতি আর রাজপুত চিত্রনীতি যে নিতান্ত দুটি ভিন্ন জগতের, দুইয়ের মধ্যে না ভাবে না রীতিতে কোন সম্বন্ধই নেই, সে কথা দৃঢ়ভাবে বলেন। এ ব্যাপারে 'রাজপুত পেন্টিং' বইটির প্রথম খণ্ডের ৫ ও ৬ পৃষ্ঠা থেকে তাঁর বক্তব্য তর্জমা করে দেওয়াই সবচেয়ে ভাল, তাতে তাঁর বক্তব্য আমরা শুনতে পাব : "মুঘল চিত্রকলা আসলে মিনিয়েচর চিত্ররীতি, যেমন পারসীক চিত্রকলা উদ্ভাসরীতি। কদাচিৎ যেখানে দেয়ালে মুঘলচিত্র দেখা যায় স্পষ্টই বোঝা যায় মিনিয়েচরকে গুণ করে বাড়িয়ে আঁকা হয়েছে। রাজা ওমরা সমঝদারদের গ্রন্থাগারের বইয়ের মধ্যেই মুঘল চিত্রকলা মানায় ভাল ; কিন্তু হিন্দু চিত্রকলা মন্দির, প্রাসাদ, সাধারণের ব্যবহার্য হর্মের দেয়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে, তার চিহ্ন সে সব জায়গায় এখনও বর্তমান। মুঘল চিত্রকলা জাগতিক, বর্তমান মুহূর্তের উপর নির্ভর, ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যে প্রগাঢ়ভাবে কুতূহলী। জীবনকে আদর্শ ছাঁচে ফেলে না, কিন্তু তবুও জীবনের মহান ও জাঁকজমকপূর্ণ একটি দিকের সুকুমার, সুচারু প্রতিচ্ছবি। স্তব্ধ নয়, নাটকীয় ; যৌবনোচ্ছল, পরীক্ষা ভালবাসে, পরিপাক করতে প্রস্তুত। যেমন জৌলুস তেমনি মনোহারী কিন্তু কচিৎ জীবনের গভীর উৎস পর্যন্ত যায়। মুঘল চিত্রের সবচেয়ে সাফল্য প্রতিকৃতিতে, দরবারের জমকালো জাঁকজমকে। সবকটি বিষয়ই জাগতিক, এবং যদিও অবশ্য নিছক পর্যবেক্ষণের তীব্রতায়, গভীর আবেগময় নক্শার জোরে, কিছু কিছু একক ছবি,—যেমন অক্সফোর্ডের বডলিয়ান লাইব্রেরিতে রক্ষিত 'মুমূর্ষুলোকের' ছবিটি—মহত্ত্বের শ্রেষ্ঠতম পর্যায়ে অক্লেশে পৌঁছেছে, তবুও মুঘল শিল্পের চিত্রবিষয় মুখ্যত নিতান্ত রাজা উজিরের পক্ষে ভাল লাগার কথা। অন্যপক্ষে রাজপুত চিত্রের প্রধান পার্থক্য হচ্ছে যে প্রথমটি অভিজাত ও জাতশিল্পীর দরবারী কাজ : দ্বিতীয়টি দেবদেবীর স্তরভেদে যুগপৎ আপ্লুত অথচ লৌকিক ; এবং প্রায়ই দৈনন্দিন জীবনের নিতান্ত সাধারণ ঘটনার মধ্যে অনন্ত অর্থের মরমিয়া রসে সিক্ত। মুঘল সভাসদদের যেমন রাখাল ও গোপিনীদের চিত্রে উৎসাহ পাবার কথা নয়, তেমনি বৈষ্ণবদেরও হাতির লড়াই ভাল লাগার কথা নয়। এটা মনে রাখা দরকার যে মুঘল চিত্রকলা নিতান্তই রাজানুগ্রহের উপর নির্ভর ছিল ; ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর আর টিকল না : আকবরের রাজত্বের সঙ্গে তার জন্ম, আর মোটামুটি ১৭০৬ সনে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর সঙ্গেই তার মৃত্যু। এখন আর তার কিছু অবশিষ্ট নেই : আছে শুধু হাতির দাঁতের উপর কিছু ক্ষুদ্রকায় ছবি, যা নাকি মুখ্যত পর্যটকদের উদ্দেশ্যেই আঁকা। সাধারণ লোকের এ ছবি ভাল লাগার কথা নয়। হিন্দু দোকানে, বাড়িতে, মুঘল বাদশাদের প্রতিকৃতি পাওয়া যাবে না, পাওয়া যাবে প্রাচীন নক্শার অবলম্বনে জার্মানি ওলিওগ্রাফে ছাপা রাজপুত ঐতিহ্যে আঁকা খেলো ছবি। রবিবর্মার ঝুটো ভারতীয় চিত্রকলার কথা নাই বললুম।...

মুঘল চিত্র যে নিতান্তই বিদগ্ধদের উদ্দেশে পোশাকী শিল্প, তার আরেক প্রমাণ এই যে অধিকাংশ ছবিরই শিল্পীর নাম জানা যায়, অনেক ছবিতে নামসই আছে। তাছাড়া মুঘল চিত্ররীতিতে এক খুব সুস্পষ্ট দ্রুত পরিণতি লক্ষ্য করা যায়, উত্থান ও পতন, পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই যার লগ্ন শেষ হয়ে গেল। এই কারণে ইওরোপীয় নীতি অনুযায়ী মুঘল চিত্রশিল্পেরও নাম তারিখ অনুসারে ইতিহাস গড়া যায়। কিন্তু রাজপুত চিত্রকলার পক্ষে এ কখনও সম্ভব হবে না। সমস্ত প্রাচীন, একান্ত ভারতীয় চারুশিল্পের মতই রাজপুত চিত্রকলা নিতান্ত অনামী ও রক্ষণশীল, গতি প্রগতি সম্বন্ধে উদাসীন। স্বল্প আয়ুতে মুঘল চিত্রকলা যতই সমৃদ্ধ হোক না কেন, তবুও সে ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাসে একটি ঘটনা বা উপাখ্যান মাত্র। অন্যপক্ষে, অন্যান্য প্রাকৃত শিল্পের মত, রাজপুত চিত্রকলা ভারতীয় শিল্পের নিজস্ব ধারায় একটি অংশ।"

কুমারস্বামীর মত বিদগ্ধ, রসজ্ঞ, মহাপণ্ডিত যখন এই ধরনের মত প্রকাশ করেন তখন সাধারণ বিচারে তা অকাট্য, অলঙ্ঘনীয় হতে বাধ্য। কিন্তু গভীর শ্রদ্ধায় একান্ত বিনীত চিত্তে এই অংশটি পড়লেও এটুকু স্বীকার করতেই হয় যে কুমারস্বামী মুঘল চিত্ররীতিকে অযথা দূষেছেন, রাজপুত রীতিকে অযথা সম্মান দিয়েছেন। কারণ দুই চিত্ররীতিই নিতান্ত রাজানুগ্রহনির্ভর ছিল ; কোনটাই কামার, কুমোর, চাকুরিয়া, ছোট ব্যবসায়ীর পৃষ্ঠপোষকতার



উপর আস্থা রাখত না। দ্বিতীয়ত, মুঘল চিত্ররীতিকে ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাসে একটি ঘটনামাত্র কোনমতেই বলা যায় না, যেহেতু মুঘল চিত্রকলা নিতান্ত ভারতীয় ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ ও পরিপুষ্ট এবং এইভাবে সমৃদ্ধ ও পরিপুষ্ট হবার পর ফিরেফিরতি সে আবার রাজপুত চিত্রকলাকে সমৃদ্ধ ও পরিপুষ্ট করে। তৃতীয়ত, বিষয়বস্তুর দিক থেকেও দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি ঘটনার প্রতি, জীবজন্তুর প্রতি মুঘল ও রাজপুত চিত্রের সমান দরদ দেখা যায়, এবং একদিকে যদি আমরা মুঘল চিত্রে দরবারের জাঁকজমকের প্রতি পক্ষপাত দোষ দেখি, অন্যদিকে তেমনি অন্তর্দ্বন্দ্বে হিংসামাৎসর্যের ঘাতপ্রতিঘাতে ছিন্নভিন্ন রাজপুত শৌর্যবীর্যময় যুদ্ধবহুল জীবনে মধুর, পেলব, সুকুমার, গীতধর্মী, কাব্যময় তনু প্রেমের প্রতি পক্ষপাতও আমরা রাজপুত চিত্রে বিশেষভাবে দেখি। একদিকে যেমন জীবনে নিত্য যুদ্ধবিগ্রহের আগুন, অন্যদিকে তার তাপ জুড়নোর তৃষ্ণায় বৈষ্ণব বিষয়ক চিত্রের প্রতি রাজপুতদের একান্ত আগ্রহ। চতুর্থত, কি মুঘল কি রাজপুত, দুয়েতেই প্রতিকৃতি বা পোর্ট্রেট সমান স্থান অধিকার করে আছে। পঞ্চমত, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে কুমারস্বামীর মতেই ষোল শতকের আগের রাজপুত চিত্রের চিহ্ন বিশেষ নেই। অর্থাৎ নানাস্থানের লৌকিক রীতির সংমিশ্রণে ও মধ্যযুগের তথা গুজরাটী পুঁথি ও দাক্ষিণাত্যের

রাজদরবারের প্রভাবাপ্লুত হয়ে রাজপুতানায় যদি বা কোন দেশীয় রীতি বিশেষ সাফল্যলাভ করে থাকে, তবুও তার পূর্ণ স্বীকৃতি রাজপুত রাজারা ঠিকমত দেননি যতক্ষণ না মুঘল বাদশা তাদের বহু সমাদরে নিজের দরবারে স্থান দেন, এবং সেই সমাদরে উচ্চকিত হয়ে রাজপুত রাজারা নিজেদের দেশের অনাদৃত শিল্পীদের খুঁজে পেতে বার করে সম্মানের আসনে পুনরধিষ্ঠিত করেন। মুঘল চিত্র ও রাজপুত চিত্রের সন তারিখ মেলালেই একথার যুক্তিযুক্ততা স্বতঃপ্রমাণ হয়। পঞ্চমত, আজ ১৯৯৪ সনে স্বীকার করতে আর বাধা নেই যে মুঘল ও রাজপুত চিত্রের চিত্ররীতি বা নক্শা ও রঙের টেকনিক মুখ্যত একই, বিষয়বস্তু যতই অবৈষ্ণব হোক না কেন ; এবং রাজপুত চিত্র না হলে মুঘল চিত্র যেমন সম্ভব হত না, তেমনি মুঘল চিত্র না হলে রাজপুত চিত্র হত অসম্ভব।

তবে রাজপুত চিত্রকলার বিশিষ্ট গুণ সম্বন্ধে কুমারস্বামী যা লিখেছেন তাতে কেউই আপত্তি করার কিছু পাবেন না। তাঁর মতে রাজপুত চিত্র ভারতীয় জীবন ও চিন্তাধারার একান্ত প্রতিচ্ছবি, যার এখনও কিছু কিছু আমরা চোখের সামনে লুপ্ত হয়ে যেতে দেখছি। রাজপুত চিত্রের নীতিদর্শন তার একান্ত নিজস্ব। প্রাকৃতিক দৃশ্যের ক্ষেত্রে চীনে ছবি যা করেছে, মানুষী প্রেমে রাজপুত চিত্র তাই করেছে। মানুষী প্রেম বিশ্বজগতের সর্বসৃষ্টির মধ্যে কিভাবে ব্যাপ্ত-চরাচর, শ্রীমদ্ভাগবতে তার সন্ধান পাওয়া যায়। আপাতদৃষ্টিতে রাজপুত চিত্রে পারসীক প্রাকৃতিক দৃশ্যগত মাধুর্য নেই, মুঘল পোর্ট্রেটের ঐতিহাসিক মূল্যও নেই। তার বদলে যা আছে, তার তুলনা মেলা ভার। সে হচ্ছে সুকুমার কোমলতা ও ভাবের গভীরত্বের পরাকাষ্ঠা, যা গাম্ভীর্য, শ্রদ্ধায় ও বৈষ্ণবসুলভ ভক্তিতে অতুলনীয়। আরেকটি গুণের উল্লেখ করে কুমারস্বামী নিজেই নিজের মত খণ্ডন করেছেন। কুমারস্বামী বলেন : "রাজপুত শিল্প এমন এক ইন্দ্রলোকের সৃষ্টি করে যেখানে সব পুরুষই বীর, সব নারীই রূপবতী, আবেগময়ী, ব্রীড়াময়ী ; কি ঘরের পালিত জন্তু, কি বনের পশু সকলেই মানুষের বন্ধু ; নায়ক বঁধু যখন পদক্ষেপ করে চলে যান, তখন গাছপালা, ফলফুল সবই উৎকর্ণ হয়ে থাকে। এই ইন্দ্রলোক মোটেই অবাস্তব বা অলীক নয় ; এ কল্পনা ও অসীমের জগৎ ; এ দেখা দেয় তাদেরই কাছে যারা প্রেমাঞ্জনমাখা চোখে দেখতে আপত্তি করে না।"

রাজপুত চিত্রের বিষয়বৈচিত্র্য

তবে রাজপুত চিত্রের বিষয়বস্তু যে শ্রীমদ্ভাগবতের উপরে একান্তনির্ভর তা নয়, তার রস যে সবসময়েই গীতিকাব্যধর্মী ও কোমল তা নয়। মহাকাব্য থেকেও বিষয়বস্তু এসেছে, যেমন ভীষ্মের শরশয্যা, দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরের পাশাখেলা, অথবা দুঃশাসন কর্তৃক দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ। শৈব বা শাক্ত বিষয়ও এসেছে, যেমন শিব পার্বতীর বিবাহ, গার্হস্থ্য জীবন, দুর্গার সিংহ, শিবের নন্দী, কার্তিকেয়, গণেশ। দেবাসুরের যুদ্ধ, মহিষাসুর বধ, ভীমা বিকটদশনা কালী, ইত্যাদি নানা বিষয়ই রাজপুত চিত্রে ভিড় করে এসেছে। স্পষ্টই বোঝা যায় লৌকিক ধর্মকে রাজপুত চিত্র কতখানি আশ্রয় করে ছিল। এ ছাড়াও রাজপুত চিত্রে ভাল ভাল পোর্ট্রেট আছে, যদিও কুমারস্বামীর মতে রাজপুত পোর্ট্রেটে মুঘল পোর্ট্রেটসুলভ চরিত্রচিত্রণের চেয়ে বীরোচিত পৌরাণিক ভাব বেশি।

ছবিতে বীরোচিত পৌরাণিক ভাবের কথা বলতে গিয়ে নরনারীর কতকগুলি লক্ষণের উল্লেখ করা উচিত। নারীর দৈহিক ও আধ্যাত্মিক লক্ষণাদর্শ রাজপুত চিত্রে ফোটানোর প্রয়াস আছে। নায়িকার চোখ হবে বড়, আয়ত, পদ্মফুলের মত ; আগুলফ কেশভার গুচ্ছে গুচ্ছে ঘন মেঘের মত পড়বে ; স্তন হবে সুঠাম, সুউচ্চ ; উরুদেশ হবে পূর্ণ, মসৃণ ; হাত হবে গোলাপবর্ণ ফুলের মত ; গতি হবে গজেন্দ্রগমন ; মুখের ও দেহের ভাব হবে একান্ত ব্রীড়ানত। রাধা যখন কৃষ্ণের বাণী শুনবেন তখন নক্শা দেখে খ্রীস্টীয় অনান্সিয়েশনের কথা মনে পড়বে ; যখন কৃষ্ণের চোখে চোখ পড়বে তখন তাঁর চোখ হবে আনত, ঘোমটা ঢাকা, যখন স্বয়ং কৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে তখন তিনি চলৎশক্তি রহিত হয়ে, চিত্রার্পিতার মত অথবা স্বর্ণমূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে যাবেন, এক মুহূর্তে বিশ্বজীবনের সব কিছু তাঁর কাছে প্রতিভাত হবে। তিনি নিতান্ত মানবী, নারী, নিজের কোমলতা সম্বন্ধে ক্রুদ্ধ, কৃষ্ণের চটুলতা ও লাম্পট্যের প্রতি একান্ত বিরক্ত। অথচ তিনি কৃষ্ণের কাছে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করেন, প্রতিদানে কিছু চান না।

যেহেতু লৌকিক ধর্মের সঙ্গে রাজপুত চিত্রের গভীর সম্বন্ধ আছে, সেহেতু রাজপুত ছবি ভারতীয় আচার ব্যবহার, প্রথা পদ্ধতি, পোশাক, স্থাপত্য, ধর্মবিষয়ক তথ্যের আকর বলা যায়। বিশেষ করে বৈষ্ণব ও শৈব ধর্মে এমন কিছু লোকপ্রসিদ্ধি নেই যা রাজপুত ছবিতে পাওয়া যায় না। বিশেষ করে গোটা শ্রীমদ্ভাগবতের সন্ধান রাজপুত ছবিতে অনায়াসে মেলে একথা বললে মোটেই অত্যুক্তি হয় না।

কুমারস্বামী তাঁর 'রাজপুত পেন্টিং' বইয়ের প্রথম খণ্ডে খুব বিশদভাবে রাজপুত চিত্রকলার বিষয়বস্তুর বিবরণ দিয়েছেন। বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত ও বিভিন্ন বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত অভিধান হিসাবে বইটির ২৬ থেকে ৭৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত নিবন্ধটি অমূল্য। নিবন্ধটি মুখ্যত বিদেশী পাঠকের জন্য লেখা। উল্লেখ করলেই যাবতীয় সংশ্লিষ্ট বিষয় ভারতীয় পাঠকের মনে পড়বে এই আশায় আমি শুধু বিষয়গুলির শিরোনামা কয়টি কুমারস্বামীর বই থেকে তুলে দিলুম।

(ক) কৃষ্ণলীলা। ভক্তি : প্রেমসাগর : স্বকীয়া নায়িকা : কুলমানলজ্জাত্যাগ : পরকীয়া প্রেম : অভিসার : ভাবসম্মিলন : স্বরূপ।

জন্মলীলা : গোষ্ঠলীলা : গিরিগোবর্ধন ধারণ : কালিয়দমন : গোপিনীকুল : রাস মণ্ডল : বসন্তলীলা ও দোল : বৃন্দাবনলীলা : রসিকনাগর : রাধাকৃষ্ণলীলা।

জন্মলীলা : কংসগৃহে দেবকী ও বাসুদেব : কৃষ্ণের চতুর্ভুজ আবির্ভাব : বৃন্দাবন যাত্রা : শৈশব : ননীচুরি : নল কুবরের বৃক্ষপাশ মোচন : বকাসুর ও অন্যান্য দৈত্যনিধন : রাখালী : গোধূলি : কানাই বলাই, নন্দ, যশোদা, গোপ গোপী।



বংশীবদন : ঘাটলীলা : কদম্বমূলে চীরহরণ : মথুরার ব্রাহ্মণ কর্তৃক কৃষ্ণের নিমন্ত্রণ (বরোদা সরকারী মিউজিয়মে এই বিষয়ে একটি ছবি আছে। বোধহয় সতেরো শতকের একেবারে প্রথমদিকে আঁকা। খুব কড়া তপ্ত রঙে আঁকা, হলুদের প্রাচুর্য যথেষ্ট। মুখগুলি মোটা লাল রেখায় আঁকা। মথুরার ব্রাহ্মণীরা কৃষ্ণকে খাওয়াচ্ছেন। একজন দুধের বাটি ধরে, একজন পিঠা। কৃষ্ণ ছাতে বসে, হাঁটুদুটি বাঁধা।)

গোবর্ধনধারণ : দুগ্ধদোহন।



রাসলীলা : রাধামিলন : রাসমণ্ডল : যোগমায়া।
দানলীলা।
শঙ্খাসুর বধ।
উষা অনিরুদ্ধ উপাখ্যান : বাণাসুর বধ : অনিরুদ্ধের বিবাহ্।
যমুনা প্রয়াণ।
পার্থসারথি।
কৃষ্ণসুদামা।
শ্রীমদ্ভাগবতের বিবিধ আখ্যান : ব্রহ্মার জন্ম : গজেন্দ্র মোক্ষ : গজগ্রাহ্।

সমুদ্র মন্থন : মান্দারদণ্ড : বাসুকীরজ্জু : দেবাসুরের যুদ্ধ : অমৃতভাণ্ড : মোহিনী মূর্তি ধারণ : অসুরের অমৃত পান : রাহুর মুণ্ডচ্ছেদ।

হৃৎপদ্ম : লক্ষ্মী নারায়ণ : পদ্মাসন লক্ষ্মী।
গীতবোবিন্দ।

(খ) শ্রীনাথজী : শ্রীবল্লভাচার্য (জন্ম ১৪৭৯ সন) : বল্লভাচারী সম্প্রদায় : গোবর্ধন দর্শন : শ্রীনাথজী ও রাধা : দাউজী বা বলরাম : দ্বারকানাথ।

(গ) রসচিত্র : শৃঙ্গার।

অষ্টনায়িকা। রসিকপ্রিয়া রচয়িতা কেশবদাসের মতে অষ্টনায়িকার নাম :

স্বাধীনপতিকা : যাঁর পতি তাঁর ইচ্ছার একান্ত বশ।

উৎকা, উৎকলা, উৎকণ্ঠিতা, বা বিরহোৎকণ্ঠিতা : যিনি প্রিয়জনের পথ চেয়ে ব্যাকুল হয়ে আছেন।

বাসক শয্যা বা শয্যিকা : যিনি প্রভুর আগমন প্রত্যাশা করে শয্যা প্রস্তুত করে অপেক্ষা করছেন।

অভিসন্ধিতা বা কলহান্তরিতা : মানভঞ্জন করতে এলে যিনি প্রভুকে তাড়না করেন, এবং প্রভু চলে গেলে অনুতপ্ত হন।

খণ্ডিতা : যাঁর প্রভু অন্যত্র নিশাযাপন করে, প্রত্যূষে গৃহে এলে নায়িকা তীব্র ভৎর্সনা করেন।

প্রোষিতপতিকা বা প্রোষিতপ্রেয়সী : যাঁর প্রভু প্রত্যাবর্তনের লগ্ন স্থির করে বিদেশ গিয়েছেন ; লগ্ন পার হয়ে গেছে অথচ ফেরেননি।

বিপ্রলব্ধা বা লব্ধবিপ্রা : যিনি কাল গুণে বসে আছেন, অথচ যামিনী যায়, প্রভু আসেন না।

অভিসারিকা : যিনি নিশাকালে কোন কিছু বাধাবিপত্তি না মেনে প্রভুর উদ্দেশে পথে বেরিয়ে পড়েন।

অভিসারিকার আবার শ্রেণী বিভাগ আছে : যেমন কামাভিসারিকা (সাধারণ রক্ত মাংসে গড়া স্ত্রীলোক) ; কৃষ্ণাভিসারিকা (আধ্যাত্মিক) ; গর্ভাভিসারিকা (মানুষী), ইত্যাদি।

পাহাড়ী চিত্রশিল্পীরা (যথা কাংড়া, কুলু ইত্যাদি, এঁদের সম্বন্ধে পরে আলোচনা হবে) অষ্টনায়িকার প্রত্যেকের সাধারণ লক্ষণ মোটামুটি বাঁধাধরা ছকে ফেলে আঁকতেন, যেমন :

স্বাধীনপতিকা, নিশ্চিন্তে আরাম করে বসে থাকবেন, প্রভু পদচর্যা করবেন।

উৎকা, অভিসারস্থলে অপেক্ষারতা গাছের তলায় বা কুঞ্জবনের ধারে পত্রশয্যার উপর বসে বা দাঁড়িয়ে। সমুখদিকে জলে প্রস্ফুটিত পদ্ম, একপাশে বুনো হরিণ ঘাস খাচ্ছে মুখ তুলে হাওয়ায় ঘ্রাণ নিচ্ছে।

বাসকশয্যা, দরজার পাশে উদ্‌গ্রীব হয়ে দেখছেন অথবা প্রভুকে অভ্যর্থনা করছেন, পরিচারিকারা ভিতরে শয্যা প্রস্তুত করছে। মাঝে মাঝে একটি কাক থাকে, এটি প্রেমিকের প্রত্যাবর্তনের লক্ষণ। যদি পতি সত্যই প্রত্যাবর্তন করে থাকেন, তবে আগতপতিকা বলা হয়।

অভিসন্ধিতা, প্রভুকে তাড়না করছেন, নিতান্ত হতাশায় গভীর শোকে ভূমিতে বসে। প্রভুর পিঠ দেখা যাচ্ছে, তিনি চলে যাচ্ছেন।

খণ্ডিতা নায়িকা, প্রত্যূষে আগন্তুক প্রেমিককে দেখে তীব্র র্ভৎসনা করছেন।

প্রোষিতপতিকা, সখিমধ্যে বসে, প্রভুর অনাগমনে কিছুতেই সান্ত্বনা মানছেন না।

বিপ্রলব্ধা, উৎকার মতই পত্রশয্যার পাশে অপেক্ষা করছেন ; ভোর হয়েছে তবুও প্রভুর দেখা নেই। নায়িকা ক্ষোভে লজ্জায় রাগে ভূষণ অলঙ্কার ছিঁড়ে খুলে ফেলে দিচ্ছেন।

অভিসারিকা তমসাচ্ছন্ন প্রলয়রাতে বেরিয়েছেন, কিছু অলঙ্কার পথে খসে পড়েছে, পায়ে মলের মত গোখ্‌রো সাপ জড়িয়ে ধরেছে ; বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ; মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে ; পথে ভূতপ্রেত ভিড় করে ভয় দেখাচ্ছে। কখনও কখনও অভিসারিকা সবেমাত্র প্রেমিকের ঘরে অথবা অভিসারস্থলে পৌছেছেন।

এর মধ্যে উৎকা আর অভিসারিকাই কেবল রাত্রির ছবি।

নায়িকা তিন রকম : স্বকীয়া (যিনি নিজের পতিকে ভালবাসেন) ; পরকীয়া (যিনি পরপুরুষে প্রেম করেন) ; সামান্যা (যাঁর নিজপতি ও পরপুরুষে ভেদজ্ঞান নেই)। স্বকীয়ার আবার অভিজ্ঞতা অনুসারে শ্রেণীভেদ আছে। তিনি নিতান্ত কাঁচা অনভিজ্ঞা, তিনি মুগ্ধা, মুগদিনী বা নবোঢ়া।

বিরহ। বিরহে অর্থাৎ প্রেমবিচ্ছেদে তিন ভাগ। প্রথম পূর্বরাগ অর্থাৎ প্রেমারম্ভ, প্রথম চোখে চোখে দর্শন। দ্বিতীয় মান। মান তিন প্রকার : লঘু, মধ্যম, গুরু। গুরু মানের অভিব্যক্তি মাননী। তৃতীয় প্রভাস অর্থাৎ প্রেমিক প্রেমিকার দূরদেশে প্রয়াণ, যেমন কৃষ্ণ যখন বৃন্দাবন থেকে মথুরা প্রয়াণ করেন। এর প্রথম লক্ষণ প্রোষিত-প্রেয়সী। তারপরে আসে ব্যাধি। দর্শনশাস্ত্রে প্রভাস হচ্ছে আত্মার কালরাত্রি।

বায়স লক্ষণ : কাকের গতিবিধি লক্ষ্য করে প্রভু কখন ফিরবেন তার অনুমান নির্ণয়।

সংযোগ। মিলন। প্রেমপাশ বা প্রেমডোর। লীলাভাব। কৃষ্ণ মনচোরা।

(ঘ) শিবপার্বতী। শিবপার্বতীর হিমালয়ে বাস। শিবের নৃত্য। শিবপার্বতীর সিংহাসনে অভিষেক। হৃৎপদ্মে শিব ও শক্তি। গঙ্গার উৎপত্তি। শক্তি। অসুর সংহারিণী শক্তি। তামসী।

(ঙ) পুরাণ ও মহাকাব্য।

(১) রামায়ণ : লঙ্কার অবরোধ ; বনবাস ; রামের অভিষেক।

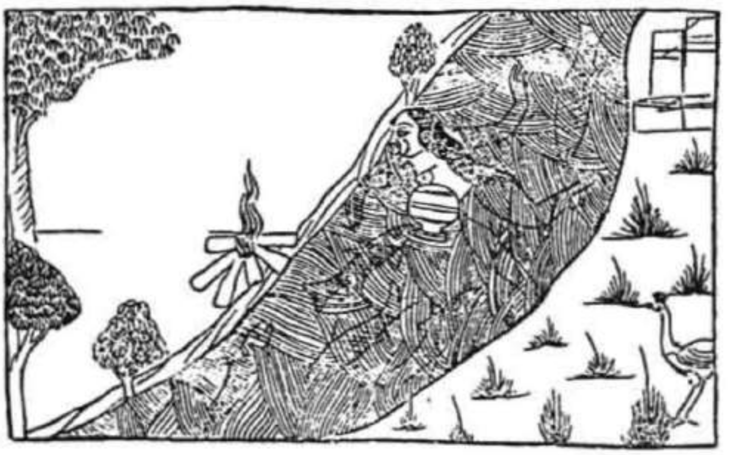
(২) মহাভারত : দ্যূতক্রীড়া ; ভীষ্মের শরশয্যা।

(চ) কাহিনী

হাম্বীর হাথ।

নল দময়ন্তী।

সোহনী—সহীঁয়াল।



পদ্মাবতী।

লয়লা-মজনু।

সস্মী-পুনুন।

(ছ) রাগমালা

ভারতীয় সঙ্গীতের মূল শাখা প্রশাখাকে বলে রাগ রাগিণী। অষ্টপ্রহরের প্রতিটি ভাব ও মুহূর্তের উপযোগী একটি রাগ আছে। রাগরাগিণীর উৎপত্তির চারটি উৎস আছে (১) লোক বা মার্গসঙ্গীত, (২) কাব্য, (৩) ভজন বা

যোগীর গান, কীর্তন, (৪) ওস্তাদী বা দরবারী সঙ্গীত। রাগমালার নামে এদের প্রমাণ পাওয়া যায়, যেমন পাহাড়ী, হিন্দোলা, যোগী, সারঙ্গ (তেরো শতকের গাইয়ে সারঙ্গদেব)। অন্যান্য নামে ভাব বা মুহূর্তের সঙ্গে যোগ আছে, যেমন বসন্ত, দীপক। এইভাবে সব রাগরাগিণীরই বিশেষ বিশেষ অভিব্যক্তি বা ব্যঞ্জনা আছে।

রাগগণ যেন মন্ত্রের দেবতা। অশুদ্ধভাবে রাগরাগিণী গাওয়াও যা আর দেবদেবীর অঙ্গচ্ছেদ একই ধরনের পাপ। রাগিণীরা রাগদের স্ত্রী। হনুমান মতে ছয়টি রাগ আছে, প্রত্যেকের পাঁচজন করে রাগিণী। কিন্তু একটিমাত্র মত ত নেই। আছে নানা মত। কোনও মতে রাগরাগিণী ছাড়া আবার আছে পুত্র। ভরত প্রণীত নাট্যশাস্ত্রে (পাঁচ শতকে লেখা) এর বিশদ আলোচনা আছে। প্রাচীন রচনা সবই সংস্কৃত। কিন্তু ষোল শতক থেকে হিন্দীতে রাগমালা কাব্য লেখা চলন হল। আর রাগমালা কাব্যের পুঁথিতে রাগরাগিণীর ছবি এঁকে দেখানও রেওয়াজ হল। সব ছবিই শুদ্ধ হল না, অনেক ছোটখাট পুঁথিতে যার যেমন ইচ্ছা হল সেইমত আঁকল। তবে প্রাচীন ছবিগুলি প্রায়ই শাস্ত্রসম্মত যথাযথ। যেমন গীতগোবিন্দের প্রতিটি গান একটি বিশেষ রাগিণীনির্ভর, এবং সেই গানের বিষয় অনায়াসে সেই রাগিণীর বিবরণী ছবি হতে পারে।

কতকগুলি প্রসিদ্ধ রাগের ছবি বরাবরই প্রায় এক। যেমন ভৈরব রাগ বলতে শিবের ছবি। ভৈরবী রাগিণী হবে শিবপূজা। খম্বাবতী হবে ব্রহ্মপূজা। হিন্দোলা হবে ঝুলন। তোড়ি হবে একটি বীণাবাদনরতা মহিলা, সঙ্গীত শুনে হরিণ কাছে এগিয়ে আসছে। দেশাখ্য হচ্ছে কুস্তির চিত্র। ধনাশ্রীতে একটি সখি একটি পুরুষের ছবি এঁকে নায়িকাকে দেখাবে ; ছবিতে নায়িকা বঁধুকে চিনবেন ; ঠিক যেমন ঊষা অনিরুদ্ধের আখ্যানে চিত্ররেখা অনিরুদ্ধের ছবি এঁকে ঊষাকে দেখান। বসন্ত হচ্ছে নাচ, হোরি খেলার নাচ। মেঘমল্লার হচ্ছে বর্ষায় কৃষ্ণের নাচ। গুর্জরীতে একটি নারী ময়ূরকে সঙ্গীত বাজিয়ে শোনাচ্ছেন। বিভাস প্রেমের দৃশ্য, পুরুষটি প্রেমের ধনুক থেকে পুষ্পবাণ ছুঁড়ছে।

অন্যান্য রাগরাগিণীর ছবি সব সময়ে একরকম হয় না। রাগিণীদের ক্ষেত্রেও বিষয়বস্তু নানারকম হয়। অধিকাংশই প্রেমের দৃশ্য, অথবা নৃত্যগীতাদিপ্রমোদবিষয়ক। রাগচিত্রমালার সর্বশ্রেষ্ঠ সংগ্রহ আছে ব্রিটিশ মিউজিয়মের পুঁথি ও-আর ২৮২১ নম্বরে।

নীচে রাগরাগিণীর তালিকা দেওয়া হল। রাগগুলির নামের সামান্য রকমফের পাওয়া যায়, রাগিণীদের অন্য নামও আছে।

ভৈরব রাগ : রাগিণীর নাম, ভৈরবী, নট, মালবী, পটমঞ্জরী, ললিতা।

মালকোষ রাগ : রাগিণীর নাম, গৌরী, খম্বাবতী, মালশ্রী, রামকেলী, গুণকেলী।

হিন্দোল রাগ : রাগিণীর নাম, বিলাবল, তোড়ি, দেশাখ্য, দেবগন্ধারী, মধুমাধবী।

দীপক রাগ : রাগিণীর নাম, ধনাশ্রী, বসন্ত, কানাড়া, বরাড়ী, পূরবী।

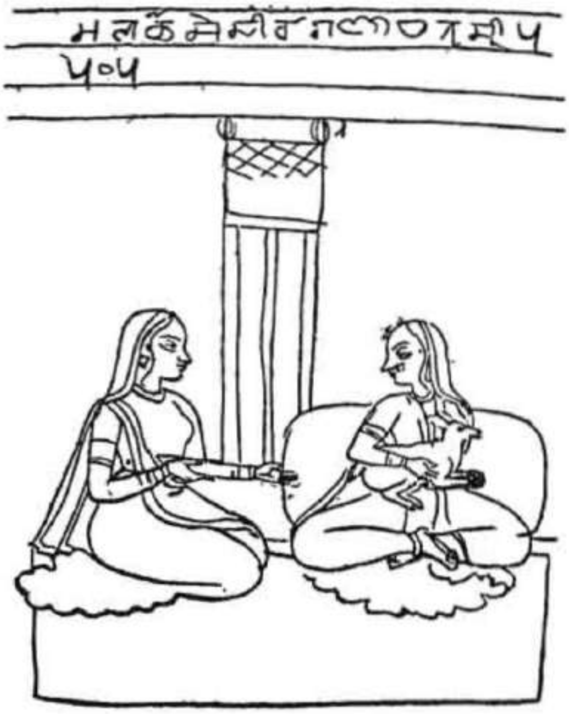
মেঘমল্লার রাগ : রাগিণীর নাম, বাঙ্গালী, গুজরী, গৌড়মল্লার, ককুভা, বিভাস।

শ্রীরাগ : রাগিণীর নাম, পঞ্চম, আসাবরী, সেতমল্লার, কেদারা, কামোদিনী।

এই নামগুলি ব্রিটিশ মিউজিয়মের ও-আর ২৮২১ নং পুঁথিতে আছে। এটি সতেরো শতকের রাজস্থানী রীতি। ব্রিটিশ মিউজিয়মের আরেকটি পুঁথিতেও (এ-ডি-ডি ২৬৫৫০) প্রায় এক নামই আছে।

জম্মুর ডোগ্‌রী পাহাড়ী রাগমালা চিত্রে আরেকটু বেশি আছে। তাতে আছে রাগ, রাগিণী (ভার্যা), আর পুত্র। এদের বিন্যাস প্রচলিত বিন্যাস থেকে বেশ তফাৎ। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, দীপক রাগের স্ত্রী গুজরী রাগিণীর ছবিতে বীণা হাতে কুঞ্জবনে একটি নারী (আরেকটি ছবিতে দ্বিতীয় নারী ও দুটি হরিণ আছে) ; শ্রীরাগের স্ত্রী রামকেলী রাগিণী চিত্রে একটি নারী দুটি চন্দনগাছ থেকে নির্গত কয়েকটি গোখরো সাপকে দুধের বাটি ধরে দিচ্ছে। মালকোষ রাগের পুত্র রাগ ভমরানন্দ চিত্রে একটি যোগী তাণ্ডবনৃত্য করছে, পাশে একটি রমণী তারের যন্ত্রে বোল তুলছে। হিন্দোল রাগের স্ত্রী অহীরী রাগিণী চিত্রে দেখানো হয়, একটি বাড়ির সমুখে কয়েকটি মেয়ে মাটির পাত্র থেকে নির্গত কয়েকটি গোখ্‌রো সাপকে দুধ দিচ্ছে। হিন্দোল রাগের স্ত্রী দেবগী (দেব গন্ধারী) রাগিণী চিত্রে শিবপূজা হচ্ছে।

রাগরাগিণী চিত্রমালা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ও· সি· গাঙ্গুলী ১৯৩৪-৩৫ সালে 'রাগজ অ্যাণ্ড রাগিণীজ' নামে প্রামাণ্য দুই খণ্ড বই প্রকাশ করেন। প্রথম খণ্ডটি বিষয়বস্তুর আলোচনায় ব্যাপৃত, ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় খণ্ডে ছয়টি রঙীন ছবি ও ৩৩৭টি ফোটোগ্রাফ আছে। রাগরাগিণীর বর্ণনামূলক বই ও ছবি হিসাবে গ্রন্থটি অমূল্য, স্পষ্ট



বোঝা যায় ভারতীয় শিল্পী শ্রবণ ও দর্শনের দ্বিত্ব ঘোচাবার কত প্রয়াস করেছেন। দ্বিতীয় খণ্ডটি ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত হয়। বইটি অবশ্য ইতিহাস, উৎপত্তি বা উৎকর্ষের দিক দিয়ে ছবিগুলিকে ভাগ করার কোন চেষ্টা করেনি, রাগরাগিণী অনুসারে গ্রন্থকার ছবিগুলিকে এইভাবে ভাগ করেছেন :

(ক) রাগ : ভৈরো, ভৈরোঁ বা ভৈরব
রাগিণী : ভৈরবী, মধ্যমাদি, বংগাল (বংগালিকা বা বংগালি, বংগালিনী), ভরাটিকা (ভরাটী, ভৈরটী, ভৈরাদি), দেশভরাটি, সৈন্ধবী

(খ) রাগ : মালব-কৌশিক (মালব বা মালকোষ)
রাগিণী : তোড়ী, তুরুস্ক তোড়ী, তুড়িকা (তুড়ি, তুড়িয়া), গৌরী, গুণকলী (গুণকেলী, গুণক্রী, গুণকিরী), খম্বাবতী, কুকুভ (ককভ, ককুভা, ককুম্ভিকা)

(গ) রাগ : হিন্দোলা (হিদোরা)
রাগিণী : : রামকেলী (রামকৃতি, রামকিরী বা মানবতী), দেশাখ্য (দেশাখি, দেশাখ), ললিতা, বেলাবলী (বিলাওল), পটমঞ্জরী

(ঘ) রাগ : দীপক
রাগিণী : দেশী, নট, নাটিকা, কেদার, কেদারিকা, কামোদ, কানড়া (কানড়ো, কর্ণাটক)

(ঙ) রাগ : শ্রী
রাগিণী : মালশ্রী, মারু, ধনাশ্রী, বসন্ত, আসাবরী

(চ) রাগ : মেঘ (মেঘমল্লার)
রাগিণী : মল্লারিকা (মল্লারি, মল্লার), ময়ূরিকা, সেত-মল্লার, গৌড়-মল্লার, গুজ্জরী (গুর্জরী, গুজরী), শ্যামগুজরী, দক্ষিণগুজরী, দেশকারী (দেশকার), ভূপালী, তঙ্কতিঙ্কা, তকু, তক্ক), রাগ (?) রাগিণী (?) : পঞ্চম

(ছ) রাগ : নট-নারায়ণ (নট্ট-নারায়ণ)
রাগিণী : মালবী, মধুমাধবী, পটমঞ্জরী, বিভাস

(জ) রাগ : সারঙ্গ

রাগিণী : সারঙ্গী, দেবগান্ধার, ত্রিবণী (ত্রিবণা, ত্রাবণী, ত্রাবণিকা), গৌণ্ড-করী, পূরবিকা, পাহাড়ী, শাবিরী, শাবেরিকা, হাম্বিরী, কৌমারিকা, কল্যাণ, নট-কল্যাণ

(ঝ) রাগ : ভমরানন্দ, গম্ভীর

রাগিণী : গুজরী, দেবগিরি, দেবকলী, অহীরী, কেদার, দেবগন্ধরী। কামোদ। সুরত।

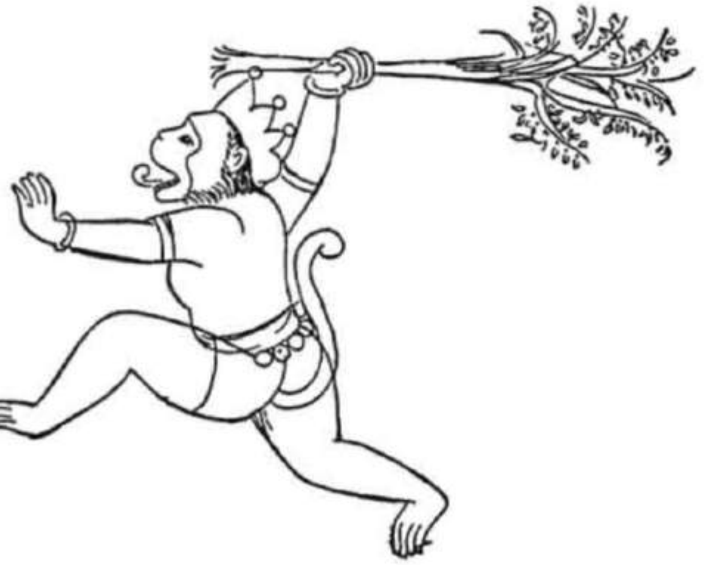
বিবিধ রাগ : মেঘ। কুন্দ-মল্লার। বসন্ত। ককুভ। বেহাগ। পরজ। সোহিনী। ভৈরো। রাগিণী-কাংলি। রাগ মালকোষ। কবক্কি রাগিণী। পূরবী রাগিণী। শ্যামকল্যাণ। খামাজ রাগিণী। মুঘদয়ী রাগিণী। শঙ্করাভরণ। খোক্কর রাগিণী।

মুঘল চিত্রেও রাগমালা চিত্রের নমুনা আছে।

(ঞ) ঋতু, পশুপক্ষী, প্রাকৃতিক দৃশ্য।

রাজপুত চিত্রে বিশেষ প্রিয় বিষয় হচ্ছে বারমাস্যা বা বারোমাসের বর্ণনাচিত্র। ষড়ঋতুর চিত্রও অনেক আছে।

গজকুমীরের লড়াই রাজপুত ছবিতে এক বিশেষ প্রিয় বিষয়। তেমনি প্রিয় হচ্ছে মৃগজল বা মৃগতৃষ্ণা। চকোর সারসের ছবি বহু আছে। গাভী নন্দী ত আছেই। সাপ, হরিণ, ময়ূরও যথেষ্ট। পশুর মানুষী ভাব দেখাতে ভারতীয় ছবি অদ্বিতীয়, অত বোধ, পর্যবেক্ষণ ও জ্ঞান আর অন্য কোন দেশের ছবিতে নেই। এর সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ হনুমান।



তাছাড়া আছে ফুল, ফল, গাছপালা, মধুকরের গুঞ্জন, বাতাস, সারা বিশ্বপ্রকৃতি, যা ভারতীয় ছবিতে যুগে যুগে ভিড় করে আসে ; ইতিহাসের আগের যুগের গুহা, মহেঞ্জোদারো থেকে আরম্ভ করে বিশ শতক পর্যন্ত যার শোভাযাত্রার বিরাম নেই।

(ট) প্রতিকৃতি বা পোর্ট্রেট। মুঘল চিত্রকলায় চরম উৎকর্ষ লাভ করার পর এই রীতি যায় জয়পুরে। পরে জম্মুতে, কাংড়ায় আর অন্যান্য পাহাড়ী রাজ্যে, শিখ দরবারে।

তালিকা লম্বা হয়ে গেল, তবুও রাজপুত চিত্রের বিষয়বৈচিত্র্য হয়ত পরিষ্কার হল না। রাজপুত চিত্রে শুধু যে অজন্তার প্রাচীরচিত্রের ধর্মপ্রবণতা এল তা নয়, হিন্দুধর্মসুলভ এক অস্থির কুতূহলী জিজ্ঞাসাও এল। শুধু যে হিন্দুধর্মের প্রবল আবেগ এল তা নয়, সেই সঙ্গে এল দেশের জীবনের দৈনন্দিন সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় সম্বন্ধে আগ্রহ, ঔৎসুক্য, রূপকথা ও লোক-সাহিত্য সম্বন্ধে শ্রদ্ধা। এইভাবে রাজপুত চিত্র হল নিতান্ত লৌকিক চিত্র, দেশের লোকের একান্ত আপন সম্পদ। সাধারণ গ্রামবাসীর কাজ, খেলা, ধর্ম, কর্ম, সামাজিক আচার পদ্ধতি,

গার্হস্থ্য জীবন, সমস্তই চিত্রে ফুটে উঠল দুই ভাগে ; এক সাধারণ ভারতীয় গ্রামবাসীর দৈনন্দিন জীবনের আলেখ্যে, দ্বিতীয়ত তার ধর্মসংশ্লিষ্ট বিশ্বাস ও পৌরাণিক গল্পের ছবিতে।

প্রথম ভাগটির কথাই ধরা যাক। রাজপুত চিত্রশিল্পীর তুলিতে দৈনন্দিন কোন বিষয়ই বাদ পড়ল না। সব সময়ে যে নিখুঁত পুরো ছবি হল তা নয়, তবুও নক্‌শা বা রেখাচিত্র রয়ে গেল ; যেমন সাধারণ বাজারের দৃশ্য, কারিকরদের কাজের ছবি। কার্পেট বোনার ছবিই কি সুন্দর : তাঁতের নক্‌শার উপর নানা রঙের পশম গিঁটবাঁধা অবস্থায় জটপাকানো রয়েছে, চারিদিকে ছুরি কাঁচি যন্ত্রপাতি ছড়ানো, ওদিকে একপাশে জুতো খুলে রাখা, পায়ের আঙ্গুল দিয়ে পোড়েনের সুতো টান করে ধরা হয়েছে। যন্ত্রপাতি নিশ্চয়ই সব যথাযথভাবে আঁকা, কারণ এটা বুঝতে দেরি হয় না যে চিত্রকর নিজের জানালা থেকে রোজ তার ঘর দেখে দেখে এঁকেছেন। কাপড় ছাপাইকর রঙরেজি, সুতোচিকণের কারিকর, স্যাকরা, তাদের ছোটখাটো টুকিটাকি কাজ সবই রাজপুত শিল্পীর তুলিতে অপূর্ব উৎরেছে। একটি ছবিতে দেখি বাড়ির ছোটছেলে বড়ছেলের কাছে সবে কাজ শিখতে নেমেছে। ছবিটি ভাবের অভিব্যক্তিতে অপূর্ব। এই ছবিটিরই পিছনদিকে দুটি স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে, একটির কোলে শিশু আহ্লাদে কলবল করে মায়ের বড় মাক্‌ড়ি নিয়ে টানাটানি করছে, অন্যটি নিজের ছেলের হাত ধরে দাঁড়িয়ে প্রথম নারীটির শিশুর খেলা সস্নেহ নয়নে দেখছে। বোধ হয় দুই ভাইয়ের দুই বউ।

অথবা আরেক ধরনের ছবির কথা ধরা যাক, যে বিষয়টি জোব, রাণাঘুণ্ডাই, কুল্লী থেকে শুরু করে ভারতীয় সব ছবিতেই ঘুরে ফিরে এসেছে। বিষয়টি হচ্ছে রাস্তার অতি সাধারণ দৈনন্দিন দৃশ্য। ভারতে চিরকালই বড় বড় রাজপথের অভাব নেই, তাতে লোকচলাচলেরও বিরাম নেই। যানবাহন যে যুগে মন্থর ছিল সে যুগে পথিকের অন্তত কয়েকদিনের জন্য রাজপথই হত ঘর। দুপুরে খাওয়া ও বিশ্রাম, রাত্রে আগুন জ্বালিয়ে বসা, সরাই বা চটিতে থাকা এসব হল চিত্রের বিষয়। এ বিষয়ে কত যে ছবি আছে হিসাব নেই, এখনও বিষয়টি শিল্পীদের টানে, যদিও মোটর রেলের যুগে বিষয়টি আজকাল রোমান্টিক ঠেকে। দুপুর সময়ে রাস্তায় বিশ্রামের চিত্র রাজপুত শিল্পীর একটি প্রিয় বিষয়। কূয়া, তার পাশে বৃদ্ধ বট, চারদিকে যাত্রীরা বসে, সমুখদিকে ক্লান্ত মুখে মাল নামিয়ে জীর্ণ বিছানার উপর এলিয়ে পড়েছে, দূরে আরেকটি মুটেরও একই অবস্থা। বল্লম হাতে এক পাইক কূয়ার ধারে আলগোছে হাতে অঞ্জলি করে জল খাচ্ছে, একজন স্ত্রীলোক ঘটি থেকে জল ঢেলে দিচ্ছে। তারই তলায় ভৃত্য প্রভুর জন্য হুঁকো সাজছে। প্রভুটি বিরাট বপু নিয়ে গদাইলস্করি চালে বিছানায় আরাম করে শুয়ে হাতে আরশি ধরে প্রসাধন করছেন, পাশে দু'জন স্ত্রীলোক বসে, তার মধ্যে একজন বাতাস করছে, আরেকজন পা টিপে দিচ্ছে। ছবিটা অবশ্য কাংড়ার, কিন্তু এইসূত্রে না উল্লেখ করে পারা যায় না।

আরেকটি রীতিতে রাজপুত চিত্র সিদ্ধহস্ত, সেটি চিত্রকলার নিতান্তই অসামান্য নৈপুণ্যের ফল। এর উল্লেখ মুঘল চিত্র সম্বন্ধে আলোচনাকালে করেছি। রীতিটি হচ্ছে ছবিতে দু'রকম আলো আনা, প্রকৃতির উপর চাঁদের আলো, আর তারই মধ্যে আগুনের আলো। ছোট্ট কুঁড়ে বা গাছের চারধার ঘিরে কাঠের আগুনের চারপাশে লোকজন ঘিরে বসে, দূরে প্রকৃতির প্রায় সবটাই অন্ধকারে মগ্ন, যা কিছু আলো কেবল তৃতীয়া চতুর্থীর চাঁদের— ছবিতে এই ধরনের আলো আনা ব্যাপারে রাজপুত শিল্পীর তুলনা মেলা ভার। দুটি বিভিন্ন আলোর মিশ্রণ রাজপুত শিল্পী এক অদ্ভুত কৌশলে আনতেন। কাগজের জমি সবটা প্রথমে সোনার জল লাগিয়ে নিয়ে ইংরেজিতে যাকে বলে 'প্রাইম' করা, (পারসীতে 'তার' করা), অর্থাৎ জমি তৈরি করে নিতেন। তার উপরে পড়ত অন্যান্য রঙ। এইভাবে যেখানটা আলো সেখানটা এত উজ্জ্বল আর যেখানে ছায়া সেখানটা এমন এক স্বচ্ছ, টলটলে, ঝিকঝিকে ভাব আসত যে অন্য কোন দেশের ছবিতে এরকমটি হয় কিনা সন্দেহ। সোনার তার করার বদলে অনেক সময়ে রূপোর তার-আফশন্ধনও হত, বিশেষত যে সব ছবিতে স্থির জলের উপর পদ্ম ও অন্যান্য জলজ উদ্ভিদের ছবি আঁকা হত ; কিন্তু সোনার তার করা জমির মত রূপোর তার করা জমি তত খুলত না।

রামায়ণ, মহাভারত, বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, নানা বিষয়বস্তুর উল্লেখ আগেই করেছি ; সবেরই বর্ণলিপি হচ্ছে ভারতের বহু প্রাচীন প্রাণবন্ত রেখা, যা তারের মত এঁকে বেঁকে গেছে, স্পষ্ট তীক্ষ্ণ তীব্র ; যেমন আবেগময় তেমনি সংযত, কোমল অথচ দৃঢ়, স্বয়ম্বশ অথচ নম্র প্রশান্ত। কৃষ্ণলীলার মধ্যে দিয়ে রাজপুত শিল্পী আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সামান্য সামান্য ঘটনা দেখাতে সমর্থ হয়েছেন, ভারতীয় জীবনের প্রায় সবদিকই আলোকিত করেছেন। সবচেয়ে কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে পশুপক্ষীর চিত্রে। মুঘল চিত্রেও পশুপক্ষী আছে, কিন্তু সে ছবি নিতান্তই প্রতিরূপ, প্রতিকৃতি, যেমন বনের পশু শিকার, হরিণ, হাতি। কিন্তু রাজপুত চিত্রে পশু হয় সহচর, বিপদে বন্ধু

এমনকি ছদ্মবেশী দেবতা। হনুমানের ধ্যানধারণা বোধহয় কোন দেশের ধর্মে বা চিত্রে নেই। ঠিক একই কথা বলা যায় গরু ষাঁড় সম্বন্ধে। বস্তুত পশুপক্ষী আঁকতে গিয়ে ভারতীয় শিল্পী যে নিখুঁত জ্ঞান, সমবেদনা, অন্তর্দৃষ্টি, পর্যবেক্ষণ, ধৈর্য ও যথাযথ্যের পরিচয় দিয়েছেন, এমন বোধহয় পৃথিবীর অন্য কোন শিল্পীগোষ্ঠী পারেননি।

রাজপুত চিত্রের আঞ্চলিক বৈচিত্র্য

রাজপুত চিত্র সাধারণত তিনভাগে ভাগ করা যায়: বিষয় হিসাবে, দেশ বা উৎপত্তিস্থল অনুসারে, যুগ অনুসারে। বিষয় হিসাবে ভাগ করা খুব সোজা কিন্তু চিত্রপদ্ধতি বোঝবার পক্ষে তাতে সুবিধা হয় না, কারণ যদিও অধিকাংশ ছবিই বৈষ্ণব-বিষয়ক তবুও রাজপুত ছবিকে যে কোন একটা বিষয়ের অন্তর্গত করে সম্প্রদায়ভুক্ত করা ভুল হবে, কারণ রাজপুত চিত্রকলার বৈচিত্র্য প্রায় আশ্চর্যজনক। কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া স্থান হিসাবে রাজপুত ছবিকে ভাগ করাও বেশ সহজ, তবে এইভাবে ভাগ করলে চিত্রপদ্ধতির ক্রমোন্নতি বা পরিণতি বোঝার সুবিধা হয় না। সময় যুগ ও শতক হিসাবে ভাগ করাই প্রকৃষ্ট রীতি; তার সঙ্গে অবশ্য ভৌগোলিক ও বিষয়বস্তু সম্বন্ধে টীকাও কিছু দরকার। কারণ ঐতিহাসিক বা যুগানুসারে ধারাবাহিক আলোচনাতেই শুধু একটা সমগ্রতার আভাস পাওয়া যায়; উত্থান, উন্নতি ও ক্ষয়ের বিবরণ মেলে। দুঃখের বিষয় ভারতীয়, বিশেষ করে রাজপুত চিত্রকলা সম্বন্ধে আমাদের তথ্য ও জ্ঞান পুঙ্খানুপুঙ্খ ত নয়ই, সম্পূর্ণও নয়। ফলে বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক রীতিতে অথবা বিশুদ্ধ ভৌগোলিক রীতিতে এমন বিশদ আলোচনা সম্ভব নয় যাতে কেউ পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারেন। তবুও ভূগোলের উল্লেখ থাকবেই, কারণ যে কোন ভাষায় স্থানীয় টানের মত ছবির ভাষাতেও স্থানীয় ছাপ স্পষ্টভাবে থাকতে বাধ্য।

ভূগোল অনুসারে রাজপুত ছবি দুটি বড় ভাগে ভাগ করা যায়। এক হচ্ছে রাজস্থানী, দ্বিতীয় হচ্ছে পাহাড়ী। রাজস্থানী রীতির মধ্যে পড়ে, পূর্বদেশের বুন্দেলা (ডাটিয়া ও অর্চা রাজ্য), উদয়পুর, বুঁদি, জয়পুর, অম্বর, আজমীর, বিকানীর। রাজস্থানী রীতির কিছুটা কক্ষচ্যুত হয়ে যায় উড়িষ্যায়, যদিও উড়িষ্যার পুঁথি ও পুঁথির পাটায় রাজস্থানী রীতির চেয়ে গুজরাটী এবং দক্ষিণী প্রভাবই বেশি। পাহাড়ী রীতির মধ্যে পড়ে বাশোলী, কাংড়া, কুলু, গুলের, চাম্বা, জম্মু, পুঞ্চ, মাণ্ডি, রামপুর, তেহরি-গাড়োয়াল।

রাজস্থানী চিত্র রাজস্থানের প্রায় সর্বত্রই কিছু না কিছু পাওয়া যায়। যতদূর নজীর পাওয়া যায় তাতে মনে হয় প্রথম যুগে রাজপুত চিত্রের প্রধান কেন্দ্র ছিল জয়পুর, অর্চা, বিকানীর, সম্ভবত উদয়পুর ও উজ্জয়িনীও; তারও আগে বোধ হয় মথুরা। প্রত্যেক ছোট রাজ্যেরই নিজস্ব দরবার ছিল, চিত্রকর ছিল; তাছাড়া অনবরত অন্তর্যুদ্ধ প্রচলিত থাকার দরুন স্থানীয় রীতি ও বৈশিষ্ট্যও নিশ্চয়ই প্রবল ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় রাজপুত চিত্রের খুব পুরনো নিদর্শন কিছু বর্তমান নেই। যা কিছু আছে কোনটাই ষোল শতকের আগের নয়। প্রকৃতপক্ষে সতেরো শতকের আগের আঁকা রাজপুত ছবি একান্ত বিরল। ফলে যে সমস্ত রাজপুত ছবি আমরা পেয়েছি তার অধিকাংশতেই মুঘল প্রভাব দেখা যায়। এমন কি হিন্দী হরফে ষোল শতকের আগের লেখা রাজপুত পুঁথিও কচিৎ পাওয়া যায়, খুবই দুষ্প্রাপ্য। আনন্দ কুমারস্বামী তাঁর 'রাজপুত পেন্টিং' বইয়ে সংগৃহীত তেইশটি রাগমালা চিত্রের উল্লেখ করেন; তাঁর মতে এগুলি প্রাচীনতম রাজপুত ছবির মধ্যে গণ্য করা যায়। এদের মধ্যে চিত্রগুণের চেয়েও ভাবচ্ছবি প্রকাশের দিকে লক্ষ্য বেশি। রাগিণী গৌড়মল্লার ছবিতে পাকানো কাছির মত মেঘের সার আর লাল সাপের মত বিদ্যুতের নক্শা যেমন উল্লেখযোগ্য তেমনি উল্লেখযোগ্য প্রয়োগ হচ্ছে বৃষ্টি বোঝানোর জন্যে পটির উপর সাদা মিহি কালর আঁকা নক্শার। নক্শার সংযমের মধ্যে এমন আশ্চর্য দ্যোতনা দুর্লভ।

এই রাগমালা চিত্রগুলির তুলনা মেলা শক্ত, আর রাজপুত চিত্রের বিশেষত্বগুলিও এদের মধ্যে খুব স্পষ্ট। যেমন নক্শার নৈপুণ্য তেমন নিত্য নতুন বিস্ময়কর উদ্ভাবনা, দুর্মর বন্য প্রাণশক্তি, উদ্ভট বিচিত্র বিন্যাস। যে সব বৈশিষ্ট্যগুণ মুঘল চিত্র রাজপুত চিত্রের কাছে ধার করে, সে সব গুণগুলি অত আগে থাকতেই বেশ প্রকট; যেমন হাওয়ায় ভাসা হাল্কা স্বচ্ছ পরিধেয় বাস; হল্দে অথবা সাদা একেবারে স্বচ্ছ মসলিনের জামা অথবা ঘাঘরার মধ্যে দিয়ে ভিতরের অস্বচ্ছ পরিধেয় বস্ত্রের রঙ বা শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চামড়ার রঙ। প্রাচীন রাজপুত ছবির একটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি কুমারস্বামী বিশেষ করে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যে বৈশিষ্ট্যটি পরের যুগের রাজপুত ছবিতে দেখা যায় না; সে হচ্ছে যখনই ছবিতে পুরুষের শরীরের উপর অংশ শুধু স্বচ্ছ মসলিনে আবৃত দেখানো হত তখনই বগলের উপর দিয়ে ছায়া আঁকা হত। কুমারস্বামী এটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে বলেন, কারণ ঠিক এই রীতিটি

আকবর জাহাঙ্গীর বাদশার সময়ে মুঘল চিত্রের পোর্ট্রেটে পুনরায় দেখা দেয়। ঠিক এই ধরনের ছায়া এবং মসলিনের মধ্যে দিয়ে বর্ণবিন্যাস দেখানোর চেষ্টা এই সময়ের মুঘল পোর্ট্রেটে বিশেষ করে আসে। ব্রিটিশ মিউজিয়মের এ-ডি-ডি ১৮৮০১নং পুঁথির মানসিংহের পোশাক আর কুমারস্বামী সংগৃহীত তেইশটি রাগিণীচিত্রের পুরুষদের পোষাক প্রায় হুবহু এক।

কিন্তু এই তেইশটি রাগমালা চিত্রে মুঘল প্রভাব নেই। এদের স্থান তারিখ সঠিক নির্ণয়ের কোন উপায় নেই, তবে এটা নিশ্চিত যে এগুলি বোধ হয় ১৬০০ সন নাগাদ তৈরি। পোশাক, অলঙ্কার আর অন্য উপকরণও এই তারিখের সঙ্গে খাপ খায় না। নিশ্চয় এমন জায়গা থেকে ছবিগুলি পাওয়া গেছে যেখানে মুঘল প্রভাব তেমন যেতে পারেনি। সম্প্রতি আরও কয়েকটি মিনিয়েচর পাওয়া গেছে যার সঙ্গে কুমারস্বামীর রাগমালা চিত্রের খুব মিল, বিশেষ করে অদম্য প্রাণশক্তির ব্যঞ্জনায়। কোমরবন্ধের ঝালর ও ঝুমকো আঁকার রীতিও একরকম। অনেকে বলেন কুমারস্বামীর রাগমালা চিত্রগুলি বুন্দেলখণ্ড অঞ্চল থেকে এসেছে। কারণ বুন্দেলখণ্ডের ডাটিয়া আর অর্চা তখন খুব দুর্গম রাজ্য ছিল আর সেখানের রসুনের কোয়াকাটা গম্বুজ আর হাতের অঞ্জলির ঢঙে খিলান করা জানালার সঙ্গে ছবিগুলির বাড়িঘরের খুব মিল দেখা যায়।

রাজপুত চিত্রে একটি আল্পনা ঘুরে ফিরে খুব আসে, সে হচ্ছে ছবির সমুখদিকে জল আর পদ্মের ছবি। রাজপুত ছবির গাছ কিন্তু জয়পুরের এক আধটি ছবি ছাড়া অন্যত্র দেখা যায় না। রাগিণী চিত্রগুলির পাড় গোলাপী, উপরনীচে হল্‌দের পটি, ছবির অংশ প্রায় গণ্ডী অতিক্রম করে পাড়ের মধ্যে ঢুকে যায় (ঠিক যেমন পূর্ববঙ্গের লক্ষ্মীর সরার ছবিতে ছবির অংশ প্রায়ই কানার পাড়ের মধ্যে চলে যায়)। ছবিতে দিক্‌রেখা উঁচু করে টানা, তার উপরে থাকে কালো আকাশের পাড়, তার উপর সীমায় থাকে ছেঁড়া খোঁড়া মেঘের পটি। তারই মধ্যে মাঝে মাঝে থাকে সোনালি লাল বিদ্যুতের সাপ আর ঝালরের মত পড়ন্ত বৃষ্টির রেখার সারি। বিকানীর প্রাসাদের প্রাচীরচিত্রেও এরকমটি দেখা যায়।

বাড়িঘরের স্থাপত্য প্রাচীন এবং একটু অদ্ভুত। রাজপুতানায় এখনও যে সব ঘরবাড়ি বা প্রাসাদ আছে তার সঙ্গে মেলে না। তবে স্থাপত্যরীতি খুব সরল, ভিতরের রঙ হয় লাল নয় সবুজ, দেয়ালে কোন আল্পনা নেই।

ছবিগুলি বর্ণাঢ্যতায় অদ্ভুত জমকালো। কালোর ছিটের খেলাও অসামান্য, বিশেষ করে মাথার বিনুনী বা কোমরবন্ধের ঝালরে ও ঝুমকোয়। অন্যপক্ষে সোনারূপোর ব্যবহার খুব কম। জম্মুর চিত্রকলার প্রথমযুগের ছবিগুলিতে এই বৈশিষ্ট্যগুলি খুবই বর্তমান, ফলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে মুঘল সাম্রাজ্য কায়েম হবার আগে পর্যন্ত রাজপুতানা আর জম্মুর মধ্যে চিত্ররীতির খুব আদান-প্রদান ছিল।

বিকানীর প্রাসাদের প্রাচীরচিত্রের উল্লেখ আগেই করেছি। কিন্তু এগুলি সবই সতেরো শতকের। ইতিমধ্যে রাজপুত চিত্র ও মুঘল চিত্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, রাজপুত শিল্পী মুঘল দরবারে সসম্মানে ভর্তি হন, মুঘল দরবারে সম্মানিত রাজপুত রাজারাজড়ারা নিজের রাজ্যে চিত্রশিল্পের উন্নতির জন্য চেষ্টিত হন, ফলে উভয়পক্ষেই যথেষ্ট আদান-প্রদান চলে।

বিকানীর ও অম্বরের চিত্ররীতিতে মুঘল প্রভাব যে বেশ তাড়াতাড়ি আসে তার প্রমাণ আছে। ১৬৪০ সনে ইংল্যন্ডের আর্চবিশপ লড বডলিয়ান গ্রন্থাগারে রাগিণীচিত্রমালার একটি অ্যালবাম উপহার দেন। আর্চবিশপ থিলিয়ম লড তখন ছিলেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর। এই অ্যালবামটির সঙ্গে তিনি আরও আশিটি পুঁথি দেন। লরেন্স বিনিয়ন অনুমান করেন স্যর টমাস রো যখন মুঘল দরবারে ১৬১৫-১৯ সনে দৌত্যকার্য শেষ করে ইংলণ্ডে ফেরেন তখন অ্যালবামটি সঙ্গে নিয়ে যান। যতই দেরি হোক ১৬৩৯ সনের পর নিশ্চয়ই অ্যালবামটি ইংলণ্ডে যায়নি। অ্যালবামটির মধ্যে যে ছবি দুটি সবচেয়ে হালের, তার একটি হচ্ছে ১৬১০-১১ সন নাগাদ আঁকা একটি হস্তলিপির নমুনা, জাহাঙ্গীর আর তাঁর ছেলে পরভিজের পোর্ট্রেট। পরভিজ জন্মান ১৫৯০ সনে। মারা যান ১৬২৬ সনে। ছবিতে তাঁর বয়স কুড়ির কম নয়। সুতরাং অ্যালবামটি ১৬১০-এর কিছু পরে তৈরি হয়েছিল বলে ধরা যায়। তাছাড়া অ্যালবামটির রাগমালাচিত্রগুলিতে মুঘল প্রভাব স্পষ্ট। বর্ণবিন্যাসরীতিতে আকবরের চেয়ে জাহাঙ্গীরের সময়কার প্রভাবই বেশি, গতিও অনেক মন্থর। উড়ন্ত পাখির সার ছকে ফেলে আঁকা, পশ্চাদ্‌পটের সাইপ্রেস গাছে আর বাড়িঘরের স্থাপত্যে সতেরো শতকের প্রথম যুগের ছাপ সুস্পষ্ট। ইংলণ্ডের সারে'র অধিবাসী ডব্লিউ বি ম্যানলি বলে এক ভদ্রলোকের কাছে চৌত্রিশটি রাগমালা চিত্র আছে। চিত্রগুলির আশ্চর্য উজ্জ্বল রঙ আর সরল ছন্দোময় কম্পোজিশন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ছবিগুলি ১৯৪৭-৪৮ সনে লণ্ডনের

রয়াল অ্যাকাডেমিতে যে প্রদর্শনী হয় তাতে দেখানো হয়। বোস্টনের রসিকপ্রিয়া মিনিয়েচরগুলিতে মুঘল প্রভাব যত দেখা যায় এগুলিতে তার চেয়ে কম। ছবিগুলি বোধ হয় ১৬১০-২০ সনে আঁকা। আগেই বলেছি ষোল শতকের চৌরপঞ্চাশিকা ও বারমাস্যা চিত্রগুলিতে মুঘল প্রভাব একেবারেই নেই। এই পুঁথিগুলির ছবি চোখের সামনে থাকলে পরবর্তী যুগে রাজস্থানী ছবিতে কতখানি মুঘল প্রভাব এসেছিল বেশ বোঝা যায়। কিন্তু তখন মুঘল দরবার আর রাজপুত রাজ্যগুলির মধ্যে এত আদান-প্রদান ছিল, এবং প্রত্যেকেরই নিজস্ব বৈচিত্র্য, প্রাণ ও ঐশ্বর্য এত বেশি ছিল যে উভয়ের মধ্যে নিশ্চয় অনেক রকমের মিশ্রিত রীতির উদ্ভব হয়। তবে মুঘলরীতির অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হতে এবং তার প্রভাব চতুর্দিকে ছড়িয়ে যেতে আরও একশ' বছর লাগে। তবে বিস্ময়ের কথা এই যে সুদূর উদয়পুরেও ১৬১০ সনের মধ্যেই মুঘল রীতির প্রতিপত্তি বেশ দেখা যায়। রাণা সংগ্রাম ও তাঁর ছেলেদের একটি পোর্ট্রেট আছে; এটি ১৬১০ সনের খুব বেশি পরে আঁকা নয়। এর মধ্যে চরিত্র চিত্রণের যে নৈপুণ্য দেখা যায় তা নেহাৎই মুঘল দরবারে শিক্ষানবিশীর ফল। কালো জমির উপরে সিলুয়েট বা একপাশ করে দেখা সাদা পোশাক পরা প্রতিকৃতি ভারতীয় ঐতিহ্যরীতিসিদ্ধ যদি হয়ও তবুও তা নিতান্ত জাহাঙ্গীরের দরবার থেকে ধার করা।

বুন্দেলখণ্ডের বুন্দেলা রীতি আঠারো শতকে কিরকম পরিণতি লাভ করে তার আলোচনা একটু পরেই করব। কিন্তু রাজপুত রীতির প্রথম যুগের নিদর্শনও যে বুন্দেলা রীতিতে পাওয়া যায় তার উল্লেখ প্রথমেই করেছি। লাহোরের এরিক ডিকিন্‌সন্ বলে এক ভদ্রলোকের সংগ্রহে শিল্পী মাধবদাসের হাতের কাজ পাওয়া গেছে। এঁর দেশ ছিল বুন্দেলখণ্ডের রাজগড় ও ভূপালের মধ্যবর্তী উমতওয়ারা রাজ্যের রাজধানী নরসিংগড়ে। ডিকিন্‌সন্ সংগ্রহের ছবিগুলির অধিকাংশই ১৬৩৩ থেকে ১৬৮০ সনের মধ্যে আঁকা। ডঃ গোয়েট্‌স্ মনে করেন যে ষোল শতকের প্রথমার্ধে রাজা বীরসিংহ দেওর অধীনে বুন্দেলখণ্ড শিল্পকলার বোধ হয় বড় কেন্দ্র ছিল। বুন্দেলা ছবির তুলনায় সমসাময়িক উদয়পুর বা বিকানীরের চিত্ররীতিতে মুঘল প্রভাব অনেক বেশি। পরে বুন্দেলারীতি বড় অলঙ্কারবহুল হয়ে পড়ে, ফলে তার শক্তিমত্তা যায় কমে, কিন্তু তবুও রীতিটি থেকে যায়।

বীরসিংহ দেও ছিলেন স্বনামধন্য পুরুষ। জাহাঙ্গীর আবুল ফজলের উপর ভয়ানক রেগে যান এবং আকবরের জীবদ্দশাতেই আবুল ফজলের খুনের ব্যবস্থা করেন। জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মজীবনীতে লিখে গেছেন কেমন করে তিনি আবুল ফজলকে খুন করবার জন্যে বীরসিংহ দেওকে নিযুক্ত করেন, কেমন করে "ঈশ্বরের কৃপায় শেখ আবুল ফজল যখন বীরসিংহ দেওর এলাকার মধ্যে দিয়ে দাক্ষিণাত্য থেকে ফিরছিলেন তখন রাজা বীরসিংহ তাঁর পথরোধ করে তাঁকে আক্রমণ করে, তাঁর লোকজনকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে, হঠাৎ তাঁকে হত্যা করেন এবং আবুল ফজলের কাটা মুণ্ড এলাহাবাদ থেকে জাহাঙ্গীরকে পাঠিয়ে দেন"। এইভাবে ১৬০২ সনের ১২ই আগস্ট আবুল ফজল প্রাণ হারান ও দস্যুরাজ বীরসিংহ দেও বাদশা জাহাঙ্গীরের অনুগ্রহে ডাটিয়া ও অর্চায় বিরাট রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে বড় বড় নগর প্রাসাদ পত্তন করেন। বীরসিংহ দেও যখন ১৬২৭ সনে মারা গেলেন তখন ডাটিয়া নগর মধ্যভারতে একটি বিখ্যাত শহর। বীরসিংহ দেওর সময়ে লেখা হাফিজের দেওয়ানের একটি নকল প্রাচ্যদেশের একটি অমূল্য পুঁথি বললে বাড়িয়ে বলা হয় না। এই বংশেই ১৭৬২ থেকে ১৮০১ পর্যন্ত রাও শত্রুজিৎ বলে রাজা রাজত্ব করেন। তাঁর কতকগুলি বিখ্যাত পোর্ট্রেট আছে, তার দুটি নানালাল মেহতা তাঁর বইতে ছেপেছেন।

আগেই বলেছি আঠারো শতকে যে জয়পুরী কলমের কথা আমরা শুনি তাতে আদি বা প্রাচীন রাজপুত রীতি প্রায় লোপ পেয়েছিল বললেই হয়। আঠারো শতকের জয়পুরী চিত্র অধিকাংশই পোর্ট্রেট এবং তাতে রঙের গাঢ়-ফিকে করে মড়লিং-এর গুণ এল। অবশ্য জয়পুরী পোর্ট্রেট বড় বেশি রীতি বা কানুনদুরস্ত, একপাশ থেকে দেখা ছবি আড়ষ্ট করে আঁকা, রঙ এত পান্‌সে যে সেগুলি ভীরুতাদুষ্ট বলা চলে। অধিকাংশ পোর্ট্রেটই রেখায় আঁকা, যেন শেষ করা হয়নি। রেখা অবশ্যই খুব উল্লেখযোগ্য, যেমন প্রখর, তেমনি পরিষ্কার, চুলের মত সরু, কিন্তু তারই মধ্যে প্রাণের আবেগ ও স্পন্দনে পূর্ণ। নক্‌শা এত সুকুমার ও কোমল যে মনে হয় প্রসিদ্ধ ইওরোপীয় 'সিলভার-পয়েন্ট' টেকনিকে বুঝি বা সেগুলি আঁকা হত, তারপরে জমিটা মোটা সাদা রঙে তার করা হত। এইরকম অস্বচ্ছ জমির মধ্যে দিয়ে নীচের রেখা অল্প ফুটে উঠত। তখন সেই প্রথম রেখার উপর আবার খুব সূক্ষ্ম তুলি দিয়ে অতি নরম সুকুমার ছাইরঙের রেখা দিয়ে পুনরায় নক্‌শাটি আঁকা হত। অন্য যদি কোন রঙ প্রয়োজন মনে হত তবে সামান্য অল্প কয়েকটি রঙের ওয়াশ দিয়ে ছবিটি শেষ করা হত। শিল্পী রঙের বদলে ছবিতে আনতে চাইতেন হাতির দাঁতের রঙের জমির উপর ছাইরঙের নক্‌শা, ইংরেজিতে যাকে বলে গ্রিজেইল। এ টেকনিক

অবশ্য কাংড়ার পোর্ট্রেট টেকনিক থেকে আলাদা।

কুমারস্বামী যদিও প্রথমে রাজপুত ও মুঘল ছবি আকাশ পাতাল তফাৎ ঘোষণা করেন তবুও তাঁর 'রাজপুত পেন্টিং' বইয়ে রাজস্থানী রীতির আলোচনায় তিনি স্বীকার করেন যে রাজপুত চিত্রে মুঘল প্রভাব যথেষ্ট। জয়পুর কলমের পোর্ট্রেট শিল্পে তিনি মুঘল প্রভাবের কথা স্পষ্টভাবে বলেন। জয়পুরের পোর্ট্রেটে যদিও মুঘল ছবির মত গভীরভাবে চরিত্র ফুটে ওঠে না তবুও পোশাক ও অলঙ্কার লক্ষ্য করার মত। কুমারস্বামীর মতে কেশব দাসের রসিকপ্রিয়া পুঁথির কৃষ্ণের নৃত্য ছবিটির বিষয়বস্তু যদিও হিন্দু তবু মেঘ আঁকার রীতি ও নক্‌শার অন্যান্য খুঁটিনাটিতে মুঘল প্রভাব সুস্পষ্ট। স্ত্রীলোকদের স্নান বিষয়ক চিত্রেও, তাঁর মতে, মুঘল প্রভাব যথেষ্ট। কুমারস্বামীর মতে সতেরো শতকের শেষদিকে ও আঠারো উনিশ শতকে রাজপুত ও মুঘলরীতি অনেক ক্ষেত্রেই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে, কোন স্থানে রাজপুত ভাবের সঙ্গে মিলেছে মুঘলরীতি, কোনও স্থানে আবার মুঘল মেজাজের সঙ্গে রাজপুতরীতি। কিন্তু এখানে ওখানে শুদ্ধ রাজপুত নীতিতে যথেষ্ট ছবি আঁকা হত। হীরানন্দ শাস্ত্রী ও খাণ্ডালাবালা কিছু বিজ্ঞপ্তিপত্র বা নিমন্ত্রণ পত্রের উল্লেখ করেন। এগুলি আবু পাহাড়ের কাছে সিরোহীর জৈনদের মধ্যে আঠারো শতকের প্রথমভাগে চলিত ছিল: তাতে পশ্চিমভারতীয় চিত্ররীতি খুব স্পষ্ট। পরে যে সব বিজ্ঞপ্তিপত্র হয় তাতে কিন্তু চিত্রগুণ স্তিমিত হয়ে যায়। আঠারো শতকের শেষদিকে উত্তর রাজপুতানায় আবার কিছু কিছু ভাল ছবি আঁকা হয়। কিন্তু আঠারো আর উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত পাঞ্জাবের পার্বত্য রাজ্যগুলিতে রাজপুত চিত্র উৎকর্ষের যে সীমায় ওঠে তার কাছে সমসাময়িক রাজপুতানী চিত্রের মূল্য অনেক কম।

পিছোয়াই চিত্র

দেয়ালে বা ছাত থেকে ঝুলিয়ে টাঙ্গানো কাপড়ে আঁকা ছবি

ভারতে যত কিছুই সম্প্রদায়, ধর্মীয় রীতি বা ঐতিহ্য থাক— হিন্দু, ইসলাম, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ যাই থাক (অবশ্য অনেক বৌদ্ধ ভাস্কর্য বা চিত্র নিশ্চয় কালের প্রকোপে ধ্বংস বা লুপ্ত হয়েছে), চিত্রিত ঐশ্বর্যে, বৈষ্ণবধর্মকে কোন কিছুই অতিক্রম করতে পারে না। ভারতীয় চিত্রের ইতিহাসে মধ্যযুগ থেকে ভাগবত পুরাণ বা কৃষ্ণলীলা বিষয়ে যত ছবি যত দীর্ঘকাল ধরে ভারতের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে আঁকা হয়েছে সে যে-কোন ধর্মীয় শাসনেই হোক—সংখ্যায়, বৈচিত্র্যে, ভাবে, নান্দনিক ও আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে পার্থিব, প্রাকৃত সৌন্দর্যের, মানবমানবীর সম্বন্ধের দ্যোতনায় এত মহিমাময় সৃষ্টি দ্বিতীয় কোন বিষয়ে হয়নি। এই ঐতিহ্যের এক অত্যুজ্জ্বল অঙ্গ হচ্ছে পিছোয়াই চিত্ররাজি। পিছোয়াই চিত্ররাজির আবার মধ্যমণি হচ্ছে বল্লভ সম্প্রদায়ের বংশ, যার বংশলতিকা বল্লভাচার্য (১৪৭৯-১৫৩১) পর্যন্ত একাদিক্রমে পাওয়া যায়। বল্লভাচার্যের আদি নিবাস বৃন্দাবন। বল্লভাচার্যের বংশধর দামোদরজী (বড়ে দাউজী, ১৬৫৫-১৭০৪) গিরি গোবর্ধন থেকে শ্রীনাথজীর মূর্তি বহন করে ১৬৭২ সালে নাথদ্বারায় প্রতিষ্ঠা করেন। দামোদরজীর বৃদ্ধ প্রপিতামহ গিরিধরজী (১৫৪১-১৬২১) সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজপুত পত্নী অম্বররাজের কন্যা মানমতীর সময়ে শ্রীনাথজীর টিকায়েত ছিলেন। মানমতী শ্রীনাথজীর উপাসিকা হিসাবে সর্ববিদিত হন। মানমতীর উপাধি হয় জগৎগোঁসাই। জাহাঙ্গীর ও মানমতীর পুত্র শাজাহান পরে সম্রাট হন। জাহাঙ্গীর ও শাজাহানের রাজত্বে মথুরা ও তার চতুর্দিকের বৈষ্ণব মন্দিরগুলির কোন ক্ষতি হয়নি। কিন্তু ঔরঙ্গজেব সিংহাসনে আসার পর মুঘল সেনা মথুরার কেশবরায়জীর মন্দির যখন ধ্বংস ও লুঠ করে, এবং সেই সঙ্গে উত্তর ভারতের আরো অনেক মন্দির ধ্বংস হয়, তখন বড়ে দাউজী, যিনি বল্লভাচার্যের বংশধর হিসাবে গিরিগোবর্ধনে প্রতিষ্ঠিত শ্রীনাথজীর মন্দিরের টিকায়েত পদে অধিষ্ঠিত হন, তিনি সন্ত্রস্ত হয়ে শ্রীনাথজীর মূর্তি লুকিয়ে নিয়ে গরুর গাড়ি করে রাজস্থান মুখে যাত্রা করেন। বহু বিপদ কাটিয়ে তিনি সিংহদে মূর্তি নিয়ে উপস্থিত হন। সিংহদ বর্তমান নাথদ্বারা। তখন বড়ে দাউজীর বয়স মাত্র পনেরো। তার কিছু পরেই সম্রাটের ফৌজ গিরিগোবর্ধনের শ্রীনাথজীর শূন্য মন্দির ধ্বংস করে।

নাথদ্বারায় সারা বছর ধরেই নানা উৎসব চলে, সমস্তই শ্রীনাথজী ও কৃষ্ণকে ঘিরে। বল্লভাচার্য সম্প্রদায়ের পূজার অর্ঘ্য হিসাবে চলে এসেছে পিছোয়াই-চিত্রের ঐতিহ্য। পিছোয়াই সম্পূর্ণভাবে চিত্রিত ছবি। বড় আকারের মোটা চাদরের মত কাপড়ের উপর ছবি আঁকা। ইওরোপে যাকে ট্যাপেস্ট্রি বলে সেগুলি তাঁতে বোনা ছবি, অনেক

ট্যাপেস্ট্রি রেশমের সুতো ত বটেই, সোনা-রূপোর সুতোতেও বোনা। পিছোয়াইকে অনায়াসে ভারতীয় ট্যাপেস্ট্রি বলা যায়। তফাৎ শুধু বোনা ছবির বদলে পিছোয়াইয়ের ছবিগুলি বহুবর্ণে সম্পূর্ণভাবে চিত্রিত। সাইজে সেগুলি প্রমাণ চাদরের মত লম্বা ও চওড়া হয়। নাথদ্বারার পিছোয়াই সবথেকে বিখ্যাত ও আদৃত হলেও, বর্তমানকালে পিছোয়াই আরো অন্যান্য স্থানে চিত্রিত হয়। তবে ঐতিহ্যমত সবকিছু শাস্ত্রীয় ও নান্দনিক নির্দেশ মেনে তৈরি পিছোয়াই নাথদ্বারাতেই একমাত্র হয়। সম্প্রতি অমিত আম্বালাল 'কৃষ্ণ অ্যাজ শ্রীনাথজী' বলে বইটিতে নাথদ্বারা ও পিছোয়াই বিষয়ে বিশদ একটি বই লিখেছেন। যা কিছু ঐতিহাসিক পিছোয়াই পাওয়া গেছে তার সবথেকে প্রাচীন নমুনা হচ্ছে আঠারো শতকের মাঝামাঝির।

শ্রীনাথজী পিছোয়াইগুলির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বছরের মাসে মাসে কৃষ্ণজীকে উপলক্ষ্য করে যে সব উৎসব হয়, সেই উৎসব মত বিভিন্ন বিষয়ের পিছোয়াই প্রতি মাসে মন্দিরে ও অন্যান্য স্থানে টাঙিয়ে প্রদর্শিত হয়। ঋতু অনুযায়ী বিষয় বদলায়। যথা

বৈশাখ মাস	—নন্দমহোৎসব, বালকৃষ্ণ, ননীচোর কৃষ্ণ, দেবগণের কৃষ্ণ পূজা ও আরাধনা।
জ্যৈষ্ঠ মাস	—পদ্ম সরোবর। বিবাহ। জলক্রীড়া। নিকুঞ্জে কৃষ্ণলীলা, দানলীলা।
আষাঢ় মাস	—উষ্ণ কলিক লীলা। রাধাকৃষ্ণের বিবাহ।
শ্রাবণ মাস	—সংকেতবনে কৃষ্ণের বিবাহ। ব্রহ্মা পৌরোহিত্য করছেন। কৃষ্ণ বলরাম গোপে গরু চরাচ্ছেন। গোপিনীদের ও রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের ঝুলন লীলা। রাধার অভিসার। ব্রজবাসীদের গোবধনপর্বতে যাত্রা। ময়ূর-ময়ূরীর নাচ।
ভাদ্র মাস	—গোস্বামীদের গোপিনীভাব। যশোদা ও কৃষ্ণ। কৃষ্ণের শৈশব। দানলীলা।
আশ্বিন মাস	—দানলীলা। সংকেতবনে বিবাহ। কৃষ্ণের বাল্যলীলা। রামচরিত পিছোয়াই। রাস পিছোয়াই। বেণুনাদ রাসনৃত্য।
কার্তিক মাস	—কৃষ্ণের গিরিগোবর্ধন উত্তোলন। যশোদা ও ব্রজবাসী গিরিগোবর্ধনের নিচে বর্ষার বৃষ্টি থেকে আশ্রয় নিচ্ছেন।
মার্গশীর্ষ (মাঘ মাস)	—বস্ত্রহরণ উৎসব।
ফাল্গুন মাস	—হোলি উৎসব।
চৈত্র মাস	—কৃষ্ণ বলরাম হস্তীপৃষ্ঠে চড়ে ব্রজবাসীদের সঙ্গে হোলি খেলছেন। নন্দরায় ও যশোদা বালকৃষ্ণের দোলা দোলাচ্ছেন। ননীচুরি লীলা। রাসলীলা।

রাজস্থানী প্রাচীর চিত্র

আনন্দ কুমারস্বামী মুঘল ও রাজপুত মিনিয়েচর বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন রাজপুত চিত্র হচ্ছে অভিজাত লোকশিল্প। এই সংজ্ঞাটি খুবই যথাযথ, এবং এর পিছনে ঐতিহাসিক ও নান্দনিক কারণও যথেষ্ট আছে। ইতিপূর্বে আমি মন্তব্য করেছি যে প্রাচীন বৌদ্ধ এবং অন্যান্য মার্গ গুহ্য বা প্রাচীরচিত্ররীতির যদি কিছু শৈলীগত ও জাতিগত উত্তরাধিকার মধ্যযুগে ও আধুনিক যুগের প্রারম্ভে থাকে তাহলে সে উত্তরাধিকার জৈন বা পাল পুঁথিচিত্রের সূত্রে যত না হয়েছে তার থেকে বেশি এবং সোজাসুজি হয়েছে, সারা ভারতময় মধ্যযুগীয় প্রাচীর চিত্রের বংশতালিকায়। এবং তার সার্বভৌম—গরীবের কুটির থেকে মহাপরাক্রম রাজাদের প্রাসাদ পর্যন্ত প্রকট দেখি রাজস্থানের এবং পশ্চিম ভারতের প্রাচীর চিত্রে। দক্ষিণ ভারতের প্রাচীর চিত্রে যে মার্গরীতির ধারা দেখি—প্রাচীর চিত্রের জমি তৈরি থেকে শুরু করে রেখাঙ্কন, বর্তনাব্যঞ্জনা, বর্ণকর্ম সারার পর দ্বিককর্ম দিয়ে শেষ করা—তাদের প্রতিটি ধাপের প্রয়োগ আমরা রাজপুত প্রাচীর চিত্রে পাই। মার্গরীতির থেকে লোকরীতির প্রাচীর চিত্রে যদি ব্যতিক্রম হয়েছে তা বর্তনাব্যঞ্জনার ঐতিহ্য হ্রাসে। মার্গরীতিতে যেমন প্রতিটি দেহ— সে মানুষেরই হোক, কীটপতঙ্গ পাখি বা জীবজন্তুরই হোক— প্রতিটির প্রাকৃতিক আকার— সে মেঘ, গাছপালা, পত্র পুষ্পই হোক— সবগুলিই সুডৌল, বর্ণালিবিভঙ্গে, ছায়াতপে, রঙের ও রেখার ও কড়া হাল্কা রঙের তারতম্যে, তিনমাত্রার পুরো আভাস আনে, রাজপুত প্রাচীর চিত্রে সেই সুডৌল ভাবের অভাব। খুব কম ক্ষেত্রেই তিনমাত্রার আভাস

আছে। প্রায় সবচিত্রই তুলির একটি রঙের সাপ্টা টানে পাতলাভাবে এক একটি অংশের জমি লেপা, তার মধ্যে বর্ণক্রম বা ছায়াতপ নেই, মনে হয় সমস্ত আকারটি হয় একটি না হয় কয়েকটি রঙের পাশাপাশি রাখা সমান পাতলা রঙের জমি দিয়ে ভর্তি ; যা কিছু সুডৌলভাবে আসে তা শুধু ছোট-বড় আকারের পরিসীমা রেখার কল্যাণে। ঠিক যেন ভিন্ন ভিন্ন আকারের ভিন্ন ভিন্ন রঙের ব্যাপারটা মোজেইক ক্ষেত্র দিয়ে পুরো দেহটি, বা প্রাকৃতিক বস্তুটি তৈরি। এমন কি প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্রে জীবজন্তু, মানুষের দেহে যে রঙের বর্ণালিবিভঙ্গে, ছায়াতপের ইঙ্গিতে অপূর্ব ঘনত্ব, ওজন, ভল্যুম, ম্যাস আসে রাজস্থান প্রাচীর চিত্রে তাও নেই। তার পরিবর্তে আছে প্রতিটি জীবের আকারে ও রেখায় গতিবেগ প্রকাশ করার অপূর্ব প্রতিভা। চ্যাপটা, দ্বিমাত্রিক ওজনহীন আকারে এতখানি গতি, তেজ, প্রাণবন্ততা, অন্তরের অভিব্যক্তি ও ভাব প্রকাশ, শুধু চোখের চাউনিতে বা দেহের কুঞ্চিত রেখায় নয়, দেহের, এমন কি প্রাকৃতিক গাছ, ডাল, লতা-পাতার সংস্থানে গতি ও বেগের দ্যোতনা এত মর্মনিবেদনে সার্থক যে অবাক হতে হয়।

আরেকটি লক্ষণ দেখে অবাক হতে হয়। যাকে বলে বর্ণক্রমের বিস্তার অর্থাৎ আলোর স্পেক্ট্রামের সাতবর্ণের মধ্যে অনন্তক্রম তার অনেকগুলিই প্রাচীর চিত্রে পাই, শুধুমাত্র যাকে বলে প্রাথমিক ও গৌণমাত্রিক কয়েকটি রঙ তা নয়। কিন্তু যে কোন রঙের যে কোন শেড বা বর্ণক্রম হোক, কোন রেখা দিয়ে ঘেরা ক্ষেত্রে একটিমাত্র প্রাথমিক বা গৌণ মাত্রিক বা সংকর রঙই লাগানো হয়েছে। এক রঙের উপর কখনও অন্য রঙ দেওয়া হয়নি।

কিন্তু যে গুণটির সর্বত্র সাবলীল প্রকাশ দেখে অবাক হতে হয়, সেটি হচ্ছে যে কোন কুটির, বাড়ি বা প্রাসাদের যে অংশটিতে যে মিউরাল আছে, প্রতিক্ষেত্রে স্থাপত্যের সেই অংশের মধ্যে চিত্রিত মিউরালটির অপূর্ব একাত্মতা। অবাক হতে হয় মিউরালটির কথা ভেবে স্থপতি ঐ জমিটি ঐভাবে তৈরি করেছিলেন, না ঐ জমিটি কি করে আশ্চর্য যথাযথভাবে ছবি দিয়ে ভরানো যায়, সেই চিন্তায় মগ্ন হয়ে চিত্রকর প্রতিটি চিত্রবিষয়ের উদ্ভাবনা করেছেন। স্বভাবতই দ্বিতীয়োক্ত ক্রমটিই ঠিক। কিন্তু ইংরেজিতে যাকে বলে হাত ও দস্তানার মিল, এ যে ঠিক তাই। আরো আশ্চর্য হতে হয় প্রাচীর চিত্রশিল্পীর আলো ছায়া সম্বন্ধে অমোঘ বিচারশক্তি দেখে। দুই দেয়ালের কোণে, বা জানালা ও দেয়ালের মধ্যের জমি, অথবা ঝিলিমিলি বা পাথরের জানালায় জালিকাটা পাথরের কাজের বিদীর্ণ ফাটাফাটা আলোয়, যে রঙ যে আকার যে বিষয় যথাযথভাবে মানাবে, অনিবার্যভাবে ঠিক সেই রঙের ক্রম, আকার, গতির উপযুক্ত রেখা ছবিতে প্রতিফলিত। আরও আশ্চর্য হতে হয় অসম্ভব গতিপূর্ণ দৃশ্যে, যেমন শিকারের দৃশ্যে যেখানে শিকারী, তার ঘোড়া, তার শিকারী কুকুর বা চিতা, এবং যা শিকার করা হচ্ছে যেমন বন্য বরাহ, হরিণ, বাঘ বা অন্য কোন বন্যজন্তু, সেইসব দৃশ্যে চিত্রে কনেক্টিং-লিংক কম্পোজিশনের বিস্তার, যেন সীমাহীন প্রান্তর, ঢেউখেলানো পাহাড়, অথবা বিস্তীর্ণ বন। যেখানে আবার ছোট ছোট চতুষ্কোণ সীমিত প্রাচীর ক্ষেত্র— যেমন দুটি জানালার মধ্যবর্তী স্থান, অথবা ছাতের দিকে কার্নিশে সমান্তরাল জমি যেখানে জ্যামিতিক একের পর এক বহুবর্ণ সমান্তরাল রেখার মধ্যে চিত্রিত জ্যামিতিক ছক বা অলঙ্কার, যার কল্যাণে জমির আয়তন আসল আয়তনের থেকে অনেক বেশি মনে হয়।

সারা রাজস্থানময়, আপনি যেখানেই থান, প্রাসাদ, মধ্যবিত্ত গৃহে, গরীবের কুটিরে এই ধরনের প্রাচীর চিত্রের ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য দেখে বিস্ময়ে হতবাক হবেন। দিল্লীতে তথ্য ও বেতার দপ্তরে সচিব হিসাবে কাজ করার সময়ে ১৯৬৭ সালে আমি বিখ্যাত শিল্পী এম এফ হুসেনকে রাজস্থান সম্বন্ধে একটি ছোট তথ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করার জন্য অনুরোধ করি। তাঁকে এই কাজে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হয় উনি একটি ছোট তথ্যচিত্র তৈরি করেন, তার নাম রাখা হয় থ্রু এ পেন্টার্স আই (চিত্রকরের চোখে)। ছবিটি সেই বছরের বার্লিন উৎসবে 'গোল্ডেন্ বেয়ার' সর্বোচ্চ স্বর্ণপদক পুরস্কার পায়। ছবিটির মুখ্য বিষয় ছিল রাজস্থানের প্রাকৃতিক বিস্তারের মধ্যে তাদের অধিবাসীরা এবং তাদের চিত্রিত ঘরবাড়ি। পশ্চিম ইওরোপের দর্শক সাধারণ কুটিরেও চিত্রকলার এই ধরনের ঐশ্বর্য দেখে নিশ্চয় হতবাক হয়ে গেছিলেন।

রাজস্থানের প্রাচীর চিত্র নিয়ে অনেক ভাল ভাল একক রচনা ও বই আছে, তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা বইয়ের শেষে গ্রন্থপঞ্জীতে দিয়েছি। তাদের মধ্যে যে বইটি আমাকে সবথেকে বেশি আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করেছে সেটি ফ্রান্সিস Wacziarg ও অমরনাথের লেখা 'রাজস্থান : দি পেন্টেড ওয়াল্‌স্ অভ শেখাবতী'। বইটি দিল্লীর 'বিকাশ পাবলিশিং' থেকে ১৯৮২-তে প্রকাশিত হয়। পাঠককে আমি এই বইটি দেখতে অনুরোধ করি। শেখাবতী অঞ্চলটির পূবে হচ্ছে দিল্লী-জয়পুর রাস্তায় রেওয়াড়ি পেরিয়ে নারনৌলের সীমা : পশ্চিম সীমা হচ্ছে চুরু শহর ;

উত্তর সীমা লোহারু ; দক্ষিণ সীমা রামগড়। এই অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে ছোট কোটলি নদী প্রবাহিত। স্থাপত্যের মহিমা, ব্যাপ্তি, বিস্তার, বৈচিত্র, পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে প্রতি নগর ও গ্রামের অবস্থান, উপরন্তু প্রাচীর চিত্রের অফুরন্ত বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্য দেখলে অবাক হতে হয়। সারা অঞ্চলটি মরুভূমির দেশ বললেই হয়, সেইজন্যই সম্ভবত মানুষের সৃষ্টিতে এসেছে যত প্রশান্তি ও রঙীন জগৎ। এ সব মন্তব্য শুধু একমাত্র শেখাবতী সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়, সারা রাজস্থান সম্বন্ধেই খাটে।



পরিশিষ্ট-১

ভারতীয় সঙ্গীতে বিভিন্ন রাগমালারীতির চিত্রবিন্যাস

(সপ্তম অধ্যায়ের রাজপুত চিত্রের বিষয়বৈচিত্র্য দ্রষ্টব্য)

১। সাধারণ চলিত বিন্যাস

রাগ	রাগিণী				
	১	২	৩	৪	৫
ভৈরব	ভৈরবী	নট	মালশ্রী	পটমঞ্জরী	ললিতা
মালকোষ	গৌরী	খাম্বাবতী	মালবী	রামকেলী	গুণকেলী
হিন্দোলা	বিলাওলী	তোড়ি	দেশাখ্য	দেবগান্ধার	মধুমাধবী
দীপক	ধনশ্রী	বসন্ত	কানাড়া	বৈরাদী	পূর্বী(দেশ্বরতী)
মেঘ	গুজরী	গৌড়মল্লার	ককুভ	বিভাস	বাঙ্গালী
শ্রী	পঞ্চম	কামোদ	সেতমল্লার	আশাবরী	কেদারা

২। হনুমান বিন্যাস

ভৈরব	মধ্যমাদি	ভৈরবী	বাঙ্গালী	বরাড়ি	সন্ধাবী
মালকোষ	তোড়ি	খাম্বাবতী	গৌরী	গুণকেলী	ককুভ
হিন্দোলা	বিলাওলী	রামকেলী	দেশাখ্য	পটমঞ্জরী	ললিতা
দীপক	কেদারা	কানাড়া	দেশ	কামোদ	নট
শ্রী	বসন্ত	মালবী	মালশ্রী	ধনশ্রী	আশাবরী
মেঘ	মালারি(কা) (বা মল্লার)	দেশকারী	ভূপালী	গুজরী	টংকা

৩। হনুমান বিন্যাসের বিকল্প

ভৈরব	মধুমাধবী	ভৈরবী	বাঙ্গালী	বরারি	বিভাস	
(২৭)	(২৬)	(২৫)	(২৪)	(২৩)	(২২)	
মালকোষ	বেহাগ	খাম্বাবতী	গৌরী	গুণকেলী	ককুভ	
(২০)	(১৯)	(২১)	(১৮)	(১৭)	(১৬)	
হিন্দোলা	বিলাওলী	রামকেলী	দেশাখ্য		ললিতা	
	(১৫)	(১৪)	(১৩)		(১২)	
দীপক	কেদারা	কানাড়া			নট	
(১১)	(১০)	(৯)			(৮)	
শ্রী	বসন্ত			ধানশ্রী		
(২৮)	(২৯)			(৩০)		
মেঘমল্লার	মালারি	দেশকারী	ভূপালী	গুজরী	দেবগান্ধার	কল্যাণ
(১)	(২)	(৫)	(৬)	(৭)	(৩)	(৪)

৪। দক্ষিণী বিন্যাস

রাগ	রাগিণী				
	১	২	৩	৪	৫
ভৈরব	দেবগান্ধার	গুণকেলী	রামকেলী	ভৈরবী	বিভাস
(৫)	(৩১)	(১২)	(১)	(৩৫)	(৩)

মালকোষ	তোড়ি	গুজ্জরী	ককুভ	ললিতা	পূরজ
(৩৬)	(২২)	(৪)	(২১)	(৮)	(৯)
হিন্দোলা	বসন্ত	বাঙ্গালী	নট	পূরজ	কেদার
(১১)	(৬)	(২৮)	(১৬)	(৭)	(১০)
মেঘ	গৌড়মল্লার	সারাঙ্গ	সৌরথ	মধুমাধবী	দেশাখ্য
(১৭)	(৩৩)	(১৫)	(২৪)	(৩২)	(১৯)
শ্রী	ধনশ্রী	পটমঞ্জরী	আশাবরী	গৌরী	শ্যামকল্যাণ
(২৩)	(২০)	(২)	(৩০)	(২৫)	
দীপক	খাম্বাবতী	গুগবাই	বিলাওলী	শঙ্করবরণ	কল্যাণ
(২৯)	(৩৪)	(২৭)	(১৩)	(১৪)	

৫। বিশেষ বিন্যাস

ভৈরব	ভৈরবী	রামকেলী	ধনশ্রী	মালশ্রী	আশাবরী	সিন্ধুরা
মেঘমল্লার	বিলাওলী	পূরবী	কানাড়া	মাধমত	গৌড়	কেদার
শ্রী	দেবগান্ধার	ভারতী	কুমারী	গৌরী	বিলাওল	বৈরাগিণী
বসন্ত	ললিতা	তোড়ি	পটমঞ্জরী	শ্রীপঞ্চমী	গুজ্জরী	বিভাস
হিন্দোলা	মালব	দীপক	দেশকর	পাহ্‌রা	বরারি	—
কর্ণাট	নট	ভূপালী	রামকেলী	কামোদ	কর	কল্যাণ

৬। বিশেষ বিন্যাস

(ভৈরব)	—	দেবগান্ধার		ললিত		
মালকোষ	—	দেশাখ্য	সাদি	তোড়ি		
হিন্দোলা	—	সরঙ্গ		নট		
দীপক	মারু	কল্লনেন	খাম্বাবতী	কানাড়া		
শ্রী	গুণকেলী		কামোদ	আদানা	ভূপালী	
(মেঘ)			ককুভ	গুণকরী	গৌড়	বাঙ্গাল

পরিশিষ্ট-২

রিচার্ড জনসন ও ফ্রান্সিস বুকানন হ্যামিল্‌টন

(ষষ্ঠ অধ্যায় মুঘল চিত্রের দ্বিতীয় যুগ (১৭০৭-১৮০৬) দ্রষ্টব্য)

মুঘল, প্রাদেশিক মুঘল, দক্ষিণী ও রাজপুত চিত্ররীতির সংগ্রহে ও সংরক্ষণে রিচার্ড জনসন ও বুকানন হ্যামিল্টনের অবদান অতুলনীয়। এঁদের দু'জনের বিচিত্রমুখী জীবন, সংগ্রহ, উৎসাহ, ঔৎসুক্য, যে দেশে কাজ করছেন সে দেশের সংস্কৃতি ও সমাজ সম্বন্ধে শ্রদ্ধা, সম্ভ্রম ও আত্মনিবেদনের কথা স্মরণ করলে মন আপনা হতেই শ্রদ্ধায় নুয়ে পড়ে। উপরন্তু তাঁদের যত্ন ও সাবধানতা অতীত ও বর্তমানের প্রতি মততা, শ্রদ্ধা ও সততা আমাদের জাতীয় জীবনে বিরল। সর্বোপরি ছিল নিজের দেশের সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির উদ্দেশে তাঁদের নিজেদের সকল পরিশ্রম, যত্ন ও নিষ্ঠার ফল উজাড় করে কর্তৃপক্ষের হাতে ন্যস্ত করার একান্ত কামনা, এবং সেইসঙ্গে কর্তৃপক্ষের তরফে তাঁদের গচ্ছিত দান চক্ষের মণির মত সযত্নে রক্ষা করার রীতিতে। ফ্রান্সিস বুকানন হ্যামিল্টন সম্বন্ধে নানা বিশ্বকোষে বিশদ বিবরণ আছে। রিচার্ড জনসন সম্বন্ধে বিশদ তথ্য শুধু ফ'ক ও আর্চারের ইণ্ডিয়ান মিনিয়েচার্স ইন দি ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি গ্রন্থেই আমি পেয়েছি। এখানে তার সংক্ষিপ্তসার না দিলে এ বই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে এই মর্মেই এই বিবরণটুকু দিলুম।

রিচার্ড জনসন (১৭৫৩-১৮০৭, জীবনকাল মাত্র ৫৪ বছর) ছিলেন ডাঃ আলেক্‌জাণ্ডার জনসনের কনিষ্ঠ পুত্র। ১৭৬৯ সালে বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত হয়ে ভারতে পৌঁছলেন ১৭৭০-এর ৪ঠা জুন। নীচে তাঁর কাজের কালক্রমিক তালিকা দিলুম:

১৭৭১ একাউন্টান্টের অফিসে সহকারী, কলকাতা।
১৭৭২ গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংসের সহকারী।
১৭৭৩ ১০ই জানুয়ারির অর্ডারে বলা হয় রেভেনিউ বোর্ডে একাউন্টান্ট জেনরল ও সাবট্রেজারার নিযুক্ত হলেন। কিন্তু সে সব পদে তিনি যোগ না দিয়ে ডেপুটি হিসাবে ১৭৮০ পর্যন্ত কাজ করেন। ১৭৭৪ সালের ১৫ মার্চের একটি তালিকায় উপরোক্ত কাজ দুটির কথা বলা আছে।
১৭৭৩ 'খালসা'র একাউন্টান্টেরও প্রেসিডেন্টের সহকারী।
১৭৭৪ ক্যাশকীপারের সহকারী। রেভেনিউ বোর্ড (পরে ডিপার্টমেন্ট)-এর ডেপুটি একাউন্টান্ট।
১৭৭৫-৭৮ ফ্যাক্টর। ক্যাশকীপারের সহকারী। রেভেনিউ বিভাগের ডেপুটি একাউন্টান্ট।
১৭৭৯-৮০ জুনিয়র মার্চেন্ট। রেভেনিউ বিভাগের ডেপুটি একাউন্টান্ট, জজ অ্যাডভোকেট জেনরল।
১৭৮০ ১০ই মার্চ। দ্বিতীয় শা আলমের সনদে জনসন ৬ হাজারি মনসবদার নিযুক্ত হন। তার সঙ্গে খেতাব পান মমতাজ অল-দৌলা মকথ্‌খার অল্‌-মুলুক বাহাদুর হাসাম-ই-জঙ্গ।
১৭৮০ সেপ্টেম্বরে আলম শাহের দরবারে দূত নিযুক্ত হন। তাঁর নিয়োগ সার'আইয়ার কূট মঞ্জুর করেন, কিন্তু দূতাবাস হয়নি।
১৭৮০ লক্ষ্ণৌ ৪ঠা অক্টোবর। লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্ট নাথানিয়েল মিড্‌লটনের হেড এসিস্ট্যান্ট।
১৭৮১ ৫ মার্চ। সিনিয়র মার্চেন্ট।
১৭৮২ জুন। মিড্‌লটনের অবর্তমানে অস্থায়ী ভারপ্রাপ্ত।
১৭৮২ অগাস্ট। মিড্‌লটনের সহিত প্রত্যাহৃত। সম্ভবত অক্টোবর পর্যন্ত লক্ষ্ণৌ-এ অবস্থিতি।
১৭৮২ কলকাতা। ২০শে নভেম্বরের মধ্যে নিশ্চিত প্রত্যাবর্তন।
১৭৮২-৮৩ অনিযুক্ত অবস্থায় সিনিয়র মার্চেন্ট।
১৭৮৪ হায়দ্রাবাদ। জানুয়ারি। হায়দ্রাবাদে রেসিডেন্ট।
১৭৮৫ ১ মার্চ। হায়দ্রাবাদ থেকে প্রত্যাহৃত।
১৭৮৫ কলকাতা। ১৫ জুন। কলকাতায় প্রত্যাবর্তন।
১৭৮৫ ১৯ অগাস্ট। রেভেনিউ বিভাগে একাউন্টান্ট জেনরল ঘোষিত।
১৭৮৫ ৯ সেপ্টেম্বর নিয়োগ পাকা হল।
১৭৮৬ জানুয়ারি। কমিটি অভ রেভেনিউতে নিয়োগ।
১৭৮৬ কমিটি অভ রেভেনিউ তুলে দেয়া হল। নতুন রেভেনিউ বোর্ডে জনসন উপস্থিত থেকে মতামত ব্যক্ত করতে পারবেন, যতক্ষণ না তাঁর জন্য পাকা স্থান হয়।

১৭৮৬-৮৭ জেনরল ব্যাঙ্ক অভ ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান নিযুক্ত। সৃষ্টি হয় মে ১৭৮৬।

১৭৮৭ 'ভারতীয়দের সুষ্ঠুতর নিয়ন্ত্রণের জন্য' যে কমিটিগুলি তৈরি হয় তার সভ্য। সেই সঙ্গে রৌপ্যমুদ্রার অপ্রাচুর্যের কারণ নির্ধারণে নিযুক্ত।

১৭৯০ জানুয়ারি। পারিবারিক ও ভগ্নস্বাস্থ্য কারণে ইংলন্ডে প্রত্যাবর্তনের জন্য আবেদন। পিগট জাহাজে উঠলেন।

১৭৯০ লন্ডন। ২৮শে জুন। লন্ডনে নামলেন।

সেপ্টেম্বর ১৭৮০ থেকে ১৭৮৯-র ডিসেম্বর, মাত্র দশ বছরে, জনসন তাঁর বহু বিচিত্র কাজ ও অনিশ্চিত পরিস্থিতি সত্ত্বেও নিম্নলিখিত সংখ্যার মিনিয়েচর চিত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে লন্ডন ফিরে ইন্ডিয়া অফিসে সেগুলি দান করেন :

অ্যালবাম সংখ্যা	ছবির সংখ্যা
নং ১	৪৩

পরিশিষ্ট-৩

ভারতের প্রধান প্রধান সাধারণ চিত্রশালা বা চিত্রসংগ্রহ

কলকাতা :	ইন্ডিয়ান মিউজিয়ম
	ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল
	কলেজ অভ আর্টস অ্যান্ড ক্রাফ্‌ট্‌স
	আশুতোষ মিউজিয়ম অভ ইন্ডিয়ান আর্ট
	ইন্ডিয়ান সোসাইটি অভ ওরিয়েন্টাল আর্ট
	বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ
	এশিয়াটিক সোসাইটি
	অ্যাকাডেমি অভ ফাইন আর্ট
	বিড়লা অ্যাকাডেমি অভ আর্ট এন্ড কাল্‌চার
	রবীন্দ্রভারতী
শান্তিনিকেতন :	কলাভবন
পাটনা :	কলেজ অভ আর্ট
বানারস :	ভারত কলা ভবন
লক্ষ্ণৌ :	স্কুল অভ আর্ট
	বিশ্ববিদ্যালয় মিউজিয়ম
ধার (মধ্য ভারত) :	লক্ষ্মী কলাভবন
দিল্লী :	সেন্ট্রাল এশিয়ান মিউজিয়ম
	জাতীয় মিউজিয়ম
	জয়পুর ভবন
	দিল্লী শিল্পীচক্র
	সারদা উকীল স্কুল অভ আর্ট
পাতিয়ালা :	পাতিয়ালা প্রাসাদ
উদয়পুর :	বিদ্যাভবন সোসাইটি
জয়পুর :	জয়পুর রাজপ্রাসাদ
	রাজস্থান কলা সংস্থান
আজমীর :	মেয়ো কলেজ
গোয়ালিয়র :	গোয়ালিয়র মিউজিয়ম
আমেদাবাদ :	আমেদাবাদ মিউজিয়ম
	কস্তুরভাই লালভাই সংগ্রহ
বরোদা :	বরোদা মিউজিয়ম চিত্রশালা
বোম্বাই :	প্রিন্স অভ ওয়েল্‌স্‌ মিউজিয়ম
	স্যর জে-জে স্কুল অভ আর্ট
	বম্বে আর্ট সোসাইটি
হায়দ্রাবাদ :	হায়দ্রাবাদ মিউজিয়ম
	স্যার সালার জঙ্গ মিউজিয়ম
মহীশূর :	জগনমোহন রাজপ্রাসাদ চিত্রশালা
ত্রিবান্দ্রম :	শ্রীচিত্রালয়ম
মাদ্রাজ :	স্কুল অভ আর্ট
	বেসান্ট থিওজফিক্যাল স্কুল, আডিয়ার
	এস-ভি রামস্বামী মুদালিয়ার সংগ্রহ
মসলিপট্টনম :	অন্ধ্র জাতীয় কলাশালা

রাজামুন্ড্রি :　　　　　　রামরাও আর্ট গ্যালারি

উপরোক্ত চিত্রশালা বা মিউজিয়মের অনেকগুলিতে সংগ্রহের তালিকা বা ক্যাটালগ পাওয়া যায়। অধিকাংশ ক্যাটালগ অবশ্য হালের নয়।

পরিশিষ্ট-৪

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জী

ক—সাধারণ

Archer, W.G. — *Visions of Courtly India.* Washington D.C. 1976

Arnold, T.W. — Arabic and Persian Manuscripts. *Journal of Indian Art.* Vol. 15. No. 120. London, 1914.

Ashton, L.ed. — *The Art of India and Pakistan.* London, 1914.

Bachhofer — *Early Indian Sculpture.* 2 vols. Paris, 1929.

Banerjee, J.N. — *The Development of Hindu Iconography.* Calcutta, 1941.

Basahm, A.L. — *The Wonder That Was India.* London, 1955.

Beach, Milo Cleveland — *The Art of India and Pakistan,* Durham, North Carolina, 1985.

Binyon, L. — *Painting in the Far East.* 2d ed, London. 1913.

Bose, N.K. — *Canons of Orissan Architecture.* Calcutta, 1932.

Brown, P. — *Indian Painting.* Calcutta, 1927.

The Forthcoming Exhibition at the Royal Academy. *Indian Art and Letters.* Vol. 21. No. 1. London, 1947.

Coomaraswamy, A.K. — *Selected Examples of Indian Art.* London, 1910.

Portfolio of Indian Art. Boston, 1923.

Early Indian Iconography. *Eastern Art.* Vol. 1. Philadelphia, 1928.

Indian Drawings I, 1910. Second Series, Chiefly Rajput. London, 1912.

Falk, T & Archer, M. — *Indian Miniatures in the India Office Library.* Delhi, 1981.

Fazl, Abul — *The Ain-i-Akbari* (tr. Blochmann, H. & Jarrett, H.S. 3 Vols. Calcutta, 1873-94) (tr. Beveridge, The Akbarnama, 3 Vols. Calcutta, 1898-1910)

Notes on Indian Paintings. 1-4. *Artibus Asiae.* 1927. (1,4). Dresden, 1927.

Goetz, H. — Indian Miniatures in German Museums and Private Collections. *Eastern Art.* Vol. 2. Philadelphia, 1930.

Ghose, A. — A Comparative Study of Indian Painting. *Indian Historical Quarterly.* Vol. 2. 1926.

Gray, B. — The Art of India and Pakistan, with Special Reference to the Exhibition of the Royal Academy. *Indian Art and Letters.* Vol. 21. No. 1. London, 1947.

Painting. *The Art of India and Pakistan.* London, 1950.

Gupta, S.M. — *Catalogue of Paintings in the Central Museum, Lahore.* Lahore, 1922.

Havell, E.B. — *Indian Sculpture and Painting.* 1st Ed. 1908. 2nd Ed. 1928.

A Handbook of Indian Art. London, 1927.

Hendley, T.H — Illustrations and General Notes; Portraits by Indian Artists; Symbolism, Mythology. *Journal of Indian Art.* Vol. 15. No. 120. London, 1913.

Festival of Empire and Imperial Exhibition. *Journal of Indian Art.* Vol. 15. London, 1913.

War in Indian Art. *Journal of Indian Art and Industry.* Vol. 17. No. 130. London, April, 1915.

Sport in Indian Art. *Ditto.* Vol. 17. No. 134. London, 1916.

Khandalavala, K. — *Indian Sculpture and Painting:* An Introductory Study. Bombay, 1938.

Some Paintings from the Collection of the Late Burjar N. Treasuryvala. *Marg I.* No. 1 Bombay, 1946.

Kramrisch, S. *Visnudharmottaram.* Pt. III. 2nd ed. Calcutta, 1928.
Indian Sculpture. Calcutta, London, 1933.
A Survey of Painting in the Deccan. London, 1937.
The Art of India. London, 1954.
Manifestations.

Kuhnel, E. *Indian Miniatures in the Berlin Museum.* Berlin (undated).

Mehta, N.C. *Studies in Indian Painting.* Bombay, 1926.

Mitra, R.L. *The Antiquities of Orissa.* 2 Vols. Calcutta, 1880.

Nivedita, S. *Select Essays of Sister Nivedita.* 2nd ed. Madras, 1911.

Nivedia, S. and Coomarswamy, A.K. *Myths of the Hindus and Buddhists* (with thirty-two illustrations in colour by Indian artists under the supervision of Abanindranath Tagore). London, 1913.

Pal, Pratapaditya *Indian Paintings in the Los Angeles Museum.* LKA, 1976.

Randhawa, M.S. & Galbraith, J.K. *Indian Paintings; The Scene Themes and Legends.* Bombay, 1968. Reprinted New York, 1968.

Rao, T.A. Gopinath *Elements of Hindu Inconography.* 4 Vols. Madras, 1914-15.

Rao, B. *The Art and Architecture of India.* Baltimor, 1953.

Sarkar, B.K. The Sukraniti (Translation). *The Sacred Books of the Hindus.* Vol. XIII. Allahabad, 1914.

Şastri, H. *Indian Pictorial Art as Developed in Book Illustrations.* Baroda, 1936.

Smith, V.A. *A History of Fine Art in India and Ceylon.* 2nd ed. Oxford, 1930. 3d ed. Bombay, 1962.

State Fine Arts Publishing House, Moscow. *Indian Art in Soviet Collections.* Moscow, 1955.

Stchoukine. I. *La Peinture Indienne.* Paris, 1929.

Tagore, A. *Sadanga or the Six Limbs of Indian Painting.* ISOA. Calcutta, 1928.

Victoria & Albert Meseum *Review of the Principal Accessions, 1913.* London. 1914.
100 Masterpieces, Mohammedan and Oriental. London. 1931.

Watt,G. *Indian Art at Delhi.* Calcutta, 1903.

খ—ইতিহাসের আগের যুগের গুহাচিত্র

Cockburn, J. On the Recent Existence of Rhinoceros Indicus. *J.S.A.B.* Vol. 52. Pt. 2. No. 1. Calcutta, 1883.
Cave Drawings in the Kaimur Range, North-Western Provinces. *J.R.A.S.* London, 1899.

Fawcett, F. Notes on the Rock Carvings in the Edakal Cave, Wynaad. *The Indian Antiquary.* Vol. 30. Bombay, October, 1901.

Ghosh, M.R. *Rock-paintings and other Antiquities of Prehistoric and Later Times* (Memoir No. 24 of A.S.I.). Delhi, 1932.

Gordon, D.H. Rock Engravings and Microliths in the Bangalore Area. *Journal of the Anthropological Institute.* Vol.I. New Series, 1945.

Silberrad, C.A. Rock Drawings in the Banda District. *J.A.S.B.* New Series. Vol. 3. August, 1907.

Wakanker, V.S. & Brooks, R.R.R. *Stone Age Painting in India.* D.B. Taraporevala Sons & Co. 1976. (See *Archaeology* Vol. 28. No. 2 of Archaeological Institute of America.)

গ—দুই নদীর দেশের সভ্যতা

Ancient India (Bulletin of the Archaeological Survey of India). No. 1, January, 1946.
(a) Piggot, S.—The Chronology of Prehistoric North-West India.
(b) Ghosh. A. and

Panigrahi, K.C.—Pottery of Ahichhatra (U.P.)
No. 2, Jufy, 1946.
Wheeler, R.E.M.,
Ghosh, A. and
Krhishna Deva,—Arikamedu: an Indo-Roman Trading Station on the East Coast of India.
No.3, January, 1947.
(a) Krishnaswamy, V.D.—Stone Age in India.
(b) Wheeler, R.E.M.—Harappa 1946: The Defences and Cemetery R. 37.
(c) Piggot, S.—A New Prehistoric Ceramic from Baluchistan.
No. 4, July 1947—January, 1948.
(a) Piggott, S.—Notes on Certain Pins and a Mace-head from Harappa.
(b) Ghosh, A.—Texila (Sirkap), 1944-45.
(c) Agrawala, V.S.—The Terracottas of Ahichchhatra.

Childe, V. Gordon — *New Light on the Most Ancient East.* London, 1934. New ed. 1952.

Cousens, H. — *Antiquities of Sind.* Archaeological Survey of India, New Imperial Series, Vo. 46. Delhi, 1929.

Cummings, J. ed. — *Revealing Indias's Past.* London, 1939.

Cunningham, A. — Harappa. *Archaeological Survey Report.* (Vol.5) for 1872-3. Calcutta, 1875.

Gordon, D.H. — Early Indian Painted Pottery. *J.I.S.O.A.* Vol. 13. 1945.

Hargreaves, H. — *Excavations in Baluchistan, 1935, Sampur Mound, Nastung, and Sohr Damb, Nal* (Memoir No. 35 of A.S.I) Delhi, 1929.
Journal of Near Eastern Studies, Vol. V. 1956 (for Rana Ghundai)

Mackay, E.J.H. — *The Indus Civilization*, London, 1939.
Further Excavations at Mohenjo-daro, 2 Vols. Delhi, 1938.
Chanhu-Daro Excavations. 1935-36. (American Oriental Series, Vol. 20) Connecticut, 1943.
Early Indus Civilizations. 2nd ed. London, 1945.

Majumdar, N.G. — *Explorations in Sind*, (Memoir No. 48 of A.S.I.) Delhi, 1934.

Marshall, J.H. — *A New Type of Pottery from Baluchistan* (Annual Report of A.S.I. 1904-5). Delhi, 1908.

Marshall, J. & Ors. — *Mohenjo-Daro and the Indus Civilization*, 3 Vols. London, 1931.

Mitra, P. — *Prehistoric India.* Calcutta, 1923. 2nd ed. 1927.

Piggott, S. — *Some Ancient Cities of India.* London, 1945.
Prehistoric Sculpture in the R.A. Exhibition. *Burlington Magazine.* Vol. 90. No. 539. London, 1948.
Prehistoric India. London, 1950.

Prasad, S. — *Animal Remains from Harappa.* (Memoir No. 51 of A.S.I.) Delhi, 1947-8.

Stein, M.A. — The Ancient Buddhist Pictures and Embroideries discovered at Tunghuang. *Journal of India Art.* Vol. 15. London, 1913.
Ancient Khotan: Detailed Report of Archaeological Explorations in Chinese Turkestan, 2 Vols. Oxford, 1907.
An Archæological Tour in Waziristan and North Baluchistan. Memoir No. 37 of the A.S.I. Delhi, 1929.
Archaeological Reconnaissances in North-West India and South-East Iran. London, 1937.

Vats, M.S. — *Excavations at Harappa.* 2. Vols. A.S.I. Delhi, 1940.

Wheeler, R.E.M. — *The Indus Civilization.* Supplement to the Cambridge History of India, Cambridge, 1953.

Auboyer, J. — Composition and Perspective at Ajanta. *Art and Letters India and Pakistan*. New Series. Vol. 22. No.1. London, 1948.

Bloch, T. — Caves and Inscriptions in Ramgarh Hill; Sitabenga and Jogimara. *Annual Report of the Archaeological Survey of India*, 1903-4.

Binyon, L. — A Chinese Painting of the Fourth Century. *Burlington Magazine*. London. January, 1904.

Burgess. J. — *Archaeological Survey of India. Reports*. Vols. 1—5.

Notes on the Bauddha Rock Temples of Ajanta, Their Paintings and Sculptures and on the Paintings of the Bagh Caves, Modern Bauddha Mythology, etc. London, 1879.

Codrington, K. & De, B. — *Ancient India*. London, 1926

Dangerfield, Lt. — Reference to Ajanta. *Transactions of the Literary Society of Bombay*. Vol. 2. Bombay, 1818.

Dey, M.C. — *My Pilgrimages to Ajanta and Bagh*. London, 1925.

De, Silva-Vigier, A. — *The Life of the Buddha*. London, 1955.

Fergusson, J. — On the Rock-Cut Temples of India. *Journal of the Royal Asiatic Society*. Vol. 15. Pt.1. London, 1844.

Illustrations of the Rock-Cut Temples of India [Selected from the best examples of the different series of Caves at Ellora, Ajanta, Cuttack, Salsette, Karli and Mahavellipore. From sketches made 1838-39] wtih text to accompany the folio volume of plates. London, 1845.

The Rock-Cut Temples of India. Illustrated by 74 Photographs taken on the Spot by Major Gill. London, 1864.

Fergusson, J. and Burgess, J. — *The Cave Temples of India*. 1880.

A History of Indian and Eastern Architecture. London, 1910.

Goetz., H. — The Neglected Aspects of Ajanta Art. *Marg*, Vol. 2 No. 4. Bombay, 1947.

Griffiths. J. — *The Paintings of the Buddhist Cave Temples of Ajanta, Khandesh, India*. 2 Vols. London, 1896.

Haldar, A. K. — The Paintings of the Bagh Caves. *Rupam*. No. 8. Calcutta, October. 1921.

The Bagh Caves. *Brulington Magazine*. London. October, 1923

Havell, E.B. — Fundamentals of the Indian Art. *Rupam*: Nos. 27-8. July-October, 1926.

Heeley, W.L. — Extracts from Taranath's History of Buddhism in India. *The Indian Antiquary*. April, 1875.

Herringham. C.J. — The Bagh Caves. *Burlington Magazine*. Vol. 17. London, June, 1910.

The Frescoes of Ajanta. *Burlington Magazine*. London. 1910.

Description of Ajanta Caves and Frescoes. *Journal of Indian Art*. Vol. 15. No. 120. London, 1913.

Ajanta Frescoes. Being Reproduction in Colour and Monochrome of Frescoes in some of the Caves at Ajanta after copies taken in the years 1909-10 and 1910-11 by Lady Herringham and Her Assistants. India Society. 2 Vols. Oxford, 1915.

Le Coq, A.Von — Chotscho. Facsimile—Wieder gaben. etc. Berlin. 1913.

Longhurst. A.H. — The Sigiriya Frescoes. *J.I.S.O.A*. Vol. 5, Calcutta, 1937.

Luard, C.E. — The Buddhist Caves of Central India (The Bagh Caves). *Indian Antiquary*. Vol. 39. August, 1910.

Havell, E.B. and Marshall, J., Garde, M.B. Vogel, J. Ph., — *The Bagh Caves*. India Society, 1927.

Cousins, J.H.
Royal Society — Transactions of the 1829 (Ajanta Paintings).
Schiefner, A. — *Taranath's Geschichte Des Buddhismus in Indien.* St. Petersburg. 1869.
Smith, V.A. — Caves of Ajanta and the Frescoes therein. *The Journal of Indian Art.* Vol. 15, No. 120. London, 1913.
U.N.E.S.C.O. World Art Series — India, *Paintings from Ajanta Caves* (New York Graphic Societies). Paris, undated (1951).
Yazdani, G. & Ors. — *Ajanta,* 3 Vols. Oxford, 1931-46. Vol. 4. published in 1955.

ঙ—মধ্যযুগের পুঁথিপত্র

Bendall, C. — *Catalogue of Buddhist Sanskrit Manuscripts in the Universtiy Library.* Cambridge, 1883.
Brown, W.N. — *The Vasanta Vilasa.* New Haven 1942.
Chandra, Promode — Notes on Mandu Kalpasutra of A.D. 1439 *Marg.* XII No. 3. June 1959.
Das, Rajatananda — *Eastern India Manuscript Painting.*
French, J.C. — *The Art of the Pal Empire.* London, 1928.
Gangoly, O.C. — *Vasanta Vilasa: A New document on Indian Painting* O.Z.N. F.2, 1925.
Ghose, A. — The Development of Jaina Painting. *Artibus Asiae.* Nos.3,4,1927.
Old Bengal Painting. *Rupam,* 27-28. 1926.
Goetz, H. — Notes on a collection of Historical Portraits from Golconda. *Indian Art and Letters.* X (III). 1936.
A Unique Early Deccani Miniature. *Bulletin of the Baroda State Museum.* Vol. 1. No. 1. 1944.
Portraits from Bijapur. *British Museum Quarterly.* Vol. III, 1937.
Decline and Rebirth of Medieval Indian Art, (Western Indian Painting). *Marg.* Vol.4. No. 2, 1949.
Gray, B. — Deccani Paintings: the School of Bijapur. *Burlington Magazine.* Vol. 73. August, 1938.
Kramrisch, S. — A Painted Ceiling. *J.I.S.O.A.* 1937.
Dravida and Kerala in the Art of Travancore. Switzerland, 1952.
Kramrisch, S., Cousins, J.H., Vasudeva Podyval, R. — *The Art and Crafts of Travancore.* London, Travancore, 1948.
Martin F.R. — The Miniature Paintings and Painters of Persia, India and Turkey from the 8th to the 18th Century. 2 Vols. London, 1912.
Mehta, N.C. — *Gujarati Painting in the Fifteenth Century.* India Society. London, 1931.
Mitra, Rajendralal — Sanskrit Buddhist Literature of Nepal (contains an account of B.H. Hodgson Collection) 1882.
Moti Chandra & Shah, U.P. New Documents of Jaina Painting. 1975.
Saraswati, S.K. — Tantrayana Art: An Album. 1972.
Pal Juger Chitrakala (in Bengali) 1978.
Sivaramamurti, C. — Painting in Lepakshi. *J.I.S.O.A.* Vol.5. 1937.
Skelton, R. — The Art of India and Nepal: The Nasli & Alice Heeramaneek Collection.
The Nimat Namahi: a landmark in Malwa Painting. *Marg,* XII No. 3. June, 1959.

Ardeshir, A.C. — The Ardeshir Collection of Mughal Miniatures. *Roopa Lekha* N.S.1 (2), 1940.

Arnold, T.W. — The Johnston Collection, India Office. *Rupam.* No. 6, 1921.
Notes on Oriental Manuscripts (Chester Beatty Collection). *Indian Art and Letters.* Vol. III. Pt.1. 1929.

Arnold, T.W. and Binyon, L. — *Court Painters of The Grand Moguls.* Oxford, 1921.

Arnold, T.W. and Wilkinson, J.V.S. — *The Library of A. Chester Beatty:* A Catalogue of the Indian Miniatures. 3 Vols. 1936.

Arnold, T.W. and Grohmann — *The Islamic Book.* London, 1929.

Barrett. D. — *Painting of the Deccan XVI-XVII Century.* London, 1958.

Beach, Milo — (1) Mughal and Rajput Paintings. *The New Cambridge History of India.* Vol 1.3 Cambridge U.P. 1992. (This volume contains a very comprehensive bibliography of Mughal, Rajput and Pahari Paintings.)
(2) *The Grand Moghul—Imperial Painting of India 1600-1660.* Williamstown, Mass. 1978
(3) *The Imperial Image—Paintings for the Mughal Court,* Washington D.C. 1981.

Bell, Clive — Persian Miniatures. *Burlington Magazine.* Vol. 25. London, May, 1914.

Bilgrami, S.A.A. — *Landmarks of the Deccan.* Hyderabad, 1927.

Binney, E. — *Persian & Indian Miniatures from the Collection of Edwin Binney, 3d* Portland, 1962.
Indian Miniature Painting from the Collection of Edwin Binney 3d I the Mughal and Deccani Schools. Portland 1973.

Binyon, L. — Relation between Rajput and Moghul Paintings: A New Document. *Rupam.* No. 29, 1927.
Indian Art at Wembley. The Restrospective Exhibition. *Rupam.* No. 21, 1925.
Emperors and Princes of the House of Timur. British Museum, 1930.

Binyon, L. & Arnold T.W. — *The Court Painters of the Grand Mughals.* Oxford, 1921.

Blochet, E. — *Musulman Painting.* London, 1929.

Breck, J. — Four Seventeenth Century Pintadoes. *Metropolitan Museum Studies,* 1929.
An Early Mughal Painting. *Metropolitan Museum Studies,* Vol II. Pt. 2. 1930.

Brown, P. — *Indian Painting under the Mughals.* A.D. 1550 to A.D. 1750. Oxford, 1924.

Chandra, P. — *The Tuti Nama of the Cleveland Museum of Art and the Origins of Mughal Painting.* 2 Vols. Chicago, 1976.

Chaghatai, M.A. — The Illustrated Edition of the Razm Nama. *Bulletin of the Deccan College Research Institute.* Vol 5. Poona, 1944.

Clarke, C.S. — *Twelve Paintings of the School of Humayun.* Victoria & Albert Museum, 1921.
Victoria & Albert Museum. Indian Drawings; Thirty Mogul Paintings of the School of Jahangir in the Wantage Bequest. Victoria & Albert Museum, 1922.

Codrington, K. & De, B. — Portraits of Akbar, the Great Mughal (1542-1605). *Burlington Mazagine.* Vol. 82. London, 1943.

Cohn-Wiener, E. Miniatures of a Razm Namah from Akbar's Time. *Indian Art & Letters.* Vol. 1. No. 2. London, 1938.

Coomaraswmy, A.K. Mughal Painting. *Museum of Fine Art Bulletin.* No. 93. Boston. February, 1916.

Notes on Indian Paintings. A Contribution to Mughal Iconography, *Artibus Asiae.* No. 182. 1927.

Notes on Mughal Painting. *Artibus Asiae.* No. 3, 1927.

Nots on Indian Painting, Bishnudas and others. *Artibus Asiae.* No.4. 1927.

Catalogue of the Indian Collections in the Museum of Fine Art, Boston. *Mughal Paintings.* Boston, 1930.

De Lorey, E. Behzad Le Gulistan Rothschild. *Ars Islamica.* Vol. IV. Ann Arbor, 1937.

Dimand, M.S. Several Illustrations from the Dastan-i-Amir Hamza in American Collections. *Artibus Asiae,* Vol. II, No. 1-2. Ascona. Switzerland, 1948.

Gray, B. An Early Mughal Illustrated Page. *British Museum Quarterly* No. 8, 1934.

A New Mughal Painting of Stuff. *Ars Islamica.* Vol. 4, 1937.

Treasures of Indian Miniatures. Oxford, 1955.

Gray, B. and Wilkinson, J.V.S. Mughal Miniatures from the Period of Akbar. *Ostasiatische Zeitschrits,* N.F. XI. 1955.

Indian Paintings in a Persian Museum. *Burlington Magazine.* 1935.

Haq, M.M. Discovery of a Portion of the Original Manuscript of Tarikh-i-Alfi, Written for the Emperor Akbar. *Bulletin of the School of Oriental Studies.* 1934.

Hendley, T.H. The Razm Namah Manusctipt. *Memorials of the Jeypore Exhibition,* Vol. 4, 1913.

Khandalavala, K. An Akbar Period Mughal Miniature Illustration of the Gita Govinda. *Roopalekha,* N.S. Vol.2 No. 3, 1941.

Kramrisch,S. *A Survey of Painting in the Deccan.* London, 1937.

Krishnadasa, Rai *Mughal Miniatures.* LKA, Delhi, 1955.

Macaulay, D. Mughal Art. *Burlington Magazine,* Vol. 46. 1926.

Moti Chandra *The Technique of Moghul Painting.* 1949.

Payne, C.H. *Akbar and the Jesuits.* From the Accounts of Du Jarric. London, 1926.

Rogers, A.ed. Beveridge H. *Jahangir: Tuzuk-i-Jahangir or Memories of Jahangir.* 2 Vols. London (1909-14).

Schroeder, E. *Persian Miniatures in the Fogg Museum of Art.* Cambridge Mass, 1942.

Skelton, R. *Indian Miniatures from XVII to XIX Centuries.* Venice, 1961.

Smith, E.W. *The Architecture of Fatehpur Sikri. Moghal Colour Decoration of Agra.* 2 Vols. Allahabad, 1901.

Tyulayev.S. *Miniatures of Babur Namah.* Moscow, 1960.

Welch, S.C. *The Art of Mughul India.* New York, 1963.

Indian Drawings and Painted Sketches 16th to 19th Centuries. New York Asia Society, 1976.

Imperial Mughul Painting. New York, 1978.

Wellesz, E. An Akbar Namah Manuscript. *Burlington Magazine.* Vol. 80 London, June, 1942.

Mughal Paintings at Burlington House. *Burlington Magazine.* February, 1948.

Akbar's Religious Thought As Reflected in Mogul Painting. London, 1952.

Wilkinson, J.V.S.	*The Lights of Conopus: Anvar-i-Suhaili.* London, 1929.
	A Note on an Illustrated Manuscript of the Jog-Bashisht. *Bulletin of the School of Oriental Studies.* Vol. 12, 1948.
	Mughal Painting. London, 1948.
Williamson, T.	*The East India Vade Museum.* 2 Vols. London, 1810.
Yazdani, G.	Two Miniatures from Bijapur. *Islamic Culture.* April, 1935.

ছ—রাজপুত চিত্রকলা

Aijazuddin, F.S.	*Pahari Paintings and Sikh Potraits in the Lahore Museum.* London, 1977.
Andhare, S. & Rawat N.	*Deogarh-Paintings.* LKA, 1977.
Archer, Mildred	*Natural History Drawings in the India Office Library.* London, 1962.
	Indian Paintings from Court, Town and Village. London, 1970-72.
Archer, W.G.	*Indian Paintings from Rajasthan.* London, 1957.
	The Loves of Krishna in Indian Painting and Poetry. London, 1957.
	Central Indian Paintings. London, 1958.
	Indian Painting in Bundi and Kotah. London, 1959.
	Indian Miniatures. London, 1960.
	Paintings of the Sikhs. London, 1966.
	Kishnagarh Paintings. Lalit Kala, 1959.
Bake, A.	Kirtan in Bengal. *Indian Art and Letters* XXI (I), 1947.
Basu, R.	The Ajit Ghosh Collection of Old Indian Paintings. *The Modern Review.* Calcutta, January, 1926.
Beach, M.C.	Rajput Paintings at Bundi and Kotah. *Artibus Asiae* (Suppl. 37) 1974.
Brown, P.	*Catalogue of Loan Exhibition from the Ghosh Collection of Representative Specimens of Rare Old Indian Paintings.* Held at the Government School of Arts. Calcutta, 1925.
Brown, W.N.	Early Svetambara Jaina Miniatures. *Indian Art and Letters.* Vol. III. No.1. 1929.
	Early Vaishnava Miniature Paintings from Western India. *Eastern Art.* Vol. 2. Philadelphia, 1930.
	A *Description and Illustrated Catalogue of Miniature Paintings of the Jaina Kalapasutra as Executed in the Early Western India Style.* Washington, 1934. (Freer Gallery of Art, Oriental Studies. No. 2)
	Stylistic Varieties of Early Western Indian Miniature Painting above 1400 A.D. *J.S.I.O.A.* 1937.
	A Jain Manuscript from Gujarata. Illustrated in Early Western India and Persian Styles. *Ars Islamica,* IV. Ann Arbor, 1937.
	Manuscript Illustrations of the Uttaradhyana Sutra. New Haven. 1941 (American Oriental Series, Vol. XXI).
Chaghatai, M.A.	.*A Few Hindu Miniature Painters of the 18th and 19th Century.* Lahore, 1934.
Chandra, Moti	*Mewer Painting.* LKA, 1981.
Conze,E.	Remarks on a Pala Manuscript in the Bodleian Library. *Oriental Art.*Vol.1. No. 1. London, Summer. 1948.
Coomarswamy, A.K.	*Rajput Painting.* 2 Vols. Oxford, 1916, Delhi 1976.
	Catalogue of the Indian Collections in the Museum of Fine Art. *Jaina Paintings.* Boston, 1924. *Part VI Mughal Painting.* Cambridge Mass. 1930.
	Ditto. *Rajput Painting.* Boston. 1926.
	Notes on Jaina Art. *Journal of Indian Art.* Vol. 16. No. 127. London, 1914.

The Eight Nayikas. *Journal of Indian Art.* Vol. 16. No. 128. London, 1914.
Hindi Ragmala Texts. *Journal of the American Oriental Society.* 1929.
Two Leaves from a Seventeenth Century Manuscript of the Rasikapriya. *Metropolitan Museum Studies.* Vol. 3. Pt.1. 1930.
An Early Rajput Painting. *Bulletin of the Boston Museum of Fine Art.* Vol. 30. No. 177. Boston, 1932.
Indian Drawings; Second Series, Chiefly Rajput. London, 1912.
The Conqueror's Life in Jaina Painting. *J.I.S.O.A.* Vol. 3. No. 2. 1935.

Das, A.K. — *Mughal Painting During Jahangir's Time.* 1978.

Dickinson, E. — The Way of Pleasure. The Kishangarh Paintings. *Marg.* Vol. 3. No.4. 1949.

Dickinson E & Khandalavala, K. — *Kishangarh Painting.* LKA, 1959.

Gangoly, O.C. — *Masterpieces of Rajput Painting.* Calcutta, 1949.
Two Early Rajput Miniatures (in Bharat Kala Parishad, Benaras). *Rupam.* No. 40. 1929.
Ragas and Raginis. 2. Vols. Calcutta, 1934-35. 2nd ed. Calcutta, 1934.
Critical Catalogues of Miniature Paintings in the Baroda Museum. Baroda, 1961.

Goetz, H. — Notes on some Schools of Rajput Painting. *J.I.S.O.A.* Vol. 5, 1937.
Bundela Art. *J.I.S.O.A.* Vol. 6, 1938.
The Kachhwaha School of Rajput Painting. *Bulletin of the Baroda State Museum.* Vol. 4. Parts I-II. 1949.
New Discoveries of Rajput Painting. *Indian Art and Letters.* N.S. 12 (I). 1947 and 32 (II). 1948.
The Art and Architecture of Bikaner State. Oxford, 1951.
The Nagaur School of Rajput Painting, *Artibus Asiae.* Vol. 12. Nos. 1-2, 1949.
The Marwar School of Rajput Painting. *Bulletin of the Baroda State Museum.* Vol. 5. Pt. I-II. 1949.
Rajput Sculpture and Painting under Raja Umed Singh of Chamba. *Marg.* Vol. 7. No. 4. Bombay, 1954.

Gray, B. — Western Indian Painting in the Sixteenth Century: the Origins of the Rajput School. *Brulington Magazine.* February, 1948.
Rajput Painting. London, 1948.

Gupta, M.L. — Vraj: The Centre of Indian Culture. Delhi, 1982.

Khandalavala, K. — Leaves from Rajasthan. *Marg.* Vol. 4. No. 3. 1949.

Mazumdar, M.L. — Antiquities of Gujarat: Two Illustrated Manuscripts of Ratirahasya of the Gujarat School of Painting. *Journal of the University of Bombay.* Vol. 5. Pt. 6. May, 1937.
A 15th Century Gitagovinda Manuscript with Gujarati Painting. *Journal of the University of Bombay.* Vol. 6. Pt.6. May, 1938.
Earliest Devimahatmya Miniatures with special reference to Sakti-worship in Gujarat, *J.I.S.O.A.* Vol. 6, 1938.
A Newly Diacovered Illustrated Gitagovinda Manuscript from Gujrat. *Journal of the University of Bombay.* September, 1941.
The Gujarati School of Painting and some Newly Discovered Vaisnava Miniatures. *J.I.S.O.A.* Vol. 10, 1942.
A Note on Western Indian or Gujrati Miniatures in the Baroda Art

Gallery. *Bulletin of the Baroda State Museum.* Vol. II. No. 2, 1945.
Some Interesting Jaina Miniatures in the Baroda Art Gallery. *Bulletin of the Baroda State Museum.* Vol. 4. Pt. 1-2 1946-47.

Mehta, N.C. — Indian Painting in the Fifteenth Century. An Early Illustrated (Gujarati) Manuscript. *Rupam.* No. 22-3. 1925
Gujarati Paintings in the Fifteenth Century. A Further Essay on Vasanta Vilasa. London, 1931.
Ragas and Raginis in a Laudian Manuscript. *Bodleian Quarterly Record.* Vol. 7. No. 76. Oxford, 1932.
A Note on Ragmala. *J.I.S.O.A.* Vol. 3 (2). 1935.
A New Document of Gujarati Painting. *J.I.S.O.A.* Vol. 13, 1945.

Mirza, K. — An Illustrated Manuscript of Madhu Malati. *Rupam.* No. 33-4, 1928.

Moti Chandra — *Jaina Miniature Paintings from Western India.* Ahmedabad, 1948.

Randhawa M.S. & D.S. — *Kishangarh Painting.* Bombay, 1980.

Sarabhai, M.N. — *Jaina Chitra Kalpadruma* (Masterpieces of Kalpasutra Painting). Ahmedabad, 1936.

Sastri, H. — *Ancient Vijnaptipatras.* Baroda, 1942.

Skelton, R.W. — *Rajasthan Temple Hangings of the Krishna Cult.* New York, 1973.

Stooke, H.J. — An XI Century Palm Leaf Manuscript (The Bodleian Library Astasahasrika-prajnaparamita). *Oriental Art.* Vol. 1, No. 1 London, Summer, 1948.

Topsfield, A. — *Paintings form Rajasthan in the National Gallery of Victoria,* Melbourne. 1980.

Villiers-Stuart, C.M. — The Last of the Rajput Courtpainters. *Burlington Magazine.* Vol. 48. January, 1926.

জ—পাহাড়ী চিত্রকলা

Archer, W.G. — *Indian Painting in the Punjab Hills.* London, 1952.
Indian Paintings from the Punjab Hills. 2 Vols. 1973.
Garhwal Painting. London, 1954.
Kangra Painting. London, Revised 1956.
Some Nurpur Paintings. *Marg.* Vol. 8. No. 3, 1955.
Pahari Miniatures: A Concise History. Bombay, 1975.

Chandradhar, Giri Pandit. — A Signed Molaram, *Rupam.* No. 2, 1920.

French, J.C. — *Himalayan Art.* London, 1931.
Sansar Chand of Kangra. *Indian Art and Letters.* N. S. Vol. 21. No. 2, 1947.
Kangra Frescoes. *Indian Art and Letters.* N.S. Vol. 22. No. 2, 1948.

Ganguli, K.K. — Chamba Rumal. *J.I.S.O.A.* Vol. 11, 1943.

Ghose, A. — The Basohli School of Rajput Painting. *Rupam.* No. 37, 1929.

Goetz, H. — Raja Isvari Sen of Mandi and the History of Kangra Painting. *Bulletin of the Baroda State Museum.* Vol. 2. No. 1, 1946.
The Coming of Muslim Cultural Influence in the Punjab Himalayas. *India Antiqua.* Leyden, 1948.
The Indian and Persian Miniature Paintings in the Rijksprentenkabinet (Rijksmuseum) Amsterdom, 1958.

Goswamy, B.N. — *Pahari Paintings of the Nala Damayanti Theme.* Delhi, 1980.

Hutchinson, J. and Vogel, J. P. — *History of the Punjab Hill States.* 2 Vols. Lahore, 1933.

Mukundi Lal — Some Notes on Mola Ram. *Rupam.* No. 1921.
The Pahari (Himalayan) School of Indian Painting and Mola Ram's Place in it. *Roopa-Lekha.* No. 1, 1929. No. 3, 1929.

Randhawa, M.S. *Kangra Valley Painting*. Delhi, 1955.
Guler, The Birthplace of Kangra Art. *Marg*. Vol. 6. No. 4. Bombay, 1953.

Sastri, H. The Hamir-Hath or the Obstinacy of Hamir. *Journal of Indian Art*. Vol. 17, 1916.

Traeasuryvala, B.N. A New Variety of Pahari Painting. *J.I.S.O.A.* Vol. II. 1943.

ঝ—লোকচিত্র

Agarwala, R.A. *Marwar Murals*. Agam Prakasan. New Delhi, 1977.

Ambalal, A *Krishna as Srinathji*. Ahmedabad, 1988.

Archer, W.G. *The Vertical Man*. A Study in Primitive Sculpture. London, 1947.

Bhattacharya, B. Tewntytwo Buddhist Miniatures from Bengal. *Bulletin of the Baroda State Museum*. Vol.1. Part 1, 1943.

Birdwood, G.C.M. *The Industrial Arts of India*. 2 Vols. London, 1880.

Chandra, R.P. *The Beginning of Art in Eastern India*. A.S.I. Memoir No. 30, 1927.

Chatterjee, T.M. *Alpona*, Calcutta, 1940

Codrington, K. & De, B. Animals in Indian Art. *Geographical Magazine*. London, 1948.

Coomaraswamy A.K. *The Arts and Crafts of India and Ceylon*. London. 1913.
Visva-Karma. London, 1914.

Das, C.R. Tie-and-Dye Work, *J.I.A.* Vol. 2, 1888.

Davar, Satish A Homage to Jaipur. *Marg*. Vol. XXX. No. 4.

Dey, M.C. Drawings and Paintings of Kalighat. *Advance*, Calcutta, 1332.

Dutt, G.S. The Indigenous Painters of Bengal. *J.I.S.O.A.* Vol.1. No. 1, 1933.
Painted Saras of Rural Bengal. *J.I.S.O.A.* Vol. 2. 1932.
Bengali Terracottas, *J.I.S.O.A.* Vol.6. 1936.

Elwin. V. *The Tribal Art of Middle India*. Bombay, 1951.

Fergusson, J. *Tree and Serpent Worship*. 2nd ed, London, 1880.

Fergusson, J & Burgess J. *History of Indian and Eastern Architecture*. Revised and Edited by R.P.Spers (2 Vols). New Delhi, 1967.

French, J.C. The Land of the Wrestlers (A Chapter in the Art of Bengal). *Indian Art and Letters*. New Series. Vol. 1. No. 1. 1927.

Ghose, A. Old Bengal Painting. *Rupam*. Nos. 27-8. July-Cotober 1926.
The Art of the Bengal "Pat" Drawings. *The Hindoosthan*. Vol.1. No. 3, July-September. 1944.

Ghosh, D.P. Orissan Paintings, *J.I.S.O.A.* Vol. 9, 1941.
An Illustrated Ramayana Manuscript of Tulsidas and Pats from Bengal. *J.I.S.O.A.* Vol. 13, 1915.

Goetz. Herman *The Art and Architecture of Bikaner State*. 1950.

Gupta, Mohanlal *Frescoes and Wall Paintings of Rajsthan*. Jaipur, 1965.

Hadaway, W.S. *Cotton Painting and Printing in the Madras Presidency*. Madras, 1917.

Hendley, T.H. Indian Pictures: Indian Art Styles, Dressed Dolls and Models, etc. *Journal of Indian Art*. Vol. 15. No. 121. London, 1913.

Irwin, J. The Folk-art of Bengal. *Studio*. Vol. 132 No. 644, 1946.
Shawls. London, 1955.

Kramrisch, S. Kantha. *J.I.S.O.A*, Vol. 7, 1939.
Kanthas of Bengal. *Marg*. Vol. 5, No. 2, 1949.

Mehta, Rama *Inside the Haveli*. New Delhi, 1977.

Mookherjee, A. *The Folk-art of Bengal*. Calcutta, 1939.

Mukharji, T.N. The Art Industries of Bengal. *J.I.A.* January, 1886.
Art Manufactures of India. Calcutta, 1888.

Randhawa, M.S. *Kangra Painting on Love*. Delhi, 1962.

Seth, Mira *Wall Paintings of the Western Himalayas*. Delhi, 1976.

Skelton, R.W. — *Rajasthani Temple Hangings of the Krishna Cult.* 1973.
Smith, A. D. H. — Indian Embroidery. *Journal of the Embroiderers' Guild.* Vol. 3. No.3, London, 1935.
The Dyed and Printed Cottons of India. *Indian Art and Letters.* New Seris Vol. 14, No. 2, 1940.
Steel, F.A. (Mrs.) — Phulkari Work. *J.I.A.* Vol. III. 1888.
Stooke, H.J. — Kalighat Paintings in Oxford. *Indian Art and Letters.* Vol. XX. 1946.
Von Leyden, R. and N. — Ganjifa. The Playing Cards of India. *Marg.* Vol. 3, No. 4. 1949.
Wacziarg, F. & Amar Nath — *Rajasthan the Painted Walls of Shekhawati.*

ঞ—দেশজ রীতি

Appasamy, J. — *Early Calcutta Lithographs.* 1981.
Archer, W.G. — *Bazar Paintings of Calcutta.* London, 1952.
Maithil Painting. *Marg.* Vol. 3, No. 3. 1949.
Baden-Powell, B.H. — *Handbook of the Manufactures and Arts of the Punjab.* 2 Vols. Lahore, 1872.
Baker, G.P. — *Calico Painting and Paintings in the East Indias.* London, 1921.
Beglar, J.D. — *Archaeological Survey Reports.* Vol. VIII. 1873.
Coomarswamy, A.K. — A Bengali Painting. *Bulletin of the Boston Museum of Fine Art.* Vol. 30, No.177, 1932.
Irwin J. & Hall, M. — *Indian Painted and Printed Fabrics.* Ahmedabad, 1978.
Irwin, J. — *Golconda Cotton Paintings of the Early 17th Century.* Lalitkala 5. 1969.
Majumder, M.R. — *Gujarat —Its Art Heritage.* Bombay, 1968.

ট—বিদেশী রীতি

Crane. W. — India from the Landscape Artist's Point of View. *J.I.A.* Vol. 15, No. 177. London.
Fischer, E.H. — Animal Life of India from the Artist's Standpoint. *J.I.A.* Vol. 15, No. 177. London, 1943.
Foster, W. — The Murno Zofanny. *Indian Art and Letters.* Vol. 21, No.1. 1947.
Hendy, P. — John Zofanny, R.A. *Bulletin of the Museum of Fine Arts.* Boston. Vol. 30. No. 177. 1932.
Lyell, G. — The Two Daniells. *J.I.A.* Vol. 15. 117. London, 1913.
Reynolds, G. — Britsh Artists in India. *The Art of India and Pakistan.* London, 1950.

ঠ—মিশ্র রীতি

Appasamy, J. — *Indian Paintings of the Company School.* 1980
Archer, M. & W.G. — *Indian Painting for the British 1770-1880.* Oxford, 1955.
Archer, M. (Mrs) — *Indian and British Portraiture.* London, 1979.
Tilly Kettle and the Court of Oudh. *Apollo.* Feb. 1972.
Company Drawings in the India Office Library. 1972.
Patna Painting. London, 1947.
British Drawings in the India Office Library. 1972.
Belnos, C.S. (Mrs) — *Tewntyfour Plates: Illustration of Hindoo and European Manners in Bengal.* London, 1832.
Birdwood, G.C.M. and Foster, W. — *Relics of the Honorable East Indian Company.* London, 1909.
Ganguly, D.C. — *Victoria Memorial Hall.* Calcutta. 1953.

Manuk. P.C.	The Patna School of Painting. *Journal of the Bihar Research Society.* Vol. 29.
Welch, S.C.	*Room for Wonder. Indian Painting during the British Period 1760-1880.* New York, 1978.

ড—বিশ শতক

Appasamy, J.	Some Contemporary Painters in Delhi. *Marg.* Vol. 7. No. 4. Bombay, 1954.
Coomaraswamy, A. K.	Modern School of Indian Painting. *Journal of Indian Art.* Vol. 15, No. 120. London, 1913.
Fischer, K.	The Calcutta Group. *Marg.* Vol. 6, No. 4. Bombay, 1953.
Guha-Thakurta, Tapati	*The Making of A New 'Indian' Art: Artists, aesthetics and naturialism in Bengal 1850-1920.* Cambridge U.P. 1992 (A searching, critical account with a comphrensive bibliography)
Irwin, J. and Dey, B	Jamini Roy, *J.S.I.O.A.* Vol. 12. 1944.
Marg, Vol 4. No. 3.	Some Contemporary Artists (N.S. Bendre. S. Chavda, K.K. Hebbar, K.H. Ara, S.K. Bakre, S. Choudhury, M.F. Hussain)
Ramachandra Rao, P.R.	*Modern Indian Painting.* Madras, 1953.
Sahrma, R.C, & Chawla, Rupika	*Raja Ravi Varma: New Perspectives.* National Museum, New Delhi, 1993.
Suhrawardy, S.	*Prefaces.* Calcutta. 1936.
	Jamini Roy. *Marg.* Vol. 2. No. 1. 1947.
Thompson, F.	Amrita Sher Gil. *Marg.* Vol. 1. No. 1, 1946.

পরিশিষ্ট-৫

ভারত ইতিহাসের প্রধান প্রধান সন তারিখ

ইতিহাসের আগের যুগ : খ্রীস্টপূর্ব অনুমান ৩০০০—১৫৫০

২৪০০—৫৬৫০ খ্রীস্টপূর্ব	বালুচিস্তানে চাষবাস আরম্ভ : সিন্ধু উপত্যকা সংস্কৃতি ; হরপ্পা সংস্কৃতি	সীলমোহর, ব্রোঞ্জ ও ধাতুর মূর্তি, মাটির পাত্র, পুতুল, নগর সভ্যতা।

বৈদিক যুগ : খ্রীস্টপূর্ব ২০০০—৫০০

১৫০০—৯০০	ঋগ্বেদ মন্ত্র
৯০০	মহাভারতের যুদ্ধ
৯০০—৫০০	পরবর্তী বেদ, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ

বৌদ্ধ যুগ : খ্রীস্টপূর্ব ৫৬৩—৩২৫

৫৬৩—৪৮৩	গৌতম বুদ্ধ
৫৪২—৪৯০	মগধরাজ বিম্বিসার
৩৯০—৪৫৮	মগধরাজ অজাতশত্রু
৩৬২—৩৩৪	মগধরাজ মহাপদ্ম নন্দ
৩২৭—৩২৫	আলেকজান্ডারের আক্রমণ

মৌর্য যুগ : খ্রীস্টপূর্ব ৩২২—১৮৩

৩২২—২৯৮	চন্দ্রগুপ্ত	অখণ্ড স্তম্ভ, যক্ষ মূর্তি,
২৯৮—২৭৩	বিন্দুসার	বৌদ্ধ স্তূপ
২৬৯—২৩২	অশোক	
১৮৩	মৌর্যবংশের লোপ	

বিদেশী আক্রমণের যুগ : খ্রীস্টপূর্ব ১৯০—খ্রীস্টাব্দ ৩৮৮

২৩০ খ্রীস্টপূর্ব—২২৫ খ্রীস্টাব্দ	অন্ধ্রবংশ (দাক্ষিণাত্য) রাজধানী নাসিক	গুহামন্দির, অমরাবতী স্তূপ, প্রথম অজন্তার চিত্র
১৯০ খ্রীস্টপূর্ব	উত্তর-পশ্চিম ভারতে গ্রীকরাজ্য	ভারুত ও সাঁচি
১৮০ খ্রীস্টপূর্ব—১৪৭ খ্রীঃপূঃ	পুষ্যমিত্র সুঙ্গ	
৯০ খ্রীস্টপূর্ব	শকদের উত্তর-পশ্চিম ভারত আক্রমণ	
৭১ খ্রীস্টপূর্ব	সুঙ্গবংশের লোপ	
৫০ খ্রীস্টপূর্ব—২৫০ খ্রীস্টাব্দ	দাক্ষিণাত্যের শতবাহন বংশ	
প্রথম শতক খ্রীস্টাব্দ	উত্তর-পশ্চিম ভারতে কুষাণদের আক্রমণ	রোমক-বৌদ্ধ স্থাপত্য ও ভাস্কর্য
৭৮—১০১ খ্রীস্টাব্দ (১২০—১৬২ ?)	কণিষ্ক (রাজধানী পেশোয়ার)	(২য়—৫ম শতক) মথুরায় দেশজ
১৩০—৩৮৮	উজ্জয়িনীতে শক শাসন	ভাস্কর্য রীতি (২য়—৪র্থ শতক) বুদ্ধ মূর্তির আবির্ভাব

গুপ্তযুগ : ৩২০—৫৫০ খ্রীস্টাব্দ

৩২০ (৩৩৫ ?)	প্রথম চন্দ্রগুপ্ত	অঙ্কশাস্ত্রে দশমিক প্রথার আবিষ্কার। সংস্কৃত ভাষার চরম উৎকর্ষ। অজন্তা ইলোরা বাঘ চিত্ররীতি। বৌদ্ধভাস্কর্য
৩৩৫(?)—৩৭৫	সমুদ্রগুপ্ত	
৩৭৫—৪১৫	দ্বিতীয়.চন্দ্রগুপ্ত	
৪১৫—৪৫৪	প্রথম কুমারগুপ্ত	
৪৫৪ (অনুমান)	প্রথম হুণ আক্রমণ	
৪৫৫—৪৬৭	স্কন্দগুপ্ত	
৪৯৫	দ্বিতীয় হুণ আক্রমণ	
৪৫০	গুপ্তবংশের লোপ	

হর্ষবর্ধন : ৬০৬—৬৪৭ কান্যকুব্জ

মধ্যযুগে দাক্ষিণাত্যের রাজবংশ : ৩০০ খ্রীস্টাব্দ—১৫৬৫ খ্রীস্টাব্দ

৩০০—৮৮৮	কাঞ্চীর পল্লব বংশ (মাদ্রাজ)	মহাবল্লীপুরম ভাস্কর্য; কাঞ্চীপুরমের মন্দির
৫৫০—৭৫৭	বাতাপীর প্রথম চালুক্য বংশ (পশ্চিম ও মধ্য দাক্ষিণাত্য)	বাদামী গুহা
৬৩০—৯৭০	ভেঙ্গীর পূর্ব চালুক্য বংশ („)	
৭৫৭—৯৭৩	মান্যখেতের রাষ্ট্রকূট বংশ („)	ইলোরার কৈলাসনাথ মন্দির, বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয়, বেদান্ত প্রচার, শঙ্করাচার্য (৭৮৮—৮২০ ?)। রামানুজ (১০১৭—১১৩৭ ?) ভক্তিতত্ত্ব
৮৫০—১২৬৭	তাঞ্জোরের চোলবংশ (মাদ্রাজ)	দক্ষিণ মাদ্রাজের মন্দির, দক্ষিণ ভারতের ব্রোঞ্জ
৯৭৩—১১৮৯	কল্যাণীর দ্বিতীয় চালুক্য বংশ (পশ্চিম ও মধ্য দাক্ষিণাত্য)	
১১১০—১৩২৭	হয়শল বংশ (মধ্য ও দক্ষিণ দাক্ষিণাত্য)	বেলুড়, হালেবিদ মন্দির
১১৯০—১২৯৪	দেবগিরির যাদব বংশ (উত্তর দাক্ষিণাত্য)	
১১৯৭—১৩২৩	ওয়ারাঙ্গলের কাকতীয় বংশ (পূর্ব দাক্ষিণাত্য)	
১২১৬—১৩২৭	মাদুরাই-এর পাণ্ড্য বংশ (মাদ্রাজ)	
১৩৩৬—১৫৬৫	বিজয়নগর সাম্রাজ্য	ভাস্কর্য, লেপাক্ষী,
১৫০৯—১৫২৯	কৃষ্ণদেব রায়া	দাক্ষিণাত্যের মন্দির
১৫৬৫	তালিকোটের যুদ্ধ ও বিজয়নগর লুণ্ঠন	

মধ্যযুগে উত্তর-ভারতের রাজবংশ : ৭১২—১১৯২ খ্রীস্টাব্দ

৭১২	আরবদের সিন্ধুদেশ দখল	
৭৩০	কান্যকুব্জের যশোবর্মণ	
৭৬০—১১৪২	পালবংশ (বাঙলা বিহার)	মহাযান ও তান্ত্রিক ধর্ম, বৌদ্ধ ভাস্কর্য, তন্ত্রের প্রসার
৭৬৭—১১৯৭	গুজরাটের শোলাঙ্কী বংশ	আবুপর্বতের দিলওয়ারা মন্দির, সোমনাথ মন্দির
৮০০—১০১৯	কান্যকুব্জের প্রতিহার বংশ	

৯১৬—১২০৩	বুন্দেলখণ্ডের চাণ্ডেল বংশ	
৯৫০—১১৯৫	ত্রিপুরীর কলচুরি বংশ (মধ্যপ্রদেশ)	
৯৭৩—১১৯২	আজমীরের চাহমান বংশ	
৯৭৪—১২৩৮	গুজরাটের চালুক্য বংশ	
৯৭৪—১০৬০	ধারার পরমার বংশ (মালোয়া)	
১০৭৬—১৫৮৬	কলিঙ্গের গঙ্গ বংশ (উড়িষ্যা)	পুরী, কোণার্ক, ভুবনেশ্বর
১০৯০—১১৯৩	কাশী কান্যকুব্জের গহড়ওয়াল বংশ	
১১১৮—১১৯৯	বাঙলার সেন বংশ	
১১৯২	তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ	

১২০০—১৫২৫ খ্রীস্টাব্দ

১২৯৬—১৫২৬	দিল্লী সুলতান বংশাবলী	মুসলমান স্থাপত্য, দিল্লী, আজমীর, মাণ্ডু,
	বাঙলা	বিজাপুর। পশ্চিম ভারতীয় চিত্ররীতি।
	গুজরাট	বিজাপুর চিত্ররীতি। বিজয়নগর
	দাক্ষিণাত্য	চিত্ররীতি।
৮১৬—১৮০০	রাজপুতানা ও মধ্য ভারতের রাজপুত বংশাবলী	রাজপুত দুর্গ ও প্রাসাদ, রাজপুত্র চিত্র

মুঘল যুগ : ১৫২৬—১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দ

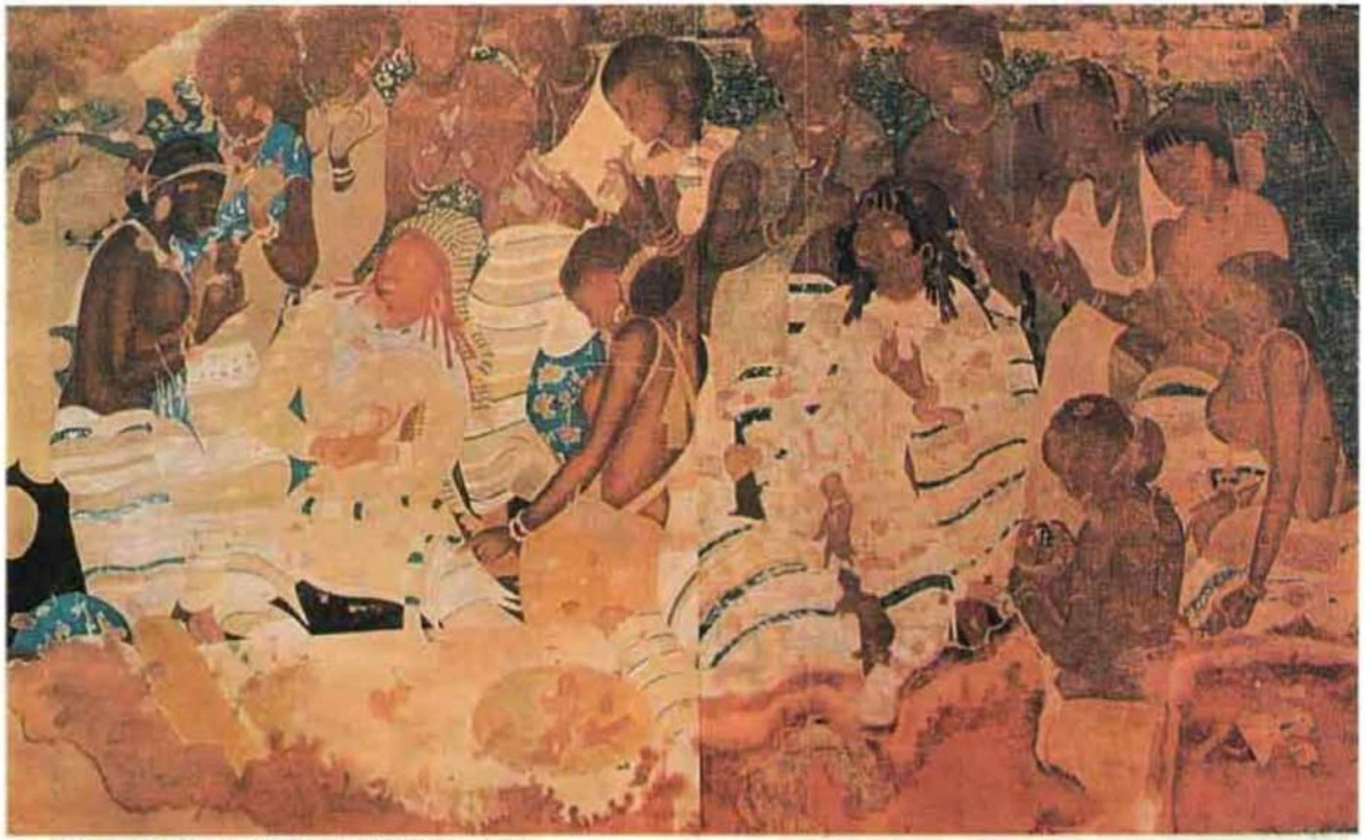
১৫২৬—১৫৩০	বাবর	মুঘল স্থাপত্য, দিল্লী, আগ্রা, ফতেপুর
১৫৩০—১৫৫৫	হুমায়ুন	সিক্রি, এলাহাবাদ, লাহোর। মুঘল
১৫৫৬—১৬০৫	আকবর	চিত্ররীতি। রাজপুত ও পাহাড়ী
১৬০৫—১৬২৭	জাহাঙ্গীর	চিত্ররীতি। গুরু নানক
১৬২৮—১৬৬৬	শাজাহান	(১৪৬৯—১৫৩৩)। মাদুরার প্রাসাদ।
১৬৬৬—১৭০৭	ঔরঙ্গজেব	
১৬২৭—১৬৮০	শিবাজী	
১৭৯০—১৮৪৯	শিখরাজ্য, পাঞ্জাব (রণজিৎ সিংহ)	



চিত্রিত হরিণ : খারভাই ভীমবেটকা (নিয়োলিথিক চ্যালকোলিথিক যুগ)



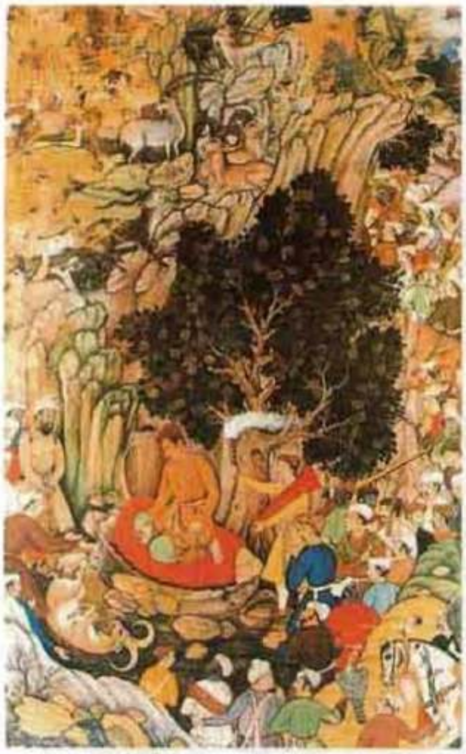
চিতাবাঘ : অনু ১০" খারভাই ভীমবেটকা (নিয়োলিথিক চ্যালকোলিথিক যুগ)



বাঘ : ৪নং গুহা : দুটি স্পষ্ট ভাগ অথচ একত্রে (কনেক্টিং-লিঙ্ক কম্পোজিশন)



পাল পুঁথিচিত্র : তান্ত্রিক দেবী (গোবিন্দপালদেবের ১৮শ সম্বৎসর (খ্রীঃ ১১৭৯-৮০)



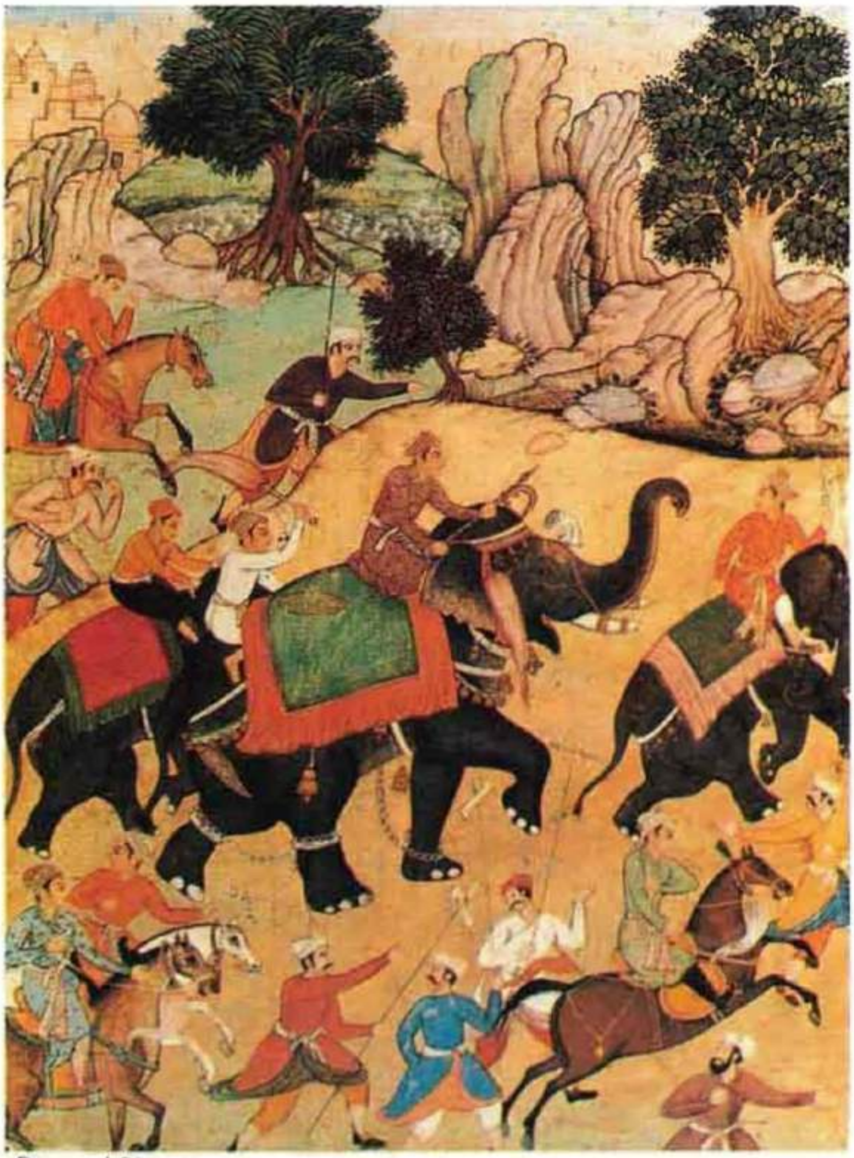
সম্রাট আকবর প্রাণীহত্যা অবসানের আদেশ দিতেছেন । আকবরনামা । আনু. ১৫৯০

দৈত্য অর্গন দিব আমীর জুরুকের পদে অস্ত্রের সিন্দুক সমর্পণ করছেন । হাম্‌জানামা । আনু. ১৫৭০





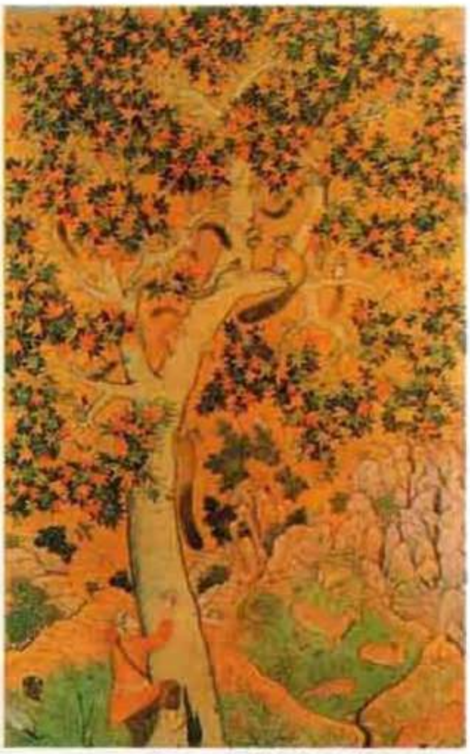
সম্রাট আকবর চিতাবাঘ নিয়ে শিকার করছেন। চিত্রকর বসাওয়ন ও ধরমদাস। আনু. ১৫৯০



হস্তী ও অশ্বপৃষ্ঠে শিকার । মুঘল । আনু. ১৫৯০



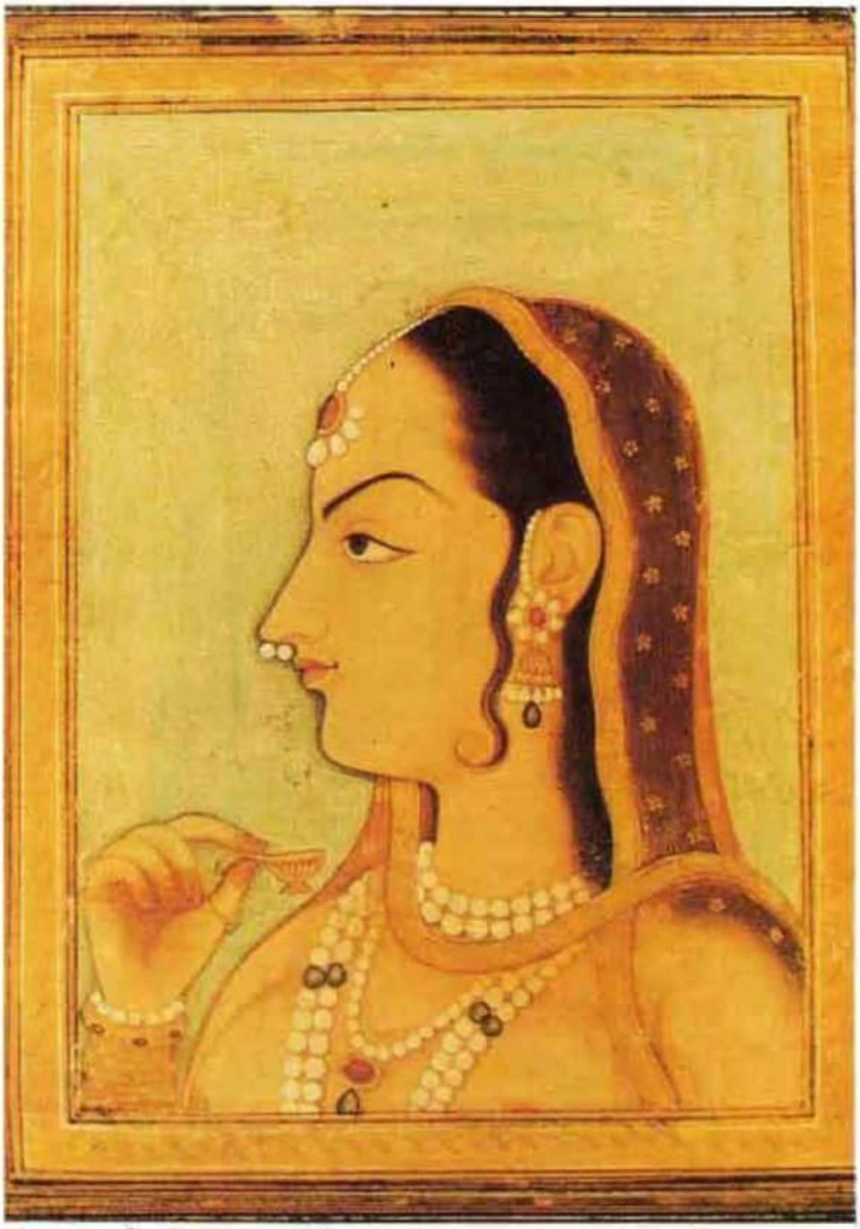
বন্য পক্ষীযুগল : শিল্পী মনসুর। মুঘল। ১৬০০-১৬২৫



চিনার গাছে কাঠবিড়ালী । শিল্পী আবুল হাসান
নাদির অলজামান । মুঘল । আনু. ১৬১০

দেওয়ান-ই-আমে সম্রাট শাজাহান ।
মুঘল । আনু. ১৬৫০

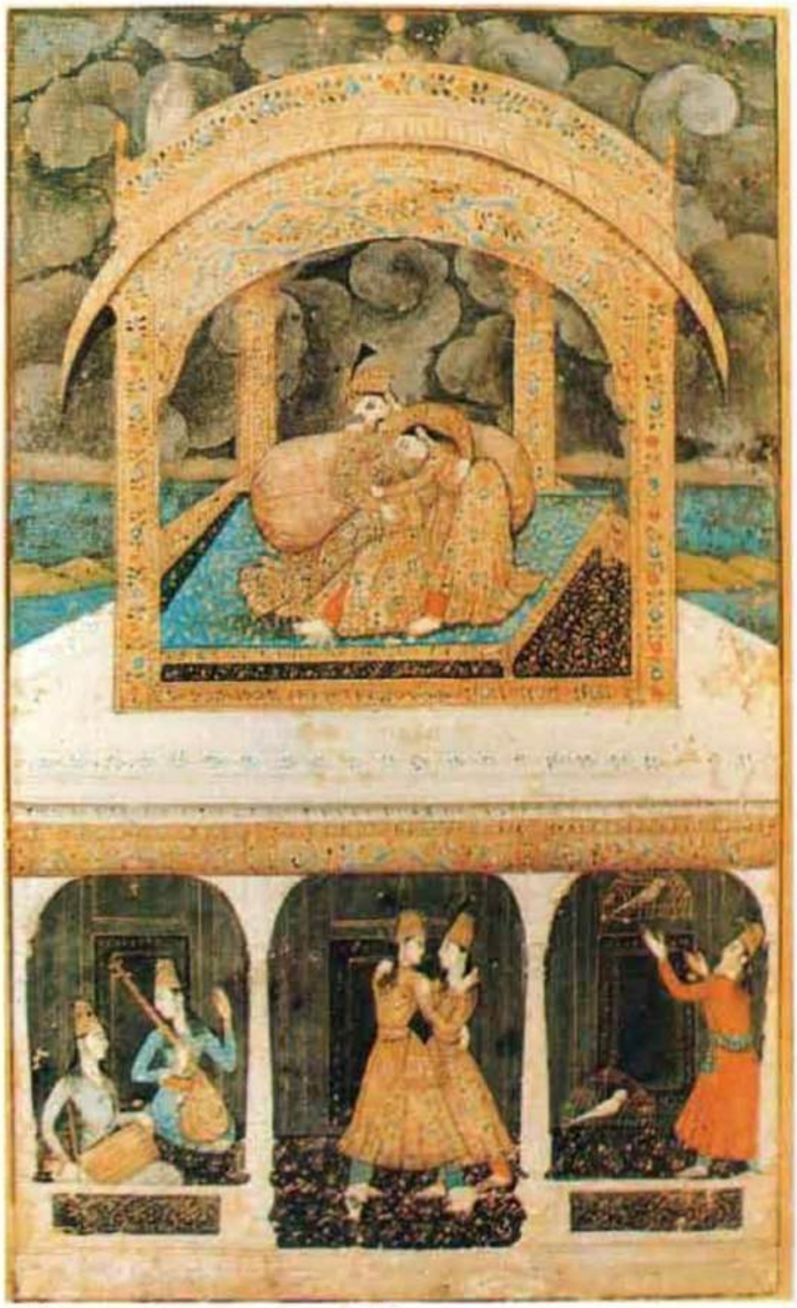




পানপাত্র হাতে রমণী । মিশ্র মুঘল-রাজপুত রীতি । আনু. ১৬২৫-৫০



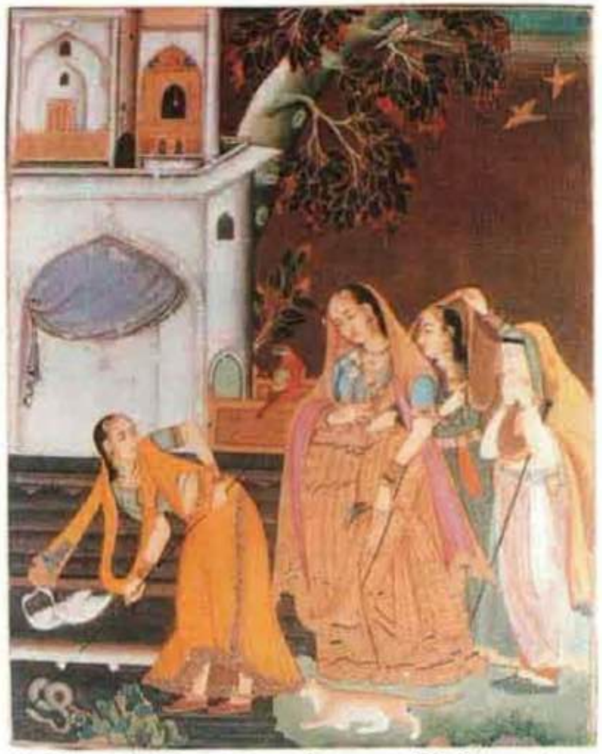
রাত্রিচারী সারস : দারা শিকো অ্যালবাম । মুঘল । আনু. ১৬৩৫



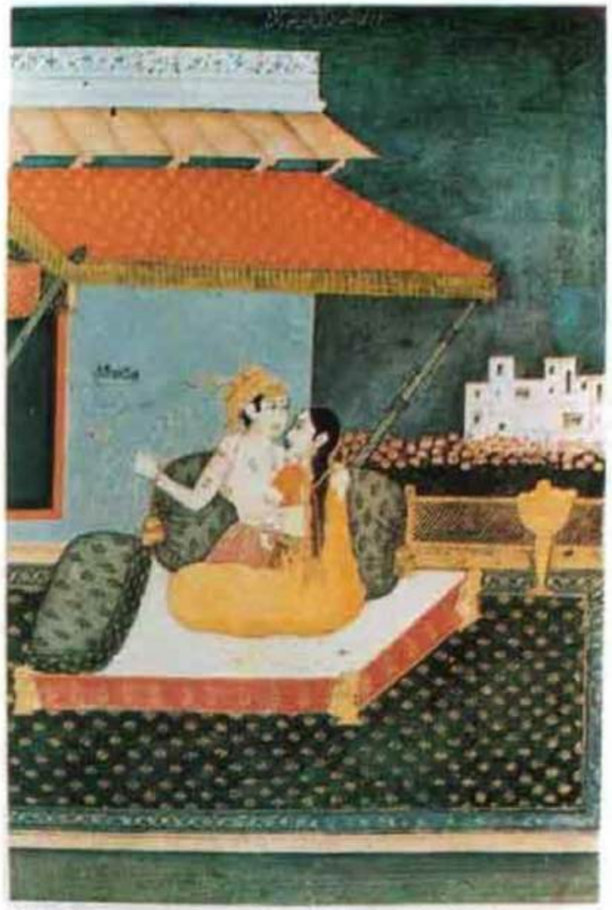
প্রেমালিঙ্গনে রাজদম্পতি । মুঘল অন্তযুগ । প্রাদেশিক রীতি । ফররুখাবাদ । আনু ১৭৭৫



অনুচরীসহ রাজকুমারী । মুঘল অন্তযুগ । প্রাদেশিক রীতি ।
ফররুখাবাদ । আনু. ১৭৬০-৭০



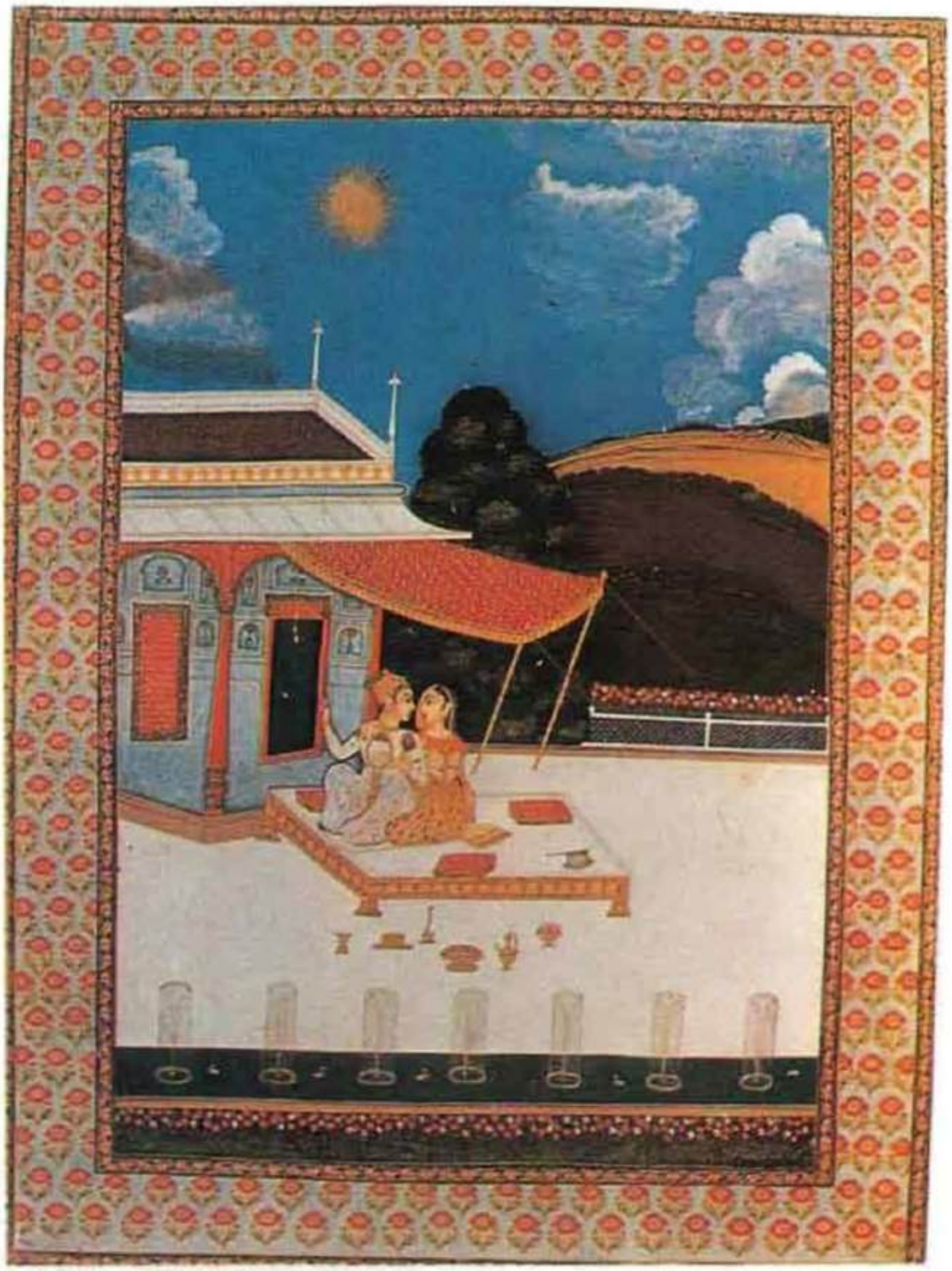
পরিচারিকাগণ সর্প বধ করিতেছে । রাজকুমারী দণ্ডায়মান । শিল্পী মীর কালাম খাঁ ।
প্রাদেশিক রীতি । ফৈজাবাদ (অযোধ্যা) । আনু. ১৭৭০



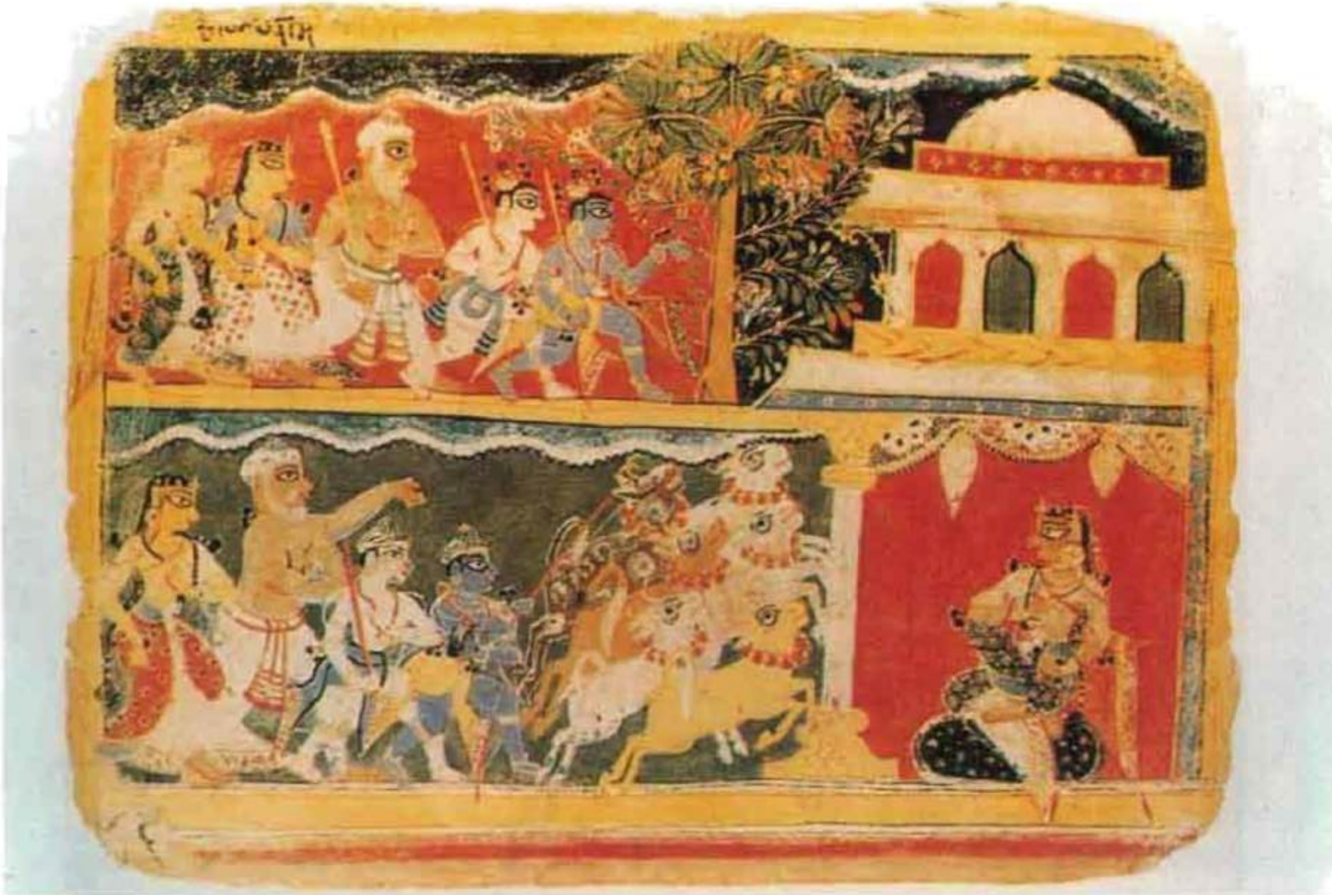
প্রেমিকার আলিঙ্গনবদ্ধ প্রেমিকের হাতে তীরধনুক। শিল্পী উদবন্ত সিং।
মুঘল অন্ত্যযুগ। প্রাদেশিক। অযোধ্যা। আনু. ১৭৭৫



যোগী ও রাজকুমার। প্রাদেশিক। মুর্শিদাবাদ। আনু. ১৭৫০-৭৫



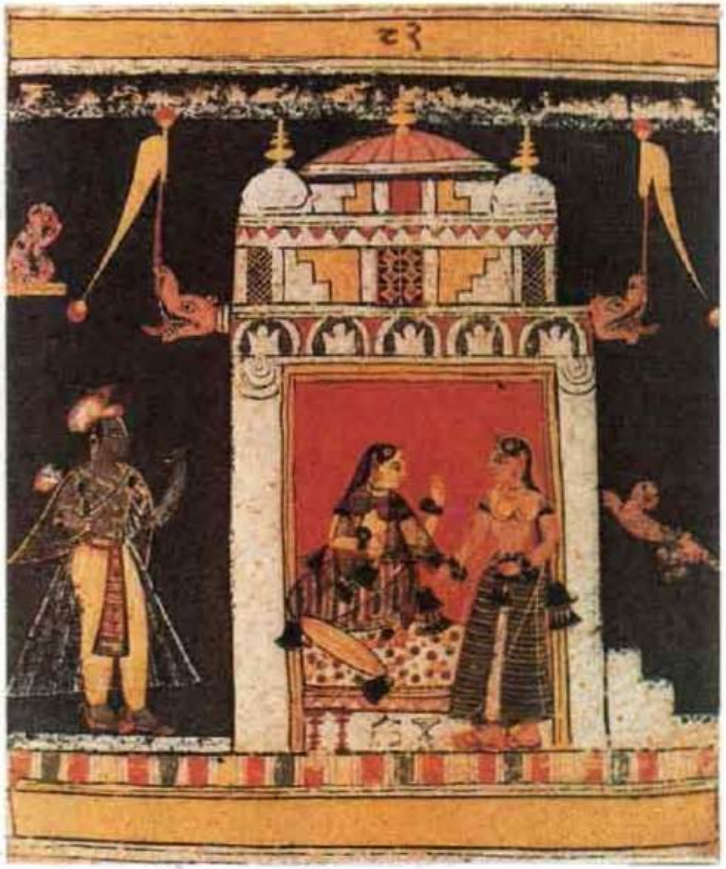
মধ্যমাদি রাগিণী । প্রাদেশিক । মুর্শিদাবাদ । আনু. ১৭৬০



বৃন্দাবনে কৃষ্ণ বলরাম । ভাগবত পুরাণ । উত্তর ভারত । আনু. ১৫৯০



মালকোষ রাগিণী । শিল্পী নাসিরুদ্দিন । মেবার । আনু. ১৬০৫



রাধার অন্বেষে কৃষ্ণ । শিল্পী কেশবদাস । রসিকপ্রিয়া । মালোয়া । আনু. ১৬২৫-১৬৫০



পুষ্করিণী তীরে স্নানরতা রমণী ; হাঁস ও সারস । দেওগড় । মেবার । আনু. ১৭৫০-১৭৭৫



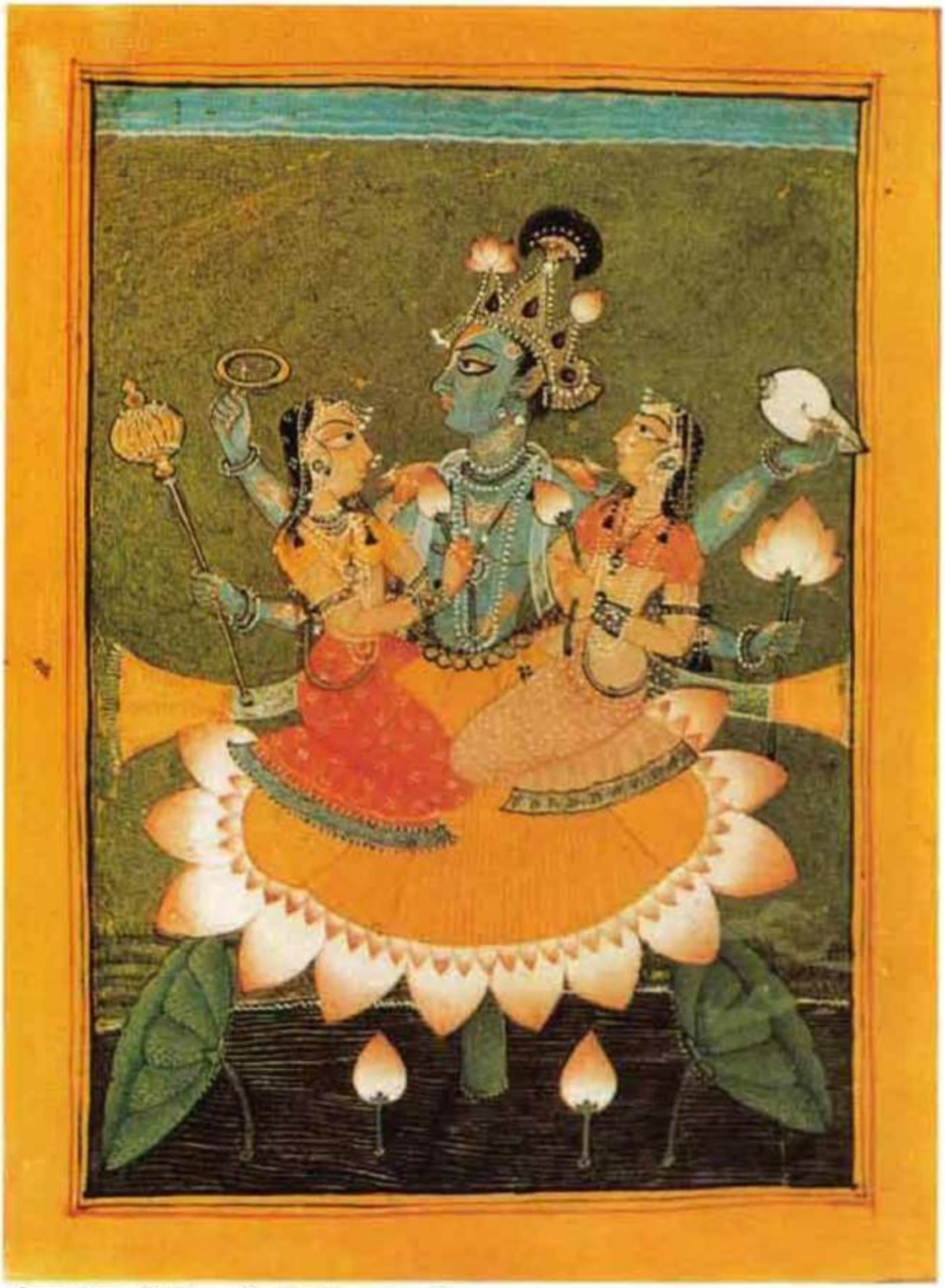
অশোকবনে হনুমান। উদয়পুর, মেবার। আনু. ১৬৫৩



রাধার কুঞ্জে কৃষ্ণ রাধার নিদ্রাভঙ্গ করছেন। মেবার। আনু. ১৭০০



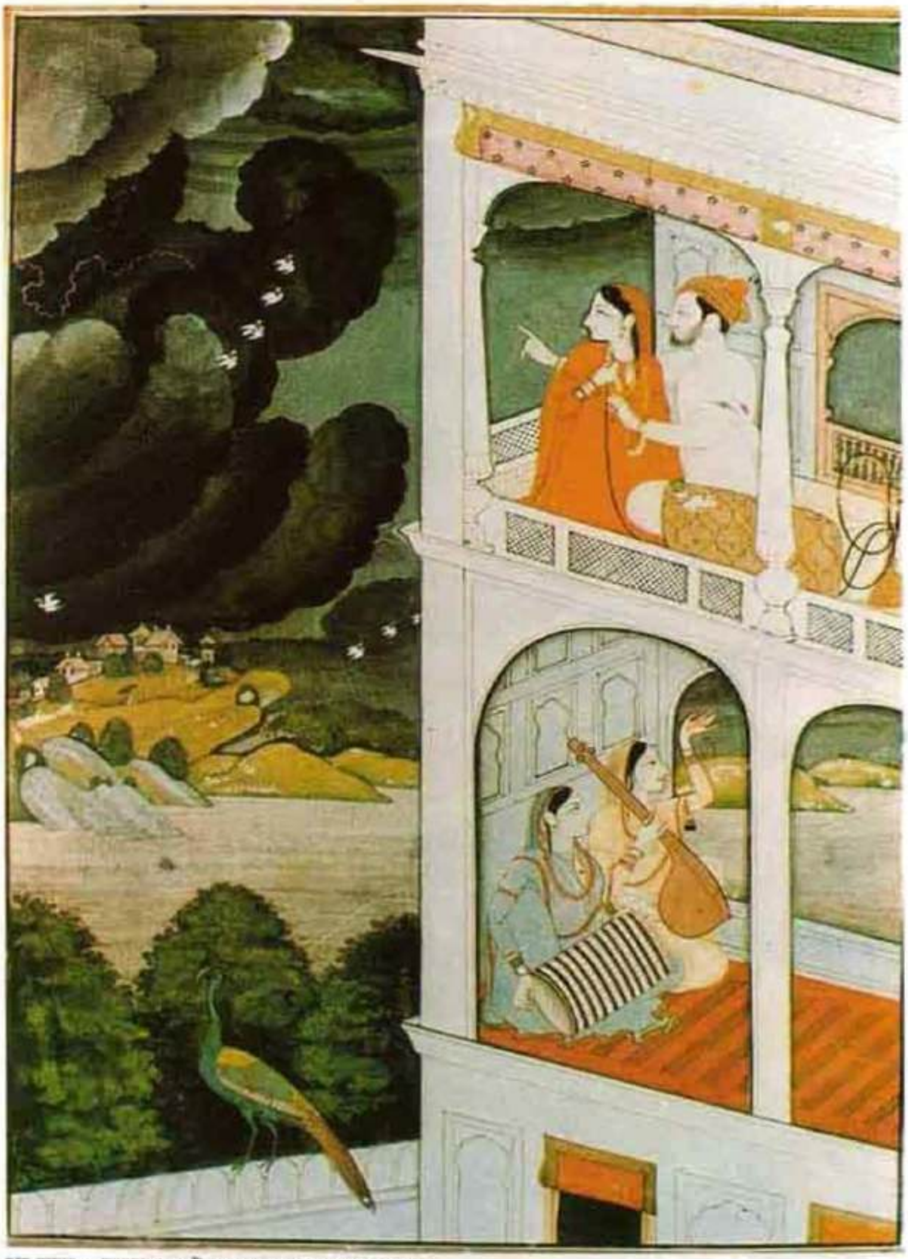
রাজকুমারী শিশুকে আশীর্বাদ করছেন ; সম্মুখে সহচরী দাঁড়িয়ে । বিলাসপুর । আনু. ১৬৫০



বিষ্ণুর দুই কোলে শ্রীদেবী ও ভূদেবী । বাশোলি অথবা মানকোট । আনু. ১৭০০



বিষ্ণু ও লক্ষ্মী (?)। কুলু। আনু. ১৭০০-১৭২৫



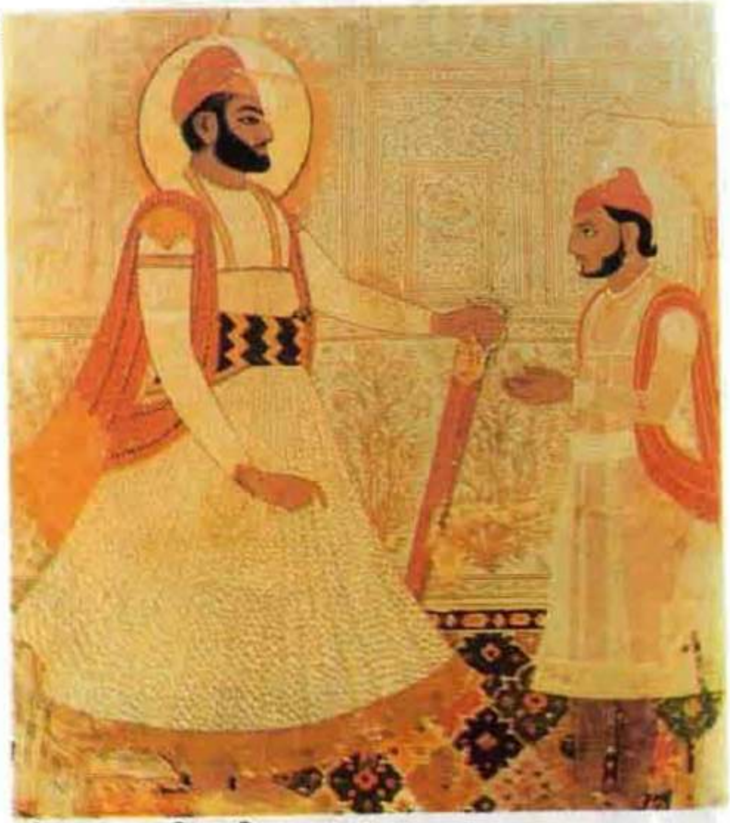
ঝড় আসন্ন । সম্ভবত গুরশাহি কলম । গুলের । আনু, ১৭০০



অলৌকিক কর্মকাণ্ডে রত শ্রীরাম । রামায়ণ চিত্রকলা । হিন্দুর । আনু, ১৮০০-১৮২৫



কৃষ্ণ ও রাধা । গাড়োয়াল । আনু ১৭৭৫



পাতিয়ালার রাজা করম সিং । পাতিয়ালা । আনু. ১৮৩০



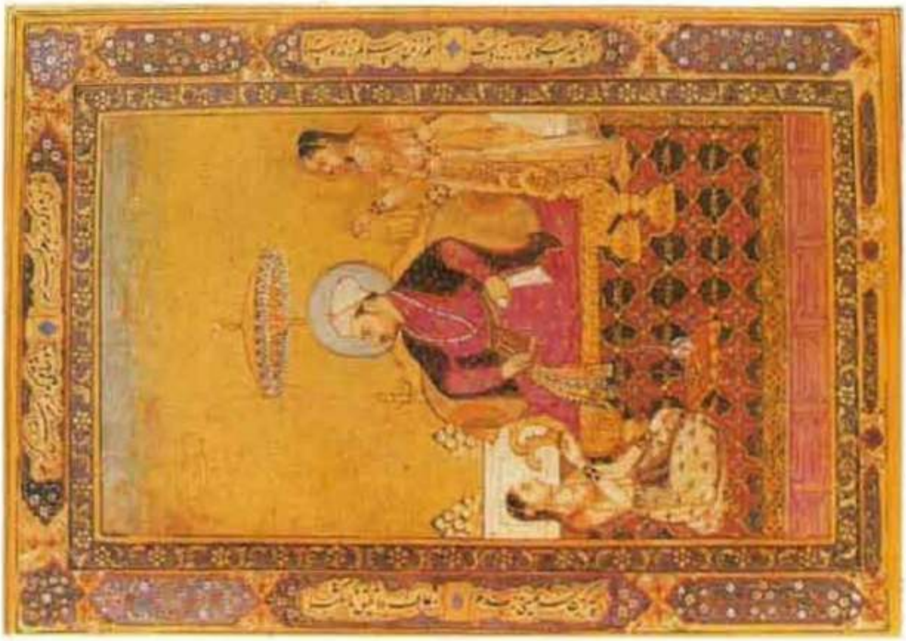
রাজকুমার বাজপক্ষী লইয়া শিকার খেলিতেছেন ।
গোলকুণ্ডা । আনু. ১৬১০-২০



বাশোলির রাজা সংগ্রাম পাল (১৬৩৫-১৬৭৩)। বাশোলি। আনু. ১৬৭৫-১৭০০।



কৃষ্ণের বিরুদ্ধে গোপীদের অনুযোগ। ভাগবত পুরাণ।
ঔরঙ্গাবাদ। আনু. ১৬৭৫-১৭০০



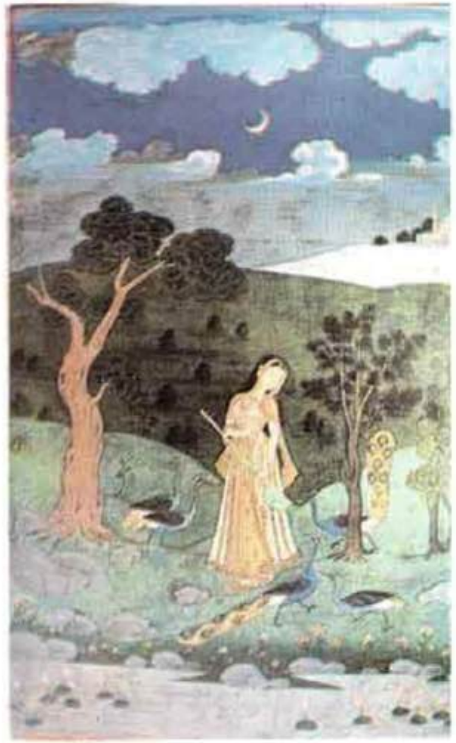
সিংহাসনাসীন রাজা। বিজাপুর। আনু. ১৬৭০



পারসীক রাজকুমার । গোলকুণ্ডা । আনু. ১৬৭৫



মহীশূরের টিপু সুলতান (১৭৮২-১৭৯৯) । মহীশূর । আনু ১৮০০



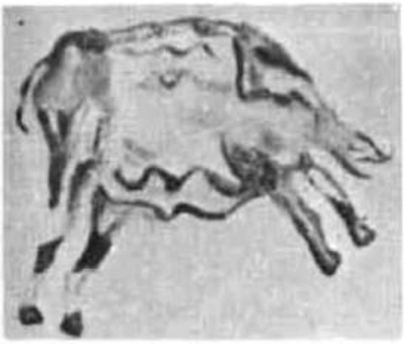
সোরথ রাগিণী । হায়দ্রাবাদ । আনু. ১৭৬০



মহেঞ্জোদারো : ডি-কে এরিয়া,
জি সেকশন, তলার স্তর :
ষাঁড়ের সীল



হরপ্পা পটারি : মানুষ ও জীবজন্তু
(হরপ্পার ঢিপি)



ইতিহাসের আগের যুগের গুহাচিত্র



মহেঞ্জোদারো : ডি-কে এরিয়া,
জি সেকশন, তলার স্তর :
চিত্রিত পটারির টুকরো



হরপ্পায় প্রাপ্ত বসা অবস্থায়
ছোট মূর্তি



হরপ্পায় প্রাপ্ত
মানুষের
ছোট মূর্তি



হরপ্পায় প্রাপ্ত
ছেলে-কোলে মাতৃমূর্তি



মহেঞ্জোদারো : ডি-কে এরিয়া,
জি সেকশন, নীচের স্তর :
বাঘের সীল



মহেঞ্জোদারো : ডি-কে এরিয়া,
জি সেকশন, নীচের স্তর :
হাতির সীল



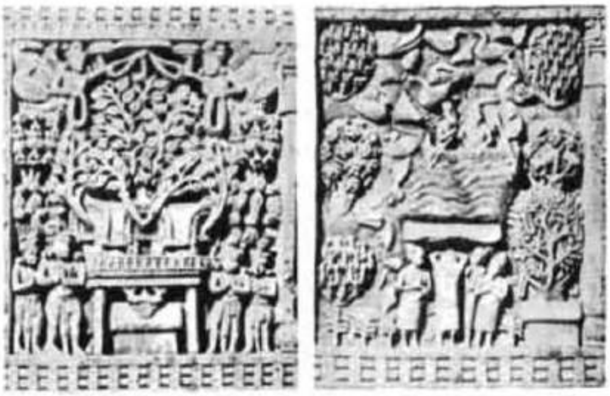
হরপ্পায় প্রাপ্ত দুটি
ছোট মূর্তি



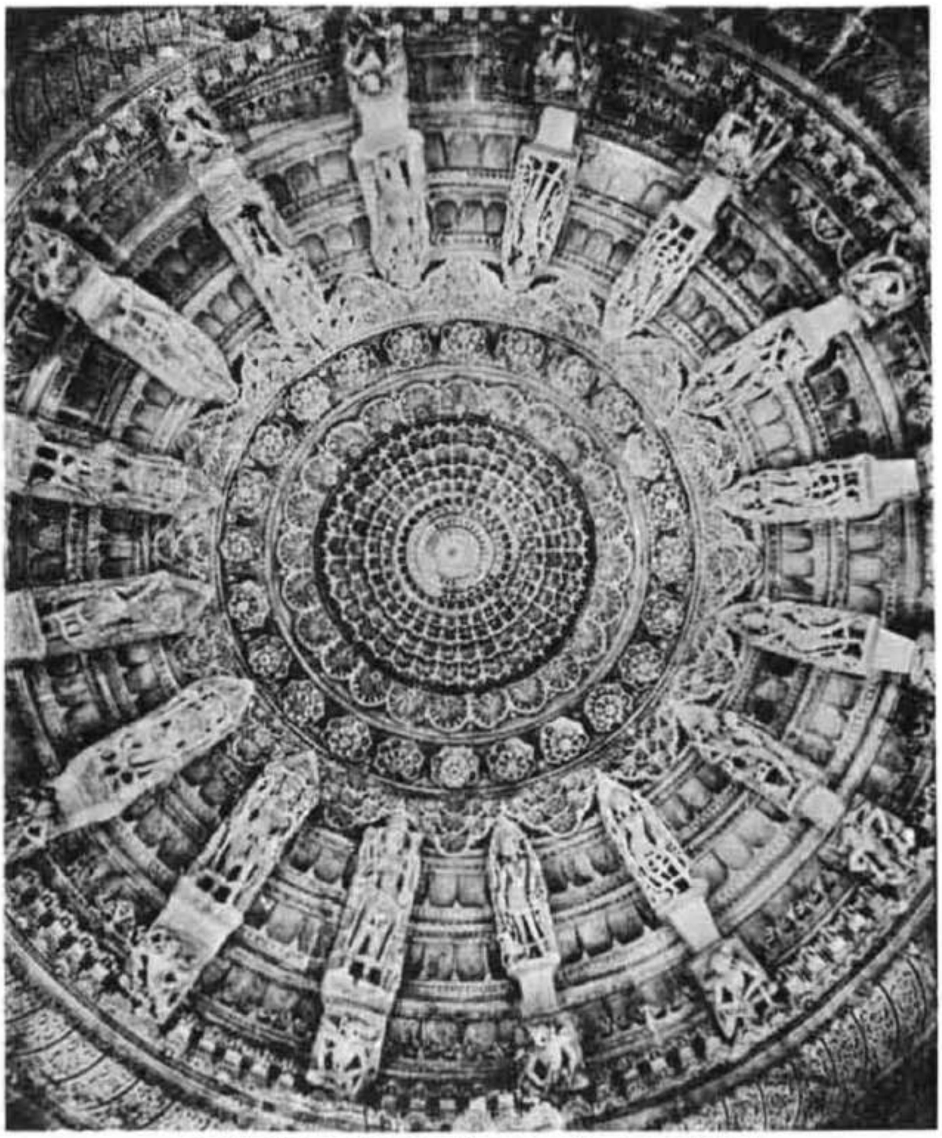
মহেঞ্জোদারোয় প্রাপ্ত নানা জন্তুর সীল



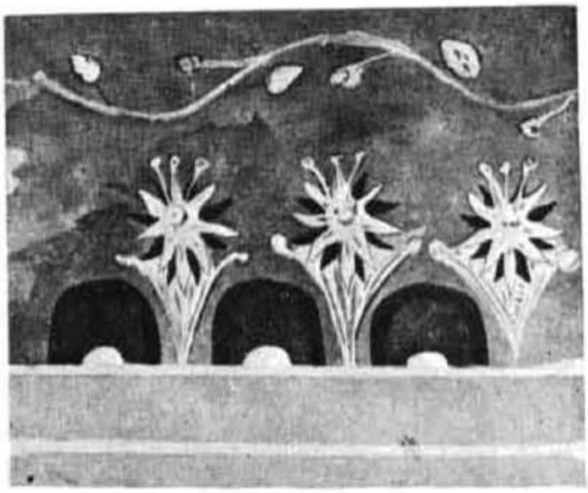
সিগিরিয়ার একটি ফ্রেস্কো



সাঁচির পূর্বতোরণে খোদাই (খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতক)



আবু পর্বতের দিলওয়ারা মন্দিরের ছাতের ভিতরকার ভাস্কর্য (অনুমান ১২৩২ খ্রীস্টাব্দ)



বাঘ : ৪নং গুহার উত্তর-পূর্ব প্রকোষ্ঠের ফ্রিজের অংশ



বাঘ : ৪নং গুহার সমুখের
বারান্দার ছবি



বাঘ : ৩নং গুহার প্রকোষ্ঠে দরজার ছবি



বাঘ : ৩নং গুহার প্রকোষ্ঠে দরজার ছবি



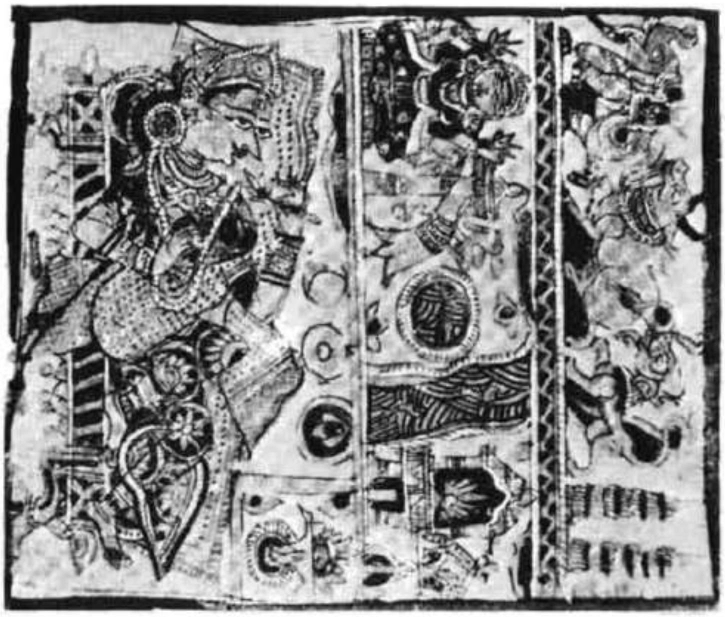
দণ্ডন-উলিখ : চীনে রাজকুমারী



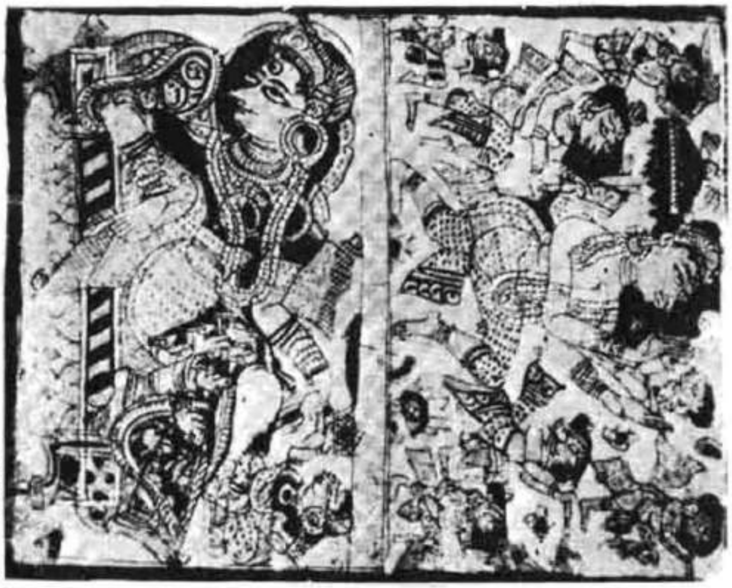
দণ্ডন-উলিখ : পারসীক বোধিসত্ত্ব
(কাঠের পাটায় চিত্রিত)



তিব্বতী ধ্বজা : বুদ্ধ অমিতাভ



দেবানন্দ চৌদ্দটি স্বপ্ন দেখছেন : ফোলিও ৩-ক। কল্পসূত্র ও কালকাকথা। সংগ্রহ : মুনি শ্রীপুণ্যবিজয়জী মহারাজ, খ্রীঃ ১৩৪৬



মহাবীরের জন্ম। ফোলিও ৩৬-খ। কল্পসূত্র ও কালকাকথা। সংগ্রহ : মুনি শ্রীপুণ্যবিজয়জী মহারাজ। খ্রীঃ ১৩৪৬



যুদ্ধদৃশ্য : নল-দময়ন্তী রাস পুঁথিচিত্র, ফোলিও ১৬-খ। সংগ্রহ : মুনি শ্রীপুণ্যবিজয়জী মহারাজ। খ্রীঃ ১৭শ শতক

ব্যাতম্র বৃক্ষের বিভিন্ন প্রতীক। ফোলিও ৬-ক। লঘু সংগ্রহণী সূত্র। খ্রীঃ ১৫৮৩



নর্তকী ও বাদ্যকরগণ। ফোলিও ৭-খ। লঘু সংগ্রহণী সূত্র। খ্রীঃ ১৫৮৩। সংগ্রহ : শ্রীপুণ্যবিজয়জী মহারাজ



মহাবীরের জন্ম। উত্তরাধ্যয়ন সূত্রের পুঁথিচিত্র : ষোল শতক (১৫৯০-১)



আমীর হামজা (১৫৫০-৭৫) : কাপড়ের উপর চিত্র



ফতেপুর-সিক্রির দেয়াল চিত্র : একটি নৌকায় আটটি যাত্রী (ষোল শতকের শেষভাগ)



ঝিলম নদীর উপর নৌকাসেতুতে হাতির পিঠে আকবরের যুদ্ধ।
আকবরনামা হইতে : বসাওয়ন ও ছতরের কাজ



আকবরনামা (অনুমান ১৬০২) রাজপুত্র সেলীমের জন্মসংবাদ (কেশুর রেখা, ছতরের রঙ)



যুবরাজ সেলীম হিসাবে জাহাঙ্গীর (দারা শিকো অ্যালবামের ১৮নং ফোলিও)



প্রাণীহত্যা সম্বন্ধে জাহাঙ্গীরের
ফর্মান সম্বলিত বিজ্ঞপ্তিপত্র
(সতেরো শতক)



শা দৌলতের প্রতিকৃতি (চিত্রকর বিচিত্র)



রাত্রে পথিকদের আগুন পোহান



ধনশ্রী রাগিণী (অনুমান ১৫৭০)



গাছতলায় বিশ্রামরত ফকীরের দল (অনুমান ১৬৫০ খ্রীঃ)



রাজান্তঃপুরের দৃশ্য : কাপড়ের উপর আঁকা, চারপাশের পাড় ছাপা (অনুমান ১৬১৫-৪০)



শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা : ভাগবত পুরাণ পুঁথিচিত্র, মারোয়াড় (যোধপুর), সতেরো শতকের মাঝামাঝি



কৃষ্ণলীলা : দানলীলা (রাজপুত, অনুমান ১৫৮০)। ভাগবত পুরাণ পুঁথিচিত্র



রসিকপ্রিয়া পুঁথিচিত্র, মালোয়া, মধ্য ভারত
(সতেরো শতকের তৃতীয়াংশ)



রাধাকৃষ্ণ লীলা, কাংড়া
(আঠারো শতকের শেষভাগ)



মহারাজ রাজসিংহের কন্যা : চিত্রকর ওস্তাদ হামিদ আহমদের পুত্র (অনুমান ১৭৯৮-৯৯)। লালগড় প্রাসাদ



রাজান্তঃপুরিকা, কাংড়া (আঠারো শতকের শেষভাগ)



মহারাজ সুরৎ সিংহ (রাজত্ব ১৭৮৭-১৮২৮),
কোলে চৌকল সিংহ
(চিত্রকর ওস্তাদ কাশিম, ১৮০৯) লালগড় প্রাসাদ

খণ্ডিতা নায়িকা : মধুমালতী পুঁথিচিত্র,
রাজস্থানী, অনুমান আঠারো শতক





প্রেমের তুফান, কাংড়া
(অনুমান ১৮২০)



কাণামাছি খেলা (চিত্রকর মানক)



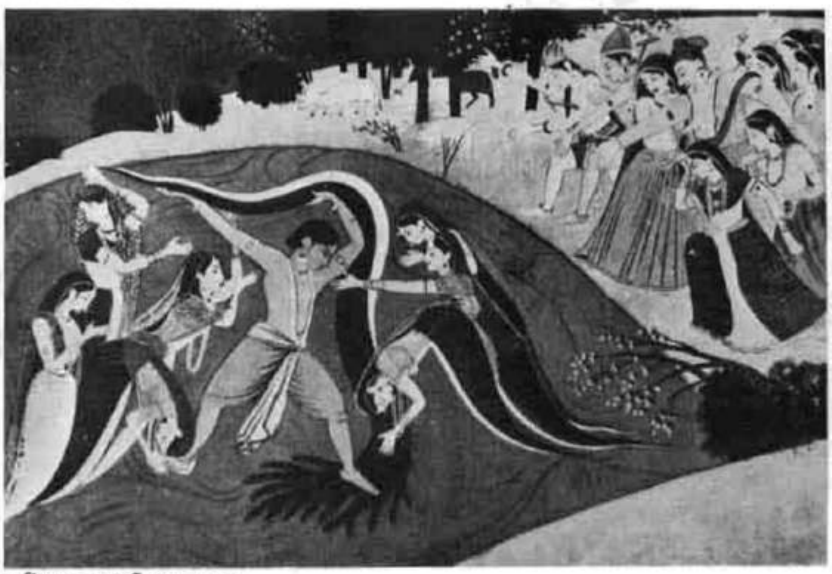
রাম ও ভরতের মিলন : তুলসীদাস রামায়ণের পুঁথিচিত্র, মুর্শিদাবাদ, অনুমান ১৭৭২-৭৫



কৃষ্ণ গোপিনী, কাংড়া (অনুমান ১৮০০)



যশোহরের পুরনো কাঁথা



কালীয় দমন (তেহরি-গাঢ়োয়াল ?)



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ছবি



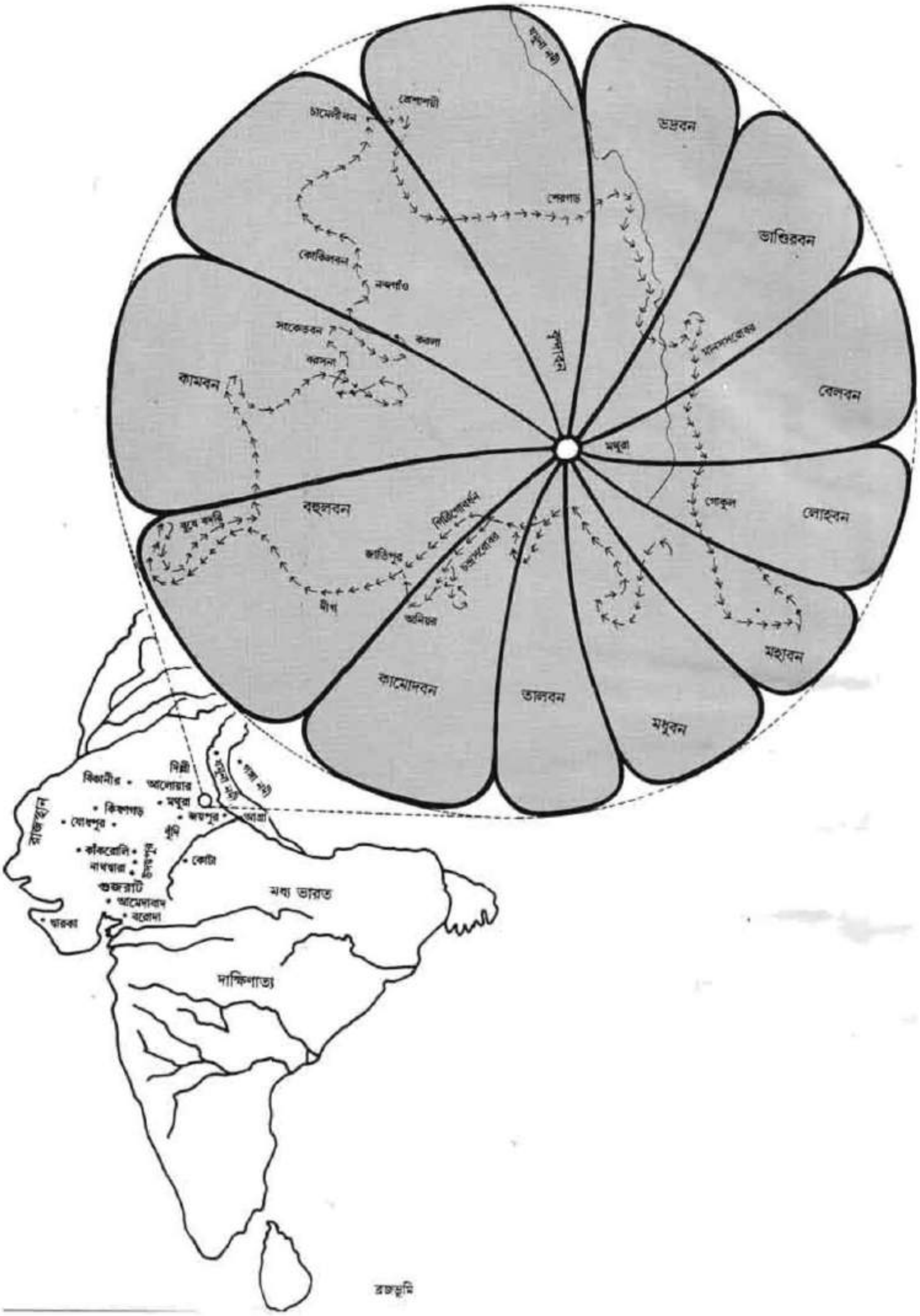
যামিনী রায় : ছবি



গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর : ছবি



অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ওমর খৈয়াম চিত্র


ভদ্রবন
ভাণ্ডিরবন
বেলবন
লোহবন
মহাবন
মধুবন
তালবন
কামোদবন
বহুলবন
কামবন
বৃন্দাবন
মথুরা
গোকুল
শেরগড়
কোকিলবন
চামেলীবন
নন্দগাঁও
বরসানা
ডীগ
গিরিগোবর্ধন
যমুনা নদী
গঙ্গা নদী
দিল্লী
বিকানীর
আলোয়ার
মথুরা
কিষণগড়
যোধপুর
জয়পুর
আগ্রা
বুন্দি
কাঁকরোলি
নাথদ্বারা
উদয়পুর
কোটা
রাজস্থান
গুজরাট
আমেদাবাদ
বরোদা
দ্বারকা
মধ্য ভারত
দাক্ষিণাত্য

ব্রজভূমি

নির্ঘণ্ট
